মক্কা শরীফের ইতিকথা

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

মক্কা শরীফের ইতিকথা

مَكَانَةُ الْحَرَمِ الْمَكِّيْ عَبْرَ التَّارِيْخْ

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৭

ISBN 984-842-077-x

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৯
পঞ্চম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৭

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা।

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় : দুইশত টাকা মাত্র

Makka Sharifer Etikatha (History and Significance of Holy Makkah) Written by ANM Sirajul Islam and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 1st Edition July 1989 Fifth Edition December 2007 Price Taka 200.00 only.

সূচীপত্র

কা'বা শরীফের বর্ণনা

হাজারে আসওয়াদ বা কালোপাথর

রোকনে ইয়ামানী

গেলাফে কা'বা

বায়তুল্লাহর তওয়াফ

হিজরে ইসমাঈল (হাতীম)

৫. মসজিদে হারাম

মসজিদে হারামের ইতিহাস

মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ ও নির্মাণ

৬. সাফা-মারওয়া

৭. হুদুদে হারাম (হারাম এলাকা)

হারাম এলাকার ৩২টি বিশেষ ফিক্হী মাসআলা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কেন এই বই?

এই বইতে ইতিহাসের আলোচনা থাকলেও তা গতানুগতিক কোন ইতিহাস নয়। বরং পবিত্র কা'বা, মসজিদের হারাম এবং মক্কাকে ঘিরে যে অসংখ্য ও অজানা রহস্য রয়েছে তার সঠিক তাৎপর্য তুলে ধরাই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর শতকোটি মুসলমান প্রত্যেকেই এসব রহস্য ও তাৎপর্য জানার ব্যাপারে আগ্রহী। আর বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কোন বই না থাকায় বাংলা ভাষাভাষী পাঠকরা এ ব্যাপারে আরো বেশী আগ্রহী হবে,এটাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ছোটকালে স্বপ্নে দেখি যে, পবিত্র কা'বার তওয়াফ করছি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে কা'বাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং নিম্নোক্ত গানটির মধ্যে সেই মর্ম খুঁজে পাই।

গানটির অংশবিশেষ হচ্ছে ঃ

> দূর আরবের স্বপন দেখি
> বাংলাদেশের কুটির হতে
> আমি চলছি যেন বেহুঁশ হয়ে
> কেঁদে কেঁদে কা'বার পথে...

১৯৮০ সালে ঢাকাস্থ সৌদী দূতাবাসে চাকুরী করার সময় হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কায় গিয়ে উক্ত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার সুযোগ পাই। ১৯৮২ সালে মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাইতুল্লাহকে ভিত্তি করে লেখা শুরুর আগ্রহ জাগে। তখন থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। জেদ্দা রেডিওর বাংলা বিভাগে আমাকে 'ইতিহাসের আলোকে হারামাইন শরীফাইন' এই বিষয়ের উপর ধারাবাহিক আলোচনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন থেকেই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই বই লেখার কাজটি বাস্তবে শুরু হয়।

এই বই লেখার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য ভাই হেলাল আহমদ, সাইয়েদ শহীদুল বারী, যোবায়ের হাওয়ারী এবং লেখায় সহযোগিতার জন্য আমার স্ত্রী রাবেয়া আখতার বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাদের উত্তম বিনিময়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই।

যে কোন সংশোধনী সাদরে গৃহীত হবে। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন। আমীন।

১৫ই মার্চ ১৯৮৯ খৃঃ
৮ই শাবান ১৪০৯ হিজরী
১লা চৈত্র ১৩৯৫ সাল

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা,
সৌদী আরব।

৪র্থ সংস্করণের ভূমিকা

'মক্কা শরীফের ইতিকথা' বই-এর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ আগ্রহী পাঠক সমাজের পরামর্শের আলোকে বইটিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। মক্কার ভৌগোলিক উন্নয়নের কারণেও তথ্যগত পরিবর্তন সাধন এবং হজ্জের ৭০টি ভুল সংশোধন জরুরী হয়ে পড়ে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বর্ধিত কলেবরে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

১. মক্কা শরীফ

প্রাথমিক কথা ঃ

মক্কার ভৌগোলিক বর্ণনা

পবিত্র মক্কা ২১.৫০ অক্ষাংশ, ৪০ দ্রাঘিমাংশ এবং সমুদ্রের স্তর থেকে ২৮০ মিটার উপরে অবস্থান করছে।[১] মক্কার আবহাওয়া উষ্ণ। বছরে ৭ মাস প্রচণ্ড গরম থাকে এবং ৫ মাস আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে। ঐ ৫ মাসকে মক্কায় শীত মওসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের শীতের মাত্রার চেয়ে তা অনেক কম। তখন তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রীর কাছে থাকে। গরম কালে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী থেকে ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[২]

মিসরের দু'জন ভূগোল বিজ্ঞানী গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মক্কা ভূমণ্ডলের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সকল অঞ্চলের মানুষের কাছে এর দূরত্বের ব্যবধান সমান করতে চেয়েছেন। অপরদিকে, আল্লাহর কুদরতে প্রথমে নতুন চাঁদ মক্কার নিকটবর্তী অঞ্চলের আকাশে দেখা যায়। তারপরের দিন মক্কার পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোতে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, একদিন পর লণ্ডন ও বাংলাদেশে নতুন চাঁদ দেখা যায়। এর দ্বারা মক্কা ভূমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে হয়।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে মহান ও সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যমীন সৃষ্টির ১ হাজার বছর আগে মক্কা সৃষ্টি করে ফেরেশতাদেরকে দিয়ে তা ঘেরাও করে রেখেছিলেন। তারপর মদীনা ও বায়তুল মাকদেস সৃষ্টি করে ঐ দুটোকে মক্কার সাথে যুক্ত করে দেন। তারও ১ হাজার বছর পর তিনি সমগ্র যমীন একসাথে সৃষ্টি করেন।[৩]

পবিত্র মক্কা নগরী পাহাড়-পর্বতে ভরা। যেদিকেই দৃষ্টি যায় সেদিকেই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সে পাহাড়গুলো কঠিন পাথর দ্বারা গঠিত। তাতে বালুর নাম নিশানাও নেই, নেই কোন গাছপালা। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে কিছু ছোট গাছ ও ঘাস দেখা যায়। এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ মরুভূমি। এখানে কোন পুকুর ও নদীনালা নেই। মাটির নীচে, অদূরেই পানির স্তর রয়েছে। যমীন খুবই উর্বর। পানি সেচের

মাধ্যমে চাষাবাদ করলে যথেষ্ট ফসল উৎপাদন হয়। বর্তমানে মক্কায় কিছু চাষাবাদ শুরু হয়েছে এবং ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে। ভূতত্ত্ববিদদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, আজকের বিশাল মরু মক্কা পূর্বে ইতিহাসের কোন এক অজ্ঞাত সময়ে, সবুজ শ্যামল এবং জনবসতিপূর্ণ ছিল। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ুর কারণে এখানকার আবহাওয়া আর্দ্র ছিল। মক্কার উঁচু পাহাড়সমূহে বৃষ্টি বর্ষিত হত এবং নীচু উপত্যকাসমূহ দিয়ে স্রোত প্রবাহিত হত। ফলে এখানকার মাটি সেই পানিতে সিক্ত হত এবং এখানে ফসলাদি উৎপন্ন হত। আজকে মক্কার মাটির নীচে, অদূরেই পানির যে স্তর রয়েছে তাও সে কথার প্রমাণ বহন করে। রাস্তা মেরামতের জন্য সমান্য খনন কাজ করলেই নীচে পানি আর পানি দেখতে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তকীউদ্দিন আলফাসী তার 'শেফাউল গারাম' বইতে ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলফাকেহীর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাক বলেছেন, হেজায অঞ্চল আল্লাহর নেয়ামতে ভরা এবং সেখানে অধিক পানির সমারোহ। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক খরার কারণে, শত শত বছর ধরে, তা কঠোর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং প্রবাহিত নদী-নালা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে যে সকল মরুদ্যানের অস্তিত্বের কথা বর্ণিত আছে, আজকে তার অধিকাংশই বিলুপ্ত। মদীনার ইহুদীরা, তায়েফের সাকিফ গোত্র এবং মক্কার কোরাইশরা যে সকল মরুদ্যানে চাষাবাদ করত আজ আর সেগুলো নেই। অনেক কূপ শুকিয়ে গেছে এবং মদীনা, তায়েফ ও ওয়াদী ইবরাহীমে প্রবাহিত বন্যার সংখ্যাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, মক্কার খরা ও উষ্ণতা বর্তমানের চাইতে ভবিষ্যতে আরো তীব্র হবে এবং এখানকার ভবিষ্যত নাগরিকেরা এই প্রচণ্ড উষ্ণতার শিকার হবে। মক্কা ও আরবদ্বীপের বিভিন্ন শহরে বসবাসকারীরা ভাল করেই জানে যে মক্কার অতীতের পানি ও উর্বরতা বর্তমানের চাইতে পরিমাণগত দিক থেকে অনেক বেশী ছিল। অতীতের ফল-ফলাদি ও সবজির বাগান মক্কার চতুর্দিকে বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। দীর্ঘদিনের কঠোর খরা ও রৌদ্রের কারণে আজ তার কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নেই।[8]

মক্কা শরীফ বলতে, কাবা শরীফ যে জায়গায় অবস্থিত সে জায়গাসহ পুরো শহর তথা 'হুদুদে হারাম' বা হারাম এলাকার সীমান্তের ভেতরকার সকল এলাকাকে বুঝায়। অবশ্য আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হুদুদে হারামের বাইরেও মক্কা শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে।

কাবা শরীফ যে জায়গায় অবস্থিত সেটিকে ইসলামী সাহিত্যে 'মক্কা উপত্যকা' কিংবা 'ইবরাহীম উপত্যকা' বলা হয়। এই উপত্যকাটি সুদূর আরাফাত থেকে শুরু হয়েছে এবং মুযদালিফা হয়ে মিনায় এসে সরু হয়ে গেছে। পুনরায় তা বর্তমান শিশ্‌শা, মায়াবদা (সাবেক বাতহা) ও হুজুন হয়ে কাবা শরীফের দিকে ঢালু হয়ে আরো সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে মেসফালা ও কুদাই হয়ে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত এই দীর্ঘ উপত্যকাটি, কাবা শরীফের কাছে এসে 'মক্কা উপত্যকা' বা 'ইবরাহীম উপত্যকা' নামে পরিচিত হয়েছে। অবশ্য আরাফাত, মিনা ও মুযদালাফার পাহাড়ে বর্ষিত বৃষ্টির পানি আরাফাত থেকে দক্ষিণ দিকে নীচু ভূমির দিকে গড়ায়। নোমান উপত্যকা, বাতহা, হুজুন ও ইবরাহীম উপত্যকার দুই পার্শ্বে অবস্থিত পাহাড়ের বৃষ্টির পানি ইবরাহীম উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়। পূর্বে অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে কাবা শরীফের পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতে স্বয়ং আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ কয়েক দফা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে মাটির নীচ দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন করা হয়েছে এবং ইতিহাসে বর্ণিত মক্কার ভয়াবহ বন্যার মত কোন বন্যা দীর্ঘদিন যাবত হয়নি বলে সাম্প্রতিককালে আমরা ঐ জাতীয় বন্যার কোন ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পারিনি। মক্কার হুজুন ও বাতহার দিকের অংশকে عَوَالِىْ مَكَّةَ মক্কার উঁচু দিক এবং মেসফালার দিককে سَوَا فِلُ مَكَّةَ নীচু দিক বলা হয়। হিজরী ১৭ সালে হযরত উমর (রা) এর যুগে পাহাড়ের বৃষ্টির পানি দ্বারা মক্কার উঁচুদিক থেকে এক ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি হয় যা মাকামে ইবরাহীমকে স্থানচ্যুত করে ভাসিয়ে নেয়। সেই বন্যায় উম্মে নাহশাল বিনতে ওবাইদা বিন সাঈদ বিন আল-আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস মারা যায়। তার নামানুসারে ঐ বন্যাকে 'উম্মে নাহশাল বন্যা' বলা হয়।[৫] এ ছাড়াও পরবর্তীতে আরো অনেক বন্যা হয়েছে। মসজিদে হারামে মোট ৩২ বার বন্যা হয়েছে। ১ম বন্যা হয়েছে ১৭ হিজরীতে, হযরত উমর (রা) এর শাসনামলে। আর সর্বশেষ বন্যা হয়েছে ১৩৯৪ হিজরীতে। প্রত্যেক বন্যার সময় মসজিদে হারামে পানি ও বালু-ময়লা প্রবেশ করে। কোন কোন বন্যায় কাবার ভেতরেও পানি প্রবেশ করেছে।

এতে মুসল্লীদের নামায আদায়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।[৬]

মক্কা শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

১. মসজিদে হারাম থেকে পূর্বদিকে ঃ কাসাসিয়া (একে গাসাসিয়াও বলে), সুকুল লাইল, তায়েফ রোড, মিনা।

২. মসজিদে হারাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ঃ আযিযিয়াহ, মুযদালিফাহ, আরাফাত, তায়েফ রোড।

৩. মসজিদে হারাম থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে ঃ শেবে আমের, মাআবদাহ, ফয়সলিয়াহ, জাবালে নূর বা হেরা পাহাড়।

৪. মসজিদে হারাম থেকে উত্তরে ঃ শামিয়াহ, কারারাহ, আল-নাকা, সোলায়মানিয়া, হুজুন, জুমেজাহ, ওতায়বিয়াহ, ওয়াদী জলীল।

৫. মসজিদে হারাম থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে ঃ জারওয়াল যাহের, তানঈম, যাহরাহ, নোযহা, রাবেতা আলমে ইসলামীর দফতর।

৬. মসজিদে হারাম থেকে পশ্চিমে ঃ শোবেকা, হাররাতুল বাব, হিন্দাওইয়াহ।

৭. মসজিদে হারাম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে : তান্দুবাই, রোসাইফা।

৮. মসজিদে হারাম থেকে দক্ষিণে ঃ মেসফালাহ, জিয়াদ, জাবালে সাওর (সাওর গুহা)।

মক্কার বিভিন্ন নাম

পবিত্র মক্কা নগরীর অনেকগুলো নাম রয়েছে এবং সেগুলোর নামকরণেরও বিভিন্ন কারণ আছে। প্রধানতঃ এই শহরের দুটো নাম বেশী প্রসিদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১। মক্কা ও ২। বাক্কা। এখন আমরা এর বিভিন্ন নামকরণের উপর আলোচনা করবো।

১. মক্কা নামকরণের কারণ সম্পর্কে কতগুলো মতভেদ রয়েছে।(৭) মতভেদগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) لِاَنَّهَا تَمُكُّ الْجَبَّارِيْنَ اَىْ تُذْهِبُ نَخْوَتَهُمْ মক্কা শব্দের অর্থ দূর করা।

এই শহর জালেম ক্ষমতাধরদের শৌর্য-বীর্যকে দূর করে দেয়। তাই এটাকে মক্কা বলা হয়।

(২) لِأَنَّهَا تَمُكُّ الْفَاجِرَ عَنْهَا اَىْ تُخْرِجُهُ এই শহর পাপী ও ফাসেকদেরকে বের করে দেয় বলে একে মক্কা বলা হয়।

(৩) كَأَنَّهَا تَجْهَدُ اَهْلاً مِنْ قَوْلِهِمْ تَمَكَّكْتَ الْعَظْمَ اِذَا اَخْرَجْتَ مُخَّهُ

হাড়ের ভেতর থেকে মগজ বের করার মতই এই শহর তার অধিবাসীদেরকে কঠোর ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমী করে গড়ে তোলে।

(৪) لِأَنَّهَا تَجْذَبُ النَّاسَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلِهِمْ اِمْتَكَّ الْفَصِيْلُ مَا فِىْ ضَرْعِ اُمِّهِ اِذَا لَمْ يُبْقِ فِيْهِ شَيْئًا ـ

এই শহর মানুষকে আকৃষ্ট করে। বাছুর যখন মায়ের স্তন চুষে সব দুধ পান করে শেষ করে ফেলে তখন উপরোক্ত কথা বলা হয়। মক্কাও মানুষকে তার দিকে মাতৃসুলভ আকর্ষণ করে।

(৫) পানির স্বল্পতার জন্য এই শহরকে মক্কা বলা হয়। কেননা, মক্কার এক অর্থ হচ্ছে স্বল্পতা।

(৬) لِأَنَّهَا تَمُكُّ الذُّنُوْبَ اَىْ تُذْهِبُ بِهَا এই শহর গুনাহ দূর করে বলে একে মক্কা বলা হয়।

২. এই শহরের ২য় নাম হল بَكَّةَ । এই শব্দের অর্থ হল ঠোকরানো বা আঘাত করা। এই শহর জালেম শক্তিধরদের ঘাড়ে আঘাত করে অথবা এই শহরে লোকদের ভিড় হয়। এই কারণে একে বাক্কা বলা হয়। এ দুটো হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের মত। ইমাম তিরমিজীর মতে, এই শহর অহংকারীদের দাপট চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় বলে একে বাক্কা বলা হয়।

শহরের নাম দুটো পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত দুটো আয়াত থেকে এসেছে–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

(العمران ـ ٩٦)

অর্থ ঃ মানুষের এবাদতের জন্য প্রথম যে ঘরটি বাক্কায় বানানো হয়েছে তা বরকতময় এবং গোটা বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শনের প্রতীক স্বরূপ। এখানে মক্কা শহরকে বাক্কা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَهُوَالَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ـ (الفتح ـ ٢٤)

অর্থ ঃ 'তিনি সে সত্তা যিনি মক্কার উপকণ্ঠে তোমাদের উপর থেকে তাদের হাতকে এবং তোমাদের হাতকেও তাদের উপর থেকে দূরে রেখেছেন।' এই আয়াতে সরাসরি মক্কা শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও এই পবিত্র নগরীর আরো কয়েকটি নাম রয়েছে।

৩. এর মধ্যে একটি হলো أُمُّ الْقُرَىْ ।

আল্লাহ কুরআন পাকে বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى ـ (الشورى ـ ٧)

অর্থ ঃ 'হে নবী, আমি আপনার নিকট আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যেন আপনি উম্মুল কোরার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর ভয় দেখান।' আরবীতে اُمَّ শব্দের অর্থ হচ্ছে মা বা কোন কিছুর মূল। اَلْقُرٰى শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রামসমূহ বা জনপদসমূহ। اُمَّ الْقُرٰى এর অর্থ হল গ্রামসমূহের মা বা মূল। মক্কাকে কেন উম্মূল কোরা বলা হয় এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, আল্লাহ যমীনকে প্রথম এখান থেকেই সৃষ্টি করেন। এটা হযরত ইবনে আব্বাসের মত। পৃথিবী সৃষ্টির আগে সবকিছু ছিল পানি। আল্লাহ যখন মাটি সৃষ্টি করেন তখন পানির উপর কাবা শরীফের ভিটিটুকু প্রথমে ভেসে উঠে। তাই এটাকে গোটা পৃথিবীর মূল ভূখণ্ড বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

'আল্লাহ মক্কা থেকেই প্রথমে জমীনকে বিন্যস্ত করেছেন এবং তার নিম্নভাগ থেকেই ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করেছেন। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'উম্মুল কোরা' সকল জনপদের মূল।'(৮)

পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাহাড় আবু কোবায়েস পাহাড়।[৯]

কারো কারো মতে, এই গ্রাম বা জনপদটি অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাই এটাকে 'উম্মুল কোরা' বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে যেহেতু আল্লাহর ঘর রয়েছে সেজন্য এটাকে 'উম্মুল কোরা' বলে। কেননা বাদশাহর শহর অন্য যে কোন শহরের চাইতে মর্যাদাবান বলে এ রকম বলার প্রথা চালু আছে। কেউ বলেছেন, এই শহরে যেহেতু কাবা বা কিবলা রয়েছে এবং সকল মানুষ নামাযে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে এজন্য এটাকে أُمُّ الْقُرٰى বলা হয়েছে।

৪. এই শহরের আরেকটি নাম হল اَلْقَرْيَةُ। মুজাহিদ তাঁর তাফসীরে বলেছেন,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَة كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مُكَانٍ - (النحل -١١٧)

এই আয়াতে قَرْيَةُ বলতে মক্কা শহরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ ঃ "আল্লাহ এমন একটি গ্রাম বা জনপদের উদাহরণ পেশ করছেন যা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রশান্ত। প্রত্যেক জায়গা থেকে এখানে অফুরন্ত রিযক আসে।" মূলতঃ اَلْقَرْيَةُ হচ্ছে যেখানে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। আরবীতে কূপে পানি জমা করাকে বলা হয় قَرَيْتَ الْمَاءَ فِى الْحَوْضِ 'তুমি কূপে পানি জমা করেছ।'

৫. এর অন্য আরেকটি নাম হল ঃ اَلْبَلَدُ আল্লাহ বলেছেন–

لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ - (البلد - ١)

অর্থ ঃ "না..., আমি এই শহরের শপথ করে বলছি।" হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, اَلْبَلَدُ বলতে আল্লাহ এখানে মক্কা শহরকে বুঝিয়েছেন। ফাকেহী লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার কাছে এর এই অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট থেকেই পৌঁছেছে।

৬. "কুরআন মজিদে মক্কা শহরকে 'বালাদে আমীন' বলা হয়েছে।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِسِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ - (التين)

অর্থ ঃ "ডুমুর, যয়তুন, সিনাই পাহাড় ও নিরাপদ নগরীর শপথ।" আল ফাকেহী জায়েদ বিন আসলামের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বালাদে আমীন বলতে এখানে মক্কা শহরকে বুঝানো হয়েছে।

৭. এই শহরের অপর একটি নাম হচ্ছে بَلْدَةٌ । আল্লাহ কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন– اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ ـ

অর্থ ঃ "এই শহরের রব এর এবাদত করার জন্য আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে।" এখানে بَلْدَةٌ বলতে মক্কা শহরকে বুঝানো হয়েছে।

৮. এই শহরের আরেকটি নাম হল 'মাআদ'। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ـ (القصص ـ٨٤)

'যে আল্লাহ আপনার উপর কুরআন ফরজ করেছেন তিনিই আপনাকে মাআদে ফিরিয়ে নেবেন।' বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, এখানে مَعَادُ শব্দের অর্থ হচ্ছে মক্কা।

এতক্ষণ আমরা কুরআনে বর্ণিত মক্কার মোট ৮টি নাম নিয়ে আলোচনা করলাম। সেগুলো হচ্ছে মক্কা, বাক্কা, উম্মুল কোরা, আল কারইয়া, আল বালাদ, আল বালাদুল আমীন, আল বালদাহ ও মা'য়াদ। এছাড়াও মক্কার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আযরাকী এই শহরের আরেকটি নামের কথা উল্লেখ করেছেন।

সেটি হলো اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ। কেউ কেউ এই শহরের নাম اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ উল্লেখ করেছেন।

কারো কারো মতে বাক্কা ও মক্কার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁরা বলেছেন, বাক্কা শব্দের অর্থ হল কা'বা শরীফের স্থানটুকু এবং মক্কা হচ্ছে গোটা শহরটির নাম। অন্যরা বলেছেন বাক্কা কা'বার স্থান, কিন্তু মক্কা বলতে বুঝায় পুরো হারাম এলাকা।

৯. وَادِىْ মানে উপত্যকা ঃ কোরআনে আছে–

رَبَّنَآ اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ ـ

'হে আমাদের রব, তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এমন এক উপত্যকায় আমার সন্তানের বসতি স্থাপন করেছি যা কৃষির অনুপযোগ্য।' (সূরা ইবরাহীম-৩৭)

মুসলমানদের কাছে মক্কা ও কাবা শরীফের মর্যাদা অনেক বেশী বলেই এর নামকরণ নিয়ে সবাই বেশী আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোন শহরের নাম ও নামকরণ সম্পর্কে এতে বেশী আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না।

মক্কা শরীফের মর্যাদা

মক্কা শরীফের অনেক ফযীলত আছে। নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজা আবদুল্লাহ বিন আদী বিন হামরা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কায় সওয়ারীর উপর আরোহন করা অবস্থায় মক্কাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর শপথ, তুমি আল্লাহর যমীনের মধ্যে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ; যদি আমাকে তোমার কাছ থেকে বের করে দেয়া না হত, তাহলে আমি কিছুতেই বের হতাম না।" ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান বা উত্তম বলেছেন। হাদীসটি হচ্ছে এই ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفُ عَلٰى رَاحِلَتِه بِمَكَّةَ يَقُوْلُ لِمَكَّةَ : وَاللّٰه اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَىَ اللّٰهِ وَلَوْلاَ اَنِّى اُخْرَجْتُ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ ـ قال لترمذى هذا حديث حسن صحيح ـ

নাসায়ী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হল ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُوْقِ الْحَزْوَرَةِ : يَا مَكَّةُ وَاللّٰه اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰه وَاَحَبُّ الْبِلاَدِ اِلَىَ اللّٰهِ وَلَوْ لاَ قَوْمُكِ اَخْرَجُوْنِى مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হাযওয়ারা নামক বাজারে বলেছিলেন, 'হে মক্কা, আল্লাহর শপথ, তুমি আল্লাহর উত্তম যমীন এবং আল্লাহর প্রিয় শহর; যদি তোমার কওম,

আমাকে তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত না করত, তাহলে আমি কখনও অন্যত্র বাস করতাম না। ইবনে আসীর বলেছেন, হাযওয়ারা মক্কার একটি জায়গার নাম। এই জায়গাটি বাবে ইবরাহীমের পশ্চিমে, সাবেক সোকে সগীরে অবস্থিত। এটি বর্তমানে মসজিদে হারামের নতুন সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَكَّةَ : مَا اَطْيَبَكِ وَاَحَبَّكِ لِىْ ! وَلَوْ لاَ قَوْمُكِ اَخْرَجُوْنِى مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ ـ

অর্থ ঃ 'তুমি, মক্কা, কতইনা ভাল এবং আমার নিকট কতইনা প্রিয়! যদি তোমার লোকেরা আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমার থেকে দূরে অন্য কোথাও বাস করতাম না।' বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোচনা দ্বারা মক্কা শরীফের সম্মান ও মর্যাদা বুঝা গেল। তবে এই নিরাপদ নগরীর সবচাইতে বড় মর্যাদা মসজিদে হারামের অস্তিত্বের কারণেই হয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন,

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاس ـ (المائدة ٩٨)

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ কাবা শরীফকে সম্মানিত ঘর এবং মানুষের টিকে থাকার কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।'

বাইতুল হারামের এই সম্মানিত এলাকা বলতে হারাম সীমান্তের ভেতরের সকল এলাকাকে বুঝায়। হারাম এলাকার চারদিকের সীমান্তের মধ্যে স্তম্ভ নির্মাণ করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ গোটা হারাম এলাকার মর্যাদা কাবা শরীফের মর্যাদার অনুরূপ করে দিয়েছেন। এতে করে কাবা শরীফের সম্মান বাড়ানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য। শরীয়তের বিধি-নিষেধ উভয় জায়গার জন্যই সমান করে দেয়া হয়েছে।

ইমাম যুহরী বলেছেন, হারাম এলাকার সীমানা সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) নিজেই নির্ধারণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ) এর নির্দেশক্রমেই তিনি সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করেন। তারপর কুসাই বিন কিলাব তা পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর মক্কা বিজয়ের বছর, রাসূলুল্লাহ (সা) তামীম বিন উসাইদ আল

খোযায়ীকে তা পুনঃনির্মাণের জন্য পাঠান। তিনি সেগুলোর পুনঃসংস্কার করেন। এভাবেই শত বছর ধরে حُدُوْدُ حَرَمٍ বা হারাম শরীফের সীমানার হেফাজত করা হচ্ছে।

মক্কার গোড়ার কথা

হযরত আদম (আ) থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) ঃ

আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ) কে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠান। তাঁরা দুনিয়ার কোন্ জায়গায় অবতরণ করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে জারীর আত্তাবারী লিখেছেন, এক বর্ণনা অনুযায়ী আদম (আ)-কে ভারতবর্ষে অবতরণ করানো হয়। বেহেশত থেকে ভারত ভূখন্ডে অবতরণের কারণে ভারতের গাছপালা বেহেশতী সুঘ্রাণে মোহিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর মতে, আদম (আ) কে ভারতে এবং হাওয়া (আ) কে জেদ্দায় অবতরণ করানো হয়। দুনিয়াতে একাকী অবতরণ করার পর পরই আদম (আ) তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে আদম (আ) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হন এবং সেখানে হাওয়া (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। হাওয়া (আ) মুযদালিফায় আদম (আ)-এর সাথে মিলিত হন। অভিধানে আরাফাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচয় বা জানাশুনা এবং মুযদালেফা শব্দের শব্দের অর্থ হচ্ছে মিলিত হওয়া। আল্লাহর ইচ্ছায় এ সকল ঘটনা সবই সম্ভব।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আদম (আ) সরন্দীপ (বর্তমান শ্রীলংকার) চুজ নামক পাহাড়ে এবং হাওয়া (আ) জেদ্দায় অবতরণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ উলঙ্গ আদম ও হাওয়ার সতর ঢাকার উদ্দেশ্যে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে তা জবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁরা উভয়ে দুম্বার পশম দিয়ে নিজেদের কাপড় তৈরি করেন। আদম (আ) নিজের জন্য একটা জুব্বা এবং হাওয়া নিজের জন্য একটা লম্বা জামা ও ওড়না তৈরি করেন।(১০)

তাঁরা বেহেশতে থাকা অবস্থায় পোশাক পরেছেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কারণে তাদের বেহেশতী পোশাক খসে পড়ে। তাই তাঁরা

বেহেশতের পাতা দিয়ে সতর ঢাকার চেষ্টা করেন। দুনিয়াতে অবতরণের পর পরই তাঁদের সেই বেহেশতী অভ্যাস বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁদের পোশাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাই যে সকল ঐতিহাসিক মানব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়কে পুরাতন ও নতুন পাথর যুগ এই দুই ভাগে ভাগ করে বলেন, প্রাথমিক যুগের মানুষ অসভ্য ছিল, তারা পোশাক না পরে উলঙ্গ থাকত–তা নিতান্ত আন্দাজ-অনুমান ও ভিত্তিহীন বক্তব্য। আদম (আ) নবী ছিলেন। তাই প্রথম আদিম মানুষটি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্য। কেননা, সভ্যতার জ্ঞানদানকারী স্বয়ং আল্লাহ্র নির্দেশের ভিত্তিতেই তিনি দুনিয়ায় মানব জীবন ও সভ্যতা সূচনা করেন। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দুনিয়ায় মানুষের অভ্যুদয় আদম থেকেই হয়েছে, বানর বা অন্য কোন পশুর ক্রমবিকাশ থেকে নয়। তাই আদম (আ)-এর অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে ভিন্নধর্মী কোন গবেষণার অর্থ নেই।

ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ আদম (আ) এর কাছে অহী পাঠিয়ে বলেন। আমার আরশ বরাবর নীচে একটি হারাম বা সম্মানিত জায়গা আছে। তুমি সেখানে গিয়ে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরি কর এবং আমার আরশের চারপাশে তওয়াফকারী ফেরেশতাদের মত তুমিও এর তওয়াফ কর। সেখানে আমি তোমার ও তোমার সন্তানদের দোয়া কবুল করবো। হযরত আদম (আ) জবাবে বলেন, হে আল্লাহ্! সে জায়গাটি তো আমি চিনিনা। তারপর একজন ফেরেশতা তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। তিনি পাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে মক্কায় আল্লাহ্র ঘর কা'বা তৈরি করেন। পাহাড়গুলো হচ্ছে, ১. তুরে সিনাই ২. তুরে যাইতুন বা যাইতা ৩. লুবনান পাহাড় ৪. যুদী পাহাড় ও ৫. হেরা পাহাড়। তিনি প্রথমোক্ত ৪টি পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবার দেয়াল এবং হেরা পাহাড়ের পাথর দিয়ে এর ভিত্তি নির্মাণ করেন। তারপর ফেরেশতা তাঁকে আরাফাতে নিয়ে যান এবং হজ্জের সকল নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন। তিনি এক সপ্তাহ যাবত আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করেন। সবশেষে তিনি ভারত ফিরে যান এবং বুজে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে।

ইবনে জারীর আত্তাবারী আরেকটি বর্ণনার কথা উল্লেখ করে বলেন, আরাফাতে ফেরেশতারা আদম (আ) কে বলেন ঃ হে আদম! আমরা আপনার ২ হাজার বছর

আগে এই ঘরে হজ্জ আদায় করেছি।(১১)

আদম (আ) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসার সময় সাথে করে হাজারে আসওয়াদ নিয়ে আসেন। এটি তখন ধবধবে সাদা ছিল। তিনি তা কা'বায় লাগান।

এক বর্ণনায় এসেছে, আদম (আ) বেহেশত থেকে আসার সময় সাথে করে এক কলসী গম নিয়ে এসেছেন। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, আদম (আ) ক্ষুধার্ত হওয়ায় জিবরীল (আ) ৭টি গম নিয়ে আসেন এবং আদমকে বলেন, এগুলো যমীনে চাষ করুন। সাথে সাথে আল্লাহ তাতে ফসল দিয়ে দেন। তারপর জিবরীল (আ) তাঁকে ফসল কাটা ও ফসল সংগ্রহ করার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। জিবরীল (আ) তাঁকে এক পাথরের উপর গম রেখে অন্য পাথর দিয়ে তা পিষে গুঁড়া করে রুটি তৈরির নির্দেশ দেন। পরে জিবরীল (আ) লোহা ও পাথরের ঘর্ষণে আগুন জ্বালিয়ে রুটি তৈরির পদ্ধতি শিক্ষা দেন। এটাই বনি আদমের প্রথম রুটি ছিল।(১২)

ইবনে কাসীর বলেছেন, দুনিয়ার আবাদীর জন্য আদম (আ) এর ঘরে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান হয় এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠিত হয়। আদম (আ) যখন হজ্জ করার জন্য মক্কায় আসেন তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের যত্ন নেয়ার জন্য প্রথমে আসমান ও পরে যমীনকে অনুরোধ করায় তারা উক্ত দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কাবিল ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করে। ঐ সময় হাবিল নিজ যমজ সুন্দরী বোনকে কাবিলের কাছে বিয়ে না দেয়ায় কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। কোরআনের সূরা বাকারায় উক্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হাবিলকে হত্যা করার পর কাবিল ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যায়। শয়তান সেখানে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলে যে, তোমাদের দুইজনের পেশকৃত কোরবানীর মধ্যে আগুন এসে হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করার কারণ হল, হাবিল আগুনের পূজা করত। তুমিও তাই কর। তখন কাবিল একটি ঘর তৈরি করে তাতে সর্বপ্রথম আগুনের পূজা শুরু করে।(১৩)

হাবিলের পরিবর্তে আল্লাহ আদম (আ)-কে শীষ নামক এক নেক সন্তান দান করেন। মৃত্যুর সময় আদম (আ) তাঁকে রাত ও দিনের ঘন্টাসমূহ এবং সেগুলোর নির্দিষ্ট এবাদতের ব্যাপারে উপদেশ দেন ও নিজ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। আবু জার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ মোট ১০৪টি আসমানী

কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে একমাত্র শীষ (আ) এর উপরই ৫০টি কিতাব নাযিল হয়। মোহাম্মদ বিন এসহাকের মতে, বনি আদমের সকল বংশ শীষ (আ) পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে এবং আদম (আ) এর অন্যান্য ছেলেদের বংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শীষ (আ) এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আনুস তাঁর দায়িত্ব পান। পরে তার ছেলে কীনান ও কীনানের ছেলে মাহলাইল উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

পরে মাহলাইলের ছেলে ইয়ারদ এবং ইয়ারদের ছেলে খানুক বা ইদরিস (আ) উক্ত দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। আদম, শীষ (আ) এবং ইদরিস (আ) আল্লাহর কাছ থেকে নবুওত পান। কলম দিয়ে ইদরিস (আ) প্রথম লেখার সূচনা করেন। মে'রাজের রাত্রে ৪র্থ আসমানে তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত হয়।[১৪]

এরপর নবুওত লাভ করেন হযরত নূহ (আ)। তাঁর বংশধারা হচ্ছে, নূহ বিন লামেক বিন মোতাওয়াস সালখ বিন খানুক (ইদরিস) বিন ইয়ারদ বিন মাহলাইল বিন কীনান বিন আনুস বিন শীষ বিন আদম।

আল্লাহ নূহ (আ) কে তাঁর গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠান। তারা মূর্তিপূজাসহ আরো বহু পাপকাজে লিপ্ত ছিল। তিনি ৯৫০ বছর যাবত তাঁর জাতিকে সংশোধনের চেষ্টা করে সামান্য কিছু সংখ্যক লোককে মাত্র সংশোধন করতে সক্ষম হন। আল্লাহ নূহের নৌকায় আরোহী সীমিত সংখ্যক মোমেনকে বাদ দিয়ে নূহ (আ) এর কাওমের অবশিষ্ট সবাইকে বন্যার পানিতে ডুবিয়ে মারেন। বন্যার পানি শুকিয়ে নূহ (আ) এর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে থামে। জুদী পাহাড় কুর্দিস্তান এলাকায় ইবনে ওমার দ্বীপের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, জুদী পাহাড় কুফার পার্শ্বে অবস্থিত। এ সকল এলাকা বর্তমানে ইরাকে অবস্থিত। এরিস্টটলের শিষ্য আবীডেনাস নিজ ইতিহাসে ঐ সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইরাকের অসংখ্য মানুষের কাছে ঐ জাহাজের চূর্ণ টুকরা সুরক্ষিত ছিল। তারা সেগুলো ধুয়ে বা গুঁড়া করে রোগীকে ওষুধ হিসেবে সেবন করাত।[১৫]

তিরমিযী শরীফে হযরত সামুরা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নূহ (আ) এর তিন ছেলের মধ্যে সাম থেকে আরব, হাম থেকে হাবশা (আফ্রিকান

নিগ্রো) এবং ইয়াফেস থেকে রোম (ইউরোপীয়) শেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

নূহ (আ) মক্কায় এসেছেন এবং হজ্জ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় ওসফানে পৌঁছে আবু বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন্ উপত্যকা? আবু বকর (রা) বলেন, 'উসফান উপত্যকা'। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এই উপত্যকা দিয়ে লাল যুবক উটের উপর আরোহন করে নূহ, হুদ ও ইবরাহীম (আ) হজ্জ করেছেন।

ইবনে জারীর আত-তাবারী এবং আযরাকী আবদুর রহমান বিন সাবেত সহ অন্যান্য তাবেঈদের বরাত দিয়ে এক মোরসাল হাদীসের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে, মসজিদে হারামে নূহ (আ) এর কবর অবস্থিত। এই মতটিই বেশী শক্তিশালী। পক্ষান্তরে, বেকা (বর্তমানে কারক নূহ) শহরের জামে মসজিদে তাঁর কবরের বর্ণনাটি দুর্বল।

এরপর আদ জাতির কাছে আল্লাহ হুদ (আ)-কে নবী করে পাঠান। তারা আহকাফ নামক স্থানে বাস করত। এটি বর্তমানে সৌদী আরবের নাজরান ও ইয়েমেনের হাদরামাউত এলাকায় অবস্থিত। এই গোত্রটি বিভিন্ন সময় সিরিয়া, ইয়েমেন ও হেজায সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় আল্লাহ তাদেরকে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত হুদ (আ)ও মক্কায় এসেছেন এবং হজ্জ করেছেন। হযরত আলী থেকে ইয়েমেনে হযরত হুদের কবরের অবস্থার বর্ণনা উল্লেখ আছে। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর কবর সিরিয়ায়।

সামুদ জাতির কাছে আল্লাহ হযরত সালেহ (আ) কে নবী করে পাঠান। সামুদ বিন আবের বিন এরাম বিন সাম বিন নূহের নামানুসারে সামুদ গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে। সালেহ বিন আবদ বিন মাসেহ বিন ওবায়েদ বিন হাজের বিন সামুদ বিন আবের বিন এরাম বিন সাম বিন নূহ হচ্ছে হযরত সালেহ (আ) এর বংশধারা। এই গোত্রটি হেজায ও তাবুকের মধ্যে হিজর নামক জায়গায় বাস করত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার পথে হিজর অতিক্রম করেন। সামুদ গোত্র মূর্তিপূজারী

ছিল। তারা পাহাড় কেটে ঘর বানিয়ে তাতে বাস করত। সে ঘরগুলো ছিল খুবই মজবুত। বর্তমানে, মাদায়েনে সালেহ্ নামক জায়গায় তাদের সেই সকল স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়ে গেছে। সামুদ গোত্রের পাপী লোকেরা নিষিদ্ধ উটকে জবেহ্ করার অপরাধে আল্লাহ্ তাদেরকে বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

ওসফানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিদায় হজ্জকালীন সময়ে বর্ণিত হাদীসে হযরত সালেহ (আ) এর মক্কায় আগমন ও হজ্জ করার কথা উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, হযরত আদম (আ) প্রথমে মক্কায় আসেন, কা'বা ঘর নির্মাণ করেন, এর তওয়াফ করেন ও হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বেহেশত থেকে যেখানেই অবতরণ করেন না কেন, তাঁর বংশধর কাবিল সহ অনেকেই আরব ভূখণ্ডে বাস করেন। হযরত নূহ (আ), হুদ (আ) ও সামুদ (আ) আরব ভূখণ্ডেই বাস করেছেন এবং সকলে মক্কায় আগমন করেন। তাই মক্কার ইতিহাসের সাথে সবাই সম্পৃক্ত।

এরপর মক্কার ইতিহাসের সাথে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জড়িত তিনি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ)। তাঁর বংশধারা হচ্ছে ইবরাহীম বিন তাসারুখ বিন নাহুর বিন সারুগ বিন রাউ' বিন ফালেগ বিন আ'রের বিন সালাহ্ বিন আরফাখাশাজ বিন সাম বিন নূহ্ (আ)। তাঁর বংশধারা সম্পর্কে ভিন্নধর্মী বর্ণনাও রয়েছে।[১৬]

মক্কার সূচনা ও ইবরাহীম (আ)

মক্কায় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর আগমনের পূর্বে আমালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করত বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।[১৭] তারা 'মক্কা উপত্যকা' বা 'ইবরাহীম উপত্যকায়' বাস করত না; মক্কার অন্য অংশে বাস করত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হযরত ইসমাঈল (আ) এর আগমনের আগেই তারা মক্কা ছেড়ে চলে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে, ইসমাঈল (আ) এর মা হাজারের অনুমতিক্রমে জোরহোম গোত্র মক্কায় বসবাস শুরু করে এবং মক্কায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারাই আমালিক সম্প্রদায়ের লোকদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করে এবং মক্কায় তাদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্র ঘরের স্থানটি একটি লাল পাহাড়ের মত

উঁচু ছিল। তখন মক্কা উপত্যকায় কেউ বাস করত না। তারপর থেকেই সেখানে অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা শুরু হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ) থেকেই মক্কা নগরীর মূল ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। এর আগে ফেরেশতা, জিন, হযরত আদম (আ) এবং আমালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সহ অন্যরা মক্কায়, পবিত্র কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে আল্লাহর এবাদত করেছেন। সত্যিকার অর্থে, ঐ উপত্যকায় মানুষের বসবাস শুরু হয় হযরত ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজারের আগমনের পর থেকেই। তারপর, ক্রমান্বয়ে তা মানব সভ্যতার লীলাভূমিতে পরিণত হয় এবং মক্কা গড়ে উঠে একটি নগররাষ্ট্র হিসেবে। কিভাবে পবিত্র মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন হয়, এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ) বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখন সে সকল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব। বুখারী শরীফের 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসের শেষাংশে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সারা, (মিসরে) এক জালেম শাসকের (ফেরআউনের) এলাকায় এসে পৌঁছলেন। শাসনকর্তাকে জানানো হল যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে এবং তাঁর সাথে রয়েছে এক শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম (আ) এর কাছে লোক পাঠায় এবং তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এই মহিলাটি কে? ইবরাহীম (আ) জবাব দিলেন, সে আমার (দ্বীনি) বোন। তারপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, আমি এবং তুমি ছাড়া, যমীনের উপর আর কোন মোমেন নেই। এই রাজা আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার (দ্বীনি) বোন। সুতরাং, তুমি আমাকে মিথ্য প্রতিপন্ন করোনা। রাজা সারাকে তার কাছে আনার জন্য লোক পাঠাল। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়াল এবং সাথে সাথে আল্লাহর গযবে আটকা পড়ল। জালেম রাজা (অবস্থা বেগতিক দেখে) সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। জালেম আবারও তাঁর প্রতি হাত বাড়াল এবং

এবারও আগের মত কিংবা আরো ভয়াবহ গযবে পতিত হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। সারা আবারও দোয়া করলেন এবং রাজা পুনরায় মুক্তি পেল। পরে রাজা কোন একজন দারোয়ানকে ডাকল এবং বলল, তোমরা আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, এনেছ একজন শয়তানকে। পরে রাজা সারার খেদমতের জন্য 'হাজার' নামক এক মহিলাকে দান করল। এরপর সারা হযরত ইবরাহীম (আ) এর কাছে আসলেন। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন এবং হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটেছে? সারা বললেন, 'আল্লাহ জালেম কাফেরের চক্রান্ত তারই বুকে পাল্টা নিক্ষেপ করেছেন (অর্থাৎ তার অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছেন) এবং সে হাজারকে আমার খেদমতের জন্য দান করেছে।'

এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, "হে আকাশের পানির সন্তানরা! এ হাজারই তোমাদের আদি মাতা।"

এই হাদীস থেকে আমরা মক্কার ইতিহাসের অন্যতম উৎস, হযরত ইসমাঈল (আ) এর মা হাজার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারি। শিশু ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজার মক্কায় বসবাস শুরু করার পর এই শহরের সূচনা হয়।

ইসমাঈল (আ) এর মায়ের নাম হচ্ছে هَاجَرُ 'হাজার'।[১৮] আরবরা ها কে ا দ্বারা পরিবর্তন করে একে اجَرُ আজারও বলে থাকে। যেমন আরবীতে هَرَاقَ الْمَاءَ শব্দটাকে ارَقَ الْمَاءَ বলা হয়। আমাদের দেশে তাঁর নাম حَاضِرَةٌ হাজেরা বলে পরিচিত। আসলে 'হাজেরা' একটি পৃথক আরবী শব্দ। এর অর্থও ভিন্ন। হযরত ইসমাঈলের মায়ের নাম হাজেরা নয়, হাজার ছিল। হযরত হাজার মিসরের বাসিন্দা ছিলেন।

সোহায়লী বলেছেন, "মহিলাদের মধ্যে হযরত হাজারই সর্বপ্রথম কান ছিদ্র করেছেন, খতনা করেছেন এবং পরনের কাপড়ের আঁচল পেঁচিয়েছেন।কেননা, হযরত সারা তাঁর উপর রাগ করেছিলেন এবং তাঁর শরীরের ৩টি অঙ্গ কেটে ফেলার শপথ করেছিলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) হাজারকে হযরত সারার শপথ পূরণ করার উদ্দেশ্যে নিজের কান ছিদ্র এবং খতনা করার নির্দেশ দেন। তখন

থেকেই, এই কাজ দুটো, মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে।[১৯] এর আগে এগুলো মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলনা। মাতাপিতাহারা হাজার মিসরের বাদশাহ ফেরআউনের কাছে রক্ষিতা ছিলেন। বাদশাহ সারার উদ্দেশ্যে হাজারকে উপহার দেয়। অপরদিকে, সারা ছিলেন ইবরাহীম (আ) এর চাচাতো কিংবা ফুফাতো বোন। পরে সারা হাজারকে ইবরাহীম (আ) এর নিকট উপহার দেন।

হযরত হাজার ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈল কেন ও কিভাবে জনমানবহীন মক্কা উপত্যকায় আসলেন, সে সম্পর্কে জানা দরকার। এখন আমরা সে ব্যাপারে আলোচনা করবো।

প্রখ্যাত মোফাসসের মোজাহিদ থেকে বর্ণিত। ইবরাহীম (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশু (১/২ বছর) ইসমাঈলসহ সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি মক্কায় আল্লাহর ঘর কা'বার স্থান সম্পর্কে জানার নির্দেশ পান। নির্দেশ দেয়া হয়, আপনি সেই স্থানকে পাক-সাফ করে তওয়াফ ও নামাজ দ্বারা আবাদ করবেন। ঐ আদেশের প্রেক্ষিতে জিবরীল (আ) বোরাক নিয়ে আসেন এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল ও হাজারকে নিয়ে রওনা হন। পথে কোন জনপদ দেখলেই ইবরাহীম (আ) জিবরীলকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ আমাদেরকে কি এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? জিবরীল বলতেন ঃ না, আপনার গন্তব্যস্থল আরও সামনে। অবশেষে তাঁরা মক্কা আসলেন। এখানে কাঁটাযুক্ত বন-জঙ্গল বাবলা গাছ ছাড়া কিছুই ছিলনা। এই ভূখণ্ডের আশেপাশে কিছু জনবসতি ছিল। তারা ছিল আমালিক সম্প্রদায়ের লোক। আল্লাহর ঘরটি তখন টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। ঐখানে পৌছে ইবরাহীম (আ) জিবরীলকে জিজেস করেন, আমাদের কি এখানেই বাস করতে হবে? জিবরীল বলেন ঃ হাঁ। ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ও স্ত্রী হাজারসহ এখানে অবতরণ করেন। কা'বা গৃহের কাছে একটি ছোট কুঁড়েঘর তৈরি করে তাতে ইসমাঈল ও হাজারকে রেখে দেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যই ইবরাহীম (আ) হাজার ও ইসমাঈল (আ) কে মক্কায় রেখে যান। তিনি তাদের উপর জুলুম করেননি এবং কোন কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেননি। শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন।

এবার এ বিষয়ে হাদীস থেকে বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন।

বুখারী শরীফের 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রা) থেকে এ মর্মে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "নারী জাতি সর্বপ্রথম হযরত ইসমাঈল (আ) এর মা (হাজার) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজার সারা থেকে নিজ নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ বা কোমরে রশি বাঁধতেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) হাজার ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসন দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হলেন। পথে হাজার শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাঁদের উভয়কে নিয়ে কাবাঘরের কাছে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদে হারামের উঁচু দিকে যমযম কূপের উপর এক বড় গাছের নীচে তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় কোন লোকজন ছিল না এবং পানিও ছিলনা। তিনি তাঁদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে অল্প পানি দিয়ে গেলেন। এরপর ইবরাহীম (আ) নিজ অবস্থানের দিকে ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মা (হাজার) তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং (কাদা নামক স্থানে পৌঁছে) ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহীম কোথায় চলে যাচ্ছেন? অথচ আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, আর না আছে (পানাহারের) কোন বস্তু। তিনি বার বার তা বলতে লাগলেন কিন্তু ইবরাহীম (আ) সেদিকে ফিরে তাকালেন না। তখন হাজার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আপনাকে এই (নির্বাসনের) নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। জবাব শুনে হাজার বললেন, তাহলে (ঠিক আছে) আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। হযরত ইবরাহীমও (আ) (পেছনে না তাকিয়ে) সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন এবং স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۰ (ابراهيم - ٣٧)

অর্থ ঃ হে আমাদের রব, তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এমন এক উপত্যকায় আমার সন্তান ও পরিবারের বসতি স্থাপন করেছি যা কৃষির অনুপযোগী। হে রব, উদ্দেশ্য এই, নামায কায়েম করবে অতএব তুমি অন্যান্য লোকের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে তাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা (তোমার নিয়ামতের) শুকরিয়া আদায় করতে পারে।

তারপর ইসমাঈলের মা, ইসমাঈলকে (নিজের বুকের) দুধ পান করাতেন আর নিজে এটা মশক থেকে পানি পান করতেন। (ঐ পানি পান করার সাথে সাথে শিশু পুত্রের জন্য তাঁর দুধে জোয়ার আসত)। শেষ পর্যন্ত মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও পিপাসায় কাতর হলেন এবং (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু-পুত্রটিও পিপাসায় ছটফট করতে থাকে। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন যে পিপাসায় শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে যমীনে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এই করুণ অবস্থার দিকে তাকানো তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং সাফা পাহাড়কেই একমাত্র নিকটতম পাহাড় হিসেবে পেলেন। তারপর তিনি এর উপর উঠলেন এবং ময়দানের দিকে মুখ করলেন। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু না, তিনি কাউকে দেখলেন না। তখন তাড়াতাড়ি সাফা পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নীচে ময়দানে নামলেন তখন আপন জামা এক দিক তুলে একজন ক্লান্ত ব্যক্তির মত দৌড়ে চললেন। তারপর উপত্যকা অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ে আসলেন এবং উপরে উঠলেন। তারপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা (লোকের খোঁজে)। তিনি (পাহাড় দু'টির মধ্যে) এভাবে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম (সা) বলেছেন, এ জন্যই (হজ্জের সময়) মানুষ এই পাহাড় দু'টির মধ্যে ৭ বার সায়ী করে (জোরে হাঁটে) এবং এটা হজ্জের একটি অংগ।

তারপর তিনি যখন (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজে নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর, (মনোযোগ

দিয়ে শুনি) তিনি মনোযোগের সাথে ঐ আওয়াজের দিকে কান দিলেন। আবারও আওয়াজ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজতো শুনিয়েছ। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে, তাহলে আমাকে সাহায্য কর। হঠাৎ তিনি যমযমের জায়গায় একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালী দ্বারা আঘাত করলেন কিংবা (তিনি বলেছেন) আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগল। হযরত হাজার এর চারপার্শ্বে আপন হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে কূপের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হযরত হাজারের অঞ্জলি ভরার পরে পানি উথলে উঠতে লাগল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মাকে রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণাধারায় পরিণত হত।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত হাজার পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন ভয় করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে এই শিশু তার বাপের সাথে মিলে এই ঘরটি পুনঃনির্মাণ করবে। আল্লাহ্ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। তখন আল্লাহর ঘরের ভিটিটি যমীন থেকে বেশ উঁচু ছিল। বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট বন্যায় এর ডানে-বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

হযরত হাজার এভাবেই দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইয়েমেনের জোরহোম গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, জোরহোম গোত্রের কিছু লোক কাবার পথে (এদিকে) আসছিলেন। তাঁরা মক্কার নীচু দিকে অবতরণ করলেন। তারা দেখলেন যে, কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই এই পাখীগুলো পানির উপরেই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি, কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তাঁরা একজন বা দু'জন লোক সেখানে পাঠালেন। তাঁরা গিয়েই পানি দেখতে পেলেন। তাঁরা ফিরে এসে অপেক্ষমান সবাইকে পানির খবর দিলেন। খবর শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাঈলের মা

পানির কাছে বসা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তাঁরা সবাই 'হ্যা' বলে রাজী হলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সা) এরশাদ করেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করেছেন। তারপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল; তাঁরাও এসে এঁদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি বংশ জন্ম নিল। ইসমাঈলও আস্তে আস্তে বড় হলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাদের ভাষা আরবী শিখলেন। যুবক হওয়ার পর তিনি তাদের কাছে অধিকতর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর তারা তাদেরই এক মেয়েকে তাঁর কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের পর ইসমাঈলের মা হাজার ইন্তেকাল করেন।

ইসমাঈলের বিয়ের পর ইবরাহীম (আ) তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখার জন্য মক্কায় আসেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। ফলে তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বললেন, তিনি আমাদের খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছেন। পরে তিনি পুত্রবধূকে তাদের সংসার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধূ বললেন, আমরা খুবই দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টে আছি। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) এর কাছে তাঁদের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তিনি পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী ঘরে ফিরে আসলে তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠটি বদলিয়ে ফেলে।

ইসমাঈল (আ) যখন ঘরে ফিরলেন, তখন তিনি যেন হযরত ইবরাহীম (আ) এর আগমন সম্পর্কে কিছু একটা আভাষ পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এমন আকৃতির একজন বুড়ো লোক এসেছিলেন এবং আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে আপনার খবর জানিয়েছি। তিনি আবার আমাকে আমাদের সংসার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমরা বেশী দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে

আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন অসীয়ত করে গেছেন? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন যেন আমি আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং বলি যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে নেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, উনি আমার আব্বা। ঐ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেন তোমাকে আমি পৃথক করে দেই, অর্থাৎ তালাক দেই। সুতরাং তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে আপন লোকদের কাছে চলে যাও। এই বলে ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ বংশের অপর আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। তারপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, ইবরাহীম (আ) ততদিন তাঁদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার এদেরকে দেখতে আসলেন কিন্তু ইসমাঈল (আ) কে পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর ঘরে ঢুকলেন এবং ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তার কাছে তাদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। পুত্রবধূ জবাব দিলেন, আমরা ভাল আছি ও সুখে আছি এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাবার কি? বধূ জবাবে বললেন, 'গোশত।' তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পানীয় কি? তিনি জবাব দিলেন, 'পানি'। ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর।'

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত না। যদি হত, হযরত ইবরাহীম (আ) সে ব্যাপারেও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।

বর্ণনাকারী বলেছেন, কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ, শুধু গোশত ও পানি সবসময় মেজাজের অনুকূল হতে পারে না। (তবে মক্কায় ইবরাহীম (আ) এর দোয়ার বরকতেই এটা সম্ভব হয়েছে)

ইবরাহীম (আ) আলাপ শেষে পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম বলবে এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

তারপর ইসমাঈল (আ) যখন বাড়ী আসলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিলেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বুড়ো লোক এসেছিলেন। স্ত্রী তাঁর প্রশংসাও করলেন। তারপর বললেন, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে আপনার খবর জানিয়েছি। তিনি আমাকে আমাদের সংসার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা সুখে-শান্তিকে আছি। ইসমাঈল জানতে চাইলেন তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আপনার কাছে সালাম বলেছেন আর আপনাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, উনিই আমার বাপ। আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

আল্লাহর ইচ্ছায়, আবারও ইবরাহীম (আ) কিছুদিন তাদের কাছ থেকে দূরে রইলেন পরে আবার তাঁদের কাছে আসলেন। এসে দেখলেন, ইসমাঈল (আ) যমযমের কাছে একটি গাছের ছায়ার নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। বাপকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সাক্ষাৎ হলে যা করে তাঁরা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম করেছেন। ইসমাঈল (আ) জবাব দিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে যা আদেশ করেছেন, আপনি তা করে ফেলুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, এতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আ) বললেন, হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য করবো। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে, এর চারপাশে ঘেরাও করে একটি ঘর তৈরী করতে নির্দেশ দিয়েছেন এ বলে তিনি উঁচু পাহাড়টির দিকে ইশারা করে তাঁকে স্থানটি দেখালেন। তারপর তাঁরা কা'বাঘরের দেয়াল উঠাতে শুরু করলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আ) গাঁথুনী করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) 'মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আ) এর জন্য তা রাখলেন। ইবরাহীম (আ) এর উপর দাঁড়িয়ে এমারত তৈরী করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল

(আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। তাঁরা উভয়ে এই দোয়া করতে লাগলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ (البقرة ـ ١٤٧)

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কাছ থেকে এটি কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি বেশী শোনেন এবং জানেন।' আবার তাঁরা উভয়ে দেয়াল তৈরী করতে লাগলেন এবং কাবাঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন। আর উভয়ে এই দোয়া করছিলেন, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই পরিশ্রমটুকু কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি বেশী শোনেন ও জানেন।" বুখারী শরীফের দীর্ঘ হাদীসটি এখানেই শেষ হল।

এই সুদীর্ঘ হাদীসে কিভাবে পবিত্র মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসমাঈল (আ) এর মা হাজার ছিলেন সারার উপহারপ্রাপ্ত একজন যুবতী কন্যা। সারার কোন সন্তান না থাকায় তিনি তাকে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সাথে বিয়ে দেন। পরে সারার সাথে হাজারের সতীন সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরপর হাজার গর্ভবতী হন। কিন্তু সারা তা সহ্য করতে পারেননি। তাই সারা সর্বক্ষণ হাজারের পেটের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। কেননা বার্ধক্য পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও সারার ঘরে কোন সন্তান না হওয়ায় হঠাৎ করে সারার মনে প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়। অবশ্য ইসমাঈলের জন্মের অনেক পরে সারার ঘরে হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করে। হাজার নিজ পেটের নিদর্শন গোপন করার জন্য কোমরবন্ধ কষে পরতেন যেন পেট বড় না দেখা যায়। তারপর হযরত ইসমাঈল (আ) হাজারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) হাজার ও ইসমাঈলকে মক্কায় নির্বাসন দেয়ার পর ফিরে যান। ইতিমধ্যে ৯০ বছর বয়সে হাজার মারা যান। তিনি কোরবানীর ঘটনা, কাবা নির্মাণ এবং নির্বাসিত পরিবারের খোঁজ নেয়ার জন্য পরবর্তীতে চারবার মক্কায় আসেন। দু'বার ইসমাঈল (আ) কে না পেয়ে তাঁর দুই স্ত্রীর সাথে আলাপ করে তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নেন। ইসমাঈল (আ) জোরহোম গোত্রে বিয়ে করার পর তাদের সাথেই তাঁর সামাজিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা গড়ে উঠে। এইভাবে, ইসমাঈল (আ) কে কেন্দ্র করে মক্কায় মানুষের পূর্ণাঙ্গ আবাদী শুরু হয়

এবং যমযম কূপের পানিই তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে দাঁড়ায়। যমযম কূপ না হলে জোরহোম গোত্রের মক্কায় বসবাস করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, যমযমের পানির কারণেই তারা এখানে বাস করতে আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে মক্কায় বসতি গড়ে উঠে। হযরত ইবরাহীম (আ) ৪র্থ বার মক্কা সফরে এসে হযরত ইসমাঈল (আ) কে নিয়ে কা'বা শরীফ তৈরী করেন।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) তারিখে মক্কা, আহমদ আস-সিবায়ী।

(২) এখানে সেন্টিগ্রেডকে তাপমাত্রার একক ধরা হয়েছে।

(৩) ওমদাতুল আখবার ফী মাদীনাতিল মোখতার, প্রকাশক! সাইয়েদ আসয়াদ দারাবযোনী।

(৪) তারীখে মক্কা, আহমদ আস-সিবায়ী।

(৫) তারীখ ইমারাতুল মসজিদিল হারাম, হোসাইন আবদুল্লাহ বাসালামা।

(৬) যমযম, ইয়াহইয়া কোশাক।

(৭) আল একদুস সামীন ফী তারীখিল বালাদীন আমীন, তকীউদ্দীন আল-ফাসী।

(৮) প্রাগুক্ত।

(৯) তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক, ইবনে জারীর আত-তাবারী, ১ম খন্ড।

(১০) প্রাগুক্ত

(১১) প্রাগুক্ত

(১২) আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ, ইবনে কাসীর, প্রথম খন্ড।

(১৩) প্রাগুক্ত

(১৪) তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সূরা হুদ- ৪৪।

(১৫) আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ, ইবনে কাসীর, প্রথম খন্ড।

(১৬) ঐ।

(১৭) ফী রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মুহাম্মদ আলাওয়ী বিন আব্বাস আল মালেকী, দারুল কেবলাহ প্রকাশনী, মক্কাআল মোকাররমা, ১৯৮৫।

(১৮) আল একদুস সামীন ফী তারীখিল বালাদীন আমীন, তকী ফাসী।

(১৯) প্রাগুক্ত।

(২০) গিরিপথের বাঁক বলতে কেউ বলেছেন হাফায়ের। কেউ বলেছেন তা হচ্ছে কুদাই।

২. যমযম

যমযমের গোড়ার কথা

আমরা ইতিপূর্বে, 'মক্কার গোড়ার কথা' এই শিরোনামে বুখারী শরীফের কিতাবুল আম্বিয়া অধ্যায়ের একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছি তাতে যমযম কূপের উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমরা নবী করীম (সা) এর জবানীতেই জানতে পেরেছি। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজার এবং শিশুপুত্র ইসমাঈলকে কাবার পার্শ্বে অবস্থিত একটি বড় ছায়াদার গাছের নীচে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে চলে গেলেন। তখন কা'বা শরীফের স্থানটি একটি উঁচু টিলার মত ছিল।

হাজারের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি সাফা-মারওয়ায় ৭ বার পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন আওয়াজকারীর আওয়াজ শুনতে পান। তারপর কাবার পার্শ্বে এসে দেখেন, হযরত জিবরাঈল ফেরেশতার পায়ের আঘাতে যমযমের কূপের পানি উথলে উঠছে। তখন তিনি কূপের মধ্যে বালির বাঁধ দেন এবং মশক ভর্তি করে পানি রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মা হাজারকে রহম করুন। তিনি যদি তাতে বাঁধ না দিতেন কিংবা অঞ্জলি ভরে পানি না নিতেন তাহলে, তা প্রবহমান ঝর্ণাধারায় পরিণত হত। হাদীসটি হচ্ছে, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صـ يَرْحَمُ اللّٰهُ أُمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمْ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَّعِيْنًا ـ

যমযম, কূপ হলেও তার সেবা একটি নদীর সমান। নদীর অসীম পানির মতই যমযমের পানি গোটা দুনিয়ায় পান করা হচ্ছে এবং হাজীরা দূর থেকে দূরান্তরে সাথে করে এই পবিত্র পানি নিয়ে যাচ্ছে। হজ্জ মওসুমে বর্তমানে প্রতিদিন ১৯ লাখ লিটার পানি সেবন করা হয়। দুনিয়ার অন্য যে কোন কূপ থেকে এর উৎপাদন ও সরবরাহ অনেক বেশী।

ফাকেহী উল্লেখ করেন যে, যমযম কূপ আবিষ্কারের পর হযরত ইবরাহীম (আ) তা খনন করে একে প্রশস্ত করে কূপের রূপ দান করেন। তখন তাঁর সাথে জুলকারনাইনের সাক্ষাত ও আলোচনা হয়। জুলকারনাইন কূপটির দখল নিয়ে নেয়। এরপর ঘটনার বর্ণনাকারী উসমান বলেন, সম্ভবতঃ জুলকারনাইন ইবরাহীম (আ) এর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। ইবরাহীম (আ) বলেন, এটা কিভাবে হয়? তোমরা আমার কূপটি নষ্ট করেছ। জুলকারনাইন বলেন, সেটা আমার হুকুমে হয়নি। ঐটি যে ইবরাহীম কূপ এ ব্যাপারে জুলকারনাইন কাউকে খবরও দেয়নি। তারপর দু'জনের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইবরাহীম (আ) জুলকারনাইনকে ৭টি ভেড়াসহ কয়েকটি গরু উপহার দেন। জুলকারনাইন জিজ্ঞেস করেন, হে ইবরাহীম! ভেড়াগুলো কেন উপহার দিচ্ছেন? তখন হযরত ইবরাহীম জবাব দেন, এগুলো কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে যে এটি হচ্ছে ইবরাহীম কূপ।[১]

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ) খৃষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের বছরই ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ) এবং হাজারকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে যান। সেই বছরেই যমযম কূপের আবির্ভাব হয়। হিজরী সাল অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মের ২৫৭২ বছর পূর্বে যমযম কূপের আবির্ভাব ঘটে। এই হিসেব অনুযায়ী এখন থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে এই যমযম কূপের উৎপত্তি হয়।[২] এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যমযম কূপের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে এবং যমযমের পানি সরবরাহের ব্যাপারে বহু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছে। আমরা এ সকল বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মক্কায় যমযম কূপের অস্তিত্বের কারণে, ইয়েমেনের জোরহোম গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক হযরত হাজারের অনুমতিক্রমে এবং যমযম কূপের উপর তাঁর মালিকানার স্বীকৃতির শর্তে মক্কায় বসবাস শুরু করে। পরে ইসমাঈল (আ) বড় হন এবং জোরহোম গোত্রে বিয়ে করেন। তারপর থেকে জোরহোম গোত্র 'যমযম' কূপসহ মক্কার শাসনভার পরিচালনা করে। দীর্ঘদিন যাবত তথা যমযম কূপের সূচনালগ্ন থেকেই তারা যমযম কূপের পানি পান করতে থাকে।

এক পর্যায়ে যমযম কূপ শুকিয়ে যায় ও মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং এর সকল চিহ্ন বা নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যায়। যমযমের বিলুপ্তি সম্পর্কে ইয়াকুত আল হামাওয়ী বলেছেন, বৃষ্টির অভাবে যমযম শুকিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এর কোন

চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এটা ভৌগোলিক কিংবা প্রাকৃতিক কারণে চাপা পড়েনি। বরং জোরহোম গোত্র পবিত্র হারামের অসম্মান করে এবং এর প্রতি প্রদত্ত উপহার সামগ্রী প্রকাশ্য ও গোপনে চুরি ও আত্মসাৎ করে। তাদের এই বিরাট পাপের কারণে যমযম কূপ শুকিয়ে যায়। পরবর্তীতে বন্যার কারণে এর সকল চিহ্ন মিটে যায়।(৩)

বর্ণিত আছে যে, আমর বিন হারেস বিন মুদাদ বিন আমর জোরহোমী তাঁর গোত্রের লোকদেরকে এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাতে সাড়া না দেয়ায় তিনি কাবার ধনভাণ্ডারে রক্ষিত দুটো সোনার হরিণের প্রতিকৃতি এবং তলোয়ার যমযম কূপে গোপনে রাত্রে দাফন করেন। তিনি অন্যদের ভয়ে গোপনে কূপটি ভরাট করেন। কেননা, তারা টের পেলে তাকে কিছুতেই ঐ কাজ করতে দিবেনা।

তারপর আল্লাহ্ এই পাপী জাতির উপর খোযাআ' গোত্রকে বিজয়ী করেন এবং জোরহোম গোত্র মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়। এইভাবে যমযম কূপের আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুদাদ বিন আমর জোরহোমী তার শত্রুদের সাথে লড়াইতে পরাজিত হন। তার আশংকা হল যে, শত্রুবাহিনী তাকে মক্কায় থাকতে দেবে না, তাই তিনি তাদেরকেও যমযম কূপের পানি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে নিজের কিছু মূল্যবান সম্পদ এবং সোনা দিয়ে কূপটি ঢেকে ফেলেন। ফলে, কূপের চিহ্ন মুছে যায়। তারপর মরুভূমির ধূলাবালুতে তা ভর্তি হয়ে যায়। পরে কারো পক্ষে আর কূপটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তারপর মুদাদ ইয়েমেনে ভেগে যায়।

মক্কায় যেহেতু নদী-নালা নেই, তাই মক্কাবাসীরা মক্কার বাইরে কূপ খনন করে পানির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। কোরাইশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুসাই বিন কিলাব চামড়ার মশকে করে মক্কার বাইর থেকে পানি সংগ্রহ করে হাজীদেরকে পান করাতেন। পরে কুসাই উম্মে হানী বিনতে আবি তালেবের ঘরের স্থলে আল-আজুল নামক একটি কূপ খনন করে হাজীদেরকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেন। ইতিহাসে এটিই হচ্ছে মক্কার ভেতরের প্রথম কূপ। মক্কাবাসী এবং বহিরাগত হাজীরা কুসাই এর এই মহতী কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন। কুসাইর মৃত্যুর

পরেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কূপটি অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরে এতে বনি জোয়াইল গোত্রের এক ব্যক্তি পড়ে মারা যাওয়ায় তা ভরাট করে দেয়া হয় এবং এরপর প্রত্যেক গোত্র কূপ খনন করে নিজেদের পানির ব্যবস্থা করে। বনু তামীম বিন মুররাহ 'আল-জোফার' কূপ, আবদ শামস বিন আবদ মন্নাফের 'তাওয়া' কূপ এবং হাশেম গোত্র 'সিজলাহ' নামক কূপ নির্মাণ করে। এইভাবে মক্কায় পানি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলে।

আবদুল মোত্তালিবের হাতে যমযম কূপ পুনরাবিষ্কার

কোরাইশ গোত্রের মধ্যে ১৫টি দায়িত্বপূর্ণ পদ ছিল। ঐ সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোরাইশরা নিজেদের এবং হাজীদের সেবা করত। এর মধ্যে سَدَانَةٌ বা 'কাবার সেবক' এই পদটি সবচাইতে বেশী সম্মানিত ছিল। কাবার সেবকের কাছে কাবার দরজার চাবি থাকতো। তিনি লোকদের জন্য কাবার দরজা খুলতেন এবং বন্ধ করতেন। ২য় গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল سِقَايَةٌ বা পানি 'পান করানো'। হাজীদের পানি পান করানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কেননা, মক্কায় পানির স্বল্পতার কারণে, এই দায়িত্ব পালনকারী বনি হাশেম বিন আবদে মন্নাফ গোত্রকে কাবার পার্শ্বে চামড়ার মশকে পানি জমা করতে হত এবং ঐ সকল পানি মক্কার বাইর থেকে উটের পিঠে করে বহন করে আনা হত। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল হাজীদেরকে খাওয়ানো رِفَادَةٌ। কোরাইশরা তাদের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে গরীব হাজীদের খানা খাওয়ানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করত এবং ঐ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির হাতে তা অর্পণ করত।

কুসাই বিন কিলাব নিজে ঐ তিনটি দায়িত্বসহ দারুন্ নাদওয়াহ পরিচালনা এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে আবদুদ্ দার এবং আবদে মন্নাফের মধ্যে ঝগড়া-সংঘর্ষের পর তা বন্টন করা হয়। ঐ বন্টন অনুযায়ী বনি আবদে মন্নাফ 'পানি পান করানো' এবং হাজীদেরকে খানা খাওয়ানোর দায়িত্ব পায়। অপরদিকে, 'কাবার সেবা' এবং দারুন্ নাদওয়াহর দায়িত্ব অর্পিত হয় বনি আবদুদ্ দারের উপর। পরে হাশেম বিন আবদ মন্নাফের কাছ থেকে তাঁর ভাই মোত্তালিবের উপর ঐ দায়িত্ব অর্পিত হয়। তারপর আবদুল মোত্তালিব বড় হলে তিনি ঐ পদটি লাভের জন্য নিজ চাচার সাথে ঝগড়া করেন এবং পদটি লাভ

করেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এত বেশী যোগ্যতার সাথে পালন করেন যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এর ফলে তাঁর সম্মান ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তখন পর্যন্ত যমযম কূপ অনাবিষ্কৃত থাকে। কিন্তু পরে তিনি স্বপ্নে যমযমের অবস্থান সংক্রান্ত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে তা খুঁড়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এতে করে তাঁর সুনাম ও যোগ্যতা আরো অনেক বৃদ্ধি পায়। আযরাকী আবদুল মোত্তালিবের যমযম কূপ সংক্রান্ত স্বপ্নটি বর্ণনা করে বলেন, আবদুল মোত্তালিবের বড় ছেলে হারেস বড় হওয়ার পর আবদুল মোত্তালিব রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে কেউ তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'কাবার সামনে অবস্থিত মূর্তি বরাবর পিঁপড়ার বসতিতে ময়লা ও রক্তের মাঝে কাকের ঠোঁকরে সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্যে খনন করে যমযম কূপ আবিষ্কার কর।' তিনি মসজিদে হারামে যান এবং স্বপ্নের লক্ষণগুলো দেখার জন্য সেখানে অপেক্ষা করেন। তখন মসজিদে হারামের বাইরে হাযওয়ারা নামক স্থানে একটি গাভী জবেহ করা হয়। গাভীটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে কসাইর কাছ থেকে ভেগে যমযমের স্থানে এসে পড়তে সক্ষম হয়। পরে কসাই এখানেই গাভীটির জবেহ কাজ সমাপ্ত করে এবং গোশত বহন করে নিয়ে যায়। তখন একটি কাক এসে গাভীর ময়লার উপর বসে এবং পিঁপড়ার বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।(৪)

এই সকল লক্ষণ দেখার পর আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ খনন শুরু করেন। খনন কাজ দেখে কোরাইশরা আবদুল মোত্তালিবের কাছে ছুটে আসে এবং বলে, আমরা তো আপনাকে মূর্খ মনে করি না কিন্তু আপনি কেন আমাদের মসজিদে হারামের কাছে খনন কাজ করে মসজিদটিকে নষ্ট করছেন? আবদুল মোত্তালিব জবাব দেন, আমি একাজ অব্যাহত রাখবো এবং কেউ আমাকে বাধা দিলে তার মুকাবিলা করবো। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে হারেসকে নিয়ে খনন কাজ অব্যাহত রাখায় কোরাইশরা তাঁর সাথে ঝগড়া শুরু করে। কিছু সংখ্যক কোরাইশ তাঁর যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও বংশের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে বিরোধীদেরকে বিরত রাখে। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপটি খনন করতে সক্ষম হন। কূপটি খনন করার সময়কার বাধা-বিপত্তি এবং কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তা সহজ করার জন্য আল্লার কাছে মান্নত করেন যে, যদি তার ১০টি ছেলে সন্তান হয় তাহলে তিনি একটিকে আল্লাহর নামে কোরবান করবেন।

কূপ খননের এক স্তরে তিনি কাবার দাফনকৃত তলোয়ারগুলো দেখতে পান। কোরাইশরা তলোয়ার দেখে তাতে নিজেদের অংশ দাবী করে। আবদুল মোত্তালিব বলেন, এতে তোমাদের কোন অংশ নেই। এগুলো আল্লাহর ঘরের তলোয়ার। তিনি পানির স্তর পর্যন্ত পৌছেন। তিনি কূপকে আরো একটু প্রশস্ত করেন যাতে করে এতে পর্যাপ্ত পানি থাকে এবং না শুকায়।

তিনি কূপের পার্শ্বে পানি সংরক্ষণের জন্য একটি হাউজ নির্মাণ করেন এবং পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে সেই হাউজটিতে পানি তুলে ভর্তি করে রাখতেন। হাজীরা সেই হাউজ থেকে পানি পান করত। কিন্তু কোরাইশদের মধ্যে তাঁর প্রতি হিংসা পোষণকারী লোকেরা রাত্রে এসে হাউজটি ভেঙ্গে যেত এবং তিনি প্রতিদিন ভোরে তা পুনঃনির্মাণ করতেন। কোরাইশদের উৎপাত বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। ফলে, তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমি এর পানি গোসলের জন্য নিষিদ্ধ করছি এবং শুধু পিপাসা নিবারণের জন্য পান করাকে বৈধ ঘোষণা করছি।" আবদুল মোত্তালিব মসজিদে হারামে যান এবং উপস্থিত কোরাইশদেরকে স্বপ্নের কথা শুনান। এর পর থেকে তাঁর তৈরী হাউজ কেউ নষ্ট করতে আসলে শরীরে বিভিন্ন রোগ দেখা দিত। ফলে, তারা তাঁর হাউজ এবং সেখান থেকে পানি পান করা ত্যাগ করে।

এরপর আবদুল মোত্তালিব কয়েকটি বিয়ে করেন এবং ১০টি ছেলে-সন্তান লাভ করেন। তিনি আল্লাহর কাছে বলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার উদ্দেশ্যে কোরবানী করার মান্নত করেছিলাম। এখন আমি তাদের মধ্যে লটারী দিয়ে ঠিক করবো যে কাকে কোরবান করবো। তুমি তোমার পছন্দ অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রহণ কর। লটারীতে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সন্তান আবদুল্লাহর নাম উঠে। তারপর আবদুল মোত্তালিব বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আবদুল্লাহ এবং একশত উটের মধ্যে যেটাকে পছন্দ কর সেটাকে গ্রহণ কর। তারপর এর মধ্যে লটারীতে পর্যায়ক্রমে একশত উট উঠায় আবদুল মোত্তালিব ১০০ উট কোরবান করেন।

হযরত আলী (রা) থেকে, তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালিবের যমযম কূপ পুনরাবিষ্কার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আবদুল মোত্তালিব হিজরে ইসমাঈলে শুয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্নে তিনবার কূপ খননের নির্দেশ পান। তারপর তিনি নিজের একমাত্র ছেলে

হারেসকে নিয়ে কূপ খনন করা শুরু করেন এবং কূপে পানির সন্ধান পেয়ে তাকবীর দেন। কোরাইশরা আবদুল মোত্তালিবের সাথে যমযমের কূপের মালিকানা দাবী করে। আবদুল মোত্তালিব নিজ মালিকানার সাথে অন্যদেরকে অংশ দিতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বনি সাদ বিন হোযাইম গোত্রের একজন মহিলা গণককে সালিশ মানার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই গণক সিরিয়ার নিকট বাস করত। তারা গণকের কাছে রওনা দেয় এবং হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি এলাকায় পৌঁছার পর আবদুল মোত্তালিব দলের পানি ফুরিয়ে যায়। ফলে, তারা কঠিন পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। অন্য কোরাইশ দল আবদুল মোত্তালিবের দলকে নিজেদের সম্ভাব্য পিপাসার আশংকায় পানি সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। পরে দলটির পানিহীন সফরের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে দলনেতা আবদুল মোত্তালিবের পরামর্শ কামনা করে। আবদুল মোত্তালিব বলেন, পানি ছাড়া আমরা যেহেতু নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি তাই শক্তি থাকতে আমাদের সবাইকে এখন নিজের কবর খুঁড়ে এতে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা উচিত। সেই অনুযায়ী তাঁর দলের সবাই কবর খুঁড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু পরে আবদুল মোত্তালিব বললেন, এইভাবে, কবরে পিপাসার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। চল আমরা রওয়ানা দেই হয়ত আল্লাহ আমাদের বাঁচার কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অন্য কোরাইশ দলটি নির্দয়ভাবে আবদুল মোত্তালিবের এই প্রস্থান দৃশ্য অবলোকন করে। ঠিক যে মুহূর্তে তিনি তাঁর উটকে রওয়ানা করাবেন ঠিক সেই মুহূর্তেই উটের পায়ের নীচ থেকে মিষ্টি পানির একটি ফোয়ারা ফুটে উঠে। তারপর আবদুল মোত্তালিব দল খুশীতে তাকবীর ধ্বনি দেয় এবং সওয়ারী থেকে নেমে পানি পান করে ও মশকে পানি ভর্তি করে নেয়। তিনি অন্য কোরাইশ দলটিকেও পানি পান করার আহবান জানিয়ে বলেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর রহমতের করুণা থেকে পানি দিয়েছেন তাই তোমরাও পানি পান কর। তারাও পানি পান করে এবং সাথে পানি নিয়ে নেয়। পরে প্রতিদ্বন্দ্বী কোরাইশ দলটি বলে ঃ হে আবদুল মোত্তালিব, আল্লাহর কসম, আমরা আর তোমার সাথে যমযমের বিষয়ে ঝগড়া করবো না। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তোমার পক্ষে ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছেন। চল, আমরা ফিরে যাই। এরপর তারা মক্কায় ফিরে আসে এবং গণকের কাছে যাওয়া বন্ধ করে।(৫)

ইবনে ইসহাক যমযম কূপ পুনরাবিষ্কার সম্পর্কে হযরত আলী (রা) এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেই বর্ণনায় অতিরিক্ত যে তথ্য যোগ হয়েছে তা হচ্ছে, কূপ

খনন করতে গিয়ে আবদুল মোত্তালিব এতে দাফনকৃত দুটো সোনার হরিণ এবং অস্ত্রশস্ত্র লাভ করনে। কোরাইশরা এই সকল প্রাপ্ত জিনিসে নিজেদের হিসসা দাবী করে। পরে আবদুল মোত্তালিব বলেন, এস আমরা এ ব্যাপারে একটি ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এজন্য তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে লটারী অনুষ্ঠিত হবে। এতে কাবার জন্য দুটো তীর, আমার জন্য দুটো এবং কোরাইশদের জন্য দুটো তীর থাকবে। কোরাইশরা এই প্রস্তাব মেনে নেয়ায় তিনি কাবার জন্য দুটো হলুদ তীর, নিজের জন্য দুটো কাল তীর এবং কোরাইশদের জন্য দুটো সাদা তীর নির্বাচন করেন এবং কিছু শ্লোক পাঠ করেন। এরপর লটারী অনুষ্ঠিত হয়। হোবল দেবতার সামনে অনুষ্ঠিত ঐ লটারীতে কাবার হলুদ তীর দু'টো হরিণ, আবদুল মোত্তালিবের কাল তীরগুলো তলোয়ার এবং শিল্ড লাভ করল এবং কোরাইশদের তীর কোন কিছু পেতে ব্যর্থ হল। পরে আবদুল মোত্তালিব তলোয়ার দিয়ে কাবার দরজায় আওয়াজ দেন এবং এতে একটি সোনার হরিণ ঝুলিয়ে রাখেন। কাবার ইতিহাসে এই প্রথম সোনার মাধ্যমে কাবা শরীফ সাজানো হল। তিনি অন্য সোনার হরিণটিকে কাবার অর্থভাণ্ডারে রেখে দেন।[৬]

আল্লামা ফাসী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের পূর্বে আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ খনন করেন। তখন হারেস ব্যতীত তাঁর কোন ছেলে ছিল না। কিন্তু আযরাকী যোহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মের পর আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ খনন করেন। তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু তালেব যমযম কূপ পুনঃনির্মাণ করেন এবং বালক মুহাম্মাদ পাথর যোগান দেন। শেষের বর্ণনাটি দুর্বল এবং আগেরটিই বেশী সহীহ। কেননা, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হারেস ব্যতীত আবদুল মোত্তালিবের অন্য কোন সন্তানাদি ছিল না। আবু তালিব রাসূলুল্লাহকে নিয়ে পরবর্তীতে যমযম কূপের সংস্কার করেছিলেন। এর সাথে আবদুল মোত্তালিবের যমযম কূপ খনন করার কোন সম্পর্ক নেই।

আবদুল মোত্তালিব তাঁর যমযম খনন করা সংক্রান্ত স্বপ্নকে প্রথমে ভেবেছিলেন যে, এটি হয়তো কোন অশুভ মুর্দার আত্মা কিংবা জিন ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে পারে। তিনি এজন্য তা পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই নিজ ছেলে হারেসকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে কূপ খনন করতে থাকেন। যদি ঐটি শয়তানের স্বপ্ন হয়ে থাকে তাহলে অন্যরা জানলে তা লজ্জার বিষয় হবে। নচেৎ মক্কার সর্দার হিসেবে যমযম

কূপের মত এত মহান কূপের খনন কাজে মক্কার অন্যান্য লোকজনের সহযোগিতার কোন অভাব হওয়ার কথা ছিল না।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, আবদুল মোত্তালিব কর্তৃক যমযম কূপ সফলভাবে খনন সম্পন্ন হলে এবং ১০ জন পুত্র সন্তান লাভ করলে একজনকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মান্নত করেন। পরবর্তীতে তাঁর ১০ জন পুত্র সন্তান হয়। তাদের নাম হচ্ছে ঃ ১. হারেস ২. আবদুল্লাহ ৩. যোবায়ের ৪. আব্বাস ৫. দারার ৬. আবু লাহাব ৭. গীদাক ৮. হামযা ৯. মোকাওয়াস এবং ১০. আবু তালিব। তিনি তাঁর ১০ ছেলের মধ্যে যে লটারী দেন তাতে সর্বাধিক প্রিয় ছেলে আবদুল্লাহর নাম উঠে। তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতা। আবদুল মোত্তালিব তাকে জবেহ করার জন্য রওয়ানা হলে আবদুল্লাহর মামা বনু মাখযুম এবং কোরাইশ গোত্রের সরদার, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিবর্গ তাতে বাধা দেয় এবং বলে, তুমি তাকে জবেহ করলে আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে তা একটি প্রথার রূপ নেবে এবং গোটা আরবে তা একটি পদ্ধতি হিসেবে চালু হবে। তারা পরামর্শ দিল যে, মদীনায় তেখাইবার নামক একজন মহিলা ভবিষ্যদ্বাণী করে। তার কাছে গিয়ে এ সমস্যার একটি সমসাধান যেন নিয়ে আসা হয়। পরামর্শ অনুযায়ী আবদুল মোত্তালিব মদীনায় যান এবং ঐ মহিলার কাছে গিয়ে গোটা ঘটনা বর্ণনা করেন। মহিলাটি বলে, আজ যাও এবং আগামীকাল আমার চাকরেরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরের দিন তারা তার কাছে পৌছার পর সে জানায় যে, হ্যাঁ, আমার কাছে খবর এসে গেছে। তবে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, তোমাদের দিয়াহ বা রক্তপণের পরিমাণ কত? তারা বলল, ১০টি উট। সে বলে, তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও এবং ১০টি উট ও লোকটির মধ্যে লটারী দাও। লটারীতে উট উঠলে সে উটগুলো জবেহ কর। আর যদি লোকটি উঠে তাহলে এর সাথে আরো ১০টি করে উট যোগ করে লটারী দিতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমাদের রব তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আবদুল মোত্তালিব মক্কায় ফিরে আসার পর ৯ বার লটারী দেন এবং প্রতিবারই আবদুল্লাহর নাম উঠে। দশমবারে উটের পরিমাণ যখন একশতে দাঁড়ায় তখন উটের নাম উঠে। আবদুল মোত্তালিব বলেন, আমি তিনবার লটারী না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ইনসাফ করছি বলে মনে হচ্ছে না। কোরাইশগণ বলেছে, আবদুল মোত্তালিব তুমি ১শ' উট জবেহ কর। তোমার রব সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু আবদুল

মোত্তালিব তিনবার ১০০ উট এবং আবদুল্লাহর মাঝে লটারী দেয়ার পর প্রত্যেকবারই ১০০ উট উঠাতে প্রশান্ত হন। তিনি উপত্যকা, গিরিপথ এবং পাহাড়ের চূড়ায় ঐ সকল উট জবেহ করেন এবং কোন মানুষ, হিংস্র প্রাণী ও পাখীকে গোশত খাওয়া থেকে বাধা দেয়া হয়নি। তবে তাঁর সন্তানেরা কেউ ঐ গোশত খায়নি। ফলে বহু বেদুইন মক্কায় এসে জড়ো হয় এবং বহু নেকড়ে বাঘ ঐ সকল উটের গোশত খেতে আসে। উটের মাধ্যমে এটাই হচ্ছে প্রথম দিয়াহ বা রক্তপণ। পরবর্তীতে ইসলাম এই রক্তপণ পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এইভাবে আল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্মদাতা পিতাকে হেফাজত করেন এবং তার ঔরসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মকে সুনিশ্চিত করেন।

সেই দিনই আবদুল মোত্তালিব ঘরে ফেরার পথে ওহাব বিন আবদে মন্নাফ বিন কিলাবকে মসজিদে হারামে বসা দেখতে পান। তিনি মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি নিজ কন্যা আমিনাকে আবদুল্লাহ বিন আবদুল মোত্তালিবের সাথে বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নানার বাড়ী হচ্ছে মক্কায়, মদীনায় নয়। তাঁর মা বাপ দু'জনই কোরেশী ছিলেন।

যমযমের পানি-সেবা

ফাসী বলেন, আবদুল মোত্তালিবের অনেক উট ছিল। হজ্জের মওসুমে তিনি সকল উটকে জড়ো করে দুধ দোহন করে তাতে মধু মিশিয়ে যমযমের পাশে চামড়ার বড় মশকে হাজীদের পান করার উদ্দেশ্যে রেখে দিতেন। এ ছাড়াও তিনি কিসমিস খরিদ করে তা যমযমের পানিতে ভিজিয়ে শরাব তৈরী করতেন। কেননা, তখন যমযমের পানি ভারী ও লবণাক্ত ছিল। আমৃত্যু তিনি ঐ কাজ অব্যাহত রাখেন এবং হাজীদেরকে পানি পান করান।

আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের উপর سِقَايَةٌ বা পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়। তায়েফে তাঁর আঙ্গুর বাগান ছিল। তিনি সেই বাগান থেকে কিসমিস সংগ্রহ করতেন এবং তায়েফবাসীদের কাছ থেকে আরো অতিরিক্ত কিসমিস কিনে তা দিয়ে শরাব তৈরী করে হাজীদেরকে পান করাতেন। এই অবস্থা আইয়ামে জাহেলিয়াত এবং ইসলামের ১ম যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তারপর মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাস থেকে

পানি পান করানোর দায়িত্ব এবং উসমান বিন তালহা থেকে কাবার সেবার দায়িত্ব ও চাবি নিজ হাতে নেন। তখন হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে হাত পাতেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার মা-বাপ কোরবান হউক। আমাকে কাবার সেবা, চাবি ও পানি পান করানোর দায়িত্ব দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, জাহেলিয়াতের খুন, সম্পদ ও প্রতিশোধসহ সবকিছু আমার দুই পায়ের নীচে। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের সকল পদ্ধতি ও সেবা বাতিল। শুধু কাবার সেবা এবং হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব অপরিবর্তিত থাকবে। এগুলো জাহেলিয়াতের সময় যে রকম ছিল সে রকমই অব্যাহত থাকবে। তখন হযরত আব্বাস (রা) পানি পান করানোর দায়িত্ব পুনরায় পান।

বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) যমযম কূপের কাছে যান এবং যমযম কূপ থেকে বড় এক বালতি পানি ভর্তি করার আহবান জানান। পানি পান করানোর অধিকার হচ্ছে হযরত আব্বাস (রা) এর। তাই তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি নিজ হাতে পানি না উঠিয়ে তাদেরকেই পানি উঠাতে বলেন। তিনি বলেন, 'হে আবদুল মোত্তালিবের সন্তানেরা! পানি উঠাও। নচেৎ অন্যরা তোমাদেরকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।' তিনি নিজে আবদুল মোত্তালিবের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে এজন্য পানি উঠাননি যাতে করে পরবর্তীতে অন্যরা তাঁর অনুসরণে পানি না উঠায়। কেননা এতে বনি আব্বাস ঐ কাজ থেকে বঞ্চিত হবে।

আযরাকী আব্বাসী পানি সেবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, পানি পান করানোর জায়গার দৈর্ঘ্য ২৪ হাত এবং প্রস্থ ১৯ হাত ছিল। এর চার দেয়ালে ৪টি স্তম্ভ ছিল এবং প্রত্যেক দেয়ালের মাঝখানে ছিল আরেকটি স্তম্ভ। এক স্তম্ভ আরেক স্তম্ভের সাথে কাঠের উন্নত তখতা দ্বারা সংযুক্ত। প্রত্যেক দেয়ালের উচ্চতা ছিল ৮ গজ এবং তখতার দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে ছয় হাত। পানি পান করার দেয়ালের উপর ৪৬টি আসন ছিল। কাবার সাথে সংলগ্ন দেয়ালে ছিল ১৩টি, মাসআর[৭] সাথে সংলগ্ন দেয়ালে ছিল ১৩টি, দারুন্ নাদওয়াহ সংলগ্ন দেয়ালে ১০টি, এবং উপত্যকা সংলগ্ন দেয়ালে ছিল ১০টি আসন। এগুলো হচ্ছে খলীফা মাহদীর নির্মিত। ২শ' হিজরীতে, হুসাইন বিন হাসান আলাওয়ী ফিতনার সময় তা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি দেয়াল সরু

করেন, দরজা ভেঙ্গে ফেলেন এবং আসনকে সংযুক্তকারী কাঠগুলো সরিয়ে ফেলেন, এর ছাদ ফেলে দেন এবং ভিটিতে পাথরের টুকরা বিছিয়ে দেন। লোকেরা এতে নামায পড়া শুরু করে। হজ্জের সময় এর দরজাগুলো পূর্বের মতই আবার লাগানো হত। মোবারক আত্‌তাবারীর আমলে কাঠের তখতা পুনর্বহাল করা হল, ছাদ দেয়া হল এবং ভিটি থেকে পাথরের টুকরাগুলো সরিয়ে ফেলা হল। পানি পানের জায়গায় কাবার দিকে দুটো দরজা ছিল। প্রত্যেক দরজার দুটো অংশ ছিল। উপত্যকা বরাবর ছিল ৩য় দরজাটি। এতে পানি পান করার ৬টি হাউজ ছিল। প্রত্যেক হাউজের দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাড়ে ৫ গজ, চওড়া হচ্ছে ২ গজ এবং উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে তিন হাত। প্রত্যেক হাউজে একটি চামড়ার মশক ছিল এতে হাজীদের জন্য মদ রাখা হত এবং যমযমের পানির সাথে পাইপের মাধ্যমে এর সংযোগ রাখা হয়েছিল। টিউব পাইপ যে কক্ষে রাখা হয়েছিল তা কানীসা নামক ছায়াদার শেডের দিক থেকে আসার সময় বামে, যমযমের উপর নির্মিত হয়েছিল। সেখানে একটি কাঠের হাউজ ছিল।

যমযমের পানি পান করার স্থানের এই চেহারা ২২৯ হিজরীতে, উমর বিন ফারাজ রাখজী কর্তৃক তা ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত বহাল ছিল। তিনি কূপের নীচের অংশ সাদা নকশা খোদাই পাথর দ্বারা নির্মাণ করেন, প্রবেশ পথকে রোমান নির্মাণ পদ্ধতি অনুযায়ী সাজান এবং উপরের অংশ ইট ও টাইলস দ্বারা নির্মাণ করেন। তিনি দেয়ালের মধ্যে লোহার তৈরী জানালা এবং দরজা লাগান। আর কানীসার উপর তিনটি ছোট গম্বুজ তৈরি করেন এবং তাতে মোজাইক করেন। তিনি পানি পান করার জায়গার ভেতর কাঠের তৈরী একটি বড় হাউজ নির্মাণ করেন এবং এর ভেতর চামড়ার তৈরি মশকে হাজীদের জন্য মিষ্টি পানি 'নাবীজ' সরবরাহ করেন।

তকী ফাসী আব্বাসের পানি সেবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, পানি পান করানোর ঘরটি বর্গাকৃতির এবং উপরে ছিল একটি বড় গম্বুজ যা সমস্ত ঘরকে আবৃত করে রেখেছিল। গম্বুজটি ইট ও চুনার তৈরি ছিল। দক্ষিণ দিক ব্যতীত ঘরের অন্যান্য সকল দিকের দেয়ালে প্রতিটিতে দুটো করে লোহার জানালা ছিল। এর উত্তরাংশের বাইরের দিকে মার্বেল পাথরের তৈরি দুটো হাউজ ছিল এবং একটি দরজা দ্বারা হাউজ দুটো একটা থেকে আরেকটা পৃথক ছিল।

ঘরের ভেতর একটি বড় কূয়া ছিল। সেটি যমযমের পানি দ্বারা ভর্তি করা হত।

নলাকৃতির একটি লম্বা কাঠ দিয়ে কূপ থেকে ঐ কূয়ায় পানি নিয়ে আসা হত। এটি যমযম কূপের উপর নির্মিত কক্ষের পূর্বের দেয়ালের সাথে লাগানো ছিল এবং সেখান থেকে উল্লেখিত দেয়ালের দিকে জোরে পানি প্রবাহিত হত। মাঝে একটা ঝর্ণা ছিল। সেটি থেকে মাটির নীচের একটি সরু খাল দিয়ে বেগে কূয়াতে পানি আসত। ৮০৭ হিজরীতে যমযমের উপর নির্মিত গম্বুজটির সর্বশেষ সংস্কার করা হয়। কেননা, উইপোকা এর কাঠের কিছু অংশ খেয়ে ফেলায় তা ধসে পড়ে। হাজারে আসওয়াদ থেকে পানি পান করানোর জায়গার দূরত্ব হচ্ছে ৮০ হাত।

হুসাইন বাসালামাহ বলেন,(৮) তকী ফাসী ৮০৭ হিজরীতে যমযমের গম্বুজের সর্বশেষ যে সংস্কারের কথা বলেন, তা হচ্ছে তাঁর সমসাময়িক সংস্কার। এর আগে খলীফা মুহাম্মদ আল মাহদী আব্বাসী এর সংস্কার করেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, খলীফা মাহদী দুটো গম্বুজ তৈরি করেন। একটি হচ্ছে যমযমের উপর। আর অন্যটি তিনি মসজিদে হারামে ওয়াকফকৃত সম্পদ রাখার জন্য নির্মাণ করেন। এতে কথিত মোসহাফে উসমানীসহ আরো কুরআন শরীফে রাখা হত। ইবনে জোবায়ের তাঁর মক্কা ভ্রমণ বইতে লিখেছেন, আব্বাসের নির্মিত গম্বুজে একটি বড় বাক্স ছিল। এতে কুরআন শরীফ রাখা হত।

নাজমুদ্দিন বিন ফাহাদ আল কোরাইশী তাঁর اتْحَافُ الْوَرٰى বইতে লিখেছেন, মোসেলের শাসকের মন্ত্রী জাওয়াদ ৫৫১ হিজরীতে যমযমের উপর যে গম্বুজ তৈরি করেন তা পোকায় খাওয়াতে ধসে পড়ায় ৮০৭ হিজরীতে পুনরায় তা মেরামত করা হয়। পরবর্তীতে যমযমের পার্শ্বে আব্বাসের বৈঠকখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। সেটি بَابُ الْخَلْوَةِ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বাবুল খালওয়াতে একটি গম্বুজ বিশিষ্ট কূপ তৈরি করা হয়। সাফা পাহাড়ের দিকের দেয়ালে তামার তৈরি পানির টেপ লাগানো হয় এবং সেখানে নীচে পাথর বিছিয়ে দেয়া হয়। লোকেরা এর উপর অজু করে। গম্বুজ বিশিষ্ট কূয়ার একটি জানালা কাবার দিকে এবং অন্যটি সাফার দিকে নির্মাণ করা হয়। গভর্ণর বাইসাক তুর্কী ঐ সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফর কাহিনীতে বলেন, যমযমের গম্বুজের নীচে কলসীতে পানি রাখা হত এবং ঠাণ্ডা হলে তা লোকেরা পান করত। ঐ কলসীগুলোকে দাওরাক বলা হত। সেই গম্বুজের নীচে কুরআন এবং মসজিদে হারামের নামে ওয়াকফকৃত

বই-পুস্তকগুলোও রাখা হয়। এতে একটি বাক্স ছিল। সেই বাক্সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের ১৮ বছর পর হযরত যায়েদ বিন সাবিতের হাতের লেখা এক কপি কুরআন মজীদও সংরক্ষিত ছিল।

১৩০১ হিজরীতে মক্কার গভর্নর শরীফ আউন রফিক এবং শেখুল হারাম উসমান নূরী পাশা পূর্বোল্লেখিত গম্বুজগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। কারণ হল, তখন মসজিদে হারামে বন্যার পানি প্রবেশ করায় গম্বুজের নীচে সংরক্ষিত প্রচুর বই-পুস্তক ও অন্যান্য জিনিসপত্র নষ্ট হয়। তখন বাবে দোরাইবায় অবস্থিত মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে ঐ সকল কিতাব স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মসজিদের অঙ্গন সম্প্রসারণ করে তা মুসল্লীদের নামাজের জায়গায় রূপান্তরিত করা হয়।

কুর্দী তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, বাবুল খালওয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বসতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটিই হযরত আব্বাসের পানি পান করানোর স্থান ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি খলীফা মাহদীর মেয়ে যুবাইদার ইচ্ছা অনুযায়ী যমযমের পানি পান করা এবং গোসল করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

বাদশাহ আবদুল আযীয বিন সউদ নিজ খরচে যমযমের পূর্বে ও দক্ষিণে পানি পান করানোর জন্য দু'টো স্থান নির্মাণ করেন। দক্ষিণ দিকে ৬টি এবং পূর্ব দিকে ৩টি টেপ লাগানো হয়। এগুলোতে গিয়ে লোকেরা পানি পান করে। দক্ষিণ দিকের সাবীল তৈরি হয় ১৩৪৬ হিজরীতে এবং পূর্বদিকের সাবীলটি তৈরি হয় ১৩৪৫ হিজরীতে।

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা সোলায়মান বিন আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মক্কার শাসক খালেদ বিন আবদুল্লাহ কোসারীর কাছে পাহাড় কেটে কূপ খনন করে যমযম এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে মিষ্টি পানির একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করার নির্দেশ দেন। আদেশ অনুযায়ী খালেদ কোসারী সাবীর পাহাড়ের মূলে, একটি মিষ্টি পানির কূপ খনন করেন। সেই কূপটি আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। একে কোসারী কূপ কিংবা 'বারদী বাবীর মায়মুন কূপ'ও বলা হয়। তিনি নকশা করা লম্বা পাথর দিয়ে তা মজবুতভাবে নির্মাণ করেন এবং সেখান থেকে একটি ঝর্ণাধারা নির্মাণ করেন। তাতে বাঁধ দিয়ে তিনি একটি কূয়া তৈরি

করেন, সেখান থেকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত একটি নালা তৈরি করেন এবং তা থেকে মার্বেল পাথরের তৈরি একটি হাউজে এসে ঝর্ণার মত পানি পড়ার ব্যবস্থা করেন। নালাটি সীসার তৈরি পাইপ দ্বারা নির্মাণ করা হয়। এই ঝর্ণাধারা নির্মাণ শেষে কোসারী মক্কায় উট জবেহ্ করে গোশত বিতরণের নির্দেশ দেন এবং লোকদেরকে খানা খাওয়ান। তারপর তিনি মিম্বারে উঠে লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেন, তোমরা খলীফার জন্য দোয়া কর। কেননা, তিনি তোমাদেরকে যমযমের লবণাক্ত পানির পরিবর্তে মিষ্টি পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু লোকেরা এই মিষ্টি পানির চাইতে যমযমের পানি পান করতেই বেশী আগ্রহী ছিল। এই অবস্থা দেখে খালেদ অন্য একদিন বক্তৃতায় মক্কাবাসীদের সমালোচনা করেন। এর পর দাউদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের খেলাফতের সময় ঐ ঝর্ণাধারাটি বন্ধ করে দেয়ায় লোকেরা খুশী হয়। কেননা, এতে করে পুনরায় যমযমের প্রধান্য বৃদ্ধি পায়।

তকী ফাসী এই ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, খালেদ কোসারী অনেক মহান কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তাঁর এবং তাঁর খলীফার পক্ষ থেকে অনুরূপ নিন্দনীয় কাজ সংঘটিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

যমযমের বিভিন্ন নাম

ফাকেহী লিখেছেন, আহমদ বিন ইবরাহীম আমাকে একটি কিতাব দিয়েছেন। সেটি তাঁর মক্কার শিক্ষকদের লেখা। সেই কিতাবে যমযমের নিম্নোক্ত নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

١) هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ ٢) سُقْيَا اللّٰهِ اِسْمَاعِيْلَ ٣) لَاشَرْقِ ٤) لَاتَنْزَمْ
٥) بِرِكَّةُ ٦) سَيِّدَةَ ٧) نَافِعَةَ ٨) مَضْنُوْنَةَ ٩) عَوْفَةَ ١٠)
بُشْرَى ١١) صَافِيَةَ ١٢) بَرَّةُ ١٣) عِصْمَةَ ١٤) سَالِمَةَ ١٥)
مَيْمُوْنَةُ ١٦) مُبَارَكَةَ ١٧) كَافِيَةَ ١٨) عَافِيَةَ ١٩) مُغَذِّيَةَ ٢٠)
طَاهِرَةَ ٢١) مَفَدَاة ٢٢) حَرَمِيَةَ ٢٣) مَرْوِيَّةَ ٢٤) مُؤْنِسَةَ ٢٥)

طَعَامُ طُعْمٍ ٢٦) شِفَاءُسُقْمٍ ٢٧) طَيِّبَة ٢٨) تَكْتُمْ ٢٩) شَبَّاعَةُ الْعِيَالِ ٣٠) شَرَابُ الْأَبْرَارِ ٣١) قَرْيَةُ النَّمْلُ ٣٢) نَقْرَةُ الْغُرَابِ ٣٣) هَزْمَةُ اِسْمَاعِيْلَ ٣٤) حَفِيْرَةُ الْعَبَّاسَ -

নগর অভিধানের লেখক ইয়াকুত হামাওয়ী শেষোক্ত ৮টি নামের কথা উল্লেখ করেছেন। যমযম শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে হিশামের মতে, আরবদের নিকট زَمْزَمَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্য এবং জমা হওয়া। যমযমের প্রচুর পানির কারণে একে যমযম বলে। কারুর মতে এটি زَمَّةٌ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হল অবরুদ্ধ হওয়া। যমযম মাটির বাঁধে অবরুদ্ধ হওয়াতে এর পানি ডানে-বামে প্রবাহিত হতে পারেনি। যদি তাকে বাঁধ দিয়ে আটক করা না হত তাহলে এর পানি মাটির উপর দিয়ে গড়াত, এটা হযরত ইবনে আব্বাসের মত।

হারবীর মতে زَمْزَمَةُ الْمَاءِ শব্দের অর্থ হচ্ছে পানির শব্দ। যমযম এই শব্দ থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। তাই এর অর্থ হচ্ছে শব্দ করা। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম যুগে এটি পারস্যবাসীদের হজ্জের স্থান ছিল এবং তারা এখানে জড় হত। এটি অনারববাসীদের শব্দ। মাসউদীর মতে, زَمْزَمَةٌ হচ্ছে ঘোড়ার পানি পান করার সময় নাকের ভেতর থেকে যে আওয়ায বের হয় তা। হযরত উমর (রা)- তাঁর কর্মচারীদের কাছে লিখেছিলেন, اَنْهَوُا الْفُرُسَ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ঘোড়াদেরকে শব্দ করা থেকে বিরত রাখ।' ইয়াকুত আল হামাওয়ী লিখেছেন, পানির প্রাচুর্যের জন্যই যমযমকে যমযম নামকরণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, জিবরীল (আ) এর আওয়ায এবং কূপটি সম্পর্কে কথা বলার কারণে এর যমযম নামকরণ করা হয়েছে।

যমযমের উপরে বর্ণিত নামসমূহের কিছু ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ আলাওয়ী মালিকের মতে[৯] (ক) شَبَّاعَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুধা নিবারণকারী। ক্ষুধা দূর করার উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করলে ক্ষুধা দূর হয়। তাই একে 'শাব্বাআ' বলা হয়। (খ) مَرْوِيَّةٌ শব্দটি رَىٌّ থেকে নির্গত হয়েছে।

এর অর্থ হল 'তৃষ্ণা নিবারণকারী'। আরবীতে বলা হয় رَوَىَ مِنَ اللَّبَنِ وَالْمَاءِ অর্থ 'দুধ ও পানি দ্বারা পিপাসা মিটাল।' (গ) نافعة শব্দের অর্থ হচ্ছে উপকারী। যমযমের পানি অনেক উপকারে আসে তাই একে 'নাফেআ' বলা হয়। (ঘ) عَافِيَةٌ অর্থ মুক্তি লাভ করা। এই কূপের পানি পান করার মাধ্যমে বহু লোক বিভিন্ন রোগ ও বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। (ঙ) مَيْمُوْنَةٌ শব্দটি يَمْنٌ শব্দ থেকে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বরকত। এর বরকত সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের বহুলোক এই কূপের পানি পান করে বরকত হাসিল করেছে। (চ) برة শব্দটি بِرٌّ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও ইহসান। যমযমের পানি পান করে বহু লোক কল্যাণ ও ইহসান লাভ করেছে। (ছ) مَضْنُوْنَةٌ এর অর্থ হচ্ছে ভাল জিনিস থেকে কাউকে বারণ করা। এটি একটি উত্তম কূপ বলে আল্লাহ তাঁর নাফরমান বান্দাহদের একটি জাতিকে এই পানি থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করেছেন। (জ) كَافِيَةٌ শব্দটি كِفَايَةٌ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হল যথেষ্ট। এই পানি পিপাসা মিটানোর জন্য যথেষ্ট। অন্য কোন পানির প্রয়োজন নেই। (ঝ) شِفَاءُ سُقْمٍ এর অর্থ হচ্ছে রোগের চিকিৎসা। এই কূপের পানি দ্বারা বহু রোগের চিকিৎসা হয়। (ঞ) طَعَامُ طُعْمٍ এর অর্থ হচ্ছে ক্ষুধার খাবার। ক্ষুধার সময় এই পানি পান করলে ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। (ট) هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ এর অর্থ হচ্ছে জিবরীলের আঘাতের স্থান। (ঠ) حَرَمِيَةٌ এটি হারামে অবস্থিত বলে একে حَرَمِيَةٌ বলা হয়। (ড) تَكَتُّمْ শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা। এটা এক সময় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে একে তাকাত্তুম বলা হয়। (ঢ) نَقْرَةُ الْغُرَابِ এর অর্থ হচ্ছে, কাকের ঠোঁকরানো। আবদুল মোত্তালিব কাকের ঠোঁকরানোর চিহ্ন অনুযায়ী যমযম কূপ খনন করে পুনরাবিষ্কার করেন। (ণ) شَرَابُ الْاَبْرَارِ এর অর্থ হচ্ছে নেককারদের পানীয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নেককারদের পানীয় অর্থাৎ যমযমের পানি পান

কর। (ত) قَرْيَةُ النَّمْلِ এর অর্থ হচ্ছে পিঁপড়ার বসতি। আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ খননের পূর্বে স্বপ্নে পিঁপড়ার বসতি খুঁড়ে যমযম আবিষ্কার করার জন্য আদিষ্ট হন। (থ) سُقْيَا اللّٰه اسْمَاعِيْلَ এর অর্থ হচ্ছে ইসমাঈলের জন্য আল্লাহর পানীয়। (দ) সাফিয়া صَافِيَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচ্ছন্ন। যমযমের পানিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। (ধ) مُغَذِّيَةٌ এর অর্থ হচ্ছে খাবারদানকারী। যমযমের পানিতে ক্ষুধা ও পিপাসা মিটে। কেউ কেউ এর নাম বলেছেন مُعَذِّبَةٌ। এটি عَذْبٌ শব্দ থেকে বেরিয়েছে। এর অর্থ হল, মিষ্টি পানি দানকারী। (ন) مُؤْنِسَةٌ শব্দের অর্থ হল প্রিয়। এই পানি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তাই এর এই নামকরণ করা হয়েছে।

যমযমের পানির ফজীলত

আযরাকী লিখেছেন, ওহাব বিন মোনাব্বিহ যমযম সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহর কসম, এটি আল্লাহর কিতাবে উত্তম কল্যাণকর, নেককারদের পানীয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিখিত আছে।[১০]

আযরাকী যানজী থেকে এবং তিনি ইবনে খায়সাম থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার ওহাব বিন মোনাব্বিহ আমাদের কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিল কিছু যমযমের পানি। আমরা বললাম, আপনি কিছু মিষ্টি পানি (স্বাভাবিক পানি) কেন পান করছেন না? যমযমের পানি তো যথেষ্ট লবণাক্ত। তখন তিনি জবাব দেন, আমার অসুখ ভাল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি অন্য কোন পানি পান করবো না। যার হাতে ওহাবের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহর কিতাবে এটি যমযম হিসেবে লিখিত; এটি কখনও শুকাবে না এবং ক্ষতিকর হবে না; এটি আল্লাহর কিতাবে উপকারী এবং নেককার লোকদের পানীয় হিসেবে লিখিত আছে; এটি আল্লাহর কিতাবে উত্তম বলে বিবেচিত; এটি আল্লাহর কিতাবে ক্ষুধা নিবারণ এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। ওহাবের প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, কেউ যদি পেট ভর্তি করে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ত করে তা পান করে অবশ্যই

তার রোগের চিকৎসা হবে এবং সে রোগমুক্ত হবে।[১১] মুজাহিদ বলেন,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَاشُرِبَ لَهُ - اِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيْدُ شِفَاءً شَفَاكَ اللّٰهُ وَاِنْ شَرِبْتَهُ لِظَمَأٍ اَرْوَاكَ اللّٰهُ - وَاِنْ شَرِبْتَهُ لِجُوْعٍ اَشْبَعَكَ اللّٰهُ - وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ بِعَقِبِهِ وَسُقْيَا اللّٰهِ اِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامْ -

অর্থ ঃ যমযমের পানি যে যে নিয়তে পান করবে তার সেই নিয়ত পূরণ হবে; তুমি যদি রোগমুক্তির জন্য তা পান কর তাহলে, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। যদি তুমি পিপাসা মিটানোর জন্য পান কর, তাহলে, আল্লাহ তোমার পিপাসা পূরণ করবেন। যদি তুমি ক্ষুধা দূর করার উদ্দেশ্যে তা পান কর তাহলে, আল্লাহ তোমার ক্ষুধা দূর করে তৃপ্তি দান করবেন। এটি জিবরীলের পায়ের গোড়ালীর আঘাতে হযরত ইসমাঈল (আ) এর পানীয় হিসেবে তৈরি হয়েছে।[১২]

সুফিয়ান ইবরাহীম থেকে এবং তিনি ইবনে আবী হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোহাইল বিন আমরের কাছে যমযমের পানি উপহার পাঠিয়েছিলেন। (আযরাকী)[১৩]

ইকরামা বিন খালেদ বলেন, একদিন গভীর রাত্রে আমি যমযমের পার্শ্বে বসা ছিলাম। তখন একদল সাদা কাপড় পরিহিত লোক কাবার তওয়াফ করছিলেন। এমন ধবধবে সাদা কাপড় আমি আর কখনও দেখিনি। তওয়াফ শেষে তাঁরা আমার কাছে নামায পড়লেন এবং একজন তাঁর অন্য সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, চল আমরা নেক লোকদের পানীয় পান করি। তাঁরা যমযমে প্রবেশ করলেন। আমি ভাবলাম, আমি তো তাঁদেরকে তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। তারপর আমি তাঁদের কাছে গেলাম, দেখলাম সেখানে কোন মানুষের নাম-গন্ধও নেই। (আযরাকী)[১৪]

হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের সময় লোকেরা একবার ভীষণ অভাবের সম্মুখীন হয়। ফলে খাবার সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন লোকেরা যমযমের পানির জন্য ছুটে আসে, পরিবারসমূহ শিশুদেরকে নিয়ে ভোরে যমযমে হাজির হত। তখন শিশুদের

বাঁচানোর জন্য যমযমকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হত।

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَاشُرِبَ لَهُ ـ

অর্থ ঃ 'যমযমের পানি যে, যে নিয়তে পান করবে তার সেই নিয়ত পূরণ হবে।' (ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَاشُرِبَ لَهُ اِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِى بِه شَفَاكَ اللّٰهُ وَاِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمْئِكَ قَطَعَهُ اَللّٰهُ ـ هِىَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ وَسُقْيَا اللّٰهِ اِسْمَاعِيْلَ ـ (زمزم يحيى كوشك)

অর্থ ঃ যমযমের পানি যে যে মকসুদে পান করবে, তার সেই মকসুদ পূরণ হবে; যদি তুমি এই পানি রোগমুক্তির জন্য পান কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন; যদি তুমি পিপাসা মিটানোর জন্য এই পানি পান কর তাহলে আল্লাহ তোমার পিপাসা দূর করবেন; এটি জিবরীলের পায়ের আঘাতে ইসমাঈলের পানীয় হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلتَّضَلُّعُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ بَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ ـ (الازرقى)

অর্থ ঃ 'পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করা মুনাফেকী থেকে মুক্তির কারণ।'(১৫)

সাঈদ উসমান থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে তিনি একজন আনসার থেকে এবং ঐ আনসার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাদের সাথে মুনাফেকদের পার্থক্য হচ্ছে, তারা পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমরা নেক লোকদের নামাযের স্থানে

নামায আদায় কর এবং দ্বীনদার লোকদের পানীয় পান কর।

صَلُّوْا فِيْ مُصَلَّى الْاَخْيَارَ وَاشْرَبُوْا مِنْ شَرَابِ الْاَبْرَارِ -

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, নেককারদের মোসাল্লা এবং দ্বীনদারের পানীয় বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দেন, নেককারদের মোসাল্লা হচ্ছে মীযাবের নীচে নামায পড়া এবং দ্বীনদারের পানীয় হচ্ছে যমযমের পানি। (আযরাকী)[১৬]

হযরত আবুজর গিফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওতের খবর জানতে পেরে তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে নিজ গোত্র থেকে মক্কায় রওনা হন। মক্কায় এসে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে কাফেররা তাঁকে পাথর মেরে বেহুঁশ করে ফেলে এবং তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি যমযমের কাছে গিয়ে পানি দিয়ে রক্ত ধুয়ে ফেললাম এবং যমযমের পানি পান করলাম। হে ভাতিজা (আবদুল্লাহ বিন সামিত) শোন! আমি সেখানে রাসূলুল্লাহর অপেক্ষায় ৩০ দিন বা রাত (অন্য রেওয়ায়েতে ১৪ দিন) অবস্থান করি। কিন্তু সেখানে যমযম ছাড়া আমার আর অন্য কোন খাবার ছিল না। অথচ, আমি মোটাসোটা হয়ে গেলাম এবং পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। এমনকি আমি পেটে সামান্য ক্ষুধাও অনুভব করলাম না। দীর্ঘ একমাস কা'বার পার্শ্বে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁকে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতদিন এখানে কি খেয়েছিলে? তিনি জবাব দিলেন, আমি যমযমের পানি পান করা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। এতে আমি মোটা হয়ে গেছি এবং আমার পেটের চামড়ার উপর ভাঁজ পড়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ এটি ক্ষুধার সময় খাবারের কাজ করে।

সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন خَيْرُ مَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ অর্থ ঃ যমীনের উপর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরীল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর বুক চিরে হৃদয় বের করে এনে সোনার প্লেটে রাখেন। সেখান

থেকে একটি রক্তের চাকা ফেলে দিয়ে বলেন, এটি তোমার মধ্যে শয়তানের একটি অংশ ছিল। তারপর যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে তিনি তা যথাস্থানে রেখে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মাঠে তাঁর অন্য খেলার সাথীদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন।

হাফেজ ইরাকী বলেছেন, যমযমের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বক্ষদেশ ধোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি যেন আসমান-যমীন এবং বেহেশত-দোযখ দেখার মত শক্তি লাভ করেন। কেননা, যমযমের পানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং ভয় দূর করে।

যমযমের পানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে যমযমের পানি দ্বারা জ্বর দূর হয়েছে। নাসাঈ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দাহ্হাক বিন মোযাহেম বলেন, মাথা-ব্যথার সময় যমযমের পানি পান করলে মাথা-ব্যথা দূর হয় এবং যমযমের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।'(১৭)

ইমাম বদরুদ্দিন বিন সাহেব মিসরী বলেছেন, শরীয়াহ এবং চিকিৎসার দৃষ্টিতে, যমযমের পানি পৃথিবীর অন্য যে কোন পানির চাইতে উত্তম। তিনি বলেন, আমি যমযমের পানি এবং মক্কার অন্য কূপের সমপরিমাণ পানি ওজন করে দেখেছি, যমযমের পানির ওজন এক চতুর্থাংশ বেশী।

কথিত আছে যে, শাবানের মাসের রাত্রে যমযমের পানি মিষ্টি হয়ে যায় এবং তা নেককার লোক ছাড়া অন্য কেউ টের পায় না। শেখ আবুল হাসান কারবাজ একবার তা দেখতে পেয়েছেন।(১৮)

ফাকেহী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এক মোরসাল রেওয়ায়েতে (মোরসাল হচ্ছে তাবেঈ রাসূলুল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা) বলেন, মাকহুল বলেছেন,

اَلنَّظَرُ فِيْ زَمْزَمَ عِبَادَةٌ وَهِيَ تَحُطُّ الْخَطَايَا -

অর্থ ঃ যমযমের প্রতি নজর করা এবাদত। এর ফলে, গুনাহ মাফ হয়।

সাঈদ বিন সালেম উসমান বিন সাজ থেকে, তিনি মোকাতেল থেকে, তিনি দাহ্হাক থেকে এবং তিনি মোযাহেম থেকে বর্ণনা করেন, এমন একদিন আসবে যখন যমযমের পানি নীলনদ এবং ফোরাত নদীর পানি থেকেও অধিকতর মিষ্টি

হবে। ২৮১ হিজরীতে আজকের মত যমযমের পানি সেরা মিষ্টি পানিতে পরিণত হয়েছিল।[১৯]

আল-জামে আল-লতীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে হযরত জাবের থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযম কূপের পানি পান করবে, তার গুনাহ যত বেশীই হউকনা কেন তা মাফ হয়ে যাবে।

জামে সগীরে আল্লামা মানাওয়ী مَاءُ زَمْزَمَ لِمَاشُرِبَ لَهُ অর্থ ঃ যে যে নিয়তে যমযমের পানি পান করে তার সেই নিয়ত পূরণ হয়। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যমযমের উৎপত্তি হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ) এর ছেলে ইসমাঈলের সাহায্যের জন্য। আজও যদি কেউ ইখলাসের সাথে সেই পানি ব্যবহার করে তাহলে সেও আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে।

হাকীম তিরমিযী বলেন, যমযমের পানি থেকে উপকার পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে নিয়তের গভীরতা ও পরিপক্কতার উপর। খালেস নিয়তে ঐ পানি ব্যবহার করলে তার উপকার অবশ্যম্ভাবী।

১৯৮৯ খৃঃ ১ লা মার্চ তারিখে জিদ্দা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ওকাজ পত্রিকা 'যমযমের পানি পান করায় পঙ্গুত্ব সেরে গেছে' এই শিরোনামে খবর দিয়েছে যে, একই সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনের এক পঙ্গু স্কুলের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে ২ জন ডাক্তার ও ২ জন সুপারভাইজার মক্কা ও মদীনা যেয়ারতে আসেন। ছাত্র প্রতিনিধিদলে ভারত ও পাকিস্তান বংশোদ্ভুত ৪ জন বৃটিশ পঙ্গু ছাত্র-ছাত্রীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা প্রথমে মদীনা সফর করেন এবং পরে মক্কায় ওমরাহ্ আদায় করেন। প্রতিনিধিদলে নয় বছর বয়স্কা রায়হানা আজম নামক এক বালিকার ডান হাতের আঙ্গুল স্থায়ীভাবে পঙ্গু ছিল। ফলে সে তা নাড়াচাড়া করতে পারতনা। হঠাৎ করে দেখা গেল, সে তার আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে পারে এবং তার আঙ্গুলের পঙ্গুত্ব সেরে গেছে। এটা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। এর আগে তার পিতা তাকে লণ্ডনের বহু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যায়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছিল এ রোগের চিকিৎসা কিংবা আরোগ্য লাভ সম্ভব নয়। আল্লাহ যমযমের পানির মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে দেন।

একই দিন প্রতিনিধিদলের আরও তিনজন অসুস্থ শিশুর মধ্যেও আরোগ্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে রাজিয়া নামক ১০ বছর বয়স্কা একটি মেয়ে বাম চোখে দেখেনা। কিন্তু ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৮৯-এর সকাল বেলায় সে বাম চোখে দেখা শুরু করে। আহমদ্‌দীন নামক অন্য এক শিশুর পা স্থায়ীভাবে পঙ্গু। সে পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারেনা। কিন্তু এখন সে পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারে। ১২ বছর বয়স্ক ইকরাম ফারুক ছিল বোবা। সে এখন কথা বলতে পারে। এছাড়াও মরক্কোর এক মহিলার পুরো শরীর ক্যান্সারে ছেয়ে যায়। ডাক্তারদের মতে, তা ভাল হবার নয়। মহিলাটি যমযমের পানিকে সর্বশেষ চিকিৎসা বিবেচনা করে স্বামীকে মক্কা আসার জন্য অনুরোধ জানান। স্বামী তাতে সাড়া দেয় এবং তারা মক্কায় এসে ওমরাহ্ পালন করেন ও যমযমের পানি পান করেন। তাতে মহিলাটির ক্যান্সার ভাল হয়ে যায়।

তাদের আরোগ্য লাভের পর যারা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছে, সবাই বলেছে, মজবুত ঈমানের সাথে যমযমের পানি পান করার কারণে আল্লাহ তাদের অসুখ ভাল করে দিয়েছেন।

যমযমের পানির বৈশিষ্ট্য

ইমাম বদরুদ্দিন বিন সাহেব মিসরী যমযমের পানিকে অন্য পানির সাথে তুলনামূলক ওজন করে দেখেছেন যে, যমযমের পানি অন্য পানির চাইতে এক চতুর্থাংশ বেশী ভারী। তারপর তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করে বলেন, এটি অন্য যে কোন পানির চাইতে সেরা এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি এটাকে অন্য সকল পানির চাইতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেখতে পেয়েছেন।

'আর-রেহলাতুল হেজাযিয়াহ' বই এর লেখক মুহাম্মদ লবীব বিতুনী যমযমের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু উল্টা মন্তব্য করেছেন। তার মতে, যমযমের পানি এক হওয়া সত্বেও বিভিন্ন ভক্তের কাছে তাদের নিজস্ব ধারণা-বিশ্বাসের কারণে, তার স্বাদ বিভিন্ন রকম। কারুর কাছে তা দুধ ও মধুর মত স্বাদ এবং কারুর তাতে ক্ষুধা পর্যন্ত মিটে যায়। হাদীসের আলোকে, মক্কাবাসীরা এটাকে সকল কিছুর জন্য উপকারী মনে করে। তার মতে, এ জাতীয় ধারণা-বিশ্বাস শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন হিন্দুরা গঙ্গার পানিকে পবিত্র মনে করে তাতে স্নান করে এবং খৃষ্টানরা

বাইতুল মাকদেসের ২০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত জর্দান নদীর পানিকেও পবিত্র মনে করে।

যমযমের পানি রোগের চিকিৎসা এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) এর যে হাদীস রয়েছে, সে ব্যাপারে তার বক্তব্য হল, এই পানির প্রকৃতি অনুযায়ী তা যে সকল রোগের নিরাময় করে সে সকল রোগের জন্যই তা চিকিৎসা স্বরূপ। তিনি উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মূলতঃ যমযমের পানি ক্ষার জাতীয় (এলকালিন)। এতে সোডিয়াম, ক্লোরিন, ক্যালসিয়াম, সালফার ও নাইট্রোজেন জাতীয় এসিড এবং পটাসিয়াম সল্ট রয়েছে যার ফলে এটি খনিজ জাতীয় স্বাস্থ্যকর পানির সমতুল্য। তাই যমযমের পানি অল্প পান করা উচিত। বেশী পরিমাণ পান করা ক্ষতিকর। বিশেষ করে হজ্জ মওসুমের পর অবশ্যই অল্প পরিমাণ পানি পান করা উচিত। কেননা, তখন যমযম কূপ অব্যবহৃত থাকে এবং মক্কার লোকেরা এর পানি সামান্যই পান করে। কেননা এই পানি লবণাক্ত। ফলে, এতে নাইট্রোজেন জাতীয় গ্যাস জমে বলে তা পান করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

'তারীখ ইমারাতুল মসজিদিল হারাম' এর লেখক হুসাইন আবদুল্লাহ বাসালামাহ লবীব বিতুনীর উপরোক্ত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, মিঃ লবীব বিতুনী তার চিন্তা ও গবেষণায় সংশয়যুক্ত। তিনি একদিকে যমযমের পানির রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করে বলেন, এর পানি পান করা উপকারী। আবার বলেন, হজ্জ মওসুম ছাড়া অন্য মওসুমে তা কম পান করা উচিত। কেননা, বেশী পরিমাণ পান করলে তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। মক্কাবাসীরা হজ্জ ছাড়া অন্য মওসুমে তা পরিত্যাগ করে এবং এর পানি পান করে না বলে তা পান করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

তার এ সকল বিপরীতমুখী ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তার গবেষণায় সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ডুবে আছেন এবং সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি না হাদীসের সাথে চলতে পারেন এবং না পারেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে চলতে। তার আকীদা-বিশ্বাসে না কোন দৃঢ়তা আছে এবং না তিনি অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের সাথে পরিচিত হতে পেরেছেন।

মক্কাবাসীরা যমযমের পানিকে উপকারী বলে মনে করে মর্মে তার বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা মক্কাবাসীদের মনে করার বিষয় নয় বরং এটা তাদের গভীর

আকীদা-বিশ্বাস। হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তাদের এই গভীর বিশ্বাস জন্মেছে।

মক্কার লোকদের হজ্জ মওসুম ছাড়া অন্য মওসুমে যমযমের পানি পান না করার অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা তিনি কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন, সেটা তিনিই ভাল জানেন। মক্কায় বসবাসকারী প্রতিটি লোক সাক্ষী যে সত্য এর বিপরীত। রাত-দিন ২৪ ঘন্টা যমযম কূপের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীর সকল লোক মিলে পরীক্ষা করলেও এটাকেই সত্য বলে স্বীকার করবে। মিঃ বিতুনী খাম-খেয়ালীবশতঃ এ জাতীয় এলোপাথাড়ি মন্তব্য করেছেন। আইয়ামে জাহেলিয়াত থেকে আজ পর্যন্ত শীত ও গরম মওসুমে, সবসময় মানুষ পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করছে এবং মুহূর্তের জন্যও তাকে ত্যাগ করেনি। যমযমের পানি সম্পর্কে যে সকল হাদীস রয়েছে তিনি সেগুলো সম্পর্কে জেনেও বিকৃত তথ্য পেশ করে যমযমের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করতে চান।

তিনি হিন্দুদের গঙ্গা ও খৃষ্টানদের জর্দান নদীর প্রতি পবিত্রতার মনোভাব তুলে ধরে যমযমের প্রতি মুসলমানদের মনোভাবকেও দুর্বল ও অর্থহীন করে তুলতে চান। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে, তার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতা দ্বারা যমযমের পানির উপকারিতা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। পরবর্তীতে আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার কল্যাণ ও উপকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়াও 'আত্-তারীখ আল কাদীম লি-মক্কাহ ওয়া বাইতিল্লাহিল কারীম' বইয়ের লেখক আল কুর্দী যমযমের পানিতে রোগ-জীবাণুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং বলেন, কিছুসংখ্যক ডাক্তার মন্তব্য করেছে যে তারা যমযমের পানি পরীক্ষা করে এতে জীবাণু দেখতে পেয়েছে। তাদের মতে, বন্যা, বৃষ্টি এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ীসমূহের পয়ঃপ্রণালী থেকে ঐ সকল রোগ জীবাণু যমযমের পানির সাথে মিশায় তা পান করার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কুর্দী বলেন, এই সকল বক্তব্যকে অস্বীকার করার জন্য আমাদের কাছে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো রয়েছে।

১. আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এই উষর মরুভূমিতে আল্লাহর হুকুমে জিবরীল (আ) হযরত ইসমাইল (আ) এর জন্য এই কূপটি বের করেন।

২. এটি কাবা এবং মহান নিদর্শন সাফা-মারওয়াহর দিক থেকে উৎসারিত।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর মক্কা থেকে যমযমের পানি মদীনায় পাঠানোর জন্য বলেছেন।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা) এই পানি উদর ভর্তি করে পান করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৫. যমযমের পানি খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা এবং অন্য যে কোন নিয়তে পান করা হবে, তা পূরণ হবে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

৬. হযরত জিবরীল (আ) যমযমের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বুক চিরে তা ধুয়েছেন।

৭. বহু সংখ্যক নবী, নেক বান্দাহ, আলেম, ইমাম ও বুজুর্গানে দ্বীন এই পানি পান করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত মানুষ এই পানি পান করবে। যমযমের পানির রং অন্য পানির রং এর মত হওয়া সত্বেও এর স্বাদ অন্য যে কোন পানির চাইতে ভিন্ন। এ ছাড়াও রয়েছে এর অগণিত কল্যাণ ও উপকার। প্রশ্ন হচ্ছে, রোগ জীবাণু কি এই যুগেই এতে প্রবেশ করেছে না আগেও করেছিল? অতীতে যমযমের পানি পান করার কারণে কোন লোক অসুস্থ হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। বরং অতীতে, লোকেরা চিকিৎসাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনকে সামনে রেখে যমযমের পানি পান করে উপকার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগেও যারা অনুরূপ নিয়ত করে যমযমের পানি পান করেছে তারাও সমান উপকার পাচ্ছে। এখনও যে কোন লোক তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। কিন্তু অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যমযমের পানি পান করার কারণে ক্ষতি হওয়ার কোন রেকর্ড নেই। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, বন্যা বা বৃষ্টির পানিতে এতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করেছে তথাপি সেটি আল্লাহর কুদরতী কূপে তাঁরই ইশারায় নষ্ট হয়ে যায়। এতে পানির উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বেদুঈনরা তাদের পশুকে নিয়ে এসে যমযমের পানি পান করাতো। সেই সকল পশুর গায়ে মারাত্মক রোগ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তার পরও যমযমের পানি দূষিত হয়নি বরং বিপরীত পক্ষে, তা সবার জন্য উপকারীই প্রমাণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে আগের যুগের কথা যখন যমযম কূপের পরিচ্ছনতার মজবুত ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু বর্তমান যুগে এর সুষ্ঠু পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কুর্দী তাঁর বই এর অন্য জায়গায় বলেছেন, ১৩৭৬ হিজরীতে যমযমের পানিতে কিছুটা লবণাক্ততা দেখা দেয় এবং পানি ভারী হয়ে যায়। এর কারণ অজানা ছিল। কিন্তু ১৩৭৫ হিজরীতে সৌদী সরকার মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর জন্য যখন মাসআর দিকের ঘর বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং ১৩৭৬ হিজরীতে মাসআ অর্থাৎ সাফা হতে মারওয়া এবং বাবুল অদাআ' পর্যন্ত ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভীর গর্ত খনন করে। তখন প্রাচীন বাড়ী-ঘরসমূহের সাথে মসজিদে হারামের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে যমযমের পানি পুনরায় স্বচ্ছ ও মিষ্টি হয়ে আসে। তাই কুর্দী বলেন, যমযমের পানিতে লবণাক্ততা আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে, তাতে ঐ রকম বেশী লবণাক্ততা নেই, যা পান করার অনুপযোগী। বরং এতে সামান্য লবণাক্ততা আছে, যা পান করার উপযোগী। সম্ভবতঃ দুর্বল ও সন্দেহভাজন ঈমানদারের কাছে ত্রুটিপূর্ণ লবণাক্ত মনে হবে। যে কারণে, তারা যমযমের পানি পেট ভরে পান করতে পারে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, পেট ভরে পানি পান করার বিষয়টি আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর যমযমের পানি পান

আযরাকী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে বলেন,[২০] রাসূলুল্লাহ (সা) তওয়াফে এফাদা শেষে এক বালতি যমযমের পানি তোলার আদেশ দেন। তিনি সেই পানি দিয়ে অজু করেন এবং বলেন, হে বনি আবদুল মোত্তালিব! তোমরা পানি তোল, তোমরা পানি না তুললে অন্যরা তোমাদেরকে ঐ কাজ থেকে বঞ্চিত করবে।

আযরাকী আরো বলেন, তাউস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে দিনে তওয়াফে এফাদা করার নির্দেশ দেন এবং নিজে রাত্রে তওয়াফে এফাদা করেন। তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। তারপর যমযমের কাছে এসে বলেন, আমাকে এক বালতি পানি তুলে দাও। তিনি নিজে পানি পান করলেন এবং গড়গড়া সহকারে কুলি করলেন। তারপর বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ তোমরা পানি তুলতে না পারলে তোমাদের কাছ থেকে অন্যরা এই অধিকার নিয়ে যাবে। তারপর তিনি খেজুর মিশ্রিত মিষ্টি পানীয় (নাবীজ) পান করার স্থানে গিয়ে তা পান করতে চান। হযরত

আব্বাস (রা) বলেন, আজ সকাল থেকে লোকদের হাতে তা কিছুটা অপরিষ্কার হয়ে গেছে। ঘরে পরিষ্কার নাবীজ আছে, আপনি সেখান থেকে পান করুন। হযরত আব্বাস ৩ বার একথা বলেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করে এখান থেকেই পানি পান করার উপর জোর দেন। পরে তিনি উপস্থিত স্থান থেকেই নাবীজ পান করেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নাবীজ এবং যমযমের পানি পান করেন এবং বলেন, নাবীজ পান করা সুন্নত না হলে তা বাতিল করা হত। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নাবীজ পান করার পর মন্তব্য করেন, এটা বড় ভাল কাজ, তা অব্যাহত রাখ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নাবীজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সন্তোষ প্রকাশ করায় তা আমাদের কাছে উপত্যকা ভর্তি দুধ ও মধুর চাইতেও অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি আরো বলেন, সম্ভবতঃ এই সুন্নত পরে বাতিল হয়ে গেছে।

আতা বিন আবী রেবাহ বলেন, তওয়াফে এফাদার পর যমযমের পানি পান করতে আমার কখনও ভুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এই সুন্নত অনুসরণের উদ্দেশ্যে আগে আমি অন্য লোকদের সাথে মিলে পানি তুলে পান করতাম। কিন্তু পরে যখন আমি বুড়ো হয়ে গেলাম তখন অন্য লোকেরা পানি তুলে দিত এবং আমি তা পান করতাম। পিপাসা না থাকলেও শুধু সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যেই আমি তা করতাম। কোন কোন সময় আমি খেজুর মিশ্রিত মিষ্টি পানি (নাবীজ) পান করতাম এবং কোন সময় করতাম না। যমযমের পানি পান করা যে সুন্নত এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

যমযমের পানি পান করার আদব

আযরাকী ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি নবী করীম (সা) এর জন্য এক বালতি যমযমের পানি তুলতে এবং তাঁকে তা দাঁড়িয়ে পান করতে দেখি। হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিসমিল্লাহ বলে বালতি ধরেন এবং অনেকক্ষণ যাবত পানি পান করেন। তারপর মাথা উপরের দিকে তুলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেন। এইভাবে তিনি তিনবার পানি পান করেন। ২য় বার আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময় এবং

৩য় বার আরো কম সময় ধরে তিনি পানি পান করেন।

ইমাম তকী ফাসী বলেন, যমযমের পানি পান করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে ঃ পানি পানকারী কেবলামুখী হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনবার শ্বাস নেবে, পেট ভরে পানি পান করবে, পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে এবং পানি পান করার সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যে দোয়া পড়েছিলেন সে দোয়া পড়বে। ইবনে আব্বাস (রা) যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَ لُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণকর জ্ঞান, প্রশস্ত রিয্ক এবং সকল রোগ থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করি।

এই দোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং অন্যান্য কল্যাণকর দোয়াও পড়া যায়।

উলামায়ে কেরামের মতে, ডান হাতে গ্লাস নিয়ে কিবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ বলে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে হবে। তিনশ্বাসে পানি পান করবে। পান শেষে আল্লাহর হামদ প্রকাশ করবে এবং পেট ভরে পানি পান করবে।

যমযমের পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা ও তা অন্যত্র নেয়া

আযরাকী উল্লেখ করেছেন,(২১) যার বিন হোবাইস বলেন, আমি হযরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবকে মসজিদে হারামে, যমযমের চারপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, আমি যমযমের পানিকে গোসলের জন্য জায়েয মনে করিনা; এই পানি দ্বারা অজু করা যাবে এবং তা পান করা যাবে। বনি মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তি যমযমের পার্শ্ববর্তী একটি হাউজ থেকে উলঙ্গ গোসল করার সময় হযরত আব্বাস ঐ কথা বলেন।

ইমাম ফাসী তাঁর শেফাউল গারাম বইতে লিখেছেন, যমযমের পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। ইমাম নবওয়ী এবং মাওয়ারদী এই কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অন্য পানি থাকা অবস্থায় যমযমের পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করা (পবিত্রতা হাসিল করা) ঠিক নয়। লোকেরা বলে, যমযমের পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা

করলে অর্শ রোগ হয় এবং যারা তা করেছে তাদের অর্শ রোগ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। মুহিব আত তাবারী এর দ্বারা এস্তেঞ্জা করাকে নাজায়েয বলেছেন। মাওয়ারদীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যমযমের পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করা এবং মুর্দাকে গোসল দেয়া জায়েয নেই। মালেকী মাজহাবে যমযমের পানি দিয়ে অজু করাকে উত্তম বলা হয়েছে। শাফেঈ মাজহাবে, এই পানি দিয়ে অজু গোসল দুটোই জায়েয আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এক রেওয়ায়েতে এই পানি দিয়ে অজু করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে।

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন[২২] মক্কার লোকেরা মুর্দাদের গোসলের পর বরকতের জন্য যমযমের পানি দিয়ে তাদেরকে পুনরায় গোসল দেয়। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরকে যমযমের পানি দিয়ে গোসল করিয়েছেন। শেখ জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ জারুল্লাহ বিন জুহায়রা আল-কোরাইশী তাঁর বইতে লিখেছেন, যমযমের পানি পবিত্র। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তা এস্তেঞ্জায় ব্যবহার করা যাবে না। অপরদিকে, মুহিব আত-তাবারী জোর দিয়ে বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা গেলেও তা দিয়ে শরীরের নাপাকী দূর করা জায়েয হবে না।

ইমাম ফাসী বলেন, ৪ মাজহাবের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী যমযমের পানি অন্য স্থান বা দেশে নেয়া জায়েয আছে। বরং শাফেঈ এবং মালেকী মাজহাবে তা মুস্তাহাব। অথচ শাফেঈ মাজহাবে হারাম এলাকার পাথর অন্যত্র নেয়া জায়েয নেই।

যমযমের পানি স্থানান্তরের ব্যাপারে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে এর প্রধান ভিত্তি। হযরত আয়িশা বোতলে করে যমযমের পানি বয়ে নিয়ে গেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কলসী এবং চামড়ার মশকে করে যমযমের পানি নিয়ে গেছেন, রোগীদেরকে তা পান করিয়েছেন এবং রোগীদের উপর উক্ত পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোহাইল বিন আমরকে যমযমের পানি উপহার দিয়েছেন। বিনিময়ে সোহাইল রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য দুটো ভারবাহী পশু উপহার পাঠিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যমযম কূপের উন্নয়ন

আযরাকী লিখেছেন,[২৩] ইবনে আব্বাসের আমলে, যমযমের পানি পান করার জন্য দু'টো হাউজ ছিল। একটি ছিল, যমযম কূপ এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে, পানি পান করার হাউজ। অন্যটি ১ম টির পেছনে বাবুস সাফা বরাবর অজুর হাউজ। ১ম'টা থেকে ২য় টায় অজুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। কূপ থেকে চামড়ার মশকে করে পানি তুলে দুই হাউজে ঢালা হত। তখন দুইটি হাউজই কূপের কাছে ছিল এবং মাঝে কোন বেড়া ছিল না।

হযরত মুয়াওয়িয়াহ বিন আবু সুফিয়ান দারুন্ নাদওয়ায় একটি পানকেন্দ্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস তাঁকে না করেন। যমযম এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝে, বাবুস-সাফার দিকে নাবীজ (খেজুর মিশ্রিত মিষ্টি পানি) পান করার হাউজ ছিল।

ইবনে আব্বাসের বসার স্থান ছিল যমযমের পার্শ্বে-সাফা এবং উপত্যকা অভিমুখী। অর্থাৎ যমযমে আসার সময় হাতের বামে। ইবনে আব্বাসের বৈঠকখানার উপর সর্বপ্রথম সোলায়মান বিন আবদুল মালেক গম্বুজ তৈরী করেন। তারপর খলিফা জাফর এর উপর একটি নতুন গম্বুজ তৈরি করেন এবং যমযমে জানালা নির্মাণ করেন। খলীফা আবু জাফরই সর্বপ্রথম যমযম কূপে মার্বেল পাথর লাগান। তিনি যমযমের জানালা এবং ভিটির উপর মার্বেল পাথর লাগান। তারপর খলীফা মাহদীও নতুন করে মার্বেল পাথর লাগান। তিনি যমযমের পার্শ্বে একটি কাঠের স্তম্ভের উপর ছোট একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। এতে তাওয়াফকারীদের সুবিধার্থে রাত্রে বাতি জ্বালানো হত। পরে উমর বিন ফারাজ রাখজী তা ভেঙ্গে ফেলেন।

আযরাকী ২২০ হিজরীতে[২৪] খলীফা মুতাসিম বিল্লাহর আমলে, যমযম কূপে যে সকল নির্মাণ কাজ সংঘটিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, যমযম কূপের উপর ছোট একটি গম্বুজ ব্যতীত এর বাকী সকল অংশ খোলা ছিল। উমর বিন ফারাজ রাখজী টিন দিয়ে যমযমের উপর ছাদ নির্মাণ করেন এবং ছাদের ভেতরের অংশ সোনা দ্বারা মোড়ান। হজ্জ মওসুমে বাতি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে ছাদের চারদিকে শিকল ঝুলিয়ে তাতে তেলের বাতি লাগান। তিনি যমযম এবং পানকেন্দ্রের

মাঝখানে অবস্থিত গম্বুজে মোজাইকের প্রলেপ দেন। এর আগে প্রতিবছর হজ্জের সময় এটিকে সাজানো হত।

আযরাকী যমযম পানকেন্দ্র এবং এর উপরে নির্মিত গম্বুজের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যমযম এবং পানকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ছিল সাড়ে ২১ হাত। মাঝখান থেকে এর প্রশস্ততার পরিমাণ হচ্ছে ১২.৯ হাত, ভেতর থেকে গোলাকার হাউজের মোট আয়তন হচ্ছে ৩৯ হাত এবং বাইরের দিক থেকে এর আয়তন হচ্ছে ৪০ হাত। এর ভিটি এবং দেয়াল মার্বেল পাথরের তৈরী।

পরে রাখজী তা পরিবর্তন করেন এবং তিনি এর দেয়ালে নকশাকৃত পাথর এবং ভিটিতে মার্বেল পাথর লাগান। তাঁর নির্মিত দেয়ালের উচ্চতা ছিল ১০ আঙ্গুল এবং প্রশস্ততা ছিল ৮ আঙ্গুল। এই পানকেন্দ্রের মাঝখানে ছিল নাবীজ বা খেজুর মিশ্রিত মিষ্টি পানির কেন্দ্র। সেখানে মার্বেল পাথরের তৈরী একটি ফোয়ারা ছিল। তাতে সীসা নির্মিত একটি পাইপের মাধ্যমে যমযমের পানি প্রবাহিত হত।

২৫৬ হিজরীতে, খলীফা মাহদীর শাসনামলে, মসজিদে হারামের নির্মাণ কাজের তদারকের জন্য বিসির নামক একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়। তিনি গম্বুজের নীচের ভিটির মার্বেল পাথর সরিয়ে ফেলেন এবং সেখানে মাটি ফেলে তা উঁচু করেন। তিনি সেখানে একটি কূয়া নির্মাণ করে মাঝখানে পানি বের হওয়ার জন্য ঝর্ণা তৈরি করেন। চারদিকে কাঠের জানালা এবং খোলা ও বন্ধ করার মত দরজা লাগান। ইতিপূর্বে, এ জায়গায় লোকেরা এবাদত করত এবং ঘুম যেত। তিনি ইবনে মুহাম্মদ বিন দাউদের আমলে বড় গম্বুজের চারকোণে অবস্থিত কাঠের স্তম্ভের উপর নির্মিত ছোট ৪টি গম্বুজও ভেঙ্গে ফেলেন।

গম্বুজ বিশিষ্ট পান কেন্দ্র থেকে গম্বুজহীন হাউজের দূরত্ব ছিল ৫ হাত। গম্বুজহীন হাউজ থেকে গম্বুজ বিশিষ্ট পানকেন্দ্রের মাঝখান থেকে দূরত্ব হচ্ছে ১২.১৮ হাত। ভেতর থেকে ঐ গোলাকার হাউজের আয়তন ১৩ হাত এবং এর দেয়ালের প্রশস্ততা ছিল ৮ আঙ্গুল। হাউজের চারদিকে ৫০টি পাথর এবং হাউজের ভেতর পাথরের উপর মার্বেল পাথর লাগানো হয়। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে তা সংক্ষেপে পেশ করলাম।

যমযমের দেয়ালের উপর থেকে সরিয়ে ফেলা বিভিন্ন জিনিসের ছবি

৫৭৮ হিজরীতে ইবনে জোবায়ের তার বইতে মক্কা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, যমযমের গম্বুজটি হাজারে আসওয়াদ অভিমুখী ছিল। দুটোর মধ্যে দূরত্ব ছিল ২৪ কদম এবং মাকামে ইবরাহীম থেকে এর দূরত্ব ছিল ১০ কদম। ভেতরে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের গাঁথুনী। তিনি এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

ইমাম তকী ফাসী যমযমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, যমযমের উপর একটি বর্গাকৃতির ঘর। ঘরের দেয়ালে ৯টি ছোট হাউজ। একটি খারাপ এবং অবশিষ্টগুলো ভাল। অজু করার জন্য এগুলোতে যমযমের পানি ভর্তি করে রাখা হত। কা'বার দিকের দেয়ালে জানালা ছিল এবং টিন দিয়ে এর ছাদ তৈরী করা হয়। যমযমের কূপের উপর সাধারণ কাঠের একটি জানালা ছিল। তকী ফাসীর এই বর্ণনা আযরাকীর বর্ণনার চাইতে ভিন্ন ধরনের। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তকী ফাসীর সময়ের আব্বাসী খলীফাগণ ঐ নির্মাণ কাজ করেছেন। তারা আব্বাসী বংশের লোক হিসেবে হযরত আব্বাসের উপর যমযমের পানি পান করানোর অর্পিত

দায়িত্বের প্রতি পরবর্তীতে যথেষ্ট ভালবাসা ও গুরুত্ব প্রদান করে।

তকী ফাসী বলেন, যমযমের ছাদের উপর ছিল মুয়াজ্জিনের আজানের স্থান। উইপোকা ছাদের খুঁটি খেয়ে ফেলায় আজানখানাটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে, ৮২১ হিজরীতে, অন্য কাঠ দিয়ে মজবুত খুঁটি তৈরি করে আজানখানাকে হেফাজত করা হয়। ৮২২ হিজরীতে, যমযমের উপর নির্মিত শেড এর নীচের অলংকারপূর্ণ কাঠামো মেরামতের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলা হয়। শেড এর চারদিকে রেলিং এর ছোট ছোট খুঁটিগুলোতেও উইপোকা ধরায় সেগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কাঠের তৈরি খুঁটির পরিবর্তে দেয়ালের উপর ইট ও চুনা দিয়ে কাবার দিকের দেয়াল, শাফেঈ মাজহাবের নামাযের স্থানের দিকের দেয়াল এবং বাবুল খালওয়াহর দিকের দেয়ালে মজবুত খুঁটি তৈরি করা হয়। যাতে করে আর উইপোকা তা নষ্ট করতে না পারে।

তকী ফাসীর শেফাউল গারাম বই এর নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৯৩৩ হিজরীতে, যমযমের উপর নির্মিত কক্ষের আভ্যন্তরীণ দিকের সোনালী কাঠামোতে তুর্কী সুলতান সোলায়মানের নাম লেখা ছিল। ৯৪৮ হিজরীতে, ঐ কক্ষটি সংস্কার করা হয়।

কাজী বিন জুহাইরাহ আল-মাখযুমী তাঁর বইতে লিখেছেন, শাহজাদা খোশকালদী ঐ সংস্কার করেন। তিনি কক্ষটির ভিটি নতুন মার্বেল পাথর দ্বারা এবং শেড নতুন নকশা করা কাঠ দ্বারা তৈরী করেন।

কুর্দী তাঁর বইতে লিখেছেন, ৯৭৩ হিজরীতে সুলতান সোলায়মানের আমলে যমযম কক্ষের সংস্কার করা হয়। তারপর সুলতান আবদুল হামীদ এবং সুলতান আবদুল মজীদ খানের আমলেও অনুরূপ সংস্কার করা হয়। কুর্দী আরো বলেন, সুলতান আহমদ আউয়াল বিন সুলতান মুহাম্মাদ যমযম কূপে একটি লোহার জানালা লাগানোর নির্দেশ দেন যেন কেউ কূপে পড়ে ডুবে না মরে। ১০২৫ হিজরীতে, যমযমের ভেতর ঐ জানালাটি লাগানো হয়। ১০২৭ হিজরীতে যমযমের উক্ত লৌহ জানালার সংস্কার করা হয়। কেননা, ঐ সালেই লোহা ও তাতে শিকল লাগানো জানালাটি যমযমের ভেতর ভেঙ্গে পড়ে এর গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়।

ফলে একদিকে লোহা ও তামার সংমিশ্রণে পানির স্বাদ বিকৃত হয় এবং অন্যদিকে, বালতি দিয়ে পানি উঠানো মুশকিল হয়ে পড়ে। কেননা বালতি তলদেশে ভেঙ্গে
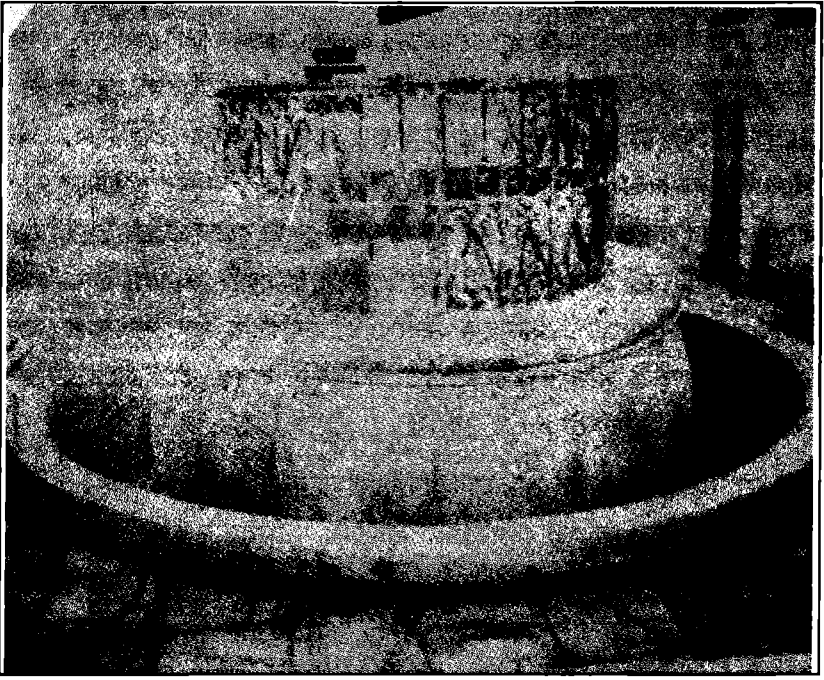
যমযম কূপে লোহার রেলিং

পড়া জানালার সাথে আটকে যায়।

এক রাত আফিন্দি শরীফ মুহাম্মদ বিন সাইয়েদ মোস্তফা গিনাওয়ী হঠাৎ করে যমযমের পানি পান করার জন্য মসজিদে হারামে উপস্থিত হন। তিনি পানির স্বাদ বিকৃত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁকে কারণ জানানো হয়। তিনি পরের দিন সকালে, উক্ত জানালা উঠানোর নির্দেশ দেন। সকালে তা উঠিয়ে আব্বাসী গম্বুজের কাছে রাখা হয়। এর ফলে, পানির স্বাদ পূর্বের মত ফিরে আসে এবং বালতি দিয়ে পানি উঠাতে আর কোন কষ্ট রইল না।

কুর্দী বলেন, ১১১২ হিজরীতে, ইবরাহীম বেগ যমযম কূপের গোলাকৃতির দেয়াল, ভেতর ও বাইরের দিক থেকে প্লাস্টার করে, তাতে সাদা রং লাগান। ১২০০ হিজরীতে ১ম সুলতান আবদুল হামীদ যমযম কূপের কক্ষের কিছু সংস্কার করেন। ১২৭৯ হিজরীতে, সুলতান আবদুল আযীয খানের আমলে, শরীফ আবদুল্লাহ বিন

শরীফ এবং আলহাজ্জ ইজ্জত পাশা যমযমের জানালা, কক্ষের ভিটির মার্বেল পাথর, যমযমের মুখ এবং মুখের সাথে সংলগ্ন সিঁড়ির ছোট পিলারগুলোর সংস্কার করেন। তখন যমযমের মুখ ছিল গোলাকার এবং তা মার্বেল পাথরের তৈরি ছিল। ভিটি থেকে উপরের দিকে উচ্চতার পরিমাণ ছিল প্রায় ১২০ সিন্টিমিটার। ভিটিতে সাদা মার্বেল পাথর লাগানো হয়। কূপের মুখে লোহার মোটা রডের ঘেরাও দেয়া হয়। ১৩৩২ হিজরীতে, উক্ত ঘেরাও এর উপর লোহার একটি জানালা দেয়া হয়। কেননা, একজন আফগানী নিজেকে যমযমে নিক্ষেপ করায়, তার লাশ কূপ থেকে উঠানোর পর তুর্কী সরকার উক্ত মজবুত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে যাতে অনুরূপ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ঐ সময়ে যমযমের শেডে, নামাযের সময় ঘোষণাকারী প্রধান কর্মকর্তার অফিস ছিল। ঐ অফিসের কর্মকর্তারা মসজিদে হারামের ৭ মিম্বারের উপর অবস্থানকারী মুযাজ্জিনদেরকে নামাযের সময় জানিয়ে দিতেন এবং সে অনুযায়ী মুয়াজ্জিনরা আজান দিতেন। তাঁরা সাধারণতঃ জুমা, দুই ঈদের সময় এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায আদায়কারী ইমামদেরকেও নামাযের সময় অবহিত করতেন। শেডের ছাদে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি ছিল।

১৩৪৫ ও '৪৬ হিজরীতে বাদশাহ আবদুল আযীয পানি সরবরাহের জন্য দুটো সুন্দর পানকেন্দ্র নির্মাণ করেন। একটি কেন্দ্র হচ্ছে যমযমের গম্বুজের কাছে। সুন্দর মার্বেল পাথরের তৈরী এই পানকেন্দ্রে ৬টি টেপ লাগান এবং অপরটি নির্মাণ করেন মসজিদে হারামের সংরক্ষণকারী কর্মকর্তাদের কক্ষের কাছে। এতে তিনটি টেপ লাগান। এর ফলে হাজীদের যমযমের পানি পান কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩টিতে। এগুলো থেকে হাজীরা রাত-দিন পানি পান করতে থাকে।

১৩৭৪ হিজরীতে যমযম কূপের সামনের দুই অংশে একটি ছোট কক্ষ নির্মাণ করা হয়। দেয়ালের উপর ছাদ দেয়ায়, পানি পানকারীরা কিছুটা ছায়া পায়। এতে কিছু জানালা ছিল। এর পার্শ্বে কিছু পানির টেপ লাগানো হয় এবং হাজীরা সেগুলো থেকে পানি পান করে। এছাড়াও যমযম কক্ষের বাইরে একটা সিঁড়ি নির্মাণ করা হয় এবং তা দিয়ে শেডের উপরে উঠার ব্যবস্থা করা হয়। আগে কক্ষের ভেতর দিয়ে ঐ সিঁড়ি বিদ্যমান ছিল।

যমযমে বৈদ্যুতিক পাম্পের ব্যবহার

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে যমযম কূপ থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে পানি তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পূর্বে বালতি দিয়ে যমযম থেকে পানি তোলা হত। ১৩৭৩ হিজরীতে যমযমের সামনে একটি শেড নির্মাণ করে তাতে পানির দুটো হাউজ তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং প্রত্যেক হাউজে ১২টি করে টেপ লাগানো হয়। সাথে পাম্পের মাধ্যমে যমযম থেকে পানি উত্তোলন করে তা হাউজে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানির স্বাদ আরো বেড়ে যায়। কেননা, বালতির মাধ্যমে কূপের উপরিভাগের পানি তোলা হত। কিন্তু পাম্পের মাধ্যমে পানির স্তর থেকে ২ মিটার নীচ হতে পানি উত্তোলন করায় এর স্বাদ বেড়ে যায়। বিদ্যুতচালিত পাম্পে কোন শব্দ না হওয়ায় তাতে তাওয়াফকারী ও মুসল্লীদের অসুবিধে অনুপস্থিত থাকায় তা সফল প্রমাণিত হয় এবং সতর্কতামূলকভাবে অতিরিক্ত আরো একটি পাম্প মেশিন মওজুদ রাখা হয়। অবশ্য বালতিতে করে পানি তুলে তা পানকারী আগ্রহী লোকদের জন্য পাশাপাশি বালতির ব্যবস্থাও রাখা হয়।[২৫]

এই সকল অভিজ্ঞতার কারণে, যমযমের পানি উত্তোলন, সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের চিন্তা ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর কিছু সংখ্যক স্বাধীন মুসলিম দেশের অভ্যুদয়, তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং ১৩৫৫ হিজরী থেকে হাজীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে, যমযমসহ, মসজিদে হারাম এবং মক্কার অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল প্রমাণিত হয় এবং তা হাজীদের প্রয়োজন পূরণে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছিলনা। তাই ১৩৫৫ হিজরীতে, বাদ্‌শাহ আবদুল আযীয মসজিদে হারামের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করার চিন্তা শুরু করেন এবং সেই চিন্তার আলোকে, ১৩৭৫ হিজরীতে মসজিদে হারামের নতুন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। বিশাল এই প্রকল্প বিশ বছরে শেষ হয়। ১৩৭৫ হিজরীতে, মসজিদে হারাম ৯৮০ হিজরীতে তৈরী তূর্কী সুলতান সেলিমের একতলা গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ছিল। যা আজও সৌদী সম্প্রসারিত দোতালা ইমারতের সম্মুখ ভাগে বিদ্যমান আছে। তারপর সৌদী সম্প্রসারণ শুরু হয়

এবং এতে মাতাফ,(২৬) যমযম, মাসআ' এবং মাটির নীচতলাসহ ৩ তলা বিশাল মসজিদ তৈরী হয়।

বাদশাহ আবদুল আযীযের ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে বাদশাহ সউদ মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সূচনা করেন এবং ১৩৭৫ হিজরীতে যুবরাজ ফয়সল বিন আবদুল আযীযের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কিছুদিন পর দুই কমিটিকে ভেঙ্গে এক কমিটি করা হয় এবং স্বয়ং বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযীয সেই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। শেখ মুহাম্মাদ বিন লাদিনের কোম্পানীকে এই বিশাল প্রকল্পের কন্ট্রাক দেয়া হয়। ১৩৭৫ হিজরীর ২৩শে শাবান, বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযীয, বাবে উম্মে হানীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৩৮১ হিজরীর জুমাদাস সানী মাসে ২য় পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সূচনা হয় এবং ১৩৮৮ হিজরীতে গিয়ে তা শেষ হয়। এই পর্যায়ে পুরাতন মাতাফ এবং যমযম কক্ষ ভেঙ্গে ফেলা হয়। যমযমের পানি পানকেন্দ্র ও টেপ মাটির নীচে তথা মাতাফের নীচে নির্মাণ করা হয়। তখন মিম্বার ও শেড পরিবর্তন করা হয় এবং মাকামে ইবরাহীমকে নতুন করে কাঁচের ভেতর বসানো হয়। ১৩৮৭ হিজরীর ১৮ই রজব, তদানীন্তন সৌদী বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযীয নতুন মাকামে ইবরাহীম ভবন উদ্বোধন করেন।

এই সম্প্রসারণের আওতায় কাবাকে মধ্যম স্থানে রেখে মাতাফ ৬৪.৮ মিটার বাড়ানো হয়। মাতাফে ২.৫ মিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার উঁচু দুটো পথ পাশাপাশি তৈরী করা হয়। মাতাফে বিভিন্ন ধরনের মার্বেল পাথর লাগানো হয়। এগুলো ইটালীর কারারা থেকে আমদানি করা হয়েছে। কিছু ঐতিহাসিক স্থানের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সেগুলোতে কাল মার্বেল পাথর লাগানো হয়। মাতাফের অবশিষ্ট খালি স্থানকে হাসওয়াহ বলা হত। হাসওয়াহ অর্থ হচ্ছে পাথরের টুকরা। সেখানে তখন শুধু পাথরের টুকরা ছিল। নামাযের সময় সেখানে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া হত। হাজীরা সেই খালি স্থানে কবুতরের খাওয়ার জন্য গম ছিটিয়ে দিত। ফলে মাতাফের আয়তন দাঁড়ায় ৩০৫৮ বর্গমিটার।

সম্প্রসারিত মাতাফে ভিড়ের সময় এক সাথে ১৪ হাজার লোক তওয়াফ করতে পারে। যমযমে লোহার খাঁচার মত গোলাকার লৌহ ঘের তৈরী করা হয় এবং খাঁচার ভেতর দিয়ে সহজেই যমযম কূপ দেখা যায়। সেই খাঁচায় দরজা লাগানো হয় এবং সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যমযম কূপ দেখা যেত। কিন্তু দরজাটি প্রায়ই বন্ধ রাখা হত। নীচের পানকেন্দ্রকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। পুরুষদের ভাগে ২০টি টেপ এবং মহিলাদের ভাগে ১৯টি টেপ ছিল। এগুলো, যমযমের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে অবস্থিত মাটির নীচের পানির রিজার্ভারের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং সেখান থেকে এগুলোতে পানি সরবরাহ করা হত। তারপর এই টেপগুলোকে বাবুস সালামে অবস্থিত পানির ট্যাংকের সাথে যুক্ত করা হয়। এই ট্যাংকের পানি অতিবেগুনী আলো (আলট্রা ভায়োলেট রে) দ্বারা জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করা হয়। যমযমের ব্যবহৃত পানি মসজিদের দেয়ালের পার্শ্বে মওজুদ খোলা চ্যানেলের সাথে মহিলা বিভাগের ভেতর দিয়ে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। তা পরে মসজিদে হারামের বাইরে শহরের ময়লা নিষ্কাশন ড্রেনে পাম্পিং করে বের করে দেয়া হয়।

যমযমের পানি বন্টন নেটওয়ার্ক

উল্লেখিত সম্প্রসারণের আওতায় যমযমের পানি বন্টন নেটওয়ার্ক বাবুস সালামে অবস্থিত পানির ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এতে ২০ অশ্বশক্তিচালিত কেন্দ্রীয় পাইপ দ্বারা কূপ থেকে পানি সরবরাহ করা হয় এবং তাতে ৩ ইঞ্চি মোটা রাসায়নিক তড়িৎ দ্বারা তৈরী লোহার পাইপ ব্যবহার করা হয়। এতে করে দিনে ৫/৬ ঘন্টা যাবত, হজ্জ মওসুম ছাড়া অন্য সময়ে বিরতিহীনভাবে মিনিটে গড়ে ৭৫০ লিটার পানি উঠানো হত। হজ্জ মওসূমে, আরো দীর্ঘ সময় ধরে পাম্প চালিয়ে পানি তোলা হত। বেজমেন্টে ২ ইঞ্চি মোটা পাইপ দ্বারা 'যামাযেমা' পানি সরবরাহ কেন্দ্র এবং মসজিদের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত পানকেন্দ্রসমূহে পানি সরবরাহ করা হত। তখন সকল সরবরাহ কেন্দ্রে মোট ১৯৪টি টেপ ছিল। তবে এর মধ্যে ১৫৫টিই ছিল যামাযেমা কক্ষ ও মসজিদের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে এবং ৩৯টি টেপ ছিল যমযম এলাকায়। হজ্জ মন্ত্রণালয় বেজমেন্টের কিছু সংখ্যক কক্ষে বড় বড় পাত্রে সীমিত পরিমাণ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এগুলোও যমযমের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ছিল। মন্ত্রণালয়ের পানি সংরক্ষণের ট্যাংকগুলো ধাতব পদার্থের তৈরী। যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা (যামাযেমা) জগে করে

পানি নিয়ে হেঁটে হেঁটে লোকদেরকে পানি পান করাত কিংবা পানি নিয়ে তারা নির্দিষ্ট কোন জায়গায় বসে পানকারীদের অপেক্ষা করত। মাতাফের ফাঁকা জায়গা হাসওয়ায় তারা অসংখ্য মগ ভর্তি করে রেখে দিত এবং রমযান ও হজ্জ মওসুমে মসজিদে হারামে আগত লোকেরা তা পান করত। এই হচ্ছে যমযমের পানি পান ও সরবরাহের পুরাতন ইতিহাস।

সর্বশেষ যমযমের পানি বন্টন নেটওয়ার্ক

যমযমের উলেখিত পানি বন্টন নেটওয়ার্ক ক্রমবর্ধমান হাজীদের সংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। সৌদী আরবসহ অন্যান্য তেল উৎপাদককারী দেশগুলো ১৯৮০ দশকে তেলমূল্য প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি করায় তাদের রাজস্ব আয় কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যায়। বিশেষ করে সৌদী আরবের বিশাল তেল মওজুদের কারণে এবং অধিক তেলবিক্রির ফলে দেশটির আয় অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পায়। তখন থেকেই সৌদী আরব দেশের ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেয়। ফলে, বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ প্রয়োজনীয় জনশক্তি আমদানি শুরু হয়। এই সকল জনশক্তির বেশীর ভাগ মুসলমান বলে তারা হারামাইন শরীফাইনে নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করায় সেখানে ব্যাপক ভিড় সৃষ্টি হয়। হজ্জের সময় সৌদী নাগরিক এবং সৌদী আরবে কর্মরত প্রবাসী হাজীদের সংখ্যা বিদেশ থেকে আগত হাজীদের সংখ্যার সমান কিংবা তাকেও ছাড়িয়ে যায়। ১৪০৩ হিজরী অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে বিদেশ থেকে আগত হাজীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ লাখ ৩ হাজার ৯১১ জন। প্রতিবছর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে যমযমের সাবেক ব্যবস্থা, বর্তমান হাজীদের সংখ্যা ও প্রয়োজনের তুলনায় $\frac{১}{৪}$ ভাগ বিবেচিত হয়।

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে, ১৩৯৮ হিজরীতে পুনরায় মাতাফ এবং যমযমের পানিসেবার সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সূচনা করা হয়। এই সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় মাতাফকে সম্প্রসারিত করে একসাথে ২৮ হাজার লোকের তওয়াফের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভবিষ্যতে ২৫ লাখ হাজীর তওয়াফের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে মাতাফের আয়তন ৩ হাজার ২৯৮ বর্গমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ হাজার ১১৯ বর্গমিটারে দাঁড়ায়।

এ ছাড়াও মসজিদে হারামে ১ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৩০০টি ব্যারেল আছে এবং প্রত্যেকটাতে ৪টি করে টেপ আছে। এই সকল টেপসহ সমজিদে হারামে মোট টেপের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০০ তে। ব্যারেলগুলোর সাথে এবং আরো কিছু টেপের সাথে স্টীলের মগ শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় যেন লোকেরা পানি পান করতে পারে। মসিজদে হারামে দৈনিক একবার ব্যবহার উপযোগী ১ লাখ প্লাস্টিকের গ্লাস ব্যবহার হয়। রমজান ও হজ্ব মওসুমে ৫ লাখ গ্লাস লাগে। পরে সেগুলো ফেলে দেয়া হয়।

একই সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় যমযমের বেজমেন্টের আয়তন ১৩৫ বর্গমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৪৫০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়। মাতাফের নীচে অবস্থিত যমযম ভবনটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং দর্শকদের জন্য অতি নিকটে দাঁড়িয়েই যমযম কূপ দেখার সুযোগ হয়েছে। হজ্জের ভিড়ের সময় এতে আড়াই হাজার মানুষের অবস্থান সম্ভব। যমযম ভবনটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পুরুষদের জন্য এবং অন্যটি মহিলাদের জন্য। এছাড়াও এতে ৩৫০টি কল (টেপ) লাগানো হয়। এর ফলে, প্রতি মিনিটে ৩৫০ ব্যক্তি এবং প্রতিদিন ৫ লাখ লোক হজ্জ মওসুমে ঐ কলগুলো থেকে সহজেই পানি পান করতে পারে। মসজিদ ভবনের একতলা এবং দোতলায় বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট স্থানে ৩৮৪টি কল লাগানো হয়েছে। ফলে, মসজিদে হারামে মোট কলের সংখ্যা হচ্ছে ৭৩৪টি। যমযম ভবন এবং মসজিদে পানির কলগুলোকে এতটুকু উঁচু করা হয়েছে যেন, যমযমের পানি দিয়ে অজু ও গোসল করা না যায়। বর্তমানে, মাটির নীচতলায় মসজিদ ভবনে যামাযেমা বা পানি পান কেন্দ্র থাকলেও ভবিষ্যতে সেখান থেকে পানির কল হ্রাস করা হবে। বর্তমানে, মাতাফ এবং মসজিদে হারামের বিভিন্ন তলায় মোট ৫ হাজার থার্মসে করে যমযমের ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করা হয়। যমযমের পানির তৈরি বরফ দিয়ে তা ঠাণ্ডা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে, যমযমের পানিকে বরফ করার জন্য এক কোম্পানীর সাথে চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী যমযমের পানিকে বরফ করে প্রতিদিন তা মসজিদে হারামে সরবরাহ করে। মসজিদের ভেতর মোট ১৩টি স্থানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মসজিদের পরিচ্ছন্নতা এবং অগ্নি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কতগুলো মোটা পানির

পাইপ বসানো হয়েছে এবং এগুলোকে দাউদিয়া কূপের পানির ট্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। দাউদিয়া কূপ থেকে ঐ সকল ট্যাংকে পানি সরবরাহ করা হয় এবং সেই পানি দিয়ে মসজিদ ধোয়া হয়।

মাতাফের নীচে যমযম ভবনটিকে আধুনিক এয়ারকণ্ডিশন ও ভেন্টিলেশন দ্বারা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যেন এর তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশী না হয়। এতে ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে পরোক্ষ আলো বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী বাতিগুলো ঘুরে ঘুরে আলো দেয়। এগুলো সাধারণ মওসুমে ৭৫ লক্স এবং হজ্জ ও রমযান মওসুমে ১৫০ লক্স আলো দান করে।

নতুন সম্প্রসারিত কর্মসূচীর আওতায় মসজিদে হারামে নতুন পাম্পিং পদ্ধতির মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্প মেশিন, পানি সংরক্ষণ, হিমায়িতকরণ ও বন্টন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন করা হয়। এই প্রকল্পের আলোকে, পানি সংরক্ষণ ট্যাংকে পানি সরবরাহ এবং পানি হিমায়িতকরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। বাবুস সালামের উপর অবস্থিত বর্তমান পানির সংরক্ষণ ট্যাংককে হজ্জের মওসুমের জন্য অতিরিক্ত মওজুদ হিসেবে বিদ্যমান রাখা হয়েছে। অপরদিকে, সাধারণ মওসুমে পানি সেবাকেন্দ্রে অবস্থিত পানিই চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। বাইরের আবহাওয়া থেকে যমযমকে মুক্ত রাখার জন্য মাতাফের উপরিভাগের মুখের উপর পরিবর্তনযোগ্য একটি ঢাকনি দেয়া হয় এবং এর উপর আরবীতে বড় অক্ষরে 'যমযম' শব্দটি লেখা হয়।

রমযান ও হজ্জ মওসুমে ভিড়ের সময় যমযমের অতিরিক্ত পানি সরবরাহ করার প্রয়োজন পড়ে। সেজন্য মসজিদে হারামের বাবুস সালামের ছাদের উপর নির্মিত পানির ট্যাংকটি পর্যাপ্ত নয় বলে কুদায়ে যমযমের অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণের জন্য এক বিরাট রিজার্ভার তৈরি করা হয় এবং ১৯৮৭ সালের রমজান মাসে তা চালু করা হয়। ১০ হাজার মিটার দূরে অবস্থিত উক্ত রিজার্ভারে, জিয়াদের পাহাড়ী সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পাইপের মাধ্যমে পানি পাম্প করে তাকে সংরক্ষণ করা হয়। রিজার্ভারটি বিশেষ কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বর্তমানে, মসজিদে হারামের উত্তর পূর্বে, গাজ্জা ও শেবে আলীর মাঝে গাড়ীর মালিকদের সুবিধার্থে গ্যালন ও কেন ভর্তি করে পানি নেয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও আগে ইবরাহীম খলীল রোডের হিজলায় বাদশাহ আবদুল আযীয লিল্লাহ

যমযমের ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা

যমযম কূপের পানির স্তর বর্তমানে প্রাকৃতিক কারণে নীচে নেমে গেছে। এই স্তর নীচে নামার আগে যমযমের পানি ইয়াখুর নামক ড্রেন দিয়ে নিষ্কাশন করা হত। যমযমের পানিস্তর নীচে নেমে যাওয়ায় ঐ ড্রেন দিয়ে পানি নিষ্কাশন অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'ইয়াখুর' একটি তুর্কী শব্দ। ধারণা করা হয় যে, তুর্কী শাসনামলে যমযমের ব্যবহৃত ও মসজিদের বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের জন্য এই গভীর ড্রেনটি নির্মাণ করা হয়। সম্ভবতঃ এই ড্রেনটি মসজিদ থেকে দূরে একটি গভীর কূপের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু কূপটির অবস্থানস্থল অজানা। বেশী গভীরতার জন্যই এটিকে কূপ বলা হয়। মেসফালার বাড়ী-ঘরসমূহের নীচে কিছু ছোট ছোট নালার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তুর্কীরা ইয়াখুর কূপের পানি বের করার জন্যই ঐ সকল ছোট নালাগুলো নির্মাণ করে। হারাম এলাকার উন্নয়ন,বহুতল বিশিষ্ট বহু সংখ্যক ইমারত নির্মাণ এবং সেগুলো থেকে ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য যে সকল নালা ইয়াখুর কূপে গিয়ে মিলিত হয়েছে তার ফলে ইয়াখুর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্ভবতঃ অচল হয়ে গেছে। ফলে, ইয়াখুর ড্রেন পদ্ধতি তার কাঙ্খিত পানি নিষ্কাশনের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। ইয়াখুর কূপ ও ড্রেন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না থাকায় তা আবিষ্কার করার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। কেননা, এতে ব্যাপক খননকার্য পরিচালনা করতে হবে, অসংখ্য বাড়ী-ঘরের ভিত্তি নষ্ট হবে, ট্রাফিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে, এবং মোটা অংকের অর্থ ব্যয় হবে। অনুমানের ভিত্তিতে খনন কাজ হবে, তারপরও লক্ষ্যে পৌঁছার কোন নিশ্চিত সম্ভাবনা নেই।(২৭)

পরে জাবালে আবু কোবায়েসের নীচ দিয়ে মসজিদে হারামের ধোয়া ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয় যা কিলা পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে প্রধান সড়ক বরাবর মেসফালায় বিদ্যমান শহরের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ড্রেনের সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়। পরে মসজিদে হারামের সর্বনিম্ন স্থানের লেবেল থেকে যমযমের ব্যবহৃত পানি এবং মসজিদে হারামের অন্যান্য স্থান থেকে, স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে আসার সুবিধার্থে, আরেকটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়। এই দুটি ড্রেনের মাধ্যমে যমযম ও মসজিদে হারামের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিপূর্বে, মসজিদে হারাম থেকে মেসফালার দিকে হিজলা রোডে বিদ্যমান শহরের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ড্রেনের সাথে সংযোগ দিয়ে যমযম এবং মসজিদে হারামের পানি নিষ্কাশনের জন্য দুটো পৃথক ড্রেন নির্মাণ করার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

মসজিদে হারামের সর্বনিম্ন স্থানের লেবেল থেকে যমযমের ব্যবহৃত পানি ও মসজিদে হারামের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন কাটার পর যমযমের পানির স্তর নীচে নেমে যায়। ফলে, ড্রেনের কাজ বন্ধ রাখা হয় এবং বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলো গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যমযমের পানির স্তর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা এবং বাইরের দূষিত পানি যাতে কূপে প্রবেশ করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, অতীতে যমযমের পানি এত বেশী পরিমাণ ছিল না এবং যমযমের পানির স্তরও এত উঁচু ছিলনা। কোন কোন সময় যমযম কূপ শুকিয়ে পর্যন্ত গিয়েছিল। তাই পানির স্তর কমে যাওয়ার বিষয়টি সমস্যা হিসেবে বিবেচিত না হয়ে তাকে যমযমের জন্য কল্যাণকর মনে করা হয়। এতে করে আরো প্রমাণিত হয় যে, ড্রেনের ফলে, ভূগর্ভের পানি যমযমে এসে মিশতে পারে না। তাই যমযমের বর্তমান পানি শুধুমাত্র যমযমেরই পানি যা যমযমের মূল উৎস থেকে উৎসারিত। এর ফলে ড্রেনের স্থগিত কাজ পুনরায় শুরু করতে আর কোন সমস্যা নেই। পরে ড্রেন তৈরির কাজ সমাপ্ত করা হয়।

যমযমের পরিমাপ ও পানির উৎস

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, যমযম উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ৬০ হাত এবং নীচের মেঝেতে তিনটি ঝর্ণাধারা রয়েছে। ঝর্ণাধারাগুলোর একটি হচ্ছে হাজারে আসওয়াদমুখী, একটি সাফা ও জাবালে আবু কোবায়েসমুখী এবং অন্যটি হচ্ছে মারওয়াহ পাহাড়মুখী।

২২৩ ও ২২৪ হিজরীতে, যমযমের পানি কমে শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন নীচের দিকে আরো ৯ হাত গভীর করে তা খনন করা হয় এবং ভিটির পার্শ্বেও কিছুটা খনন করে তা চওড়া করা হয় যেন পানি প্রবাহ বাড়ে। ২২৫ হিজরীতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় যমযমের পানির স্তর বৃদ্ধি পায়।

আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে, সালেম বিন জাররাহ্ যমযম কূপ কয়েক হাত নীচের দিকে গভীর করেন। তিনি খলীফা মাহ্দীর আমলেও যমযম কূপকে আরো গভীর করেন।

খলীফা আমীন মুহাম্মদ বিন রশীদের আমলে, তাঁর ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধানকারী এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির কেয়ারটেকার উমর বিন হামান যমযমের পানি কমে যাওয়ায় তা খনন করে আরো গভীর করেন। খনন কাজে অংশগ্রহণকারী তায়েফের অধিবাসী মুহাম্মদ বিন মুশীর বলেন, আমি যমযমের মেঝেতে নামায পড়েছি। উপর থেকে নীচের দিকের পাকা অংশের পরিমাণ হচ্ছে ৪০ হাত এবং সেখান থেকে নীচের মেঝের দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে ২৯ হাত। নিম্নের এই অংশটুকু সম্পূর্ণ পাথর কাটা অর্থাৎ এই অংশে কোন প্লাস্টার নেই। তিনি আরো বলেন, তখন উপরে যমযমের মুখের ঘেরাও-এর উচ্চতা ছিল আড়াই হাত, চারদিকে গোলাকার ঐ বেড়ার আয়তন ছিল ১১ হাত এবং যমযমের মুখের প্রশস্ততা ছিল ৩ ২/৩ হাত। যমযম কূপের উপর সাজ কাঠের একটি ফ্রেমওয়ার্ক ছিল এবং তাতে পানি তোলার জন্য ১২টি কপিকল লাগানো ছিল।

ইমাম ফাসী বলেন, আমার কিছু সাথী আমার সামনে যমীন থেকে যমযমের মুখের উচ্চতা, প্রশস্ততা ও গোলাকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এর মুখের উচ্চতা পৌনে দু'হাত, প্রশস্ততা সাড়ে ৪ হাত এবং গোলাকৃতি ১৫ হাত থেকে সামান্য কম। তবে হাত বলতে এখানে পূর্বে প্রচলিত লোহার গজ বুঝানো হয়েছে। 'নগর অভিধানের' লেখক ইয়াকুত হামাওয়ী লিখেছেন, যমযম উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ৬০ হাত লম্বা, এর তলদেশে তিনটি ঝর্ণাধারা আছে। একটি হাজারে আসওয়াদ, একটি সাফা ও আবু কোবায়েস পাহাড় এবং অন্যটি মারওয়ার দিক থেকে এসেছে। তারপর এর পানি কমে যায় এবং ২২৩ কিংবা ২২৪ হিজরীতে তা শুকিয়ে যায়। তখন মক্কার গভর্নর উমর বিন ফারাজ রাখজীর উত্তরসুরী ও ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মুহাম্মদ বিন দাহ্হাক তা ৯ হাত নীচের দিকে গভীর করেন। ফলে এর পানি বৃদ্ধি পায়। তারপর ২২৫ হিজরীতে আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় পানির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। তিনি বলেন, এর গভীরতা উপর থেকে নীচের কাটা অংশের শুরু পর্যন্ত ১১ হাত, সেখান থেকে সর্বশেষ তলা পর্যন্ত ২৯

হাত এবং এই অংশ সবটুকুই পাথর কাটা। এর মুখের গোলাকার চক্রের পরিমাণ হচ্ছে ১১ হাত ও মুখের প্রশস্ততা হচ্ছে ৩$\frac{২}{৩}$ হাত।

উপরোক্ত আলোচনায় আযরাকী, ফাসী এবং হামাওয়ীর বক্তব্যে যমযমের পরিমাপে পার্থক্য দেখা যায়। হাতের পার্থক্য এবং কালের ব্যবধানে এর মধ্যে যে সকল নির্মাণ, সংস্কার ও ভাঙ্গা গড়া হয়েছে সেগুলোই এই পার্থক্যের মূল কারণ।

আযরাকী, যমযমের ৩টি উৎসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যমযমের তলদেশে তিনটি ঝর্ণাধারা থেকেই যমযমের পানি উৎসারিত হয়। ফাকেহী বলেছেন, হযরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব (রা) কা'ব-আল আহবারকে জিজ্ঞেস করেন, কোন্ ঝর্ণাধারাটি থেকে বেশী পানি নির্গত হয়? কা'ব বলেন, হাজারে আসওয়াদের দিক থেকে আগত ঝর্ণাধারাটি থেকে। তখন হযরত আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যথার্থই বলেছ।

দারু কুতনী ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার এক নিগ্রো কূপে পড়ে মারা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস মৃত ব্যক্তির লাশটি উঠানো এবং কূপের সকল পানি বের করার নির্দেশ দেন। কূপের পানি বের করার সময় তারা হাজারে আসওয়াদের দিক থেকে আগত ঝর্ণাধারার বেগবান উৎসের সম্মুখীন হন। তারা বস্তা ও মোটা কাপড় দিয়ে তা বন্ধ করেন এবং পানি তোলার পর ঐ উৎস থেকে পানি ফেটে পড়ে।

ইমাম তাহাওয়ী শরহে মাআনী আল-আসার বইতে লিখেছেন এবং ইবনে শায়বা আতা বিন আবী রেবাহ থেকে সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি একবার কূপে পড়ে মারা যায়। তখন ইবনে যুবায়ের (রা) লাশ উঠানোর পর কূপের সকল পানি সেচ করে বাইরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। অবিরাম পানি সেচের পরও পানি আর শেষ হয় না। তখন দেখা গেল যে, হাজারে আসওয়াদের দিক থেকে একটি বেগবান উৎস হতে পানি আসার কারণেই সেচ করে পানি শেষ করা যাচ্ছে না। তখন ইবনে যুবায়ের (রা) বলেন, এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

উমরী তার মাসালেক আল-আবসার বইতে লিখেছেন, কূপে একবার হাবশার একজন লোক পড়ে মারা যায়। তখন কূপের পানি সব তুলে ফেলার চেষ্টার সময় দেখা যায় যে, তিন দিক থেকে পানি এসে যমযমে পড়ছে এবং এর মধ্যে

শক্তিশালী উৎসটি হচ্ছে কাবা শরীফের দিক থেকে আগত ঝর্ণাধারা।[২৮] (দারু কুতনী) ১৪০০ হিজরীতে, যমযম কূপ পরিচ্ছন্নতাকালীন সময়ে যমযমের সকল পানি সেচ করে বাইরে ফেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে বড় বড় কয়েকটি দমকল বসানো হয়। ফলে, পানি সেচের মাধ্যমে যমযমের পানির উৎসের নীচ পর্যন্ত, কূপের সঠিক পরিমাপ, দেয়াল ও পানির উৎস সম্পর্কে জানা যায় এবং এর সাধারণ ছবি ও মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়। পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণকারী ২ জন ডুবুরীর সাহায্যে জানা যায় যে, কূপের ব্যাস হচ্ছে ৪ মিটার। তাঁরা বলেন, আমরা দেখতে পাই যে, কূপের উপর থেকে ১৪.৮০ মিটার নীচ পর্যন্ত মজবুত প্লাস্টার। এর নীচে যমযমে পানি সরবরাহকারী দুটো উৎস রয়েছে। একটি কা'বার দিক থেকে এবং অন্যটি জিয়াদের দিক থেকে এসেছে। এই উৎসদ্বয়ের নীচে কূপের তলদেশ পর্যন্ত ১৭.২০ মিটার পাথর কাটা অংশ। এই অংশটুকু পাথরের ভেতর সিলিণ্ডারের মতো পিলারের আকৃতিতে বেঁকে গেছে। এর মাঝের প্রশস্ততা হচ্ছে ১.৮০ মিটার এবং নীচে বদ্ধমুখ। এটিকে যমযমের ক্ষুদ্র জলাধার বলা যায়। সেখানকার লাল পাথর বিশিষ্ট দেয়ালের গায়ে بِإِذْنِ اللهِ 'আল্লাহর হুকুমে' এই কথাটি খোদিত আছে।

উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ এই পরিমাপ যমযমের ইতিহাসে বর্ণিত আগের পরিমাপের নিকটবর্তী। পূর্বের বর্ণনাসমূহের অধিকাংশে একথা বলা হয়েছে যে, যমযমের মুখ থেকে নীচে পাথর কাটা পর্যন্ত প্লাস্টার করা অংশের পরিমাণ হচ্ছে, ৪০ হাত অর্থাৎ ২২.৫০ মিটার এবং নীচের পাথর কাটা অংশের পরিমাপ হচ্ছে, ২৯ হাত অর্থাৎ ১৬.২৫ মিটার। যমযমের প্লাস্টারকৃত অংশের পরিমাপের ব্যাপারে অতীতের ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে বর্তমান পরিমাপের পার্থক্যের কারণ হল, যমযম বর্তমানে মাতাফের নীচে কাবার স্তর থেকে আরো নীচে অবস্থান করছে অর্থাৎ যমযম এখন মাতাফের নীচে। অথচ পূর্বে তা মাতাফের উপর কাবার স্তরের সাথে ছিল। পাথর কাটা অংশের পরিমাপে মাত্র ১ মিটারের ব্যবধান। এটা কূপ পরিষ্কার করার কারণেই হয়েছে। কেননা, কূপে অনেক জিনিসপত্র পড়েছিল। সেগুলো উঠানোর কারণে এর গভীরতা কিছু বেড়েছে। গভীরতার পার্থক্যের কারণে, এর ব্যাসরেখায় ১.৫০ মিটার থেকে ২ মিটার পর্যন্ত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। কূপের প্লাস্টারকৃত অংশ ও পাথর কাটা অংশের সংযোগস্থলের ব্যাসরেখা হচ্ছে ১.৮০ মিটার। সেই
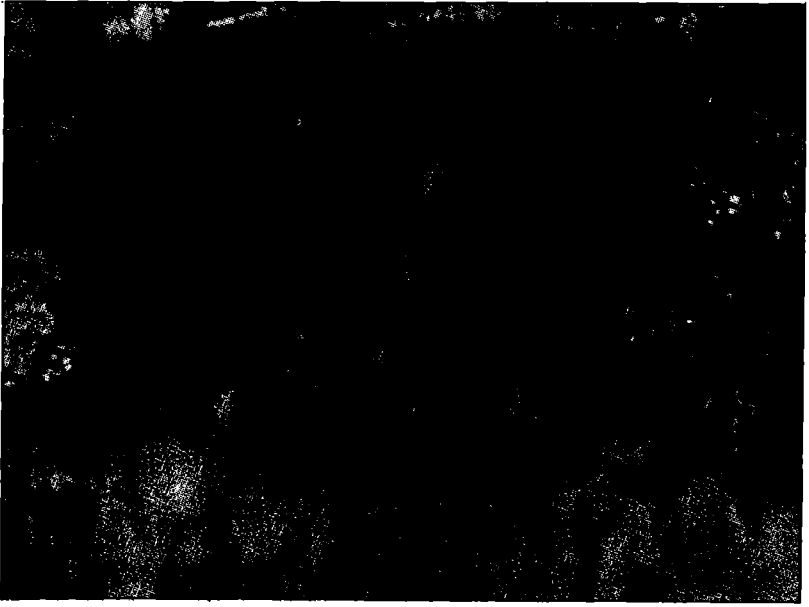
বিভিন্ন দিকথেকে আসা যমযমের পানির কয়েকটি উৎস

সংযোগ স্থানেই রয়েছে যমযমের পানির প্রধান উৎসসমূহ। এই উৎসগুলো পাথরের দুটো সারির মধ্যে অবস্থিত।

প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ ঃ(২৯)

১. প্রধান উৎস বা ঝর্ণাধারা ঃ এটি কা'বা শরীফের হাজারে আসওয়াদের দিক থেকে এসেছে। এই উৎসমুখের দৈর্ঘ্য ৪৫ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা বা প্রশস্ততা হচ্ছে ৩০ সেন্টিমিটার। ভেতরের দিকে তা গভীর। কূপের বেশীর ভাগ পানি এই উৎস থেকেই আসে।

২. দ্বিতীয় উৎস ঃ এর উৎসমুখের দৈর্ঘ ৭০ সেন্টিমিটার। ভেতরে তা আরো দুটো মুখে বিভক্ত। এর প্রশস্ততা বা উচ্চতা হচ্ছে ৩০ সেন্টিমিটার। এটি জিয়াদের দিক থেকে এসেছে।

৩. শাখা উৎসসমূহ ঃ প্লাস্টারকৃত অংশ এবং পাথর কাটা অংশের সংযোগস্থলে পাথরের মাঝে কতগুলো ছোট উৎসমুখ আছে। সেগুলো থেকেও যমযমে পানি আসে। দুই প্রধান উৎসমুখের মাঝখানে ১ মিটারব্যাপী স্থানে, ৫টি ছোট উৎসমুখ

আছে। অনুরূপভাবে, প্রথম ও প্রধান উৎসমুখের পার্শ্ব থেকে শুরু করে ২য় প্রধান উৎসমুখ পর্যন্ত, জাবালে আবু কোবায়েস, সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের দিক থেকে ২১টি ছোট উৎসমুখ এসেছে। এগুলো একই স্তরের নয় বরং বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত এবং এগুলো থেকে নির্গত পানির পরিমাণও এক নয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে, যমযমের তিনটি উৎসের কথা উল্লেখ আছে। ১টি হচ্ছে কা'বার দিক থেকে, ২য়টি হচ্ছে আবু কোবায়েস এবং সাফা পাহাড়ের দিক থেকে এবং ৩য়টি মারওয়া পাহাড়ের দিক থেকে। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় মাত্র দুটো উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি কা'বার দিক থেকে এবং অন্যটি জিয়াদের দিক থেকে। তবে অতীতের ঐতিহাসিক বর্ণনায় আবু কোবায়েস ও সাফা পাহাড়ের বর্ণিত উৎসের পরিবর্তে বর্তমানে ২১টি ছোট উৎস দেখতে পাওয়া যায়। ১০২৮ হিজরীতে, যমযম কূপ সংস্কারের সময় ঐ উৎসমুখটি বন্ধ করায় তখন পাথরের ভেতর থেকে বেগে পানি বের হতে থাকে। গাজী তার ইতিহাসে আল্লামা খিদরাওয়ী (রঃ) এর تَاجُ تَوَارِيْخِ الْبَشَرِ কিতাবের বরাত দিয়ে লিখেছেন, ১০২৮ হিজরীর রমযান মাসে যমযমে, পশ্চিম দিক এবং শামীয়ার দিক থেকে অনেক পাথর ধসে পড়ে। একই সালের ৪ঠা শাওয়াল, সোমবার তা পরিষ্কার করা হয় এবং ১৬ই শাওয়ালে, যমযমের ভেতর প্লাস্টারিং এর কাজ শেষ করা হয়। পানির স্তরের সাথে সংযুক্ত অংশের প্লাস্টারে চুন ও জিপসাম ব্যতীত বালু ব্যবহার করা হয় এবং তার উপরের অংশে জিপসাম এবং চুন দিয়ে প্লাস্টার করা হয় যেন আর পাথর ধসে না পড়ে।

যমযমের পাথরযুক্ত অংশের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এর খাড়া অংশের কিছু পর পাথর কাটার কারণে কূপের আকার আর সোজা ও খাড়া থাকেনি, বরং বাঁকা হয়ে গেছে। প্রধান প্রথম উৎসমুখের নীচে ৪টি পাথর কাটা ও বাঁকা। অনুরূপভাবে, ৪টি পাথর দুই প্রধান উৎসমুখের মাঝে ১ মিটার জায়গায় এবং অন্য ১২টি পাথর ছোট উৎসমুখগুলোর স্থানে কাটা ও বাঁকা।

কাটা পাথরের গায়ে যে গভীরতা তা সর্বোচ্চ ৬ সেন্টিমিটার এবং সর্বনিম্ন নামেমাত্র কাটা। সম্ভবতঃ পানির উৎসগুলো থেকে অব্যাহত পানি বের হওয়ার কারণে তা ক্ষয় হয়েছে কিংবা কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তোলার কারণে রশির ঘষা লেগে

অথবা এই দু'টির যৌথ কারণে তা ক্ষয় হয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, ১২টি পর্যন্ত কপিকল ব্যবহার করে বালতির মাধ্যমে যমযম থেকে পানি তোলা হয়েছে। মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হজ্জ গবেষণা কেন্দ্র, যমযমের মূল উৎসগুলো আরো সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য গবেষণা চালাবে বলে জানা গেছে।

যমযমের পানি সরবরাহকারী উপাদান

মাটি ও পাথরের নীচে ভূগর্ভে পানি বিদ্যমান আছে। সেখান থেকেই সাধারণতঃ বিভিন্ন কূপে পানি এসে জমা হয়। বৃষ্টির পানি বিভিন্ন কূপগুলোর পানির উৎস হিসেবে কাজ করে। আরব উপদ্বীপে, সাধারণতঃ শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এতদঞ্চলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের কারণেই উক্ত বৃষ্টিপাত হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে ঐ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় এবং দজলা ও ফোরাত অঞ্চলের দিকে তা সম্প্রসারিত হয়। ঐ সকল ঘূর্ণিঝড়ের কিছু লোহিত সাগর উপকূলে আসে এবং তার ফলে, শীত মওসুমে মক্কায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণতঃ মক্কার আকাশ থেকে ১/২ ঘন্টা যাবত মুষলধারে প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ১৯৬৯ খৃঃ থেকে ১৯৭২ খৃঃ পর্যন্ত এই তিন বছরে মক্কায় বৃষ্টির যে রেকর্ড করা হয়েছে তাতে সর্বনিম্ন ২১ মিলিমিটার ও সর্বোচ্চ ৮২.৬ মিলিমিটার গড় রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে।

এতদঞ্চলের মাটি পাথর দ্বারা গঠিত হওয়ায় তা খুবই শক্ত। বৃষ্টির পানি মাটির নীচে প্রবেশ না করে শক্ত মাটির উপর দিয়ে বিনা বাধায় বন্যার আকারে প্রবাহিত হয়। ফলে, মক্কায় উল্লেখিত সামান্য বৃষ্টিপাত হলেও তাতে বন্যা সৃষ্টি হয় এবং গোটা এলাকাকে প্লাবিত করে। বন্যার শিকার হয়ে বহু মানুষ ও পশু মারা যায় এবং সহায় সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রস্তরময় পাহাড়ের উপর বৃষ্টি বর্ষিত পানি নিম্নভূমির দিকে নেমে আসায় এই বন্যা সৃষ্টি হয়। এখানকার পাহাড় কঠিন পাথর দ্বারা গঠিত।

মসজিদে হারাম যে ইবরাহীম উপত্যকায় অবস্থিত, সেই উপত্যকাটি উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে নিম্নগামী। ফলে, ঐ দুই দিকের প্রচণ্ড বর্ষণের পানি নিষ্কাশনের জন্য মসজিদে হারামের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত সংকীর্ণ উপত্যকা ছাড়া আর অন্য কোন নিম্নভূমি নেই। এই সংকীর্ণ উপত্যকাটির আয়তন বেশী বড় নয়, ৬৫০

হেক্টর যমীন মাত্র। ফলে, সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে দ্রুত পানি সরতে না পারায় সর্বনাশা বন্যার সৃষ্টি হয়। তাই দেখা যায় যে, ১৩৮৮ হিজরীর বন্যা, মাত্র জিয়াদের সাদ এলাকা এবং বালীলা কূপের এলাকায় বর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন বন্যায় মক্কায় জান-মাল এবং বাড়ীঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মক্কার বন্যা, সাধারণত মিনা, নূর পাহাড় এবং জোরানা উপত্যকা থেকে নেমে আসে। ঐ এলাকাগুলো ইবরাহীম উপত্যকা থেকে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রায় ৭ হাজার হেক্টর যমীন তথা ২৭ বর্গমাইল এলাকা থেকে মক্কার উপর ঐ বন্যা প্রবাহিত হয়। শিশশা নামক স্থান দিয়েই মিনা থেকে ইবরাহীম উপত্যকায় পানি প্রবেশ করে। অপরদিকে নূর পাহাড় এবং জোরানার পানি প্রবেশ করে পুরাতন রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়ে। সোজা উত্তর দিক থেকেও কোন কোন সময় বন্যার পানি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে। এই সকল এলাকা থেকে বন্যার সকল স্রোত মসজিদে হারামের নিকট কাসাসিয়া গাজ্জা, হুজুন এবং মোআল্লায় এসে মিলিত হয়। মক্কার অন্যান্য উঁচু ভূমির তুলনায় ইবরাহীম উপত্যকার মুখে অবস্থিত এ সকল নিম্ন জায়গায় এসে সকল স্রোত একাকার হয়ে তা গোটা উপত্যকাকে প্লাবিত করে। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধু আবু কোবায়েস পাহাড় এবং জিয়াদে বর্ষিত পানি। কেননা, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এলাকার এই পানি বাদশাহ আবদুল আযীয দরজার সামনে দিয়ে মেসফালার দিকে গড়ায়।

ইসলামের আগমনের পর, মক্কায় এ যাবত ৮৬টি বন্যার কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। ঐ সকল বন্যার কোন কোনটিতে কা'বা শরীফের ভিটির সমান, হাজারে আসওয়াদের সমান, কা'বার দরজার সমান কিংবা দরজার তালার সমান পানি উঠেছে। এগুলোকে ইতিহাসে নীল নদের পানির সাথেও তুলনা করা হয়েছে। ঐ সকল পানি শুকাতে ২ দিন পর্যন্ত সময়ও লেগেছে।

ইতিহাসে, ঐ সকল বৃষ্টি ও বন্যার সাথে যমযমের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আযরাকী বলেন, হিজরী ২২৩ ও ২২৪ সালে যমযম কূপ শুকিয়ে গিয়েছিল, তারপর নীচের দিকে আরো ৯ হাত খনন করা হয় এবং এর পাশ কেটে সামান্য প্রশস্ত করা হয়। তারপর ২২৫ হিজরীতে বৃষ্টি হওয়ায় যমযমের পানি বৃদ্ধি পায়।(৩০)

আযরাকী তাঁর বই এর অন্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন যমযমের পানি নীল নদ এবং ফোরাত নদীর পানির চাইতেও বেশী মিষ্টি হবে। আবু মুহাম্মদ আল-খোযাঈ বলেন, আমরা ২৮১ হিজরীতে তা দেখেছি। ২৭৯ এবং ২৮০ হিজরীতে মক্কায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। তখন যমযমের পানি বেড়ে যায় এমনকি যমযমের মুখ থেকে মাত্র ৭ হাত নীচে পানি দেখতে পাওয়া যায়। আমি নিজে এরূপ কোনদিন দেখিনি এবং কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি, শুধু তাই নয়, এর পানি এত বেশী মিষ্টি হয় যে, মক্কার অন্য কোন কূপের পানি এত মিষ্টি নয়। এই পানি বেশী মিষ্টি হওয়ায় আমি নিজে এবং মক্কাবাসীরা এই যমযমের পানি পান করাই বেশী পসন্দ করতাম। কিন্তু হিজরী ২৮৩ সালে, এর পানি ভারী ও লবণাক্ত হয়ে যায়। তবে তাতে পানির প্রাচুর্য অব্যাহত ছিল।

১৩৮৮ হিজরীর বন্যার সময় দেখা গেছে যে, বন্যার পানি কা'বা শরীফের দরজা পর্যন্ত পৌছে। তখন পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, যমযমের ভেতর থেকেও জোরে পানি বের হচ্ছে। একটি ২ মিটার বিশিষ্ট পাইপ কূপের মাঝামাঝি রেখে দেখা গেছে যে, পাইপের অপর মুখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যমযমের নীচে পানির চাপ আছে। সে কারণে পানি উপরের দিকে উথলে উঠে। এছাড়াও একখণ্ড টিস্যু পেপার কূপের মুখে ফেলে দেখা গেছে যে, ভেতর থেকে আসা স্রোত ঐ টিস্যু পেপারটিকে ভাসিয়ে অন্য দিকে নিয়ে গেছে।

এই সকল পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৃষ্টির পর যমযম কূপ আর্টেজীয় কূপের আকৃতি ধারণ করে অর্থাৎ যে কূপের পানি আভ্যন্তরীণ চাপে বের হয়ে আসে–সে রকম হয়। বৃষ্টির পর কূপের পানি অধিকতর মিষ্টি হয়। কূপের পানির এই জোর প্রবাহগতি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং পরে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। তখন কূপের পানি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং মুখ থেকে মাত্র ৩ মিটার নীচে পানি মওজুদ থাকে। পরবর্তীতে কূপের পানির এই স্তর দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ভূগর্ভস্থ পানি যমযমের পানির উৎস ও উপাদান নয়, বরং অন্য কিছুই এর মূল উৎস। কেননা, দাউদিয়া কূপে যমযমের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। যদি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধির কারণে যমযমের পানির স্তর বেড়ে থাকে, তাহলে মসজিদে হারামের পার্শ্ববর্তী দাউদিয়া কূপসহ অন্যান্য কূপগুলোর পানির

স্তরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সেগুলোতে পানির স্তর বাড়েনি। এই তথ্য দ্বারা একথার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় যে, মূলতঃ যমযম কূপের পৃথক ও স্বতন্ত্র পানি সরবরাহ উৎস রয়েছে।(৩১)

১৪০০ হিজরীতে, জোহায়মান বেগ ও তার দল-বল কর্তৃক মসজিদে হারাম আক্রমণের পর কূপ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সময় যমযমের মূল ঝর্ণাধারার পানির নমুনা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ভূগর্ভস্থ পানির মত তা দূষিত নয়, বরং তা জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ পানি যা কূপের অন্য উৎসগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

যমযমের পানি উৎপাদন ক্ষমতা

১৩৯১ হিজরীতে, সৌদী কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যমযমের পানি উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগের আওতায় যমযমের মুখে বিদ্যুত চালিত দু'টো পাম্প মেশিন বসানো হয়। বড় পাম্প মেশিনটি ৫০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এবং ঘন্টায় ৩০ ঘন মিটার পানি উত্তোলন করতে সক্ষম। ছোট পাম্প মেশিনটি ঘন্টায় ১১.৬ ঘনমিটার পানি তুলতে সক্ষম।

ছোট পাম্প মেশিন দ্বারা পানি তোলার ফলে, শুরু করার ৭ মিনিটের মধ্যে কূপের পানির স্থায়ী স্তর ২.১৬ মিটার থেকে ১.৭৪ মিটারে নেমে আসে। ১৮ মিনিট পর ২.১০ মিটার এবং ৪৭ মিনিট পর ২.১২ মিটারে নেমে আসে।

এরপর ছোট পাম্প মেশিনটি বন্ধ করে বড় পাম্প মেশিন চালু করা হয়। শুরুর ৭৭ মিনিট পর পানির স্তর ২.২৭ মিটার, ৯৬ মিনিট পর ২.৩২ মিটার, ১১৭ মিনিট পর ২.৩১ মিটার এবং ১২৩ মিনিট পর ২.৩২ মিটারে অবস্থান করে। তারপর দু'টো মেশিনকে এক সাথে চালু করলে ৪ ঘন্টায় পানির স্তর ২.৬৪ মিটারে নেমে আসে। ৩ দিন পর্যন্ত একই পরীক্ষা চালানো হয়।

দু'টো পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে যমযমের পানি উৎপাদনের ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে, প্রতি মিনিটে ১৬৪.৫ থেকে ২১৭.৩ গ্যালন পানি অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১.০৪ লিটার থেকে ১.৩৭ লিটার পানি তোলা সম্ভব হয়েছে। পানি উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ওয়াটসন কনসালটিং কোম্পানী, পাকিস্তানী কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়ন এবং পশ্চিম জার্মানীর W.F ক্রোনার

কনসালটিং ফার্ম পাম্প মেশিন দ্বারা উত্তোলিত পানির অনুপাত দ্বারা যমযমের উৎপাদন ক্ষমতা ঘন্টায় ৬০ ঘন মিটার নির্ধারণ করে এবং তা নিম্নের পরিমাপের আগ পর্যন্ত বহাল থাকে।

১৪০০ হিজরীতে, মসজিদে হারামে জোহায়মান বেগ ও তার সাথী-সঙ্গীরা আক্রমণ করার পর ঐ দুর্ঘটনা শেষে যমযম কূপ পরিষ্কার করার সময় যমযমের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে পুনরায় পরিমাপ করা হয়।

এই পরিমাপে ৪টি FLYGT মডেল বি ২১৫১ এইচ টি সাবমার্জড পাম্প ব্যবহার করা হয়। প্রথমটি কূপের ভেতর ২৫ মিটার গভীরে, ২য় টি ২২ মিটার, ৩য় টি ১৯ মিটার এবং ৪র্থ টি ১৭ মিটার গভীরে বসানো হয়। ৪ টা মেশিন একসাথে চালু করা হয়। ২৫ মিটার গভীরে বসানো প্রথম পাম্প মেশিনটি বেশী চাপের কারণে এর বৈদ্যুতিক কয়েলে পানি ঢুকায় তা বন্ধ হয়ে যায়। অবশিষ্ট তিনটি পাম্প চলতে থাকে। এই পাম্পগুলো বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ড্রেনে পানি ফেলে। একই সাথে যমযমের পার্শ্বে দুটো গর্ত থেকে ভূগর্ভস্থ পানিও একই ড্রেনে তুলে ফেলার জন্য আরো দু'টো পাম্প মেশিন বন্ধ করে দেয়া হয়।

প্রথমে পানির স্তর ছিল ৩.২৩ মিটার গভীরে এবং পানির স্তর ১২.৭২ মিটার গভীরে পৌছা পর্যন্ত প্রতি আধা মিনিটে একবার Reading নেয়া হত। একটি মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তখন গর্তে পানির স্তর ৬৫ সেন্টিমিটারে পৌছে। পানির স্তর ১২.৮৩ মিটারে পৌছা পর্যন্ত প্রতি আধা মিনিটে Reading নেয়া হয়। পানির স্তর ১৩.৩৯ মিটারে পৌছা পর্যন্ত প্রতি ১ মিনিট অন্তর Reading নেয়া হয়। এই স্তরে পৌছার পর কূপে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন পর্যন্ত গর্তে একটি মেশিন চালু রাখা হয়। তখন সেখানে পানির স্তর দাঁড়ায় ৬৫.৫ মিটারে। কূপের প্রধান উৎসসমূহ থেকে নমুনা পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৬ মিনিট যাবত রিডিং নেয়া বন্ধ রাখা হয়। কূপের অপ্রধান উৎসসমূহ থেকেও নমুনা পানি সংগ্রহ করা হয়।[৩২]

তারপর একটি মেশিন বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে, কূপের পানির স্তর বাড়তে থাকে এবং তা কূপের মুখ থেকে নীচে ৯.০৫ মিটারে এসে দাঁড়ায়। তারপর দ্বিতীয় মেশিনটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে পানির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুখ থেকে নীচের দিকে ৬.০৬ মিটারে উঠে। তারপর ৩য় মেশিনটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন ১১

মিনিটের মধ্যে পানির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুখ থেকে নীচে ৩.৯০ মিটারে দাঁড়ায়। যমযম থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ১১-১৮.৫ লিটার পানি উৎপাদন হয়। উৎপাদন সম্পর্কে এটিই সর্বশেষ তথ্য।

এই চিত্র দ্বারা যমযমের পানি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

যমযমের প্রাসঙ্গিক সমস্যা

যমযম কূপের গভীরতা হচ্ছে ৩০.৫ মিটার। এর মধ্যে ১৭.৫ মিটার হচ্ছে কঠিন পাথরের স্তরের মধ্যে। কূপের পানি ব্যবহার না করলে মুখ থেকে ৩ মিটার নীচে পানির স্তর বিদ্যমান থাকে। এই স্তরে পানি অবস্থান করলে, যমযম থেকে পানি অন্যদিকে চলে যায় এবং বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দু'টো মওজুদ গর্তে গিয়ে জমা হয়। কূপ থেকে পাম্প করে পানি বের না করা পর্যন্ত পানি বের হওয়া অব্যাহত থাকে। হিজরী ১৪০০ সালে যমযমের পানি ব্যবহার কয়েকদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকায় কূপের মুখ থেকে ২ মিটার নীচ পর্যন্ত পানির স্তর বৃদ্ধি পায়। ইবরাহীম উপত্যকার ভূগর্ভস্থ সর্বোচ্চ পানির স্তরের সাথে এই স্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐ সময় আরো একটি বিষয় জানা যায়। সেটি হচ্ছে, যমযম এলাকায় সাধারণ পানির আরো ৩টি উৎস রয়েছে। সে সকল উৎসের পানি যমযমের পার্শ্বে অবস্থিত দু'টো কূপ বা গর্তের মধ্যে জমা করে তা উল্লেখিত সময়ে হারাম সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। সাফা পাহাড়ের কাছে অবস্থিত গর্ত বা কূপে যমযমের পাশ থেকে এবং সাফা পাহাড়ের দিক থেকে আগত পানি এসে জমা হয়। এই পানি বাইরে নিক্ষেপ করা হয়।

যমযমের সামান্য কিছু পানি কংক্রিটের দেয়ালের নীচ দিয়ে বের হয়ে যায়। নির্গত পানিকে জমা করার জন্য মারওয়া পাহাড়ের নিকটে আরেকটি কূপ বা গর্ত করা হয় এবং তাতে গিয়ে উক্ত পানি জমা হয়। সেখান থেকে দুটো পাইপের মাধ্যমে তা বাইরে নিক্ষেপ করা হয়।

দাউদিয়া কূপ যমযমের নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত। হারাম এলাকার সকল পানি মেসফালার দিকে প্রবাহিত হয়। যমযম এবং দাউদিয়া কূপের পানির মধ্যে, পানি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কিছু মিল আছে। দাউদিয়া কূপেরও একাধিক উৎস রয়েছে। সম্ভবতঃ কোন কোন সময় যমযম থেকে দাউদিয়া কূপে পানি গিয়ে মিলিত হয়।

দুই কূপের পানির বৈশিষ্ট্য প্রায় কাছাকাছি। যমযমের পানি উত্তোলন করা হলে, দাউদিয়া কূপের পানি কিছুটা কমে আসে। উভয় কূপ যদি পাথরের ছিদ্রের মাধ্যমে একই উৎস থেকে উৎসারিত হত, তাহলে একটির প্রভাব সরাসরি অন্যটিতে গিয়ে পড়ত। কিন্তু, ব্যাপারটি এরকম নয় বলে একটা আরেকটা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এমনকি দাউদিয়া কূপ এবং যমযম কূপের মধ্যে পানি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাপক অমিল রয়েছে। তবে উভয়ের পানির মধ্যে কিছু সমান বৈশিষ্ট্য দ্বারা মনে হয় যে, যমযম থেকে ঐ কূপে কিছু পানি গিয়ে মিলিত হয়।

পক্ষান্তরে, বন্যা ও বৃষ্টির পানি যমযমের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে পাকিস্তানী কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়েছে যে, তাদের রেকর্ডকৃত তথ্য অনুযায়ী, তায়েফে বৃষ্টি হলে যমযমের পানির স্তরে হঠাৎ করে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়।

অপরদিকে, পানি নিষ্কাশন ড্রেন এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ড্রেন থেকে শিলা দ্বারা গঠিত প্রস্তরময় ভূখণ্ডের পাথরের ফাঁক দিয়ে পানি এসে যমযমের পানির উৎসের সাথে মিলিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে, এক পানি বন্টন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নহরে যুবায়দার পানি মক্কায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ নেটওয়ার্কের একটি শাখা সাফা পাহাড়ের রাস্তা বরাবর হয়ে যায়। ঐ নেটওয়ার্ক থেকে কিছু পানি যমযমের কাছে একটি কূপে এসে জমা হয়। নহরে যুবায়দার পানি শুধু পূর্বদিকের পাহাড়ী এলাকায় ব্যবহার করা হয়।

নহরে যুবায়দা থেকে দৈনিক মাত্র ৫ হাজার ঘনমিটার পানি সরবরাহ করা হত। কিন্তু পরবর্তীতে মক্কায় সাধারণ মৌসুমে দৈনিক ৭২ হাজার ঘনমিটার এবং হজ্জের মৌসুমে দৈনিক ১ লাখ ২০ হাজার ঘনমিটার পানি সরবরাহের প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে লোহিত সাগরের শোয়াইবিয়া থেকে মক্কা ও তায়েফে লবণাক্ত পানিকে মিষ্টি পানিতে পরিণত করে মক্কায় দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন এবং তায়েফে ১৫ মিলিয়ন গ্যালন সরবরাহ করা হচ্ছে। যমযমে যাতে অন্যান্য নেটওয়ার্কের পানি প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য গভীর গর্ত খনন করা জরুরী।

যমযমের পানির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

যমযমের পানি অতি পবিত্র ও উপকারী। সূচনালগ্ন থেকেই এই পানির ব্যবহার ও মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। হাদীসেও এই পানির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই সৌদী শাসনামলে এই পানির গুণাগুণ এবং তাকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে রাসায়নিক এবং রোগ জীবাণু সংক্রান্ত জীব বিজ্ঞানীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। ঐ সকল পরীক্ষাসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে, পানি ও পানির উৎসের যথার্থতা ও কলুষতা নির্ণয়, পানিকে কলুষতামুক্ত করার জন্য উপযোগী পদক্ষেপ নেয়া এবং পৃথকভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

বিশুদ্ধ পানি বলতে সেই পানিকে বুঝায় যাতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন খনিজ পদার্থ না থাকে এবং পানির রং, স্বাদ, ঘ্রাণ ও পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে দূষিত কিন্তু ব্যবহারের অযোগ্য নয় এমন পানি হচ্ছে, প্রাকৃতিক কারণে যে পানির স্বাদ, ঘ্রাণ ও রং এর বিকৃতি হয়েছে। এটা পানির নিজস্ব উপাদান কিংবা বাইরের প্রভাব–দু'টোর যে কোনটার কারণে হতে পারে। কোন কোন সময় এ জাতীয় পানি পান করলে কোন রোগ হয় না কিংবা শরীরেরও কোন ক্ষতি হয় না।

অপরদিকে, যে পানিতে ক্ষুদ্র রোগ জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) কিংবা বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান থাকে তা পান করার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

সাধারণতঃ পানি প্রকৃতিগতভাবে খুব কমই বিশুদ্ধ থাকে। কেননা, আকাশের জলীয় বাষ্প যখন পানির ফোটায় রূপান্তরিত হয় তখন বাতাসে মওজুদ কিছু বিষাক্ত গ্যাস, বালুকণা এবং ব্যাকটেরিয়া এর অন্তর্ভুক্ত হয়। উপর থেকে পানি যখন মাটিতে পড়ে তখন তা বালু, মাটি, রাসায়নিক উপাদান ও ব্যাকটেরিয়াকে সাথে বয়ে নিয়ে যায়। ঐ পানি মাটির নীচে চলে গেলে তখন তা মাটিতে মওজুদ লবণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ ছাড়াও এতে ভূতাত্ত্বিক অন্যান্য উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। পানিতে লোহার পরিমাণ বেশী থাকলে সেই পানি লালরূপ ধারণ করে। পানিতে ম্যাঙ্গানিজ বেশী থাকলে পানির রং কাল হয়ে যায়। এ ছাড়াও পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সোডিয়াম থাকে। পানিতে অক্সিজেন, অক্সাইড কার্বন এবং সালফার হাইড্রোজেন জাতীয় গ্যাসের অস্তিত্বও বিদ্যমান আছে।

দূষিত পানি পান করলে অনেক সময় টাইফয়েড, রক্ত আমাশয়, কলেরা, প্যারা টাইফয়েড, শিশুদের পঙ্গুত্ব এবং বলহারেসিয়াসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়, দাঁত ও পেটের জন্য ক্ষতিকর আরো অন্যান্য কিছু রোগও সৃষ্টি হতে পারে।

পানির বিশুদ্ধতা নির্ধারণের জন্য অনেকগুলো পরীক্ষা আছে। সেগুলো হচ্ছে ১. প্রাকৃতিক পরীক্ষা ২. রাসায়নিক পরীক্ষা ৩. ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা ৪. অনুবীক্ষণ পরীক্ষা।

প্রাকৃতিক পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, স্বাদ, গন্ধ, কাদা এবং মিশ্রিত উপাদানের পরিমাণ জানা।

রাসায়নিক পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে জৈব ও অজৈব পরীক্ষা। জৈব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতে করে পানিতে দূষিত পদার্থ ও জৈব পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা এবং অজৈব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পানিতে খনিজ লবণের হার জানা।

আন্তর্জাতিকভাবে বিশুদ্ধ পানিতে রাসায়নিক দ্রব্যের নিম্নলিখিত সর্বোচ্চ হার স্বীকৃত ঃ (মিলিয়ন গ্রাম/লিটার হারে)

উপাদান	সর্বোচ্চ হার	উপাদান	সর্বোচ্চ হার
সীসা	০০.০১	জিংক	১৫.০০
তামা	০.০৩	ম্যাগনেসিয়াম	১২৫.০০
আর্সেনিক	০০.০৫	ক্লোরয়েড	২৫০.০০
সেলিনাম	০০.০৫	সালফার	৫০.০০
ফ্লোরিন	১.০০	মিশ্রিত লবণ	১০০০.০০
লোহা	০.৩	এলকালি	৪০০.০০
ম্যাঙ্গানিজ	০.৩		

এছাড়াও পান করার উপযোগী পানিতে ৯০% অক্সিজেন, মিলিয়নে ৫০ ভাগ অক্সাইড কার্বন এবং ১ ভাগ সালফার হাইড্রোজেন গ্যাস থাকা জরুরী।

ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা হচ্ছে পানিতে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী যা সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব নির্ভর করে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপর। অনুকূল পরিবেশ পেলে ব্যাকটেরিয়া অনেক বেশী বংশ বিস্তার করে।

ব্যাকটেরিয়া দুই ধরনের ঃ উপকারী ও অপকারী।

উপকারী ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তরে অবস্থানকারী যে সকল ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থ প্রতিষ্ঠিত রাখে কিংবা তাকে অম্লজান পদার্থে (অক্সিজেনে) পরিণত করে অথবা মানুষ ও প্রাণীর হজমে সাহায্য করে, কিংবা দুধকে দইতে পরিণত করতে সাহায্য করে যার ফলে মাখন, পনির ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি করতে সহায়ক হয়।

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে যে সকল ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাকে দুর্গন্ধ যুক্ত ও বিষাক্ত করে তোলে। এর ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

পান করার পানিতে নিম্নলিখিত মাপকাঠি ও বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য : পানির রং ঠিক থাকতে হবে এবং মিলিয়নে ৫ ভাগ কাদা থাকতে পারে। পানির স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : পানি অবশ্যই বিষাক্ত উপাদানমুক্ত হতে হবে এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান এতে থাকতে হবে।

তৃতীয়তঃ আলফা তাপ বিকীরণ মিলিমিটারে ৯ঃ১০ মাইক্রোকিরী এবং বিটা তাপ বিকীরণ মিলিমিটারে ৮ঃ১০ মাইক্রোকিরী হতে হবে।

চতুর্থতঃ ব্যাকটেরিয়ার জন্য মাপকাঠি হচ্ছে, ১০০ মিলিমিটারে একাধিক কলন গ্রুপ থাকতে পারবে না।

সালেহ মুহাম্মদ জামাল 'আখবারে মক্কা'র ভূমিকায় লিখেছেন যে, যমযমের পানি ক্ষারজাতীয় (এলকালিন) এবং এতে সোডা, ক্লোর, চুন, সালফার এসিড, নাইট্রোজেনিক এসিড এবং পটাশ বেশী পরিমাণে থাকায় তা খনিজ পানির কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী।

যমযমের পানি নিয়ে অতীতে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালেও প্রচুর গবেষণা হয়েছে। আমরা নীচে এ জাতীয় কয়েকটি গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করবো।

২১।১১।১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭১ সালে, জেদ্দাস্থ কারানতিনা হাসপাতালে যমযমের পানির ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা করা হয়।

গবেষকদেরকে ঐ পানি যে যমযমের পানি তা আগে জানানো হয়নি। পরীক্ষার ফলাফল হচ্ছে, এতে ১০০ মিলিমিটারে মওজুদ ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ হচ্ছে ৮৫,০০০।

১০০ মিলিমিটারে কলিফরমের সংখ্যা হচ্ছে ২,৪০০।

যমযমের পানির ট্যাংক থেকে গৃহীত পানির নমুনায় দেখা গেছে যে, ১০০ মিলিমিটারে মোট ২ লাখ ৪০ হাজার ব্যাকটেরিয়া এবং ১০০ মিলিমিটারে মোট কলিফরমের সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৪ শত। রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় যে, যমযমের পানি থেকে ব্যাকটেরিয়া নির্মূলের জন্য তাতে ক্লোর ব্যবহার করা হউক এবং পানি পান করার আগে তাতে ব্যাকটেরিয়া নির্মূল হল কিনা তা পুনরায় পরীক্ষার জন্য পানি নিয়ে আসা হউক।

৭।৪।১৩৯১ হিজরীতে কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যমযমের বিশুদ্ধকৃত পানি রিয়াদের কেন্দ্রীয় হাসপাতালের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয় এবং অনুরূপভাবে কৃষি ও পানি মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাগারেও পাঠানো হয়। সেই দুই স্থানের গবেষণার ফলাফল হচ্ছে নিম্নরূপ।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণাগারের রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল হচ্ছে ঃ—

হাইড্রোজেনের ঘনত্ব	৭.৯
বিদ্যুৎ পৌছানো ঃ	৩.৫৬
ক্যালসিয়াম ঃ মিলিলিটার	১১.১২
ম্যাগনেসিয়াম ঃ "	৩.৭৩
সোডিয়াম ঃ "	১৫.০০
পটাসিয়াম ঃ "	৭.৯০
কার্বন ঃ "	নেই
বাই-কার্বন ঃ "	৫.৫০
ক্লোরয়েড ঃ "	১৪.৬০
সালফার ঃ "	১৭.৬৫
মিশ্রিত লবণ ঃ (মিলিয়ন লিটারে)	২২৭৮

রিয়াদের কেন্দ্রীয় হাসপাতালের পরীক্ষাগারের ফলাফল হচ্ছে ঃ—

১০০ মিলিমিটারে মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা		৩৮ হাজার
" " "	কলিফরমের সংখ্যা	২৪০
" " "	অন্যান্য কলিফরম	নেই।

তাদের মন্তব্য হল, বর্তমানে এই অবস্থায় যমযমের পানি পান করা যায় না।

কিন্তু সৌদী অর্থ মন্ত্রণালয় যখন ওয়ার্টসন কনসালটিং কোম্পানীকে মসজিদে হারামের পানি ও যমযমের ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন, মাতাফ সম্প্রসারণ এবং যমযমের পানিকে Sterialization (বিশুদ্ধকরণ) করার দায়িত্ব অর্পণ করে তখন উক্ত কোম্পানী যমযমের পানি, নহরে যুবায়দা এবং দাউদিয়া কূপের পানি পরীক্ষা করে। তারা তিনটি স্থানের পানি পরীক্ষা করে তুলনামূলক ফলাফল প্রদান করে। ১৯৭৩ সালে সমাপ্ত উক্ত পরীক্ষার ফলাফল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

পরীক্ষাসমূহ	দাউদিয়া কূপ	যমযম	নহরে যুবায়দা
বাহ্যিক অবস্থা	পরিষ্কার	পরিষ্কার	পরিষ্কার
মাইক্রো উম দ্বারা বিদ্যুত পৌঁছানো হয়	২৮৭৫	৩০৭৫	৯২৫
মোট শক্ত গলিত পদার্থ (মিলিয়নে)	১৭২৫	১৮৪৫	৫৫৫
হাইড্রোজেনের ঘনত্ব	৭.৯	৮.৩	৮.৩
হাইড্রোঅক্সাইডসোডিয়াম (মিলিলিটার)	১০	১০	
কার্বন-ক্যালসিয়ামের আকারে লবণ–(মিলিগ্রাম-লিটার)	৩৫০	২৬০	১৫০
ক্লোরের আকারে ক্লোরয়েড " "	৪০০	৪৮৫	১৩০
সালফার " "	৩১০	৩৫০	১১০
ক্যালসিয়াম " "	১৮৫	২১৫	৯০
ম্যাগনেসিয়াম " "	৫১	৫৫	৩৫
লোহা " "	০.০৪	০.০৪	০.০৪
তামা " "	০.০৫	১০	১০
নাইট্রোজেনিক নাইট্রেড " "	১.১০	১.৩০	৩০
নাইট্রোজেনিক নিট্রিট " "	০.১৬	০.৫২৬	০.০৮
সিলিকা " "	৮০	৮০	২৫
ফসফেট " "	নেই	নেই	নেই

লিবিয়ার ত্রিপোলীতে অবস্থিত 'ফাতেহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের' তেল ও খনিজ প্রকৌশল বিভাগের রাসায়নিক ও পেট্রো রাসায়নিক শিল্পের শিক্ষক ডঃ রাজা হোসাইন আবুস সেমান যমযমের পানির উপর গবেষণা চালান। তিনি যমযম থেকে এমনভাবে নমুনা পানি গ্রহণ করেন যাতে করে তা সত্যিকার অর্থে যমযমের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি ১৯৭৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যমযম থেকে ৩ লিটার পানি নেন। তারপর ১৯৭৭ সালে যমযম থেকে ১ লিটার পানি এবং সর্বশেষ ১৯৭৭ সালের ২রা ডিসেম্বর আরো ১ লিটার পানি নেন। অনুরূপভাবে তিনি ২৩/৪/৭৬ তারিখে আরাফাতের নহরে যুবায়দা থেকে দুই লিটার নেন এবং ২১ ।৪ ।১৯৭৬ তারিখে দাউদিয়া এবং মেসফালা থেকে ৩ লিটার পানি সংগ্রহ করেন এবং এগুলোর রাসায়নিক পরীক্ষা চালান। নিম্নে তার যমযমের পানির পরীক্ষার ফলাফল পেশ করা হল।

যমযমের পানির রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

হাইড্রোজেন	মিশ্র লবণ (মিলিয়নে)	ক্লোরয়েড (মিলিয়নে)	কার্বন (মিলিয়নে)	সালফার (মিলিয়নে)	ক্যালসিয়াম	ম্যাগনেশিয়াম	লোহা
৬০৯	১৬২০	২৩৪	৩৬৫	১৯০	আছে	আছে	আছে

যমযমের পানির জীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১৪০০ হিজরীতে, মোতাবেক ১৯৮০ খৃঃ মসজিদে হারাম আক্রান্ত হওয়ার পর যমযমের পানি দূষিত হয়ে পড়ায় তা পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সে উদ্দেশ্যে দমকল দিয়ে যমযমের পানি সেচ করে বাইরে ফেলে দেয়া হয় এবং কূপের মুখ থেকে নীচের দিকে ১৩-১৭ মিটার দূরে অবস্থিত মূল উৎসমুখসমূহ থেকে এবং ২৬-৩০ মিটার দূরে অবস্থিত কূপের সর্বশেষ তলদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তখন কূপের দূষিত পানি সেচ করে বের করে দেয়া হয়েছে এবং কূপের মৌলিক ও শাখা উৎসমুখসমূহ সুস্পষ্ট হওয়ার পরই সেখান থেকে পানি নেয়া হয়েছে।

১৩-১৭ মিটার নীচ থেকে গৃহীত পানির নমুনার মধ্যে মাইক্রোব বা রোগ জীবাণুর পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এতে স্যালামোনেল্যা, সিগেল্যা এবং ইসেরিচিয়া কোলাই মাইক্রোবের হার অনেক বেশী।

১৪০০ হিজরীর ২০শে মুহররমে গৃহীত নমুনা থেকে দেখা যায় যে, এতে ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ১ লাখ ৮০ হাজার ইসেরিচিয়া কোলাই মওজুদ রয়েছে। এই হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং ৪০০ হিজরীর ১২ই সফরের অপর এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ১০০ ঘন সেন্টিমিটার পানিতে উক্ত মাইক্রোবের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০০। কিন্তু কূপের তলদেশের পানির গৃহীত নমুনায় এই হার আরো অনেক বেশী। ২৬-৩০ মিটার নীচ থেকে একই তারিখে গৃহীত নমুনা পানিতে দেখা যায় যে, ১০০ ঘন সেন্টিমিটার পানিতে ইসেরিচিয়া কোলাই এর সংখ্যা হচ্ছে ১০ লাখ। উপরোক্ত পরীক্ষায় রোগ জীবাণুর সংখ্যার কথাও উল্লেখ রয়েছে। ২০শে মুহররমের নমুনা পানিতে এক ঘন সেন্টিমিটারে ২ লাখ ৯০ হাজার এবং ২৯শে মুহররমের নমুনা পানির পরীক্ষায় তিন ঘন সেন্টিমিটার পানিতে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লাখ ৫ হাজারে দাঁড়ায়। সেখানে পানির তাপমাত্রা হচ্ছে ৩২% ভাগ। অথচ অনুরূপ মাইক্রোবের উপযোগী তাপমাত্রা হচ্ছে ৩৭% ভাগ। ফলে সেখানে এই মাইক্রোব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা কূপে পানি সেচের সাথে সাথে ক্লোর ব্যবহার করে কূপের দেয়াল এবং তলদেশ থেকে সকল মাইক্রোব নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়। কূপ থেকে পানিসেচ করে বাইরে ফেলে তা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পাম্প মেশিনের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ৮ হাজার লিটার পানি তোলা হয় এবং কূপের পানির স্তর নীচে নামার কারণে, এর মূল উৎসমুখ সমূহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে উপরোক্ত পরীক্ষা চালানো হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৪০০ হিজরীর মসজিদে হারামে দুঃখজনক আক্রমণের ৬ মাস পূর্বে মাত্র, সৌদী সরকারের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোনের পানি ও সুয়েরেজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে যমযম কূপ পরিষ্কার করা হয়। পাম্প মেশিনের সাহায্যে পানি সেচ করে কূপ থেকে অনেক বালু ও আবর্জনা পরিষ্কার করার পর সকল রোগ-জীবাণুমুক্ত করা হয়। তখন সেখানে স্যালামোনেল্যা, সিগেল্যা এবং ইসেরিচিয়া মাইক্রোবসহ অন্য রোগ জীবাণুর আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

পক্ষান্তরে, প্রকৃতিগতভাবে পানিতে মওজুদ অন্যান্য মাইক্রোবের গড় হার কূপের প্রধান উৎসের মধ্যে স্থিতিশীল থাকলেও, ছোট উৎসমূহের মধ্যে উক্ত হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণিত হয় যে, যমযমের মূল

উৎসগুলোর পানি রোগ বিস্তারকারী জীবাণু থেকে পুরো মুক্ত। যমযমের পানি রোগ জীবাণুমুক্ত কিনা এ বিষয়ে আরো বেশী সতর্কতামূলক তথ্য লাভের উদ্দেশ্যে মাতাফের নীচের পানি মিশ্রিত মাটির জীবতাত্ত্বিক গবেষণা চালানো হয়। কা'বার পার্শ্বের মাতাফের স্তর পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খনন কাজ পরিচালনার পর দেখা যায় যে, মাত্র মার্বেল পাথরের নীচের মাটিটুকুও পানি মিশ্রিত এবং ভিজা। কাবার চতুর্দিকে এই একই অবস্থা। তখন হাজারে আসওয়াদের সামনে থেকে কা'বা হতে মাত্র ২ মিটার দূরে এবং ১ মিটার গভীর থেকে একটি নমুনা গ্রহণ করা হয়। আর ২য় নমুনাটি গ্রহণ করা হয় মাকামে ইবরাহীমের ৩ মিটার দূরে মারবেল পাথরের নীচ থেকে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পানি মিশ্রিত উক্ত কাদামাটি যে কোন রোগ জীবাণু মুক্ত। এমনকি, প্রকৃতিগতভাবে মাটিতে বা ভিজা মাটিতে যে সকল মাইক্রোব থাকে, এতে তাও নেই। অর্থাৎ মাতাফের মার্বেল পাথরের নীচের মাটিতে ক্ষতিকর রোগ জীবাণু যেমন ফেকালিস স্যালামোনেল্যা, সিগেল্যা, ইসেরিচিয়া কোলাই এবং স্ট্রেপ্ট- এগুলোর কোনটাই মওজুদ নেই। ধারণা করা হয় যে, মাতাফের সিক্ত কাদামাটির পানির উৎস হচ্ছে যমযম অর্থাৎ এগুলো যমযমেরই পানি। মাতাফের নীচের মাটিতে পর্যন্ত যখন কোন রোগ জীবাণু নেই তখন যমযমে রোগ জীবাণু কিভাবে থাকতে পারে? আল্লাহ যমযম এবং মাতাফকে রোগমুক্ত করে লক্ষ কোটি মানুষের জন্য তাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়েছেন।

যমযমের পানির রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। এ ছাড়াও এতে এলকালি, বায়োকার্বন এবং হাইড্রোজেনের মওজুদ উত্তম। এতে প্রয়োজনীয় সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্লোরয়েড রয়েছে। এ ছাড়াও এতে সালফার এবং নাইট্রিক এসিডের তৈরি লবণের হার সন্তোষজনক। স্বাস্থ্যকর পানির যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার সবগুলোই যমযমের পানিতে উত্তম ও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

যমযমের পানির পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের কারণে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য পানির চাইতে তা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এর ওজনও অপেক্ষাকৃত বেশী। সাবেক গবেষণা অনুযায়ী ওজনের ঐ পার্থক্য ১০% ভাগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

যমযম পৃথিবীর সেরা ও শ্রেষ্ঠ পানি। এটা শুধু পানি নয় বরং তা একাধারে পানীয় খাদ্য ও ওষুধ হিসেবে কাজ করে বলে তা পৃথিবীর অন্য যে কোন পানির চাইতে সার্বিক দিক থেকে অতুলনীয়।

যমযমের পানির আরো ব্যাপক গবেষণা দরকার তাতে করে হাদীসে বর্ণিত এর অন্যান্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কেও আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

অতিবেগুনী আলো দ্বারা যমযমের পানি জীবাণু মুক্তকরণ

যমযমের পানি জীবাণুমুক্ত বলে ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাইরের দূষিত পদার্থ দ্বারা তা প্রভাবিত হয়। যেমন বালতি দ্বারা পানি তোলা, কূপের পার্শ্বে হাজীদের অজু-গোসল এবং ভূগর্ভস্থ পানি প্রবেশ ইত্যাদি বহিরাগত উপাদানের কারণে যমযমের পানি দূষিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ অবস্থা পূর্বে বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে বালতি দিয়ে পানি তোলা হয় না, কূপের পার্শ্বে হাজীদের অজু-গোসল নেই এবং কূপের পার্শ্বের গর্ত থেকে ভূগর্ভস্থ পানি বাইরে নিক্ষেপের কারণে তা যমযমে প্রবেশের কোন সমস্যা নেই। তারপরও বহিরাগত কোন কারণে যদি যমযমে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে তাকে ধ্বংস করার জন্য ULTRA VIOLET RAY ব্যবহার করে পানিকে Sterialised বা জীবাণুমুক্ত করা হয়।

পানিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে। তারমধ্যে তাপ ব্যবহার করে পানিকে সিদ্ধ করা, অতিবেগুনী আলো দ্বারা জীবাণু মারা, রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা কিংবা রাসায়নিক এসিড দ্বারা পানিকে রোগজীবাণু মুক্ত করা হয়।

অতিবেগুনী আলো দ্বারা রোগ জীবাণু ধ্বংস করার পদ্ধতি হচ্ছে, এতে A-২৫৩৭ এঙ্গোস্ট্রোম ইউনিট ব্যবহার করা হয় এবং সে জন্য গ্লাসের তৈরি বিশেষ বাল্ব প্রয়োজন। সম্প্রতি এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পানিকে রোগ জীবাণুমুক্ত করার জন্য সেকেণ্ডে ১৬ হাজার মাইক্রোওয়াট আলট্রাডস ২ সেন্টি মিটারে A-২৫৩৭ অতিবেগুনী আলো ব্যবহার নির্ধারণ করেছে এবং এ জন্য ৩০ হাজার আলট্রাডস সংগ্রহের জন্য আলট্রা ডিনামিক তৈরি করেছে।

অতিবেগুনী আলো দ্বারা রোগ জীবাণু ধ্বংস হচ্ছে কিনা তা বুঝার জন্য স্বংয়ক্রিয় ও সংবেদনশীল যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। এটা অতিবেগুনী আলোর কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য ঠিক মত আদায় হচ্ছে কিনা তা বলে দেয়। ২৫৩৭ তাপ নিয়ন্ত্রণকারী উক্ত মেশিনের নাম হচ্ছে, জি এল-৫০ আলট্রা ভায়লেট। আবার এই মেশিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য রয়েছে ইউ ডি সি-৫০ মালটি সেন্সর।

অতিবেগুনী আলো দ্বারা রোগজীবাণু মুক্ত করার পদ্ধতিটি কয়েকটি কারণে অগ্রাধিকার যোগ্য। সে কারণগুলো হচ্ছে ঃ ১. এতে কোন রাসায়নিক পদার্থ

মিশানোর ঝামেলা থাকে না। ২. পানি গরম ও ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন হয় না। ৩. এর মাধ্যমে ৯৯.৯৭% ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাস মারা যায়। ৪. এতে খরচ কম। এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ দ্বারা ১২ হাজার গ্যালন পানি জীবাণুমুক্ত করা যায়। ৫. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া যায় এবং ৬. এতে স্বয়ংক্রিয় মেশিন ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও তার মাধ্যমে পানির স্বাদের মধ্যে কোন বিকৃতি ঘটে না। ক্লোরামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করলে স্বাদের মধ্যে বিকৃতি আসতে পারে।

অতিবেগুনী আলো ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসের গায়ে লাগা মাত্র এর বাইরের আবরণ জ্বলে যায় এবং মাইক্রোবের অন্তর বা ডিএনএকে ধ্বংস করে দেয়।

অতিবেগুনী আলোর পদ্ধতিটি হচ্ছে, একটি সিলিণ্ডারের ভেতর পানি ঢুকানো হয়। এর ভেতর অতিবেগুনী আলোর বাল্ব থাকে। বাল্ব ক্রিস্টাল গ্লাসের ভেতর থাকায় তা পানিকে স্পর্শ করতে পারে না। পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে সিলিণ্ডারের ভেতর কি পরিমাণ বাল্ব থাকবে। সিলিণ্ডারের নীচ দিয়ে পানি ঢুকে এবং উপর দিয়ে জীবাণুমুক্ত হয়ে বের হয়। ফলে সকল পানি এ পথ দিয়ে জীবাণুমুক্ত হতে বাধ্য।

আলোর বাল্ব যদি ৩০ হাজার ইউনিটের কম শক্তি সম্পন্ন না হয় তাহলে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য তাতে কমপক্ষে ৬ হাজার থেকে ১৩ হাজার অতিবেগুনী আলোর ইউনিট প্রয়োজন হয়।

১৯৭৫ খৃস্টাব্দে যমযমে অতিবেগুনী আলো দ্বারা রোগজীবাণুমুক্ত করার কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে দু'জন প্রতিনিধি যায়। তারপর মেশিন বসানো হয়, পরে রোগ জীবাণুমুক্ত পানি একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তা পুরো জীবাণুমুক্ত। ১৪০২ হিজরীর পর যমযমের সকল পানি অতিবেগুনী আলো দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার কাজ শেষ হয় এবং বিন লাদিন কোম্পানী তা আঞ্জাম দেয়।

যমযম পরিষ্কার অভিযান

কুর্দী বলেন, যমযমের তলদেশ মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা উত্তম। কেননা এতে বালু জমে। কূপ পরিষ্কার করার দু'টো ফায়দা আছে। একটি হল এতে কূপ পরিষ্কার হবে আর অন্যটি হচ্ছে পানির পরিচ্ছন্নতা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আযরাকী বলেন, হিজরী ২২৩ ও ২২৪ সালে যমযম পরিষ্কার করা হয়। পানি খুব কমে গিয়ে এক পর্যায়ে তা শুকিয়ে যায়। তারপর নীচে ৯ হাত গভীর করা হয় এবং পরের বছর বৃষ্টি হওয়াতে এর পানি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও খলীফা হারুনুর রশীদ এবং খলীফা মাহদীর আমলে দু'বার কূপ খনন করা হয় এবং তা পরিষ্কার করা হয়।

কুর্দী আরো উল্লেখ করেন যে, ১০২৮ হিজরীর রমযান মাসে, যমযমের পশ্চিম দিক এবং শামীয়ার দিক থেকে কূপে কিছু পাথর ধসে পড়ে। এর ফলে পানির স্বাদ পুরো পাল্টে যায় এবং এতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এমনকি পানির ওজন অপেক্ষাকৃত ভারী হয়ে যায়। তারপর তা শরীফ ইদরিস বিন হাসানের আমলে পরিষ্কার করা হয়। ১০৬৮ হিজরীর জিলকদ ও জিলহজ্জ মাসে যমযমের পানি অনেক কমে যায়। বালতিতে বালু ছাড়া তখন অন্য কিছু উঠত না। তারপর কূপ খনন করা হয় এবং তা পরিষ্কার করা হয় এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, রাত্রে কূপ বন্ধ রাখতে হয় এবং দিনে তা হাজীদের জন্য খোলা রাখতে হয়।

ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অতীতে খুব অল্পই যমযম কূপ পরিষ্কার করা হয়েছে। কেননা, এটি অন্য কূপের মত নয়। হাজী ও উমরাহ আদায়কারীদের কারণে তা বেশী সময় ধরে বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

বর্তমান যুগে দু'বার যমযম কূপ পরিষ্কার করা হয়। একবার ১৩৯৯ হিজরীতে বিন লাদিন কোম্পানী কর্তৃক মাতাফ সম্প্রসারণ করার সময়। মাতাফ বাড়ানোর জন্য যমযমের প্রবেশ পথ ও পানকেন্দ্রকে যখন কূপ থেকে সরিয়ে কিছু দূরে মাটির নীচে তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয় তখন, খননকাজ পরিচালনার সময় যমযমের কাছে এবং নতুন কক্ষ তৈরির ভিত্তি স্থানের কয়েক জায়গা থেকে হঠাৎ করে ভূগর্ভস্থ পানি বেরিয়ে আসে। তখন যমযম কূপকে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই উদ্দেশ্যে পৌছার লক্ষ্যে যমযমের পানির উৎসমুখ সম্পর্কে জানা এবং ভূগর্ভস্থ কোন পানি তাতে প্রবেশ করছে কিনা তা দেখার নির্দেশ দেয়া হয়।

এই কাজের জন্য ডুবুরীর প্রয়োজন। তাই জেদ্দা সামুদ্রিক বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দু'জন ডুবুরী ধার নেয়া হয় এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে তাদেরকে যমযমে নামানো হয়। এই দু'জন ডুবুরীর একজন হচ্ছে পাকিস্তানী এবং অন্যজন হচ্ছে মিসরীয়। ডুবুরীরা তাদের পেশাদার পোশাক পরে কূপে নামেন এবং সাথে টর্চ

লাইট নেন যাতে করে যমযমের ভেতরের দেয়াল, উৎস ও অন্যান্য জিনিসগুলো ঠিকমত দেখতে পান। তারা ১৭/৫/১৩৯৯ হিজরীর শনিবার রাত ৯ টায় কূপে নামেন, আধ ঘন্টা কূপের ভেতর অবস্থান করে উপরে উঠে আসেন এবং প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেন। তারা বলেন, উপর থেকে ৯ মিটার নীচ পর্যন্ত কূপের দেয়াল প্লাস্টার করা এবং প্লাস্টারের নীচে পানির দুটো উৎসমুখ আছে। তবে তারা এগুলো কোন দিক থেকে এসেছে তা ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি। কেননা তাদের সাথের কম্পাসটি কাজ না করায় তারা দিক নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন। কম্পাস পুরো ভাল। তারপরও কূপের ভেতর কেন কাজ করছে না তা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তারপর তারা দ্বিতীয়বার আরেকটি ভাল কম্পাস নিয়ে নীচে নামেন। এবারও কম্পাস কাজ করেনা। তারপর তাদেরকে কূপের গভীর তলদেশে পৌঁছে সে সম্পর্কে তথ্য দান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তারা তলদেশ সম্পর্কে প্রদত্ত রিপোর্টে বলেন, নীচে লোহার কিছু পাইপ, বিভিন্ন ঘটি-বাটি ও পানপাত্র রয়েছে। কম্পাসের কাজ না করার পেছনে লোহার প্রভাবই এর উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ফ্লাশ ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলার সময় ফ্লাশের সংযোগ তারটি কূপে পড়ে যায়।

অনেক তালাশ করেও ডুবুরীরা তা আর উদ্ধার করতে পারেননি। ফলে, যমযমের পানির উৎস সম্পর্কে জানার আর কোন পথই অবশিষ্ট থাকল না। জেদ্দা শহরের সকল ক্যামেরা আমদানিকারীদের সাথে যোগাযোগ করেও আর ঐ বিশেষ ফ্লাশ সংযোগটি সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। একেবারে হারিয়েই গেল এটি।

তারপর বিশেষ টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্য নেয়া হয়। ঐ ক্যামেরার মাধ্যমে পানির পাইপ ও ড্রেনের ভেতর থেকে ছবি তোলা যায়। এই ক্যামেরাটির অর্থ হচ্ছে, এটি রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত একটি গাড়ী। এর তার ৫০ মিটার লম্বা। পেছনে হচ্ছে ক্যামেরা। এর মাধ্যমে পানির ভেতরের ছবি নেয়া হয়। এই ক্যামেরা ব্যবহার করে পানির সকল উৎস ও ছিদ্রগুলো দেখা সম্ভব হয়। তবে এর মাধ্যমে বেগে নির্গত পানির পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি। কেননা, ক্যামেরাটি তখন পানিতে ছিল এবং এর ভেতর পানি ঢুকে পড়ে। আরেকটি ক্যামেরা আনার পর সেটিতেও পানি ঢুকায় তা জানা আর সম্ভব হয়নি। তারপর ক্যামেরাটি লণ্ডনে পাঠিয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং এর ভেতর যাতে পুনরায় পানি না ঢুকতে পারে সে রকম কভার লাগানো হয়।

দু'জন ডুবুরী কূপের ভেতর মওজুদ বিভিন্ন ঘটি-বাটি, পানপাত্র, লোহা, বালতি ও অন্যান্য জিনিস উঠানো শুরু করেন। অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত ডুবুরীরা কাজ করেন এবং পরে কাজ বন্ধ করে দেন।

পরের দিন ১৮।৫।১৩৯৯ হিজরী রোববার কূপ পরিষ্কার করার কাজ পুনরায় শুরু হয়। তারা আরো কিছু বালতি, মগ, বাটি, মুদ্রা ও অন্যান্য জিনিস উত্তোলন করেন। তারা কূপ সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা লাভ করেন। তারা বলেন, কূপ ৯ মিটার পর্যন্ত নীচের দিকে সোজাভাবে খাড়া। তারপর তা কাবার দিকে বেঁকে গেছে। কাবার দিকের উৎসমুখটি ৩০.৫০ সেন্টিমিটার এবং ২য়টি আজানখানার দিকে এবং সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট। তারা আরো বলেন, কূপের প্লাস্টারকৃত অংশের মধ্যে কোন ফাটল বা ছিদ্র নেই। প্লাস্টারের নীচে রয়েছে কাহ্‌ত পাথরের দেয়াল এবং তাতে রয়েছে বিভিন্ন ছিদ্র।

এই সকল তথ্যের পর মসজিদে হারামের ভূগর্ভস্থ পানি মসজিদের বাইরে অবস্থিত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ড্রেনে ফেলার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ডুবুরীরা রিপোর্ট দেয় যে, উপর থেকে কূপের ১৪.৮০ মিটার নীচ পর্যন্ত মজবুত প্লাস্টার করা এবং এর নীচে পানির দুটো উৎস আছে। তাই কূপের ৪ দিকে প্রস্তাবিত ৫ মিটার গভীর দেয়াল নির্মাণ করে ভূগর্ভস্থ পানি প্রবেশ বন্ধ করার পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়। কেননা, উক্ত প্লাস্টারের ফলে কূপে ভূগর্ভস্থ পানি ঢুকতে পারে না।

কূপ পরিষ্কার করার সময় পাকিস্তানী ডুবুরী মুহাম্মদ ইউনুস এবং মিসরীয় ডুবুরী সহ দু'জনেই বাতাস ভর্তি সিলিণ্ডার নিয়ে কূপের ভেতর নামেন যাতে করে পানির নীচে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন অসুবিধা না হয়। ছোট সিলিণ্ডারটি $\frac{১}{৩}$ ঘন্টা এবং বড় সিলিণ্ডারটি আধা ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী। এরপর বাতাস শেষ হয়ে যায়। ডুবুরীরা আস্তে উঠানামা করেন যাতে করে রক্তে এর কোন প্রভাব না পড়ে। ফলে নামতে ৫/৭ মিনিট সময় লাগে আবার উঠতেও ঐ পরিমাণ সময় লাগায় ডুবুরীরা কূপের ভেতর বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না। বড় জোর দশ মিনিট থাকতে পারেন। কিন্তু ডুবুরীদের দীর্ঘ সময় ধরে কূপের ভেতর কাজ করা প্রয়োজন এবং সেজন্য দীর্ঘস্থায়ী বাতাস সরবরাহকারী ব্যবস্থা দরকার। এজন্য কম্প্রেসার আনা হয় যাতে করে

ডুবুরীদেরকে কূপের ভেতরে কাজ করার সময় পাম্প করে বাতাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়। বাজারে বহু তালাশ করার পর ডুবুরীদের বাতাস পাম্প করার উপযোগী দুটো কম্প্রেসার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু পাম্পের বাতাস বিশুদ্ধকরণের জন্য এক ধরনের ফিলটার এবং পাম্পে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের বিশেষ তেল দরকার। যাতে করে ডুবুরীদের গলায় কোন জ্বালা সৃষ্টি না হয়। কেননা, ডুবুরীরা পানির নীচে মুখ দিয়ে বাতাস গ্রহণ করে, নাক দিয়ে নয়। পাম্পে সাধারণ তেল ব্যবহার করলে তার বাষ্প গলার জন্য ক্ষতিকর।

বহু চেষ্টার পর বাজারে বাতাস বিশুদ্ধকারী দু'টো ফিলটার পাওয়া গেলেও ঐ বিশেষ তেল কিন্তু পাওয়া যায়নি। তবুও ডুবুরীদ্বয় কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২২০ ভল্ট বিদ্যুতের মাধ্যমে কূপের ভেতর আলো দান করার ব্যবস্থা করা আরেক সমস্যা। কেননা, তা পানির সাথে লেগে বিদ্যুত বিভ্রাট সৃষ্টি হলে, ডুবুরীদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তারপর জেদ্দার সামুদ্রিক ওয়ার্কশপসহ অন্যান্য ওয়ার্কশপে তালাশ করার পর বিশেষ ধরনের টর্চ পাওয়া যায় যা কম্প্রেসারের ভেতর থেকে উর্ধগামী বাতাসের সাহায্যে জ্বালানো যায়। এর ভেতর দিনমু নামক একটি যন্ত্র আছে, তাতে কম্প্রেসারের বাতাস লাগলে বিদ্যুত তৈরি হয় এবং এর ফলে টর্চ জ্বলে ও আলো পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে কূপের ভেতরের বালু নড়াচড়া শুরু করায় ডুবুরীরা ভেতরে কিছু দেখতে পায় না। পরে এই সমস্যার সমাধান করা হয় এবং ২২০ ভল্টকে ১২ ভল্টে রূপান্তরিত করে কূপে আলো দান করা হয়। পানির সাথে ১২ ভোল্ট লাগলেও তাতে ডুবুরীদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কূপের ব্যাস সংকীর্ণ হওয়ায় ভেতরের আবর্জনা ও বিভিন্ন পাত্র তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। একজন করে ডুবুরী কাজ করে এবং উপর থেকে বিদ্যুতের তার বাতাসের পাইপ এবং যোগাযোগের তার নীচ পর্যন্ত ঝুলানোর কারণে এই সংকীর্ণতা আরো প্রকট হয়।

ময়লা আবর্জনা তোলার জন্য প্লাস্টিকের ড্রামে রশি বেঁধে কপিকলে তা জুড়ে দেয়া হয় এবং উপর থেকে টেনে ময়লা আবর্জনাগুলো বাইরে নিয়ে আসা হয়। ভেতর থেকে ড্রাম ভর্তি হলে ডুবুরী মেশিনের মাধ্যমে তা বলে দিত এবং সে অনুযায়ী ড্রাম টেনে তোলা হত।

কিন্তু একবার ড্রামের সাথে বাতাস সরবরাহকারী পাইপ আটকে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। ড্রাম টেনে তোলার সময় ঐ সংকট দেখা দেয়। ভেতরে কোন বাতাস ভর্তি সিলিণ্ডার না থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকল্প ব্যবস্থার অস্তিত্ব অনুপস্থিত। তাই ডুবুরীরা বিরাট সংকটের মধ্যে পড়ে। তারপর কোন প্রকারে ডুবুরী কূপ থেকে উঠে আসতে সক্ষম হয়। ডুবুরী উঠার আগে ড্রাম তোলা হয় এবং ড্রামের সাথে ডুবুরীর মুখোশও চলে আসে। এর তিন মিনিট পর ডুবুরী উঠে আসে। আল্লাহর মেহেরে বিনা দুর্যোগেই আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেন।

কম্প্রেসারের উপযোগী বিশেষ তেলের অভাবে ডুবুরীর গলা জ্বালা শুরু হয়। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, কূপে উঠানামার আগে-পরে দুধ কিংবা দই পান করলে গলায় জ্বালা সৃষ্টি হয় না। রাত্রেই পরিষ্কার করার কাজ অব্যাহত রাখা হয়। ডুবুরীরা দৈনিক ২ থেকে ৩ ঘন্টা কাজ করেন।

কূপ থেকে শক্ত জিনিসপত্র যেমন মগ, বালতি, লোহার পাইপ ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর দেখা যায় যে, কূপে আরো কিছু কাদা-বালু রয়েছে। তারপর ৪ ইঞ্চি কিংবা ৬ ইঞ্চি মোটা পাইপ কূপের তলদেশে লাগিয়ে এর ভেতর চিকন আরেকটি পাইপ ঢুকিয়ে তাতে কম্প্রেসারের মাধ্যমে বাতাস প্রবেশ করিয়ে চাপ দিলে কাদাগুলো সব উপরে উঠে আসে। প্রায় আধা ঘন্টা যাবত এভাবে কাজ করায় ছোট পাইপের মাধ্যমে বড় পাইপে এসে কাদা জমা হয় এবং তা পরে উপরে উঠে আসে। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় যে, পাইপে মগের মত শক্ত জিনিস ঢুকে তাকে বন্ধ করে দিয়েছে। পাইপ পরিষ্কার করে কয়েকবার ঐ রকম করায় কয়েকবারই তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুনরায় প্লাস্টিকের ড্রাম ব্যবহার করা হয় এবং কাদা উপরে তোলা হয়। কাদা তোলা বড়ই কষ্টকর। কেননা, তখন পানি ঘোলা হয়ে যায় এবং আলো থাকা সত্ত্বেও ডুবুরী কিছুই দেখতে পায় না।

১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি টীম নীচ থেকে উপরে তোলা যমযমের জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখে। তারা শক্ত জিনিসগুলোকে কাঠের বাক্সে, মুদ্রাগুলোকে প্যাকেটে এবং বালুকে প্লাস্টিকের বড় ব্যাগে ভর্তি করে হারামের যাদুঘরে রেখে দিয়েছে।

কূপের তলদেশ পরীক্ষা করার পর এর দেয়াল পরীক্ষা করা হয়। তারের তৈরি এক প্রকার জিনিস দিয়ে তা পরিষ্কার করা হয়। এই পরিষ্কার অভিযানে রঙিন ছবি তোলা

সম্ভব হয়নি এবং উৎসমুখগুলো থেকে বেগে পানি বের হওয়ার পরিমাণ সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কেননা, নীচে পানি ঘোলা ছিল বলে তা বুঝা যায়নি।

এই অভিযান ২৮।৫।১৩৯৯ হিজরী, মোতাবেক ১৫।৪।১৯৭৯ তারিখে শুরু হয় এবং ২৫।৭।১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ২০।৬।১৯৭৯ তারিখে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস পর শেষ হয়।

২য় পর্যায়ের পরিষ্কার অভিযান শুরু হয় ১৪০০ হিজরীর মুহররম মাসে। মসজিদে হারামে আক্রমণকারী জোহায়মান বেগ ও তার দলবল যখন মসজিদে হারামকে দখল করে নেয় তখন মসজিদে হারামের চারদিকের ভূগর্ভস্থ পানি সরানোর কাজে নিয়োজিত বিন লাদিন কোম্পানীর পাম্প মেশিনগুলো বিদ্যুত সংযোগের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং পানির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে পাম্প মেশিনগুলো পর্যন্ত উপরে উঠে। ফলে, গোটা হারাম ঐ পানিতে ভরে যায় এবং যমযম কূপেও তা ঢুকে। বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ তাদের ডিজেল চালিত পাম্প মেশিন দিয়ে উক্ত পানি সরানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু পানির আধিক্যের কারণে তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তখনও বিদ্রোহীরা মসজিদের মাটির নীচতলায় অবস্থান করছে। সেই সময়েই হারাম কর্তৃপক্ষ মসজিদে হারাম এবং যমযমের চারপাশ থেকে উক্ত পানি সরানোর নির্দেশ দেয় এবং বিদ্রোহীদের দমন শেষে যমযমের অবস্থা বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন যমযমের চারপার্শ্বে প্রায় দেড় মিটার উঁচু পানি বিরাজ করছে। পরে যমযমের পার্শ্বে তিনটি পাম্প মেশিন বসানো হয়। বাইরে থেকে যমযম পর্যন্ত বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে উক্ত মেশিনগুলো চালু করা হয় এবং সেই পানি বাবুস সাফার নিকট অবস্থিত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। যমযমের চারপার্শ্বে রাখা যন্ত্রপাতি এবং কূপ থেকে তোলা বিভিন্ন জিনিসপত্র কূপের চারপার্শ্বে এলোমেলো পড়ে থাকে। ঐ সময় কূপের পার্শ্বে কয়েকটি বোমা পাওয়া যায় যা বিস্ফোরিত হয়নি। পানি নিষ্কাশনের সময় তখনও গুলী এবং হাত বোমার আওয়ায মাটির নীচতলা থেকে শোনা যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও পরিষ্কার অভিযান অব্যাহত ছিল।

বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনের পর যমযমের ভেতর পরিষ্কার করার জন্য (মক্কার) হজ্জ গবেষণা কেন্দ্র এবং জেদ্দার সামুদ্রিক বন্দরের দু'জন ডুবুরীর সাহায্য নেয়া হয়। এবারকার ডুবুরীদ্বয় হচ্ছেন, পাকিস্তানের মুহাম্মদ লতীফ এবং মিসরের শওকী

আবদুল হামীদ। তারপর ডুবুরীদের সাহায্যে কূপের ১ মিটার এবং ৩ মিটার নীচের পানির নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা করা হয়।

উক্ত জীবতাত্বিক পরীক্ষায় এর মধ্যে বহু রোগ জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে– ১ মিটার নীচের পানিতে স্যালামোনেল্যা এবং সিগিল্যা মাইক্রোব হচ্ছে, ১ সেন্টিমিটারে ২ লাখ ৮৬ হাজার। ৩ মিটার নীচের ১ সেন্টিমিটার পানিতে ১ লাখ ২৩ হাজার। ৩ মিটার নীচের ১ সেন্টিমিটার পানিতে ৩৭ ডিগ্রী তাপমাত্রায় রোগ বিস্তারকারী জীবাণুর সংখ্যা হচ্ছে ৬ কোটি ২০ লাখ। তবে রোগ বিস্তারকারী নয় এমন ব্যাকটেরিয়া ২০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় অবস্থানকারী ১ মিটার নীচের পানিতে ১ সেন্টিমিটারে হচ্ছে ১৫ লাখ ৩০ হাজার এবং ৫ মিটার নীচের ১ সেন্টিমিটার পানিতে এর সংখ্যা হচ্ছে ৬৩ লাখ।

এই পরীক্ষার ফলাফলের কারণে এটা সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, বাইরের পানিতে যমযমের পানি পুরো দূষিত হয়ে গিয়েছিল। তাই হাজী এবং জিয়ারতকারীদের সহ সবাইকে এই পানি পান করতে নিষেধ করা হল। এদিকে যমযমের ভেতরের সকল পানি তুলে বাইরে ফেলে দেয়া, এর দেয়াল পরিষ্কার করা এবং পুরো কূপের পরিচ্ছন্নতা জরুরী। দূষিত পানি থেকে হজ্জ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সামী আনকাওয়ী এবং অন্য কর্মকর্তা ডঃ আবদুল হাফেজ সালামাহ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগেই পান করা সত্বেও তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। এমনকি, তাদের সাথে আরো কিছু লোকও তা পান করে, তাদেরও কোন ক্ষতি না হওয়ায় সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাইরে থেকে বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে কূপের ভেতরের পানি বের করার জন্য একটি পাম্প মেশিন লাগানো হয়। এর ফলে, পানি মাত্র ৫ মিটার নীচে নামে। ফলে এজন্য আরো বেশী পাম্প মেশিন ব্যবহার জরুরী। অপরদিকে কূপের ব্যাস সংকীর্ণ হওয়ায় এবং ডুবুরীদের নীচে অবতরণ, সংযোগ, ক্যামেরা, বিদ্যুত, কম্প্রেসারের পাইপসহ সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ঢুকানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য এগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় না হলে যে কোন সময় তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাসত্বেও পরে আরো তিনটি পাম্প মেশিন বসিয়ে পানি তোলা শুরু হয়। ৪টি পাম্প মেশিন মিনিটে গড়ে ৮ হাজার লিটার পানি সেচ শুরু করে। তখন কূপের পানি কমে আসে এবং প্রধান উৎসগুলো দেখা যায়। পানি এতো জোরে কূপে এসে পড়া শুরু করে যে, সবাই আওয়াজ শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। আযানের শব্দের মতো মনে হতে থাকে। তখন পাম্প মেশিন বন্ধ করা হয়

এবং এই দুর্লভ দৃশ্যের ছবি তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, ভেতরের উর্ধমুখী জলীয় বাষ্পের কারণে ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে যায়। পরে পাখা সমন্বিত ফ্লাশ ক্রয় করা হয় যেন ফ্লাসের বাল্বে জমা জলীয় বাষ্পকে বাতাস করে সরিয়ে দেয়া যায়। তার ২/৩ দিন পর আবার পাম্প মেশিন ব্যবহার করে পানি কমানো হয় এবং পানির উৎসমুখের ছবি তোলা হয়। ইতিমধ্যে পানিতে বিদ্যুতের তার লাগায় যারা ১৩ মিটার নীচে নেমে ছবি তুলছিলেন তাদের সমস্যা দেখা দেয়। সাথে সাথে তারা উপরে চলে আসেন এবং ইতিমধ্যে সকল প্রকার ছবি তোলা শেষ হয়।

কা'বার দিক থেকে আগত উৎসের পানির মধ্যে কোন রোগ জীবাণু পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। তারপর যমযমের পানির উৎসের গৃহীত ছবির রঙ্গীন সিনেমা ফিল্ম এবং এর উপর ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করা হয়।

তারপর আবার কূপের সকল পানি তোলার চেষ্টা করা হয় যাতে কূপের পরিষ্কার অভিযান শেষ করা যায়। ২/৩ দিন যাবত অনবরত পানি তোলার পর ধারণা করা হয় যে, বিরাট পরিমাণ পানি বাইরে ফেলে দেয়া হয়েছে, তখন পাম্প মেশিনগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। ২৪ ঘন্টার জন্য পানিতে ক্লোর মিশানো হয়। কিন্তু ভেতরে পরিষ্কারকারী ডুবুরীদের ক্লোরের গন্ধে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যাই হোক, কূপের পরিষ্কার অভিযান শেষে ডুবুরীরা উপরে উঠে আসেন। কূপের পরিষ্কার অভিযান সফল হওয়ার পর এবং তা হাজীদের পান করার উপযোগী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কারণে ২য় পর্যায়ের পরিষ্কার অভিযান এখানেই শেষ হয়।

তারপর যমযমের এই পরিষ্কার অভিযানের উপর পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে খবর ছাপা হতে থাকে এবং সৌদী টেলিভিশনে উক্ত অভিযানের উপর পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. যমযম, ইয়াহইয়া কোশাক।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. মাসআ' হচ্ছে সাঈ' করার জায়গা। অর্থাৎ সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান।
৮. তারীখ ইমারাতিল মাসজিদিল হারাম, হোসাইন আবদুল্লাহ বাসালামাহ।
৯. ফী রেহাবিল বাইতিল হারাম।
১০. আখবারে মক্কা, আল্লামা আযরাকী।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. যমযম, ইয়াহইয়া কোশাক।
১৯. আখবারে মক্কা, আযরাকী।
২০. প্রাগুক্ত।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. যমযম, ইয়াহইয়া কোশাক।
২৬. 'মাতাফ' অর্থ তওয়াফের স্থান। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈর স্থানকে 'মাসআ' বলে।
২৭. যমযম, ইয়াহইয়া কোশাক।
২৮. তারীখ ইমারাতিল মাসজিদিল হারাম, হোসাইন আবদুল্লাহ বাসালামাহ।
২৯. যমযম, ইয়াহইয়া কোশাক।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. প্রাগুক্ত।
৩২. প্রাগুক্ত।

৩. মক্কার ইতিহাস

হযরত ইবরাহীম (আ) এর দাওয়াত ও মক্কা

মক্কার ইতিহাস হযরত ইবরাহীম (আ) এর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ইহুদী– কারো কাছেই হযরত ইবরাহীম (আ) এর নাম অজানা নয়। দুনিয়ার তিন ভাগের দুইভাগেরও বেশী লোক তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে। হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) এই তিনজন শ্রেষ্ঠ রাসূলই তাঁর বংশজাত। চার হাজার বছর আগে তিনি যে সত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, পরবর্তী নবীরা তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। চার হাজার বছরেরও বেশী কাল পূর্বে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি নিজে ছিলেন একজন মূর্তিপূজারী ঠাকুরের সন্তান। তাঁর বাপ আজর তদানীন্তর সমাজে পুরোহিতের মর্যাদা লাভ করে। তাঁর বংশের সবাই মূর্তিপূজা করত। কিন্তু তিনি মূর্তিপূজার এই ঘোর অমানিশা থেকে মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। জ্ঞান হওয়ার পর তিনি চাঁদ, সূর্য এবং তারকারাজিকে আল্লাহ বা উপাস্য বলে মনে করতেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, এগুলো উপাস্য হতে পারে না। এসব তো একজন অনুগত গোলামের ন্যায় নিজ মনিবের অনুগত এবং তাঁর সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে চলছে। সবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে,

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔

অর্থ ঃ 'আমি সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই সত্তাকেই এবাদত বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।' (আল-আনয়াম ঃ ৭৯)

এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি মানুষ, দেবতা ও ক্ষমতাসীন সরকারের সার্বভৌমত্ব ও গোলামী করাকে অস্বীকার করেন। আল্লাহর আইন ও গোলামী ছাড়া আর সব কিছুকে অস্বীকার করার ফলে তাঁর উপর বিপদ মুসীবতের পাহাড় ভেংগে পড়ল।

অর্থাৎ তিনি নবুওত লাভ করার পর যখন নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা দেন এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর আইন কানুনের কথা প্রচার করেন। তখন নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। জাতির হুমকির উত্তরে নিজ হাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলে তিনি প্রমাণ করেন যে, তোমরা যাদের পূজা কর তাদের কোন ক্ষমতাই নেই, তারা নিজেদের আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না। তিনি বাদশাহর দরবারে ঘোষণা দিলেন, তুমি আমার প্রতিপালক, শাসক ও মালিক নও, আমার রব তিনিই যাঁর হাতে আমার তোমার সকলেরই জীবন মৃত্যু নিহিত রয়েছে এবং যাঁর নিয়মের কঠিন বাঁধনে চাঁদ সূর্য সবই বন্দী হয়ে আছে। বাদশাহ নমরুদ তাঁর মুখে আল্লাহর আইন ও বিধানের কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে কঠিন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহর হুকুমে, আগুন তাঁর একটি পশমও জ্বালাতে পারেনি। আল্লাহ তাঁকে অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি দিলেন।

পরে নিঃসন্তান এই নবী শুধু নিজের স্ত্রী ও ভাতিজাকে নিয়ে বের হন এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। জন্মভূমি থেকে হিজরত করে হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং আরব দেশসমূহে ঘুরাফেরা করতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসার করা। ধন-সম্পদ লাভ কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই ঘুরাফেরা করেননি। পরে ৮৫-৯০ বছর বয়সে বার্ধক্যে পৌছার পর আল্লাহর কাছে শুধু আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই সন্তান কামনা করেন এবং সন্তান লাভ করেন। কিন্তু পরে তিনি নিজের প্রিয় সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ) কে জবেহ করার কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। পিতা পুত্র দু'জনই এ পরীক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হলেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সফল হন।

ইসমাঈল (আ) এর কোরবানী ঃ এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষা

আল্লাহর প্রিয় নবী ইবরাহীম (আ) ইরাকের বাদশাহ নমরুদের মূর্তিপূজা ও ইসলাম বিরোধী শাসনের বিরুদ্ধাচারণ করেন। তিনি নমরুদসহ গোটা ইরাকবাসীকে শিরক, বেদআত, কুসংস্কার এবং মানবরচিত মতবাদ ও আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন মানার দাওয়াত দেন। তিনি তাদেরকে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে একমাত্র ইসলামী আইন কায়েমের

তাগিদ দেন এবং মূর্তিপূজার পরিবর্তে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও তওহীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু জালেম বাদশাহ নমরুদ ইবরাহীম (আ) এর দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। শেষ পর্যন্ত নমরুদ তাঁকে বিরাট অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সেই কঠিন পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ আগুনকে বলেন,

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ ـ

অর্থ ঃ 'আমরা আগুনকে আদেশ করলাম, হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও।' আল্লাহর আদেশের কারণে, আগুন ইবরাহীমের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। কেননা, আগুনসহ সকল সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই চলে। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধু আল্লাহর আইনের কিছু সংখ্যক অবাধ্য মানুষ, যারা আল্লাহর আইন মানেনা। যাক, এটা ছিল তাঁর জীবনের প্রথম অগ্নিপরীক্ষা। তাঁর জীবনের ২য় পরীক্ষা ছিল, নিজের প্রাণপ্রিয় ছেলে ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজারকে মক্কার জনমানবশূন্য মরুভূমিতে নির্বাসন দেয়া। অপরদিকে, তাঁর জীবনের ৩য় অগ্নিপরীক্ষা ছিল, ইসমাঈল (আ)-কে কোরবান করার স্বপ্নাদেশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ـ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ ـ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّى اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى ـ قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ـ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ـ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ ـ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ الْمُحْسِنِيْنَ ـ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ ـ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ـ (الصافات ـ ١٠٧-١٠٠)

অর্থ ঃ '(ইবরাহীম আঃ দোয়া করলেন) হে আল্লাহ, আমাকে একটি সন্তান দান করুন! সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে অর্থাৎ কৈশোরে পৌছল, তখন ইবরাহীম

বললেন, হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে জবেহ করছি। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি? সে বলল ঃ পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যধারণকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য করলেন এবং ইবরাহীম তাকে জবেহ করার জন্য উপুড় করে শোয়ালেন, তখন আমি ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই, সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই, এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এর পরিবর্তে জবেহ করার জন্য এক মহান পশু দিলাম।'

উপরে বর্ণিত আয়াতে ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে একটি নেক সন্তান কামনা করেছিলেন। সন্তান পাওয়ার পর সে সন্তান কতটুকু নেককার তার পরীক্ষা দরকার ছিল। এজন্য তিনি জবেহর ব্যাপারে ইসমাঈলের মতামত চান। এই পরীক্ষায় ইসমাঈল (আ) পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি সহকারে আল্লাহর আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তার ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ কার্যকর করার আহ্বান জানান।

ইবরাহীম (আ) জবেহ করার সময়, ইসমাঈল (আ)-কে চিৎ করে না শুইয়ে উপুড় করে শুইয়েছিলেন, যেন জবেহ করার সময় পুত্রের মুখ দেখে স্নেহ ভালবাসার জোয়ারে নিজ হাত কেঁপে না উঠে। সে জন্য তিনি নীচের দিক থেকে ছুরি চালিয়ে জবেহ করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ইসমাঈল (আ) পিতাকে বললেন, 'আপনি আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন। যাতে করে আমি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরনের কাপড় সামলিয়ে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিঁটা তাতে না পড়ে। কেননা, এতে আমার সওয়াব কমে যেতে পারে। এছাড়াও রক্ত দেখলে আমার মা বেশী পেরেশান হবেন। পক্ষান্তরে, আপনার ছুরিটাও ভাল করে ধার দিয়ে নিন, যেন তা আমার গলায় তাড়াতাড়ি চালাতে পারেন এবং দ্রুত আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আমার মায়ের কাছে আমার সালাম বলবেন। যদি তাঁর শান্তনার জন্য আমার জামা-কাপড় নিয়ে যেতে চান, নিয়ে যাবেন।' ছেলের মুখে এসব কথা শুনে বাপের মনে স্নেহের যে তোলপাড় শুরু হওয়ার কথা, তা সহজেই অনুমেয়। তা সত্বেও ইবরাহীম (আ) ঈমানের এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায়

মজবুত পাহাড়ের মত অটল রইলেন এবং বললেন, হে সন্তান, আল্লাহর আদেশ পালনে তুমি আমার উত্তম সহায়ক হয়েছো। তারপর তিনি ইসমাঈলকে চুমু খান এবং অশ্রুমাখা চোখে তাকে বেঁধে নেন।[১]

ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, হুবহু তা বাস্তবায়ন করেন। যে মূহূর্তে তিনি ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে, আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বলেন, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন ইসমাঈলকে জবেহ করার আর প্রয়োজন নেই, জবেহ করার উদ্যোগ ও প্রস্তুতিই জরুরী ছিল, কেননা, তুমি এটাতো স্বপ্নে দেখনি যে, ইসমাঈলকে জবেহ করেই ফেলেছ এবং তার প্রাণবায়ু তার দেহ থেকে বের করে দিয়েছ। বরং তুমি স্বপ্নে দেখেছ যে, তুমি ইসমাঈলকে জবেহ করছ। এর অর্থ ছিল তুমি জবেহ করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছ।[২] আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, তোমাকে যদি বলা হয় যে, তাকে জবেহ করেই ফেল তাহলে, তাও তুমি করবে। কেননা, আল্লাহর প্রেমে সিক্ত খলীলের জন্য এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন কিছু নয়।

ইসমাঈল (আ)-কে জবেহ করার এই পরীক্ষা-পর্বের মাধ্যমে, মিল্লাতে ইবরাহীমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে, আল্লাহর আদেশ পালনের আগ্রহ এবং জান-মাল ত্যাগ করার শিক্ষাদানই মুখ্য বিষয়। মোমেন ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য প্রয়োজন হলে, নিজের জান-মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করবে।

যাক, তারপর জিবরীল (আ) একটি দুম্বা বা ভেড়া নিয়ে হাজির হন এবং ইবরাহীম (আ) কে ইসমাঈলের পরিবর্তে তা জবেহ করার কথা বলেন। কোরআন এটাকে 'মহান কোরবানী' বলে উল্লেখ করেছে। কেননা এই উপলক্ষে, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই সুন্নাত চালু করে দিলেন যে, প্রতি বছর এই দিবসে সারা দুনিয়ার ঈমানদার লোকেরা পশু কোরবানী করবে এবং আনুগত্য ও ত্যাগের এই স্মারক মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে।

নবীদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। সেটাও ওহী। তাই ইবরাহীম (আ) ঐ স্বপ্ন দেখার পর তা বাস্তবায়ন করার প্রস্তুতি নেন। শুধু তাই নয়, ইসমাঈলও (আ) ঐ স্বপ্নকে শুধু

স্বপ্ন মনে না করে তাকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন এবং জবেহ্ হওয়ার জন্য পুরো মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইসমাঈলকে জবেহ্ করার হুকুমটি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত। কিন্তু, স্বপ্নের মাধ্যমে উক্ত আদেশের দ্বারা ইবরাহীম (আ) এর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশের সুযোগ দেয়া হল, কেননা, স্বপ্নের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকা সত্বেও ইবরাহীম (আ) নির্দ্বিধায় আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

আল্লাহ্ ইসমাঈল (আ) এর কোরবানীর এই ঘটনা বর্ণনা করে এই দুটো বংশের লোকসহ অন্যান্য লোকদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগাতে চান যে, দুনিয়ায় তোমাদের ভাগ্যে যতটুকু মর্যাদা অর্জিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহের কারণে, যা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দিতে চান যে, আল্লাহ্ তাদের আদি পিতাদের উপর অন্ধের ন্যায় কোন অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেননি। বরং তাঁরা আল্লাহর সাথে পরিপূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছেন। আর এ কারণেই তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। এখন যে কেউ শুধু তাদের বংশধর হওয়ার কারণেই আল্লাহর রহমত পেতে পারে না। সেজন্য দরকার হচ্ছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى ـ (الحج ـ ٣٤)

অর্থ ঃ 'আল্লাহর কাছে কোরবানীর রক্ত ও গোশত কোনটাই পৌছেনা। তাঁর কাছে যা পৌছে তা হচ্ছে তাকওয়া।'

ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো, তাকওয়া হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর সকল আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকা।' এর সহজ সরল অর্থ হল, ফরজ-ওয়াজিবগুলো মানা এবং হারাম কাজগুলো থেকে বিরত থাকা। তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই ইসমাঈল (আঃ) এর কোরবানীর ঘটনা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব।

বিশ্বের ইসলামী নেতৃত্বে ইবরাহীম (আ)-এর নিয়ুক্তি

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে সমগ্র দুনিয়ার ইমাম বা নেতা বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۔

অর্থ ঃ 'এবং যখন ইবরাহীম (আ) কে তাঁর রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি সে সকল পরীক্ষা সম্পন্ন করলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে সকল মানুষের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করছি।' (সূরা বাকারা : ১২৪) এইভাবে হযরত ইবরাহীমকে (আ) সারা দুনিয়ার নেতৃত্বদান করা হল এবং তাঁকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের নেতা নিযুক্ত করা হল।

এখন এই দাওয়াতী আন্দোলনের প্রচার-প্রসারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে তাঁর কিছু সংখ্যক সহযোগী আবশ্যক। এই ব্যাপারে তিন ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ) এর ডান হাত হিসেবে কাজ করেছেন। একজন তাঁর ভাতিজা হযরত লূত (আ), দ্বিতীয় তাঁর বড় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) এবং তৃতীয় হচ্ছেন তাঁর ছোট পুত্র হযরত ইসহাক (আ)। তাঁরা তিনজনই নবী ছিলেন।

ভাতিজা হযরত লূত (আ) কে 'সাদুম'(ট্রান্স-জর্দান) এলাকায় বসালেন। এখানে সেকালের সর্বাপেক্ষা লম্পট জাতি বাস করত। তাদের নৈতিকতাহীনতা সর্বনিম্নে পৌছে গিয়েছিল। নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ের পরিবর্তে পুরুষে পুরুষে সমকামিতার সয়লাব শুরু হয়েছিল। ইরান-ইরাক এবং মিসরের ব্যবসায়ীরা এই পথ দিয়ে যেত। তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়।

ছোট পুত্র হযরত ইসহাক (আ) কে তিনি কেনয়ান বা ফিলিস্তিনে বসান। এটি সিরিয়া এবং মিসরের মধ্যবর্তী স্থান। এই স্থান থেকেই হযরত ইসহাক (আ) এর পুত্র ইয়াকুব যার অপর নাম ইসরাইল এবং পৌত্র হযরত ইউসুফ (আ) এর মাধ্যমে মিসরে ইসলামের আহবান পৌছে।

বড়পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) কে মক্কায় বসান এবং পিতা-পুত্র দু'জনে মিলেই মক্কায় মুসলমানদের বিশ্ব ইসলামী কেন্দ্র, কা'বা নির্মাণ করেন। এই খানেই বিশ্বের মুসলমানদের হজ্জের ব্যবস্থা করা হয়। আল্লাহ নিজেই এই কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং নিজেই তা নির্মাণের স্থানও নির্ধারিত করেছিলেন। কা'বা শরীফের চারপার্শ্বে মসজিদে হারাম গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এই মসজিদটি সাধারণ মসজিদের মত শুধু নির্দিষ্ট এবাদতের স্থান নয়, প্রথম দিন থেকেই এটি, দ্বীন ইসলামের বিশ্ব আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর নিকট ও দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর এবাদত করবে। আবার এখান থেকেই ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। বিশ্ব মুসলিমের এই সম্মেলনের নাম হল হজ্জ। হজ্জ ইসলামের ৫ খুঁটির অন্যতম খুঁটি।

দুনিয়াব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ, প্রচার প্রসার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ, একামতে দীন তথা ইসলামী আন্দোলন, তাওহীদ এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে নবীকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হল, তাঁর প্রধান কার্যালয় ঠিক করে দেয়া হল মক্কায়। যে যতদূরেই বাস করুক না কেন, মক্কায় এসে উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দেয়া হল।

মোটকথা, হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাকসহ সর্বত্র যে শিরক, বিদআত, কুসংস্কার, মূর্তিপূজা, মানুষের উপর মানুষের শাসন, জুলুম-নির্যাতন ও অন্যান্য ক্ষতিকর নিয়ম পদ্ধতি দেখলেন, তার আমূল পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই মক্কায় তাওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্বও আইন-কানুন চালুর জন্য তাঁরই নির্দেশে এই বিশ্ব মুসলিম কেন্দ্র নির্মাণ করেন।

মক্কা শহরে জোরহোম গোত্রের শাসন

মক্কায় জোরহোম গোত্রের আবাদীর সাথে তাদের শাসন শুরু হয়। তাদের বংশে হযরত ইসমাঈল (আ) বিয়ে করেন এবং তাদের ভাষা আরবী শিখেন। তাঁর বংশধরদেরকে ঐতিহাসিকরা العرب المستعربة বা 'নতুন আরব' বলে অভিহিত করেন। কেননা, জোরহোম গোত্র ও তদানীন্তন ইয়েমেনের আরবরা ছিল মূল আরবী লোক।

হযরত ইসমাঈল (আ) এর ইন্তেকালের পর জোরহোম গোত্রে তাঁর নাতী মোদাদ বিন আমর আলজোরহোমী পর্যন্ত মক্কার শাসন অবশিষ্ট ছিল। জোরহোমীরা পরে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হচ্ছে জোরহোম শাখা আর ২য়টি হচ্ছে কাতুরা শাখা। মোদাদ তাঁর শাখার লোকদেরকে নিয়ে মক্কার উঁচু দিকে এবং কুআইকাআন পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস শুরু করেন। অপরদিকে কাতুরা সম্প্রদায়ের প্রধান সুমাইজা' তাঁর শাখার লোকদেরকে নিয়ে জিয়াদ ও মক্কার নীচু দিকে বাস করা শুরু করেন। তবে এক শাখার লোকেরা অন্য শাখার লোকদের বসবাসের এলাকায় আসা-যাওয়া করত না। জোরহোম গোত্র কুআইকাআন, যা আজকে 'জাবালে হিন্দ' নামে পরিচিত, সেই এলাকাসহ উত্তর-পূর্ব দিকে কাসাসিয়া বরাবর মক্কা উপত্যকার উপরিভাগে বাস করত। অপরদিকে, কাতুরা সম্প্রদায়ের লোকেরা জিয়াদের সাদ এলাকা থেকে শুরু করে মেসফালার মুখ পর্যন্ত এলাকায় বাস করা শুরু করে। পরে জোরহোম ও কাতুরা শাখার মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। মোদাদ বিন আমর সুমাইজা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খোলা তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হয়। শাণিত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বের হওয়াকে আরবীতে تَقَعْقَعَ 'তাকা'কা' বলে। এই জন্য তাদের বসবাসের এলাকাকে قُعَيقَعَانُ 'কুআইকাআন' বলা হয়। অপরদিকে, 'সুমাইজা' তার দলবল ও ঘোড়া নিয়ে মোকাবিলার জন্য বের হয়। আরবীতে ঘোড়াকে جِيَادُ 'জিয়াদ' বলা হয়। এজন্য তাদের বসবাসের এলাকাকে জিয়াদ বলা হয়। হযরত ইসমাঈল (আ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে সাবেত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মক্কা শহরের শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মোদাদ বিন আমর আলজোরহোমী মক্কা শহরের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই বংশ থেকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার

লাভ করেছে। পরে যখন জোরহোম বংশের লোক বেড়ে যায় এবং মক্কার পার্বত্য শহরে তাদের সংকুলান কষ্টকর হয়ে উঠে, তখন তাঁদের কিছু লোক বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যখনই যে শহরে গিয়েছেন, সেখানেই হযরত ইসমাঈল (আ) এর দীনের সঠিক অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। ফলে তাঁরা বিভিন্ন জায়গার নেতৃত্ব লাভ করেন এবাং আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। মানুষ চারদিক থেকে কা'বা শরীফের তওয়াফ ও যিয়ারত করতে আসা শুরু করে। ফলে, মক্কা শহরের শাসক হিসাবে জোরহোম গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। কেউ তাদের সাথে ঝগড়া-সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয় না। কেননা, এমনিতেই মক্কায় সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ-নিষিদ্ধ।

পরবর্তীতে ২য় মোদাদ বিন আমরের শাসনামলে, জোরহোম গোত্র আল্লাহ্র ঘরের মর্যাদা খাটো করে দেখা শুরু করে। তারা বড় ধরনের গুনাহ ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ২য় মোদাদ বিন আমর, নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে এক বক্তৃতায় বলেন, "হে আমার জাতি, তোমরা বিদ্রোহকে ভয় কর। কেননা, জালেম বিদ্রোহীরা ধ্বংস হতে বাধ্য। তোমরা দেখেছ তোমাদের আগে আমালিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও হারাম এলাকার মর্যাদাকে খাটো করে দেখার কারণে তাদের মর্যাদা কমে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করেছেন, তোমরা তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছ। তারা বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কোন সম্মান নেই। এই শহরে ও হারাম শরীফের প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা কেউ যদি এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসে, তাহলে তাদের উপর জুলুম করো না। যদি তা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে এখান থেকে বেইজ্জত হয়ে, বিতাড়িত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। ফলে তোমাদের কেউ এই হারাম কিংবা বাইতুল্লাহ্র কাছেও আসতে পারবে না। অথচ এটা তোমাদেরসহ সকলের জন্য, এমনকি পশুপাখীর জন্য নিরাপদ এলাকা।" এই বক্তৃতার জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের 'ইয়াজদা' নামক এক ব্যক্তি বলেন, "কে আমাদেরকে এই শহর থেকে বিতাড়িত করতে

পারে? আমরা কি সমস্ত আরবদের মধ্যে বেশী অস্ত্র ও অর্থের অধিকারী নই?" এর জবাবে ২য় মোদাদ বলেন, "যখন ঐ রকম অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন তোমার এ সকল ধ্যান-ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে।"

মক্কা শহরে খোজাআ গোত্রের শাসন

জোরহোম গোত্র মক্কায় পাপাচার শুরু করে, বহিরাগত লোকদের উপর জুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করে, কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহার সামগ্রী ভোগ করা শুরু করে এবং কাবা শরীফের ভেতরে জেনা-ব্যভিচারের সূচনা করে। তখন আল্লাহ্ তাদের উপর ইয়েমেনের কাহতান সম্প্রদায়ের 'খোজাআ' বংশকে বিজয়ী করেন এবং জোরহোম গোত্রকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। এই ঘটনা ৩ শত খৃষ্টাব্দের শেষ কিংবা ৪শ' খৃষ্টাব্দের প্রথমে সংঘটিত হয়।

আমর বিন মাউস্‌সামা প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কায়েসের বংশধর এবং কাহতানী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিলেন। প্রখ্যাত আরম বন্যার কারণে তিনি ও তাঁর বংশের লোকেরা নিজ এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তারা স্থানীয় লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁরা উত্তম জায়গার তালাশে মক্কা আসেন। তাঁরা মক্কার শাসক ২য় মোদাদকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহবান জানান। কিন্তু মোদাদ তা অস্বীকার করেন। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে জোরহোম গোত্র পরাজিত হয় এবং দেশত্যাগী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। তখন থেকেই মক্কায় 'খোজাআ' গোত্রের শাসন শুরু হয়। নতুন শাসকদের কাছে বনী ইসমাঈলরা আসে এবং মক্কায় থাকার অনুমতি চায়। ২য় মোদাদের ছেলে হারেসের পক্ষে মক্কা ত্যাগ করা খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তিনি পুনরায় মক্কায় বাস করার আগ্রহ নিয়ে 'খোজাআ' গোত্রের কাছে অনুমতি চান। খোজাআ গোত্র অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। 'খোজাআ' গোত্রের আমর বিন লুহাই মক্কার শাসক নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম মক্কায় মোটা-তাজা উট জবাই করে এর সুরুয়ার সাথে রুটি মিশ্রিত করে প্রখ্যাত আরব খাবার 'সারীদ' তৈরি করে হাজীদেরকে খাওয়ান এবং

প্রত্যেক হাজীকে ইয়েমেনের তৈরি ৩টি চাদর উপহার দেন। তিনিই পরবর্তীতে কা'বা শরীফের চতুর্দিকে বিভিন্ন কুসংস্কার চালু করেন, কা'বাঘরের চতুর্পার্শ্বে মূর্তি বসান এবং সুদূর ইয়েমেন থেকে অভিশপ্ত হোবল দেবতাকে এখানে নিয়ে আসেন। এখানেই কোরাইশ ও আরবরা তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হযরত ইবরাহীম (আ) এর দীনের বিকৃতি সাধন করেন।

আমর বিন লুহাই ও তাঁর বংশধররা ৫শ' খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা কা'বা শরীফের কোনকিছু নষ্ট করেনি এবং এতে কোন সংস্কার বা নতুন নির্মাণও করেনি।

মক্কায় কোরাইশ শাসন

মক্কায় কোরাইশ শাসনের সূচনা

খোজাআ' গোত্রের শাসক আমর বিন লুহাই, কা'বা শরীফে মূর্তিপূজা শুরু করার পর, মক্কায় একেশ্বরবাদী ধর্মকর্মের সমাপ্তি ঘটে এবং এটি একটি ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে কুসাই বিন কিলাবের হাতে মক্কার শাসনভার আসে। তিনিই কোরাইশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কোরাইশদেরকে একত্রিত ও সংগঠিত করেন। আরবীতে 'কারশ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'একত্রিত করা'। কুসাই বিন কিলাবের মৃত্যুর পর তার বংশধর কোরাইশরা মক্কার শাসন ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া-সংঘর্ষ করে। ৫০০ খৃস্টাব্দে মক্কায় কোরাইশ শাসন শুরু হয় এবং ৬৩১ খৃষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে কোরাইশের জাহেলী শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীতে কোরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের হাতে মক্কার শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। তিনি কোরাইশ শাসকদের মধ্যে সবচাইতে বেশী সম্মান ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। আবদুল মুত্তালিব হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাদা।

কোরাইশদের প্রশাসনিক কাঠামো

আজকের মত, পূর্বে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো এত সুবিন্যস্ত ছিল না। তাই জাহেলিয়াতের যুগে কোরাইশদের প্রশাসনিক কাঠামোও সাদা-সিধে ছিল। তাদের সমাজ ছিল গোত্র ভিত্তিক। তারা মক্কার একটি নগররাষ্ট্রে বাস করত।

বনি কানানা গোত্রের কুসাই বিন কিলাব একই সাথে মক্কার শাসনভার, হাজীদের সেবা, পানি পান করানো, খাওয়ানো এবং সম্মেলন করাসহ সকল কিছুর দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি কোরাইশদেরকে মক্কায় একত্রিত করেন বলে তাকে কোরাইশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এর আগে কোরাইশরা আরব দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনিই তাদেরকে মক্কায় একত্রিত করেন। তখন থেকে কোরাইশরা মক্কায় বসবাস শুরু করে। ঐ বছরই কোরাইশরা 'কোরাইশ' নাম ধারণ করে। এর আগে, কোরাইশ নামে কেউ পরিচিত ছিল না। কোন কোন আরব অঞ্চলে تَقَرَّشَ শব্দের অর্থ হচ্ছে تَجَمَّعَ বা একত্রিত হওয়া تَقَرُّشْ শব্দ থেকেই মূল কোরাইশ শব্দের উৎপত্তি।

কুসাই তাঁর গোত্রের লোকদের ধারণা থেকে আরো বেশী বাস্তবধর্মী ছিলেন। তিনি মক্কায় ক্ষমতা লাভ করার পর কোরাইশদের শলা-পরামর্শের জন্য দারুন-নাদওয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪০ বছরের কম বয়স্ক কোন কোরাইশীর জন্য এতে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাও আবার যে সমস্ত লোক সমাজ সেবা ও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তিনি তাদেরকেই এই পরামর্শ সভার সদস্য করতেন। হাশেম, উমাইয়া, মাখযুম, জুমাহ, সাহাম, আদী আসাদ, নওফল এবং গোহরা প্রমুখ পরামর্শ সভার সদস্য ছিলেন। অপরদিকে, কুসাই তাঁর সন্তানদেরকে, বয়সের ভেদ-বিচার না করে যাকে ইচ্ছে তাকেই পরামর্শ সভায় আসার অনুমতি দিতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি পুরো স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করেন।

কুসাই হাজীদের পানি পান করানোর বিষয়টির উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কা'বা শরীফের পার্শ্বে, চামড়ার বড় বড় মশক ভর্তি করে পানি রাখার ব্যবস্থা করেন এবং মক্কার চতুর্দিক থেকে উটের পিঠে বোঝাই করে বিভিন্ন কূপ থেকে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হারাম শরীফের বর্তমান 'বাবুল অদা'র কাছে একটি কূপ খনন করেন। তিনি রদমের মসজিদ আর-রায়ার কাছে আরেকটি কূপ খনন করেন। বর্তমানে আল্‌জুফালী ভবনের সামনের গলিতে, আল্‌জুদারিয়া নামক স্থানের কূপটিই সেই কূপ। পরবর্তীতে এটাকে 'জোবায়ের বিন মোতয়েম' কূপ বলা হয়। কেননা, এক সময় ঐ কূপটি মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়ায় জোবায়ের সেটিকে পুনরায় খনন করেন। কুসাইর পরে, তাঁর বংশে মিষ্টি পানির সন্ধান করে সেখানে কূপ খনন করে কা'বা শরীফে মিষ্টি পানি সরবরাহ করা কুসাইর সুন্নতে পরিণত হয়। এইভাবে তারা হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। কুসাই হাজীদেরকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকল কোরাইশী থেকে হজ্জ হওসুমে চাঁদা আদায় করতেন এবং গরীব ও দরিদ্র হাজীদের জন্য ঐ অর্থ দিয়ে খাবার তৈরী করে তাদেরকে খাওয়াতেন। তিনি চাঁদার অর্থ দিয়ে আটা কিনতেন এবং কোরবানীর পশুর রানের গোশত সংগ্রহ করতেন। গোশতের সাথে আটা মিশিয়ে খাবার তৈরী করে তা গরীব নিঃস্ব হাজীদেরকে খাওয়াতেন। কুসাইর মৃত্যুর পরও ঐ ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। কুসাইর নাতি উমরের শাসনামলে, মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় তিনি

কোরাইশদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা নিয়ে সিরিয়া যান এবং সেখান থেকে আটা ও কেক কিনে নিয়ে আসেন। তারপর উট জবাই করে আরবদের প্রসিদ্ধ খাবার 'সারীদ' তৈরী করে হাজীদেরকে খাওয়ান।

ইসলাম আসার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) হাজীদেরকে খাওয়ানোর সুন্নত অব্যাহত রাখেন। ৯ হিজরী সালে, তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) কে আমীরে হজ্জ বানিয়ে মক্কায় পাঠানোর সময় হাজীদের উদ্দেশ্যে খাবার তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট খোলাফায়ে রাশেদাও (রা) ঐ পদ্ধতি চালু রাখেন। আবুল অলীদ আযরাকী বলেন যে, তাঁর সময় পর্যন্ত ঐ পদ্ধতি চালু ছিল। তিনি হিজরী ৩য় শতকের মাঝামাঝি মারা যান। [৩] পরবর্তীতে কখন এই প্রথাটি বন্ধ হয়ে যায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সম্ভবতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হওয়ার পর এই প্রথাটি বন্ধ হয়ে গেছে। ইসলাম আসার পর এই আতিথেয়তার পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং এটি মক্কার জাতীয় প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী শাসকেরা যুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত থাকায় তারা হাজীদের তওয়াফ করানোর খেদমত ছাড়া অন্য কোন বড় খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেনি।

কোরাইশ আমলে মক্কার বসতি

ইবরাহীম উপত্যকা তথা মক্কা উপত্যকার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির দুই পার্শ্বে, পাহাড়ের পাদদেশে এবং শামীয়া ও কুআইকুআন পাহাড়ের গা ঘেঁষে নিম্নভূমির যে শাখাসমূহ রয়েছে, সেগুলোতে কুরাইশ আমলে বসতি ও ঘর-বাড়ী গড়ে উঠে। প্রত্যেক গোত্র ওয়াদি ইবরাহীম এবং বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত এর সমতল শাখাসমূহে ঘর তৈরী করে সেখানে বাস করত। তাই এলাকায় ঘনবসতি গড়ে উঠে। আজকের মত তখনকার দিনে, মক্কার পাহাড়-পর্বত ও ঢালু পাদদেশে কোন লোক বাস করত না।

মক্কার ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, কুসাই বিন কিলাব আজকের মাতাফ (তওয়াফের স্থান) এর সমান পরিমাণ জায়গা, তখন কা'বা শরীফের আঙ্গিনা হিসাবে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে এর বাইরে এবং কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্বে ঘর তৈরীর অনুমতি দিলেন। কুসাইর পূর্বে মক্কার লোকেরা কা'বা শরীফের পার্শ্বে বাস করা কিংবা রাত্রিযাপন করাকে জায়েয মনে করত না। কিন্তু কুসাই তাদেরকে এও নির্দেশ দিলেন, তারা যেন কা'বা শরীফের

দিকে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পথ রাখে। এর মধ্যে 'বাব বনি শায়বা'র পথটি উল্লেখযোগ্য ছিল। কা'বা শরীফের চাইতে উঁচু করে ঘর না বানানোরও নির্দেশ ছিল, যেন কা'বা শরীফ ঢাকা না পড়ে। তারা কা'বা শরীফের ছায়ায় বসে আলাপ-আলোচনা করত। এই উদ্দেশ্যেই তারা কা'বার পার্শ্বে 'দারুন নাদওয়া' তৈরি করে ও সেখানে বসে আলোচনা করে। এটাই ছিল তাদের বৈঠকের স্থান।

মক্কার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা আযরাকী তাঁর 'আখবারে মক্কা' বইতে তখনকার দিনে মক্কার জনবসতি সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, তখন বাইতুল্লাহর কাছে অনেক ঘর-বাড়ী মওজুদ ছিল। মসজিদে হারামে লোকজনের আনাগোনা বেশী হত। বাবুস সালাম ও বাবে আলীর দিকে সিরিয়ার গাসাসেনা গোত্রের কিছু লোক বাস করত। এই দুই দরজার মাঝখানে মুদী ও কবিরাজী ওষুধের দোকানপাট ছিল। তারপর বাবুন্নবীর পার্শ্বে ছিল হযরত আব্বাস, যোবায়ের বিন মোতয়ে'ম (রা) এবং আমের বিন লুয়াই গোত্রের ঘর-বাড়ী। অতঃপর মক্কার উচ্চভূমির দিকে রওনা হলে, বর্তমান কাসাসিয়ার প্রধান সড়ক যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে ফলের বাজার ছিল, তার পরেই ছিল খেজুরের বাজার। এরপর ছিল বনি আমের গোত্রের সরাইখানা। কাসাসিয়াকে মক্কার লোকেরা 'গাসাসিয়া' বলে। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে মক্কায় বসবাসকারী 'শেখ কাসাসী'র নামে এই জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছে। এর একটু পরেই রয়েছে মক্কার প্রসিদ্ধ سُوْقُ اللَّيْلِ বা 'নৈশ বাজার'। দিনে মক্কার কঠোর রোদে বের হওয়াই মুশকিল। তাই মক্কার অধিবাসীরা রাত্রে এই বাজারে এসে বেচা-কেনা করত। এজন্য এর নাম হয়েছে নৈশ বাজার। আজও সেই জায়গায় ঐ বাজারটি ঐ নামে চালু রয়েছে। 'সোক আল্‌লাইল' এর কাছেই ছিল কোরাইশদের دَارُ مَالِ اللّٰهُ। 'আল্লাহর সম্পদের ভাণ্ডার' নামক সমাজকল্যাণ কেন্দ্র। ঐ কেন্দ্র থেকে তারা অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য খরচ করত এবং তাদেরকে খাবার দান করত। এই ঘরের পার্শ্বেই শে'ব ইবনে ইউসুফ অবস্থিত যা আজকে শে'ব আলী নামে পরিচিতি। এর পূর্বের নাম ছিল শে'বে আবি তালিব। পাহাড়ের পাদদেশের ঢালু স্থানকে শে'ব বলে। শে'ব আলীতে, আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেমের ঘর ছিল। সেখানে আবু তালেব এবং আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের একটি করে ঘর

ছিল। এই জায়গাতেই নবী করীম (সা) এর জন্মস্থান রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে সেখানে একটি ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তারপর আবার প্রধান সড়ক ধরে সামনে এগুলে শে'বে বনি আমের শুরু হয় এবং শে'বে বনি আমেরের শুরুতেই আ'স এর বাড়ী ছিল। শে'বে বনি আমেরে বনি বকর গোত্রের ঘরবাড়ী ছিল। এছাড়াও সেখানে বনি আবদুল মোতালিব বিন আবদ মনাফ গোত্রের বাড়ী-ঘরও ছিল। আমরা পুনরায় প্রধান সড়কে এসে দাঁড়ালে সাবেক আল-আবদুল্লাহ বাঁধের সম্মুখীন হবো। এই বাঁধ দ্বারা তাঁরা পাহাড়ী ঢলের মাধ্যমে সৃষ্ট বন্যা প্রতিরোধ করত। সেখানে হাম্মারী গোত্রের লোকেরা বাস করত। এরপর 'মোয়াল্লাহ'র দিকে একটু এগিয়ে গেলে 'শেবে আবি দব' এবং পরে মোয়াল্লাহর কবরস্থান। শে'বে আমেরের যেখানে শেষ, সেখানেই এই কবরস্থান। তারপর শুরু হচ্ছে شُعْبَةُ الْجِنِّ জ্বীনদের ঘটনাস্থল। এরপর আল্‌হুজুন। তারপর আসে شَعْبُ الصَّفِيْ এটার বর্তমান নাম হচ্ছে 'মায়াবদাহ'। সেখানে বনি কানানা গোত্র, উতবা বিন আবি মুয়ীতের বংশ এবং আবদে শামস্ গোত্রের রবীয়ার বংশধররা বাস করত।

এবার সাঈ করার স্থান থেকে বাব বনি শায়বার উত্তর-পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালে, বাব বনি শায়বা ও বাব আস্ সালাম বরাবর সামনে, বনি আ'দী গোত্রের বাসস্থান পড়বে। সাঈ করার স্থানের সামনে, ডান দিকের অংশকে হোযামিয়া বলা হত। সেখানে নির্মাণকর্মী বা রাজমিস্ত্রীদের বাসা ছিল। সেখানে সাকীফা এবং হাকাম বিন হেযামের ঘর ছিল। এ ছাড়াও সেখানে, বনি সাহামের আঙ্গিনায় আরো কিছু ঘর ছিল। তারপরেই ছিল হযরত খাদীজা (রা) এর ঘর। বর্তমানে সেখানে 'গাজ্জা' বাজার রয়েছে।

এবার আমরা সাঈ'র স্থানে মারওয়া পাহাড়ে আসি। মারওয়ায় উতবা বিন ফারকাদের বাড়ী এবং ইয়াসের পরিবারের বড় একটি বাড়ী ছিল। বাম পার্শ্বেই ছিল নাপিত ও ক্ষৌরকারগণ। এরপর আটা, ঘি, মধু ও গমের দোকানপাট ছিল। সেখানে আবদ শামস গোত্র ও আবু সুফিয়ানের ঘর ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘরের দিকে ইশারা করেই বলেছিলেন, "যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।" এর পর আব্বাস পরিবারের বাড়ী। তারপর হারেসের বংশধরদের ঘর।

এবার সাঈর স্থানের বাব-বনি শায়বা থেকে পশ্চিম দিকে 'দারুন নাদওয়াহ'র দিকে যাওয়া যাক। সামনেই রোদ থেকে বাঁচার জন্য একটা বড় ছাতা ছিল। এই ছাতা পর্যন্ত পথের দুই ধারে ঘন ঘন ঘর। এক পার্শ্বে শায়বা বিন উসমানের ঘর, কা'বা শরীফের মালগুদাম, ডাক-পিয়নের ঘর, কোষাগার এবং খাত্তাব বিন নওফলের ঘর। ছাতার উত্তর পাশ দিয়ে উপরের দিকে বনি খোজাআ' গোত্রের ঘর-বাড়ী ছিল। মাঝখানে চলার পথ ছিল। এই পথ ধরে সুয়াইকা পর্যন্ত যাওয়া যেত। পথের উল্টো দিকে ছিল তামীম গোত্রের যেরারা পরিবারের ঘর-বাড়ী। সেখান থেকে কোআইকুআন (জাবালে হিন্দ) পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে শামীয়ার দিকে একটি সমতলভূমি রয়েছে। সেখান থেকে ডানে, দাইলামের দিকে একটি সমতল ভূমি রয়েছে। কোয়াইকুআন পাহাড় মসজিদে হারামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি উত্তর দিকে হুজুন, পশ্চিম দিকে বিরে তুওয়া এবং দক্ষিণ দিকে হাররাতুল বাব ও শোবেকা পর্যন্ত বিস্তৃত। আজকাল 'কারারা' নামে পরিচিত ঐ স্থানের কাছেই ছিল দাইলাম। সেখানকার পাহাড় কেটে মোয়াল্লাহর বাজারে যাওয়ার একটি পথ ছিল। যোবাইর বিন আওয়াম এই পথটি তৈরী করেছিলেন। তিনি মোয়াল্লাহর পার্শ্বে তার বাগানের সাথে সুয়াইকার পার্শ্বে ক্রয় করা বাড়ীর সাথে সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐ পথটি তৈরী করেছিলেন।

এবার মসজিদে হারামের নিম্নভূমির বর্ণনায় আসা যাক। এখন মসজিদে হারামের বাইরে বাবে আজইয়াদ থেকে পূর্বমুখী কিংবা পূর্ব-দক্ষিণমুখী হতে হবে। মসজিদে হারামের আঙ্গিনায়, রোকনে ইয়ামানী থেকে যমযম কূপ বরাবর, বাবে আলীর দিকে বনি আ'য়েজ গোত্রের বাড়ী-ঘর ছিল। বাবে আলীর কাছে সাঈর জায়গার বামে, কা'বা শরীফের দিকে ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় লোকজনের ঘর। মসজিদের আঙ্গিনা থেকে সাফা ও বাবে আজইয়াদ এর মধ্যবর্তী স্থানে আ'দী বিন কা'বের ঘর ছিল। পরে তিনি ও তাঁর লোকজন সেখান থেকে আরো দূরে সরে যান।

সাফা থেকে দক্ষিণ দিকে বাবে আজইয়াদ হয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, সেখানে বনি আ'য়েজ গোত্রের ছায়াদার বিশ্রামাগার এবং কাপড় বিক্রির বাজার ছিল। এর কাছেই, নবুওয়াতের আগে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অংশীদার সায়েব বিন সায়েব এর সাথে মিলে যে ব্যবসা করেন সেজন্য একটি ঘর নিয়েছিলেন।

এবার বাবুল আজইয়াদ থেকে সামনের দিকে মুখ করে কা'বা শরীফকে পেছনে রেখে দাঁড়ালে দু'টো সরু সমতল ভূমি পাওয়া যাবে। এর একটি চলে গেছে হাতের ডান দিকে। আজকাল সেটির নাম হচ্ছে বীরে বালীলা। এটাকে اجياد كبير 'বড় আজইয়াদ' ও বলা হয়। অন্যটি চলে গেছে হাতের বাম দিকে। সেটির বর্তমান নাম হচ্ছে আস্-সাদ। এটাকে তারা 'ছোট আজইয়াদ'ও বলত।

বনু তামীম গোত্র, বাবে আজইয়াদ বরাবর কা'বা শরীফের অঙ্গনের আগ পর্যন্ত এই জায়গায় বাস করত। অপর দিকে, বনি মাখযুম গোত্র বড় আজইয়াদের প্রবেশমুখে বাস করত। তাদের পেছনে বাস করত আয্দ গোত্রের একটি দল। এদের পেছনে, অদূরেই ছিল আবু জাহল বিন হিশামের ঘর।

ছোট আজইয়াদে আ'দী বিন আবদ শামস গোত্রের লোকেরা বাস করত। সেখানে আবদুল্লাহ বিন জুদআনেরও ঘর ছিল। আর ঐ ঘরেই প্রখ্যাত সমাজকল্যাণ সংস্থা حلفُ الفُضُولُ "হিলফুল ফুজুল" অবস্থিত ছিল। এই ঘরেই, বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে মক্কায় কোন জালেমকে বরদাশত না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। নবী করীম (সা) এর নবুওয়াতের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে।

আজইয়াদ ছেড়ে প্রধান সড়ক ধরে দক্ষিণে মেসফালার দিকে রওনা হলে, بَابُ الوَدَاع বাবুল বিদা'র কাছে ছিল হাযওয়ারা বাজার। এই বাজার থেকে মাতাফের সীমানা পর্যন্ত গম ও আটার বাজার ছিল। ঐ দিকেই সাঈফী গোত্রের লোকেরা বাস করত এবং আবদুদ্ দার পরিবারও সেখানে বাস করত। বনি মাখযুম গোত্রের একটি দলও সেখানে বাস করত।

সেই সময় শোবায়কা, হাররাতুল বাব কিংবা জারওয়ালে অল্প কিছু লোক বাস করত। জারওয়ালের পেছনের দিক যা মেসফালার সাথে মিশে গেছে, সেখানেও কিছু লোক বাস করত। পরবর্তীতে জাবালে উমরে লোকজনের বাস শুরু হয়। যদি আগে সেখানে অন্য কোন লোক বাস করত তাহলে, সেই গোত্রের নামানুসারেই পাহাড়টির নামকরণ করা হত। হযরত উমরের নামের সাথে পাহাড়টির নামকরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই পাহাড়ে হযরত উমরের সময় থেকেই বসবাস শুরু হয়েছে।

সানীয়ায়ও কোন লোক বসতি ছিল না। এর অপর নাম ছিল حزنة 'হাযনা' এবং বর্তমান নাম হচ্ছে হাফায়ের। এর পেছনের দিক জারওয়ালের পেছনের দিকের সাথে সম্পৃক্ত। হাফায়ের حفر 'হাফর' থেকে এসেছে। এর অর্থ হল খনন করা। এইটি চার পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি নীচু স্থান। কোরাইশদের আমলে, শোবায়কা থেকে জারওয়ালের পেছনের দিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে হাফায়েরের উপর দিয়ে পাহাড় কেটে পথচারীদের রাস্তা তৈরী করা হয়নি। বরং আব্বাসী আমলের খালেদ বারমকীর শাসনকালে এই রাস্তাটি বের করা হয়। তিনি জারওয়ালের পশ্চাতে একটি বাগান লাগিয়েছিলেন। সেই বাগানের সাথে সংক্ষিপ্ত যোগাযোগের জন্য এই রাস্তাটি পাহাড় কেটে বা খনন করে বের করেন। মেসফালার পেছনের দিকে মক্কার নিম্নভূমির শুরু। কিন্তু সেখানে তখন কোন লোক বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে নগণ্যসংখ্যক লোকের বাসকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মক্কার উপকণ্ঠে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত কিছু লোক বসতি ছিল।

জাহেলিয়াতের যুগে আকহাওয়ানায় লোক বসতি ছিল। সেখানে বাগান ও বিশ্রামগারায় ছিল। মক্কার বিভিন্ন জায়গায় অবসর বিনোদনের জন্য বাগান ও পার্কের ব্যবস্থা ছিল। মেসফালার কাছে, বড় জিয়াদ হয়ে, শেবে ঘামে অনুরূপ একটি বিনোদাগার ছিল। এ ছাড়াও মায়াবদাহ, হুজুন এবং শুহাদাহসহ বিভিন্ন জায়গায় খেজুর বাগান ছিল। সেগুলোর পার্শ্বে হাল্কা লোক বসতি ছিল তবে হারাম শরীফের পার্শ্বে, এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে, লোকবসতি ঘন ছিল।

কোরাইশ আমলে মক্কার ধর্মীয় দিক

কুসাই বিন কিলাবের সময় থেকেই মক্কায় মূর্তিপূজা চালু হয়। খোজাআ' গোত্রের শাসক আমর বিন লুহাই সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে অবস্থিত দুটো মূর্তির পূজা করার আদেশ দেন। কুসাইর আমলে মূর্তি দুটোকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। একটিকে কা'বা শরীফের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং অপরটিকে যমযম কূপের কাছে রাখা হয়। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা মূর্তি দুটোর কাছে পশু জবেহ করত এবং সেগুলোর গায়ে হাত লাগিয়ে কল্যাণ কামনা করত। পরবর্তীতে মূর্তিপূজা

চরম রূপ ধারণ করে। এমনকি মক্কাবাসীরা মূর্তির চতুর্দিকে তওয়াফ শুরু করে। বেদুঈনরা মূর্তি কিনে ঘরে নিয়ে যেত এবং তার পূজা করত। কোরাইশদের এমন কোন ঘর বাকী ছিল না, যেখানে কমপক্ষে একটি মূর্তি ছিল না। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং ঘরে প্রবেশের সময় তারা এর গায়ে হাত মুছে বরকত হাসিলের চেষ্টা করত। তাছাড়া কাবা শরীফের ভেতরে তাদের ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত কা'বা শরীফে ঐ মূর্তিগুলো মওজুদ ছিল। জাহেলিয়াতের প্রসিদ্ধ মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা ছিল হোবল। এটি কা'বা শরীফের মাঝামাঝি স্থানে ছিল। তায়েফের পথে নাখলা শামীয়া উপত্যকায় ছিল ওজ্জা নামক দেবতা। তায়েফে ছিল লাত নামক মূর্তি। সেটি ছিল মসজিদে ইবনে আব্বাসের কাছে 'মাগিবুস শামছ' নামক জায়গায়। লোহিত সাগরের তীরে, কাদীদ নামক স্থানে ছিল 'মানাত' নামক আরেকটি প্রসিদ্ধ মূর্তি। এমনকি, জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা কাবা শরীফ তওয়াফ করার সময় বলত ঃ

وَاللاَّتُ وَالْعُزَّى ـ وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ الأُخْرٰى ـ تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلاَ ـ
وَاَنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى ـ

অর্থ ঃ 'লাত, ওজ্জা ও ৩য় দেবতা মানাতের মত মহতী সুন্দরী দেবীর সুফারিশ কবুল হওয়ার আশা করা যায়।'

হোজাইল গোত্রের سُوَاعٌ 'সূয়া' নামক একটি মূর্তি ছিল। তারা এটির পূজা করত।

কা'বা শরীফে জাহেলিয়াতের লোকদের অনেকগুলো পাত্র ছিল। কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ হলে কিংবা কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে, তারা সেগুলোতে 'হ্যাঁ, বা না সূচক বাণী লিখে, লটারীর মাধ্যমে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। মূর্তিপ্রীতি তাদের মন মানসিকতায় পুরো বসে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের ধর্মীয় আচরণকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে حَلَّةٌ ও حَمْسٌ 'হাল্লা' ও 'হাম্‌স'। হাল্লা হচ্ছে, হারাম এলাকার বাইরের লোকদের পূজা অর্চনার পদ্ধতি সংক্রান্ত। আর হাম্‌স হচ্ছে, হারাম এলাকার বাসিন্দাদের পূজা-পার্বণ পদ্ধতি সংক্রান্ত। এই দলটি পূজা-পার্বনের ক্ষেত্রে চরমপন্থী বলে পরিচিত ছিল। কানানা, খোজাআ', আউস এবং খাযরাজ

ইত্যাদি গোত্রসমূহ এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোরাইশরা এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী চরমপন্থী ছিল। এমনকি, তাদের কেউ হজ্ব কিংবা উমরাহ করার জন্য ইহরাম পরার পর, শত প্রয়োজন থাকা সত্বেও পুনরায় নিজ ঘরে কিংবা বাগানে ফিরে যাওয়া পছন্দ করত না। তারা পেছনের দিকে ফিরে, নিজের পরিবারের লোকদের প্রতি তার প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়ার আহবান জানাত। ইহরাম পরার পর তারা নিজেদের জন্য ঘি, দুধ, মাখন ও পশমী কাপড় পরিধান হারাম করে নিত।

হজ্জের সময় বহিরাগত হাজীরা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করত। কিন্তু মক্কার লোকেরা হারামের বাসিন্দা হিসেবে এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আরাফায় না গিয়ে নামেরায় অবস্থান করত এবং অন্যদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক রাখত। তারা হারাম এলাকার বাইরের লোকদের জন্য তাদের আহমসী নামক কাপড় ক্রয় করা, ভাড়ায় নেয়া কিংবা ধার নেয়া ব্যতীত কা'বা শরীফের তওয়াফ করার অনুমতি দিত না। ঐ কাপড় সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে, বহিরাগত পুরুষদের জন্য দিনে এবং নারীদের জন্য রাত্রে উলঙ্গ তওয়াফ করার অনুমতি দিত। তারা মসজিদের বাইরে কাপড় খুলে আসত এবং সে কাপড় তাদের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করত না। মক্কার কিছু সংখ্যক যুবক এই সুযোগের সদ্যবহার করত এবং তারা এ জাতীয় উলঙ্গ তওয়াফকারিণী মহিলার অপেক্ষায় থাকত। উলঙ্গ কোন তওয়াফকারিণী নারীকে দেখার পর পছন্দ হলে সেই যুবকটি নিজেও উলঙ্গ হয়ে, ঐ রমণীর সাথে তওয়াফ শুরু করে দিত। শেষ পর্যন্ত তাদের দুইজন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া, জাহেলিয়াতের যুগে অনেক নারী-পুরুষ কাবাশরীফে উলঙ্গ তওয়াফ করত। মহিলারা শুধু নিজের লজ্জাস্থানের উপর একটুকরো কাপড় বেঁধে রাখত। এছাড়াও, কোরাইশরা বহিরাগত লোকদের মক্কায় থাকা অবস্থায় সাথে নিয়ে আসা খাবার খাওয়ার অনুমতি দিত না। এর ফলে, বহিরাগত লোকদের মক্কার মেহমানখানা কিংবা বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাধ্য করা হত।

কোরাইশদের যুবতী মেয়েদেরকে বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়ার পর ভাল করে সাজিয়ে-গুজিয়ে খোলাভাবে মাতাফে নিয়ে আসা হত এবং পরে ঘরে ফিরিয়ে নেয়া হত। বিয়ের আগ পর্যন্ত তাদের ঘরের বাইরে যেতে দেয়া হত না। এরপর যার

সাথে বিয়ে হবে তার ঘর ছাড়া আর কোথাও যাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। যুবতী মেয়েদেরকে হারাম শরীফে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল, পাত্রদের সামনে পাত্রীকে পেশ করা। যেন তারা ভাল করে দেখতে পায় ও পরে বিয়ের পয়গাম পাঠায়। বিশেষ করে কাবা শরীফের পার্শ্বে পাত্রী দেখার মধ্যে অসদুদ্দেশ্য থাকতে পারে না। এটি একটি মহৎ ব্যবস্থা বলে তারা মনে করত।

তাদের তওয়াফের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরনের। তারা তওয়াফের শুরুতে হাজারে আসওয়াদে চুমু খেত। তারপর কা'বা শরীফকে ডানে রেখে তওয়াফ শুরু করত। ৭ চক্কর তওয়াফ শেষে, হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার পর 'নায়লা' মূর্তিতে চুমু খেত। তাদের তওয়াফ ছিল ইসলামের তওয়াফ থেকে ভিন্ন ধরনের। ইসলাম হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার পর, কা'বা শরীফকে বামে রেখে তওয়াফের পদ্ধতি চালু করেছে।

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদেরকে ঘৃণা ও অবমাননার চোখে দেখা হত। এজন্য তারা মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে অসন্তুষ্ট হত এবং তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত। তাদের একজন মন্তব্যও করেছিল যে, دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمُكَرَّمَاتِ 'মেয়েদেরকে দাফন করে দেয়া সম্মানের বিষয়।' অবশ্য তাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এই ধারণার বিরোধী ছিলেন। এদের মধ্যে যায়েদ বিন আমর বিন নোফাইল আল কোরাইশী ৯৬টি মেয়েকে দাফনের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।

কোরাইশরা জুতা পরে কা'বা শরীফে প্রবেশ করত। কিন্তু ওয়ালিদ বিন মুগীরা তাদেরকে জুতা খুলে কা'বা শরীফে প্রবেশ করার নির্দেশ দিল। ঋতুবতী মহিলারা কা'বা শরীফ ও মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করত না। তারা এগুলো থেকে দূরে অবস্থান করত। কেউ নামায পড়তে চাইলে, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ত এবং অবসরমত যতবার ইচ্ছা ততবার রুকু ও সেজদা করত। নামাযের রাকাত সংখ্যা ও রুকু-সেজদার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-কানুন ছিল না।

কোরাইশদের মধ্যে মূর্তিপূজার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মমতও বিস্তার লাভ করেছিল। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে دَهْرِيَةٌ 'দাহরিয়া' বা 'কালবাদ'। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের ধ্বংসের জন্য 'যুগ' বা কালই একান্তভাবে দায়ী। এছাড়া গ্রহ-নক্ষত্র পূজাও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দলের মতে, মানুষের ভালমন্দের ব্যাপারে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবই প্রধানতঃ কার্যকর। তাদের মধ্যে কেউ

কেউ ইহুদী ধর্ম এবং কেউ কেউ খৃস্টান ধর্মের কাছাকাছি মতবাদও পোষণ করত। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ধর্মগুলোর প্রভাবে, কোরাইশদের মধ্যে এই সকল ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ আসমানী কিতাবসমূহের অনুসরণ করেন তাঁরা হচ্ছেন ওয়ারাকা বিন নওফল, যায়েদ বিন আমর বিন নোফাইল, উমাইয়া বিন আলত, উমাইয়া বিন আওফ আল কানানী এবং হাশেম বিন আবদ মনাফ প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেন, এগুলো বর্জন করার জন্য লোকদের উপদেশ দেন এবং তারা পরকালের উত্থান ও বেহেশত-দোযখের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতেন।[৩]

ব্যবসা-বাণিজ্য

জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। মক্কায় কাপড় ও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা জমজমাট ছিল। মক্কার দক্ষিণ ও উত্তরে অবস্থিত দেশসমূহের বাণিজ্যিক বিনিময়ের জন্য মক্কা ছিল বিরাট স্ট্রাটেজিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ব্যবসায়ীরা উত্তরে সিরিয়া ও দক্ষিণে ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য মক্কায় এসে ভিড় জমাত। অপরদিকে ইয়েমেন হয়ে আফ্রিকান দ্রব্য ও মালামাল আমদানি হত বিশেষ করে মক্কায় আফ্রিকার নিগ্রো দাস, আঠা এবং হাতীর দাঁত সহ বিভিন্ন দ্রব্যাদির বিরাট চাহিদা ছিল। মক্কার ব্যবসায়ীরা ইয়েমেনের চামড়া, সুগন্ধজাত দ্রব্য ও প্রখ্যাত ইয়েমেনী কাপড় ক্রয় করত। অপরদিকে তারা ইরাক হতে ভারতীয় মশলা সংগ্রহ করত। মিসর ও সিরিয়া থেকে তেল, আটা, অস্ত্র, সিল্ক ও মদ আমদানী করত। এভাবে মক্কা বিরাট বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং কোরাইশরাও বড় ধরনের ব্যবসায়ীতে পরিণত হল। ব্যবসা বাণিজ্যে তারা বড় অভিজ্ঞ হয়ে উঠল এবং তাদের ব্যবসার পুঁজি অনেক বেড়ে গেল। হিজরী ২য় সালে বদর যুদ্ধের সময় তাদের ব্যবসায়ী কাফেলার মূলধন ৫০ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও এক হাজার উট পর্যন্ত পৌঁছুল। এক সময় আড়াই হাজার উট ব্যবসায়ী কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তদানীন্তন সময়ে ঐ পরিমাণ উট ও ব্যবসার মূলধন বিরাট ব্যাপার ছিল। এর ফলে, কোরাইশরা ধনী হয়ে গেল। এই জন্যই তারা বদর যুদ্ধের প্রতিটি কাফের যুদ্ধবন্দীকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে ১ হাজার হতে ৪ হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত করতে পেরেছে। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) যাদেরকে মাফ করে

দিয়েছিলেন, তাদের কথা ভিন্ন।[৪]

তদানীন্তন সময়ে মক্কা আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় বাজার হিসেবে গড়ে উঠে। যে কোন দেশের ব্যবসায়ীরা যত বেশী পরিমাণ সম্পদই ক্রয় করতে চাইতো মক্কার ব্যবসায়ীরা তাদের সাথে আধুনিক যুগের ব্যাংকের মত লেনদেনের কাজ করত। তারা অনেক বেশী সুদ দাবী করত। এর ফলে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আরো বৃদ্ধি পেল। কোরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ সূরা কোরাইশে বলেছেন,

لِايْلٰفِ قُرَيْشٍ ـ الٖفِهِمْ رِحْلَةَالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ج فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ـ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

অর্থ ঃ 'যেহেতু কোরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে শীতকাল ও গরম কালের বিদেশযাত্রায়, কাজেই তাদের কর্তব্য হল এই কাবাঘরের প্রতিপালকের এবাদত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খাদ্য যুগিয়েছেন এবং ভয় ভীতি হতে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন।' এই সূরায় কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেছেন, তাদেরকে আমি এই যে বিরাট নেয়ামত দান করেছি, শুকরিয়া স্বরূপ তাদের উচিত হল মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আমার এবাদত করা।

কোরাইশদের সাহিত্য চর্চা

আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময় কোরাইশ ও আরব উপদ্বীপের অন্যান্য গোত্রগুলোর মধ্যে আরবী সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়। সে সময় আরবী সাহিত্যের মান সবচাইতে বেশী উন্নত ছিল। জাহেলিয়াতের আরবী সাহিত্য আজকের এ যুগেও সাহিত্য পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। সে সময় আরবী কাব্যের চর্চা বেশী হত। এগুলো লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হত। তবে আরবদের স্মরণ শক্তি বেশী ছিল। কোন কিছু লিখে না রাখলেও তারা অনেক কিছু মুখস্থ বলতে পারত। তারা বিভিন্ন গোত্রের গর্ব, অহংকার ও প্রশংসার উপরে শত শত কবিতা লিখত। বিভিন্ন গোত্র এ উদ্দেশ্যে কবি তৈরি করত ও তাদেরকে যথেষ্ট সম্মান দিত। কেননা তাদের

মাধ্যমেই এক গোত্র আরেক গোত্রের উপর প্রাধান্য ও সম্মান পেত। যেই বংশের কবি যত শ্রেষ্ঠ সেই বংশের মর্যাদা তত বেশী। এজন্য জাহেলিয়াতের অনেক আরবী কবির নাম ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

কবিতা চর্চা তথা কবিতা প্রতিযোগিতার প্রধান স্থান ছিল বিভিন্ন মৌসুমী বাজার ও মেলাসমূহ। এর মধ্যে ওকাজ বাজার ছিল সবচাইতে সেরা। বর্তমান যুগে সেই ওকাজ বাজারের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ (নগর অভিধান) এর লেখক এ প্রসংগে যা উল্লেখ করেছেন তাই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, ওকাজ এমন এক উপত্যকায় অবস্থিত যেখান থেকে তায়েফের দূরত্ব এক রাতের এবং মক্কার দূরত্ব তিন রাতের। সেখানে বড় বড় কিছু পাথর ছিল। তারা সেগুলোর তওয়াফ করত। এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে ذَاتُ الْقَرْنِ 'জাতুল কারন্'ই ঐ জায়গা বলে মনে হয়। এর বর্তমান নাম হচ্ছে سَيْلُ الْكَبِيْرِ (সায়লুল কবীর)। এটি পুরাতন তায়েফ রোডে অবস্থিত। এটি হাজীদের মীকাতও বটে। সেখান থেকে তায়েফের দূরত্ব কম এবং মক্কার দূরত্ব তায়েফের দূরত্বের তিনগুণ। সেখানে এখন পর্যন্ত কতগুলো বড় বড় পাথর রয়েছে। এটি একটি বড় উপত্যকা। আরব কাফেলাসমূহের বেশী সংকুলানের জন্য এটাই ছিল উপযোগী স্থান। দ্বিতীয় স্থানটি ছিল মাজান্না বাজার। বর্তমান মক্কা ও জেদ্দার মাঝখানে অবস্থিত বাহরাহ শহরটিই পূর্বের মাজান্না বাজার বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত। এটি মক্কার নিকটে অবস্থিত। ৩য় স্থানটি জুল মাজায। এটি আরাফাত থেকে উত্তর দিকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মক্কা থেকে হোনায়েন হয়ে তায়েফ যাওয়ার সময় হাতের ডানে পড়ে। সেখানে এখন পর্যন্ত সেই যুগের অনেক নির্দশন বিদ্যমান রয়েছে।

আরবের বিভিন্ন জায়গা থেকে জিলকদ মাসের শেষ ১০ তারিখে কাফেলাগুলো ওকাজ বাজারে এসে জড় হত। ওকাজ বাজারের মেলা শেষে তারা 'জুল মাজান্না' বাজারের মেলায় যোগ দিত। হজ্জ মওসুমের সর্বশেষ মেলা ছিল 'জুল মাজাযে'। জিলহজ্জ হাসের ৮ তারিখে সেখানে মেলা বসত। পরে তারা মক্কা, মিনা ও দাওমাতুল জানদালের বাজারে যেত। কিন্তু ওকাজের মত আর কোন মেলায় এত বেশী সাহিত্য চর্চা জমে উঠতনা। এটিই ছিল সাহিত্য চর্চার সেরা মেলা।[৫]

আল্লামা তকিউদ্দীন আলফাসী তাঁর شفاء الغرام 'শেফাউল গারাম' বইতে লিখেছেন যে, হিজরী ১২৯ সাল পর্যন্ত ওকাজ মেলা চালু ছিল। ১২৯ হিঃ সনে মক্কায় মোখতারের বিপ্লবের কারণে আরবরা ভয়ে ওকাজ বাজার ত্যাগ করে, যা আজ পর্যন্ত আর কোনদিন জমে উঠেনি। ক্রমান্বয়ে তারা মাজান্না ও জুলমাজায বাজারের মেলাও ত্যাগ করে এবং পরবর্তীতে শুধু মক্কা, মিনা ও আরাফাতের বাজারে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে।

কোরাইশদের বিজ্ঞান চর্চা

কোরাইশরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করত। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে লোকেরা যেত এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করত। আবহাওয়া বিজ্ঞানেও তাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। বিভিন্ন উপত্যকায় তারা বৃষ্টির স্থান নির্ধারণ করতে পারত এবং সাথে সাথে বাতাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণেও তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। লোহিত সাগরে নৌঅভিযানে তাদের সার্থক অভিজ্ঞতা ছিল। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সাহায্যে তারা নিজেদের বন্দর থেকে সামুদ্রিক পথে দূরবর্তী বন্দরসমূহে সফর করত। লোহিত সাগর থেকে তারা সুদূর ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তারা পিছিয়ে ছিল না। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের ভাল ধারণা ছিল। একই সাথে তারা বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার উপকারিতা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিল। তারা শিঙ্গা লাগানোসহ বিভিন্ন সার্জারী পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করত। এই সমস্ত বিষয়ে বড় বড় হেকিম ছিল। তাদের মধ্যে হারেস বিন কালদাহ আসসাকাফি ছিলেন অন্যতম হেকিম। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ঐ সময় পর্যন্ত অন্যান্য চিকিৎসকরা তাঁকে গুরুর মর্যাদা দিত। এখন পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকার বেদুঈনরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে ঐ প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে বিভিন্ন গাছ গাছড়ার তৈরি ওষুধ, শিঙ্গা ও দাগ লাগানোর পদ্ধতি ব্যবহার করে।

তারা আল কিয়াফাহ বা 'পদচিহ্ন বিজ্ঞানে' অদ্বিতীয় ছিল। ভেগে যাওয়া মানুষ ও পশুর পদচিহ্ন দেখে, অন্যান্য অগণিত চিহ্নগুলোর মধ্য থেকে তারা সঠিকভাবে সেগুলোর গন্তব্যস্থান বের করতে সক্ষম হত। দুই হাজার বছর পর আজ পর্যন্তও

ঐ জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা পড়ানো হচ্ছে। এই একই বিজ্ঞানের মাধ্যমে তারা মরুভূমিতে পানির অস্তিত্ব বুঝতে পারত এবং কূপ খুঁড়ে পানি আবিষ্কার করে সেখানে বাস করত। মক্কার বিভিন্ন জায়গায় তখন তারা অগণিত কূপ খনন করে পানি বের করেছিল।

তারা كَهَانَةٌ কাহানা' ও عِيَافَةٌ 'এয়াফাহ' বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিল। তারা গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকার প্রভাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা অতীতের কোন অজানা খবর বলত। সাধারণ মানুষ ঐ সকল গণকদের দ্বারা অনেক প্রতারিত হয়েছে। ইসলাম এসে এগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে। কোরাইশরা বংশ জ্ঞানের ব্যাপারে বিশেষ স্মরণশক্তির দাবীদার, তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রের পুরো বংশ তালিকা স্মরণ রাখতে পারত। এ ছাড়াও বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে ভ্রমণের কাহিনী বংশ পরম্পরায় চলে আসত। পরবর্তীতে ঐ সকল বর্ণনা ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করে। তারা ঘোড়-দৌড় এবং শরীর চর্চা বিজ্ঞানেও যথেষ্ট অগ্রসর ছিল।[৬]

কোরাইশদের গান-বাজনা

পারস্য ও রোমের পরে, গান-বাজনার ক্ষেত্রে আরবরাই ছিল সবার আগে। এক্ষেত্রে কোরাইশরা আরবদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় মক্কার ঘরে ঘরে নর্তকী ছিল। মহিলাদের কোন পর্দা ছিল না। বরং তারা জাহেলিয়াতের রং-ঢং ও সাজগোজে প্রকাশ্যে বের হত। জাহেলিয়াতের মত সেজেগুজে প্রকাশ্যে বের না হওয়ার জন্য আল্লাহ কুরআনে মুসলিম মহিলাদেরকে নির্দেশ করেছেন। যাই হোক, ঐ সকল মহিলা পুরুষদের সাথে আনন্দ অনুষ্ঠানে খোলামেলা যোগ দিত এবং ঢোল ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইত। বিয়ের রাত্রে সেই গান বাজনার আর কোন শেষ ছিল না। তাদের মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত نَصْبْ নামক ধর্মীয় গানের বহুল প্রচার ছিল। আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে কোরাইশদের ফিরে আসার উপদেশ পাঠালে এর জবাবে আবু জাহল বলেছিল, 'আল্লাহর শপথ, আমরা বদর প্রান্তর না দেখে ফিরব না, যুদ্ধের পর আমরা সেখানে ৩ দিন অবস্থান করবো, উট জবেহ করবো, খানা-পিনা, মদ, গান বাজনা ও নর্তকীর নাচ দেখবো এতে গোটা আরবে আমাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।' এই উক্তি দ্বারাও সেই সমাজে গান-বাজনা ও নাচের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে।

তাফসীরে কাশশাফে مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরানোর জন্য যে গান কিনে আনে।' (লোকমান ঃ ৬)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, নাদর বিন হারেস নতুন মুসলমানদেরকে তার ঘরে ডাকতেন এবং ঘরের একজন গায়িকাকে হুকুম দিতেন, সে যেন নও মুসলিমকে খাদ্য-পানীয় ও গান দ্বারা আপ্যায়িত করে। তার বিশ্বাস, এর ফলে নও মুসলিম ব্যক্তি নবীর দাওয়াত ভুলে যাবে এবং ইসলাম ত্যাগ করবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে ঘরে বেশ কিছু গায়িকা পালন করতেন।

মূলকথা, কোরাইশদের ঘর-মজলিশ, পার্ক, বিশ্রামাগার এবং ধনীদের বাড়ীতে নর্তকী ও গায়িকার ব্যাপক পদচারণা ছিল।

আবরাহার কা'বা ধ্বংস অভিযান

রাসূলুল্লাহ (সা) এর যে বছর জন্ম হয় সে বছর মহরম মাসে আবরাহার হস্তিবাহিনী কাবা আক্রমণ করতে এসে ধ্বংস হয়। আর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন রবিউল আউয়াল মাসে। রাসূলুল্লাহ (সা) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, হাতী বাহিনীর ঘটনার ৫০ দিন পর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। তখন মক্কার সরদার ছিলেন আবদুল মুত্তালিব।

আবরাহা শব্দটি সুরিয়ানী আব্রাহাম শব্দের হাবশী উচ্চারণ হতে পারে। ইয়েমেনে আবরাহার ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর সে দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ শুরু করে। তখন পৃথিবীতে দুটো বৃহৎ শক্তি ছিল। রোমান ও পারস্য শক্তি। রোমান সম্রাট খৃষ্টান সাম্রাজ্যের অধিকারী। হাবসা (ইথিওপিয়া) হচ্ছে রোমান সম্রাটের মিত্র শক্তি আর ইয়েমেন হচ্ছে হাবশার খৃষ্টান সরকারের প্রভাবিত দেশ। আবরাহার লক্ষ্য ছিল আরবদেশে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করা এবং আরবদের প্রাচ্যদেশসহ অন্যান্য দেশে পরিচালিত বাণিজ্য করায়ত্ত করা।

খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আবরাহা ইয়েমেনের রাজধানী সানআয় একটি গীর্জা তৈরি করে। এর নাম হচ্ছে কুলাইস গীর্জা। মুহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, গীর্জা তৈরির পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে, আমি কা'বা হতে আরবদের হজ্জকে এই গীর্জায় অবশ্যই স্থানান্তরিত করব। ইয়েমেনে একথা প্রচার করে দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল, কোন আরব একথা শুনে রাগ করে কিছু করে বসলে তা মক্কা আক্রমণের সরাসরি কারণ ও অজুহাত হয়ে দাঁড়াবে। ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, এই ঘোষণায় রাগান্বিত হয়ে– কানানা গোত্রের একজন আরব গীর্জায় পেশাব-পায়খানা করে দেয়। মুকাতিল বিন সুলায়মানের মতে কয়েকজন আরব রাগান্বিত হয়ে গীর্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার রেশ ধরে বাদশা আবরাহা মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৫৭০ খৃষ্টাব্দে, আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য এবং ১৩টি বা ৯টি হাতী সহকারে কাবা ধ্বংসের অভিযানে রওয়ানা করে। পথে তায়েফসহ কয়েক জায়গায় যুদ্ধের মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে অগ্রসর হয়। মুগাম্মাছে আসার পর তার অগ্রবাহিনীকে পাঠিয়ে দেয় এবং কোরাইশদের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে খবর দেয় যে,

কোরাইশরা আলোচনার প্রয়োজন বোধ করলে তা করতে পারে। আবদুল মুত্তালিব গিয়ে আবরাহার সাথে দেখা করেন এবং তার বাহিনী কর্তৃক অপহৃত নিজের উটগুলো ফেরত চান। আবরাহা এতে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনি তো শুধু আপনার লুন্ঠকৃত উট ফেরত চাইলেন কিন্তু কাবা সম্পর্কে কিছুই বললেন না। উত্তরে আবদুল মুত্তালিব বলেন, এই ঘরের একজন রব আছেন। তিনিই ঘরটিকে রক্ষা করবেন। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নেই। ইবনে ইসহাক এই বর্ণনা দেন। অপর দিকে ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আবদুল মুত্তালিবের উটের দাবীর কোন কথা উল্লেখ নেই। তিনি বলেন, আবরাহা যখন আরাফার অদূরে সিফাহ নামক স্থানে অবস্থান করেন তখন আবদুল মুত্তালিব তার কাছে হাজির হয়ে বলেন, আপনার এই পর্যন্ত আসার কি দরকার ছিল? কোন কিছু দরকার হলে খবর দিলে আমরাই পাঠিয়ে দিতাম। আবরাহা বলল, আমি কাবাকে ধ্বংস করার জন্য এসেছি। তখন আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত এই ঘরের উপর তিনি কাউকে চড়াও হতে দেননি। তাই আপনিও কোনকিছু চাইলে তা নিয়ে ফেরত যান। কিন্তু আবরাহা তাতে রাজী না হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে তার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়।

উভয় বর্ণনার মাধ্যমে একটি সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, মক্কার লোকেরা আবরাহা বাদশাহর বাহিনীকে বাধা দেয়নি এবং কোন প্রতিরোধও গড়ে তোলেনি। আর এদের পক্ষে আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের এত বড় বাহিনীর মোকাবিলা করাও সম্ভব ছিল না। আহযাবের যুদ্ধে তারা ইহুদীদেরকে সহ সকল শক্তি সামর্থ যোগাড় করার পর মাত্র ১০/১২ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য তখন আবরাহার হস্তিবাহিনীর ঘটনার পর ৫৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাহলে, ৫৭ বছর আগে তারা এতবড় আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যসামন্ত পাবে কোথায়?

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আরো এসেছে যে, আবদুল মুত্তালিব অন্যান্য কোরাইশ নেতাদেরকে নিয়ে কাবা শরীফে উপস্থিত হন এবং কাবার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে এই ঘর রক্ষার দোয়া করেন। তখন কাবায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু তারা ঐ মূর্তিদের কাছে এই ঘর কাবা রক্ষার কোন আবেদন জানায়নি। তারা জানত যে, ঐগুলোর কোন ক্ষমতা নেই তা সত্ত্বেও অযথা সেগুলোর পূজা করত। আল্লাহর কাছে ঐ সকল দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সাথীরা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

এদিকে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য যে হাতীর উপর সওয়ার ছিল তা সবার আগে চলছিল। হাতীগুলো হঠাৎ করে মুহাসসির উপত্যকায় বসে পড়ল। হাতীগুলোকে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে করতে আহত করা হল। তারা একবিন্দুও কাবার উদ্দেশ্যে সামনের দিকে এগুতে চায় না। কিন্তু যখন তাদেরকে বাকী তিনদিকে চালানোর চেষ্টা করা হয় তখন তারা দৌড়াতে থাকে। মক্কার দিকে এক কদমও অগ্রসর হয় না।

ইতিমধ্যেই দেখতে না দেখতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ঠোঁট ও পাঞ্জায় করে পাথর টুকরো নিয়ে উড়ে এল এবং আবরাহা বাহিনীর উপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। যার উপরই এই পাথরকুচি পড়ত তার শরীর গলে যেত। ইবনে ইসহাক এবং ইকরামার মতে, পাথরকুচির স্পর্শ লাগলেই শরীরে বসন্ত রোগ দেখা দিত। ফলে গোটা আরব দেশে ঐ বছরেই প্রথম বসন্তের ব্যাপক প্রকোপ দেখা দেয়। ইবনে আব্বাসের মতে পাথরকুচি যার উপরই পড়ত তার শরীরে ভয়াবহ চুলকানী শুরু হত, চামড়া ফেটে যেত এবং মাংস ঝরে পড়ত। স্বয়ং আবরাহারই এই অবস্থা দেখা দিল। তার শরীরের রক্ত মাংস ঝরে পড়া শুরু হল। যেখানেই একটি পাথরকুচি পড়ত সেখান থেকেই পুঁজ ও রক্ত বের হত। এরকম ভয়াবহ অবস্থা থেকে তারা ইয়েমেনের দিকে ছুটে পালাতে লাগল এবং পথে পথে মরে পড়ে থাকল। আতা বিন ইয়াসার বলেছেন, তার সব লোক এক সাথে মারা যায়নি।

আবরাহার একজন মন্ত্রী এই ঘটনা বর্ণনা করার জন্য হাবশায় বাদশাহর দরবারে গেল এবং তার মাথার উপর একটি পাখীও উড়ছিল। সে যখন হাবশার বাদশাহর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা শেষ করল, তখন পাখিটি তার উপর একই পাথরকুচি বর্ষণ করল এবং সে সেখানেই মারা গেল যা হাবশার বাদশাহ স্বচক্ষে দেখেন।[৭]

আল্লাহ তাঁর কুদরত দিয়ে কাবা শরীফকে রক্ষা করেন এবং আবরাহা বাহিনীকে পরাজিত করেন। যে পাখীগুলো ঐ অভিযানে অংশগ্রহণ করে সেগুলো লোহিত সাগরের দিক থেকে এসেছিল। সাঈদ বিন যোবায়ের বলেন, এ ধরনের পাখী আগেও দেখা যায়নি এবং পরেও আর কখনও দেখা যায়নি। ইবনে আব্বাস বলেন, পাখীগুলোর ঠোঁট পাখীর মতই ছিল কিন্তু তাদের পাঞ্জা ছিল কুকুরের মত। প্রত্যেকটা পাখীর ঠোঁটে একটি এবং পাঞ্জায় দুটো করে পাথর কুচি ছিল। মক্কার

কোন কোন লোকের কাছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐ পাথরকুচির নমুনা সংরক্ষিত ছিল। পাথরগুলো মটরশুঁটির দানার মত এবং কালচে লাল ছিল। ইবনে মারদুইয়ার মতে, ঐগুলো ছাগলের লাদের সমান ছিল। এই সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল পাথরকুচি একই সমান ছিল না। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড় ছিল।

কারুর মতে সেই পাখিগুলো ছিল আবাবিল। সেগুলো আকারে খুবই ছোট। অন্যদের মতে, আবাবীল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। অগণিত ছোট পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আবরাহার বাহিনীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। যাই হোক, আবরাহা বাহিনী পর্যুদস্ত হওয়ার পর কোরাইশরা তাদের অর্থ-সম্পদ, পশু, হাতিয়ার, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে। আবদুল মুত্তালিব আবরাহা বাহিনীর সম্পদ ও সোনা লাভ করে পরবর্তীতে ধনী হয়ে গেলেন।[৮]

আল্লাহ্ আবরাহা বাহিনীকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হননি। তারপর তিন-চার বছরের মধ্যে ইয়েমেনের বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং ইয়েমেনের উপর হাবশার শাসন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি খতম হয়ে গেল। হস্তি বাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ইয়েমেনে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা শেষ হয়ে গেল। ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, সাইফ বিন যি-ইয়াজান নামক একজন ইয়েমেনী সরদার পারস্য সম্রাটের সাহায্য চাওয়ায় মাত্র ১ হাজার পারসীয় সৈন্য ৬টি জাহাজে চেপে ইয়েমেনে আসে এবং সেখান থেকে হাবশী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।[৯]

এই ঘটনাটিই আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা ফীলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۙ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۔

অর্থ ঃ 'তুমি কি দেখনি তোমার আল্লাহ হস্তিবাহিনীর সাথে কি করেছেন? তিনি কি তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে পুরো নিষ্ফল করে দেননি? তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়ে দিলেন যা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। ফলে তাদের অবস্থা এমন করে দিল যেমন জন্তু জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূষি।'

আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতার রূপ

হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ পুত্র, ইসমাইল (আ) সহ কাবা নির্মাণ করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকেন। পরে তার বংশধরগণ কিছুদিন ইসলামের পথে চলেছে। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা তাদের নবীদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে গিয়ে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা কম-বেশী দু'হাজার বৎসর পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে আরবদেশে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) এর দোয়া কবুল হল এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এসে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন। ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ .

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ এই জাতির মধ্য থেকেই একজন নবী পাঠাও, যিনি তাদেরকে তোমার বাণী শোনাবে, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে এবং তাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করবে।' (আল বাকারা ১২৯)। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর নবুওত হযরত ইবরাহীম (আ) এর দোয়ারই ফসল। এখন আসুন, আমরা জাহেলিয়াতের বর্বর আচরণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি।

আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্বের প্রচারের জন্য যে কাবাঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই কাবার ভেতরই শত শত মূর্তি ও দেবতা ঢুকানো হল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভেতর থেকে ৩৬০টি মূর্তি সরান। দুর্বৃত্তরা স্বয়ং হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাইল (আ) এর মূর্তি তৈরি করে তা কাবার ভেতর রেখে দেয়। এ ছাড়াও তাতে লাত, মানাত, ওজ্জার ২য় সংস্করণ, আসাফ, নায়েলা, হোবল, নসর, ইয়াগুসসহ অসংখ্য মূর্তি ছিল। প্রতিমা পূজা এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, পাথর না পেলে, পানি ও মাটি মিশিয়ে একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করে এর উপর ছাগলের দুধ ছিটিয়ে দিলেই তাদের মতে সেই নিষ্প্রাণ পিণ্ডটি উপাস্য হয়ে যেত এবং তারা এরই পূজা করত।[১০]

সাইয়েদ কুতুব উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক গোত্রের একটি করে মূর্তি ছিল। এমনকি প্রত্যেক শহর ও লোকালয়ের পৃথক পৃথক মূর্তি ছিল।

আলকিন্দি লিখেছেন, মক্কার প্রত্যেক ঘরে একটি করে মূর্তি ছিল। মক্কার কোন লোক সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তার সর্বশেষ কাজ ছিল পারিবারিক মূর্তির সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাকে প্রণাম জানানো। সফর থেকে ফিরে আসার পরও প্রথম কাজটি ছিল ঘরের মূর্তিটিকে প্রণাম করা।

মূর্তি সংগ্রহ করা এবং এদেরকে রাখার জন্য মন্দির তৈরি করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল। যারা অনুরূপ পাথর বা মূর্তি সংগ্রহ করতে পারত না তারা কাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তির প্রণাম করত। ঐ সকল মূর্তি বা পাথরগুলোকে 'আনসাব' বলা হত।

বুখারী শরীফে আবু রাজোয়া আল-আতারিদী থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আমরা পাথরপূজা করতাম। যখন আমরা নতুন ভাল পাথর পেতাম তখন পুরাতন পাথরটি ফেলে দিতাম। কোন পাথর না পেলে আমরা মাটির মূর্তি তৈরি করে তার উপর ছাগলের দুধ ছিটিয়ে দিতাম।' যখন কোন পর্যটক কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করত, তখন সে চারটি পাথর সংগ্রহ করত। সে এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টটির পূজা করত এবং বাকী তিনটা দিয়ে চুলা তৈরি করে এর উপর খাবার পাকাত।

যে মূর্তিপূজা ও ঠাকুরবাদের ব্যাপারে তাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) গোটা ইরাকের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন তারা আবার তাই শুরু করে দিল। কা'বা শরীফকে মূর্তিপূজার আড্ডাখানা বানিয়ে তারা ঠাকুর সেজে বসল। তারা ভূত-প্রেত, জ্বীন, ফেরেশতা এবং মৃতপূর্বপুরুষদের আত্মার পূজাও করত। আল-কালবী লিখেছেন যে, খোজাআ গোত্রের বনি মালিক শাখার লোকেরা জ্বীনের পূজা করত। সাঈদ উল্লেখ করেছেন যে, হিমিয়ার গোত্র সূর্য এবং কাইয়ারা গোত্র চাঁদের পূজা করত। বনু কায়েস গোত্র বুধ, শুক্র, শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের পূজা করত।

মক্কায় হজ্জের মওসুমে তিনটি মেলা বসত। সবচাইতে বড় মেলাটি বসত ওকাজ বাজারে। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা যেত, তাদের কবিরা নিজ নিজ গোত্রের খ্যাতি, বীরত্ব, শক্তি, সম্মান ও দানের প্রশংসায় আকাশ বাতাস মুখরিত

করে তুলত এবং গৌরব ও অহংকার প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হত। প্রত্যেক গোত্রের প্রধানরা নিজেদের সুনাম অর্জনের জন্য বড় বড় ডেগ চড়াত এবং উটের পর উট জবাই করে মেলার মানুষদেরকে খাওয়াত। এই অপচয়ের উদ্দেশ্য হল, মেলায় আগত লোকদের মাধ্যমে গোটা আরব দেশে তাদের সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। এই সকল মেলায় নাচ-গান, মদ এবং ব্যভিচারসহ সকল প্রকার নির্লজ্জ কাজ অনুষ্ঠিত হত।[১১]

তারা উলঙ্গ হয়ে কাবার তওয়াফ করত এবং বিকৃত উপায়ে এবাদত করত। তারা কাবার পার্শ্বে হাততালি দিত, বাঁশী বাজাত এবং শিঙ্গায় ফুঁ দিত। তারা সেখানে পশু কোরবানী দিত। কোরবানীর রক্ত কাবার দেয়ালে লেপে দিত এবং গোশত কাবার দরজার সামনে ফেলে রাখত। তাদের মতে, (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ্ এগুলো কবুল করবেন।[১২]

হযরত ইবরাহীম (আ) ৪ মাসের মধ্যে রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু যখন তারা যুদ্ধ করতে চাইত তখন তারা এক বছরের নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল গণ্য করে যুদ্ধ করত এবং পরের বছর এর কাজা আদায় করত।

তারা হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা আয়-রোজগার করাকে নাযায়েজ মনে করত।

তারা হজ্জের সময় পানাহার পর্যন্ত বন্ধ করে দিত। এগুলোকে তারা এবাদত মনে করত। কোন কোন লোক হজ্জে যাত্রা করলে কথাবার্তা বন্ধ করে দিত। এর নাম ছিল হজ্জে 'মুছমেত' বা বোবা হজ্জ।

ইসলামের প্রথম দিকে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরতকারী মুসলিম দলপতি বাদশাহ নাজ্জাসীর দরবারে বলেন, আমরা ছিলাম মূর্খ লোক, আমরা শুধু মূর্তিপূজা করতাম। এমন কোন অন্যায় আচরণ বাকী নেই যা আমরা করিনি। আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং প্রতিবেশীদের অধিকার আদায় করি না। দুর্বলের উপর অত্যাচারকারীকে আমাদের মধ্যে বেশী শক্তিশালী বিবেচনা করা হয়। আমাদের মধ্যে আল্লাহর নবী আসার পূর্ব পর্যন্ত আমরা অন্ধকারে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে এইসব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

যুদ্ধবিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তাদের নিত্যকার সাথী ছিল। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বছরের পর বছর যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ওয়ায়েল, বকর এবং তামীম গোত্রের

মধ্যে যুদ্ধ ৪০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এই যুদ্ধে দুই গোত্র প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। দাহিস এবং আল-গাবরাআর যুদ্ধও অনুরূপ আরেকটি প্রমাণ। কায়েস বিন যুহাইরের দাহিস নামক ঘোড়াটি হোজাইফা বিন বদরের ঘোড়ার সাথে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী থাকায় হোজাইফার পরামর্শক্রমে আসাদ গোত্রের এক বেদুইন সেই অগ্রগামী ঘোড়াটির কপালে আঘাত হানে। ফলে, অন্যান্য ঘোড়াগুলো এই যন্ত্রণাকাতর ঘোড়াটির আগে চলে যায়। তখন একটি শিশুও মারা যায়। ফলে দুই গোত্র নিহত শিশুর প্রতিশোধে মরিয়া হয়ে উঠে। সেই যুদ্ধে বহু সংখ্যক লোক মারা যায়। উটকে পানি খাওয়ানোর বিবাদে আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ১২০ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। কত লোক ঐ যুদ্ধে মারা যায় তার কোন শেষ নেই।

এছাড়াও সর্বত্র বাণিজ্য কাফেলার উপর ডাকাত পড়ে সব লুটপাট করে নিত। সাধারণ কোন যাত্রীর জানমালের নিরাপত্তা ছিল না। কাবার উদ্দেশ্যে আগত লোকদের জানমালেরও কোনও নিরাপত্তা ছিল না। সর্বত্র এক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। সর্বত্র খুনী ও লুটেরাদের দৌরাত্ম্য এবং যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে মানুষ জর্জরিত ছিল। শান্তি শৃংখলা বলতে কিছুই ছিল না।

বিয়ে প্রথা ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও পৈশাচিক। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতে নারী পুরুষের মধ্যে ৪ ধরনের যৌন সম্পর্ক ছিল। ১ম প্রকার সম্পর্ক হচ্ছে, আজকের সমাজের বিয়ের অনুরূপ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মেয়ে কিংবা তার জিম্মায় মওজুদ অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব করত এবং বিয়েতে প্রয়োজনীয় দেনমোহর দিত। ২য় প্রকার সম্পর্ক ছিল, এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মাসিক ঋতু শেষ হওয়ার পর কোন নির্দিষ্ট লোকের নাম ধরে বলত, তার কাছে গিয়ে গর্ভধারণ করে আস। ইশারাকৃত লোকটি থেকে বাহ্যিক গর্ভ প্রকাশের আগে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন থেকে দূরে থাকত। স্ত্রীর পেট বড় হলে, স্বামী ইচ্ছা করলে তার সাথে সহবাস করত। কোন উত্তম রক্তের একটি সন্তান লাভ করার জন্যই সে এই অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণ করত। ৩য় প্রকারের সম্পর্ক ছিল, কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি একজন

মহিলাকে শেয়ারে গ্রহণ করত। এদের প্রত্যেকেই মেয়ে লোকটির সাথে সহবাস করত। সে যদি গর্ভধারণ করত, সন্তান প্রসবের কয়েকদিন পর সে ঐ সকল পুরুষদেরকে ডেকে পাঠাত। তাদের একজনও ঐ মিটিং-এ অনুপস্থিত থাকতে পারত না। মেয়েলোকটি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলত আমার এবং তোমাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাতো কারুর অজানা নয়। সে যাকে ইচ্ছে তাকে সন্তানের বাপ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারত। চিহ্নিত ব্যক্তির তা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

৪র্থ প্রকার সম্পর্ক ছিল, বর্তমান যুগের বেশ্যাবৃত্তির অনুরূপ। বহু সংখ্যক ব্যক্তি একজন মেয়েলোকের কাছে আসত এবং মেয়েলোকটি আগত কোন ব্যক্তিকেই অস্বীকার করতে পারত না। বেশ্যারা নিজেদের ঘরের দরজার সামনে এক ধরনের পতাকা উড়াত। এর দ্বারা তারা কোন ব্যক্তিকে স্বাগত জানায় বলে বুঝাত। বেশ্যাটি কোন সন্তান প্রসব করলে সংশ্লিষ্ট পুরুষরা মিলে মহিলাটিকে চাঁদা দিত এবং সন্তানের পিতা নির্বাচনের জন্য একজন গণকের আশ্রয় নিত। গণকের বক্তব্য অনুযায়ী জারজ সন্তানটির পিতা নির্দিষ্ট হত। ঐ পিতা কিছুতেই সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারত না।

এই বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, আমরা যেমন গাভী, উষ্ট্রী ও ঘোটকীকে ষাঁড় কিংবা পুরুষ উট ও ঘোড়ার কাছে পাঠাই তারাও নিজের স্ত্রীকে অন্য মানুষের কাছে পাঠিয়ে পশুর স্তরে পৌছে গিয়েছিল। যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে বর্ণিত শেষ ৩ প্রকার হচ্ছে মানবতার জন্য বিরাট অবমাননা ও লাঞ্ছনা।

আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর 'ইসলাম এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড' বইতে লিখেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে মহিলারা ছিল সবচাইতে বেশী নির্যাতিত। সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর বড় ছেলে অন্যান্য সম্পত্তির মত, পিতার বিধবা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে উত্তরাধিকার পেত। নারী এবং পুরুষদের খাবারও পৃথক ধরনের ছিল। মহিলাদের অপেক্ষাকৃত খারাপ ও নিম্নমানের খাবার দেয়া হত।

আইয়ামে জাহেলিয়াতে মেয়েশিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। অর্থহীন গর্ব ও অহংকার প্রকাশের কুপ্রথার কারণে মেয়ে শিশুদেরকে হত্যা করে গোত্রে গোত্রে

পুরুষের সংখ্যা বাড়ানোর অপচেষ্টা চলত। হায়সাম বিন আদী বলেন, প্রতি ১০ জনের মধ্যে এক ব্যক্তি জীবন্ত মেয়ে শিশু কবর দেয়ার দায়ে অপরাধী ছিল। কোন কোন সময় দয়ালু গোত্র প্রধানরা মেয়ে-শিশুদের জীবন বাঁচাত। সা'সা' বলেন, ইসলামের কিছু পূর্বে তিনি অর্থের বিনিময়ে ৩ শত মেয়ে-শিশুর প্রাণ রক্ষা করেন। এজন্য তাঁকে বহু অর্থ খরচ করতে হয়েছে।

জাহেলিয়াতের এই করুণ চিত্র মানব ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়। ঠিক এই ঘোর অমানিশার সময়ই আল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ মক্কায় পাঠান। তিনি মানুষকে এই কঠিন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন এবং মানবতার মুক্তিসনদ আল-কুরআন অনুসরণের আহ্বান জানান।

মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম ও ইসলামের আগমন

জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশার সময় উষার আলো জ্বালানোর তাকিদে এবং মানুষের উপর মানুষ ও দেব দেবীর প্রভুত্বকে খতম করে সেই স্থানে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সাবেক আসমানী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে মানবতার মুক্তিদূত ও একমাত্র নেতা হিসেবে মক্কায় পাঠান। তিনি হাতী বাহিনী তথা আবরাহা বাদশাহর কাবা ধ্বংসের অভিযানের বছর ৯ই রবিউল আউয়াল (বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) রোজ সোমবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাপের নাম আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এবং মায়ের নাম আমিনা বিনতে ওহাব। জন্মের আগে বাপ মারা যান। তার প্রতিপালনের ভার পড়ে দাদার উপর। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্মের ৬ষ্ঠ দিবসে কাবার পার্শ্বে ঘুমন্ত অবস্থায় দাদা আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন, নবজাত শিশুর নাম রাখতে হবে মুহাম্মদ। মা আমেনাও একই স্বপ্ন দেখেন। ৭ম দিবসে তার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ বা প্রশংসিত। তার জন্মের সাথে সাথে পারস্য সম্রাটের পূজার আগুন নিভে যায়। ৭ম দিবসেই তাঁকে আরবদের রীতি অনুযায়ী খতনা করানো হয়। মা আমিনার পর সর্বপ্রথম যে ধাত্রী তাকে দুধ পান করান তিনি হচ্ছেন আবু লাহাবের দাসী সাওবিয়া। শহুরে যিন্দেগী থেকে দূরে মরুভূমির তাজা হাওয়ায় সন্তান লালন পালনের রীতি অনুযায়ী, আবদুল মুত্তালিব হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্য হালিমা বিনতে আবি জোয়াইব আল-সাদীয়া নাম্নী এক বেদুইন মহিলাকে দুধ পানের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্ধারণ করেন। গরীব হালিমার বুকে দুধ কম। পেটের জ্বালায় ধাত্রীর কাজ করতে চান। হযরত মুহাম্মদ (সা) কে দুধ পান করানোর সাথে সাথে দুধে বুক ভরে আসে। হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নিয়ে তারা ঘরে ফিরে এলে সবকিছুতে পরিবর্তন ও উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। তাদের ফসল বৃদ্ধি পায়, খেজুর গাছে অনেক বেশী খেজুর ধরে। তাদের উট প্রচুর দুধ দান শুরু করে। বালক মুহাম্মদ তাদের জন্য রহমত ও বরকতের বিরাট উৎস হয়ে দাঁড়ান।[১৩]

বালক মুহাম্মদ অন্যান্য খেলার সাথীদের সাথে মাঠে বকরী– দুম্বা চরান। একসময় দু'জন ফেরেশতা এসে তাঁর বুক চিরে অন্তর ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে খেলার সাথীরা দেখে। এই ঘটনা শুনে হালিমা ভয়ে তাঁকে মা আমিনার কাছে

পাঠান। তখন তিনি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ও মোটা-তাজা।

আমেনা মৃত স্বামীর কবর যিয়ারতের জন্য ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে ১ মাস থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে পথে আবওয়া নামক স্থানে মারা যান। পথের সঙ্গিনী চাকরাণী উম্মে আইমন ৬ বছরের বালক মুহাম্মদকে সাথে করে মক্কায় এসে আবদুল মুত্তালিবের হাতে সোপর্দ করে। তাঁর বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন, তখন দাদাও মারা যান। এবার তাঁকে লালন পালন করেন আপন চাচা আবু তালিব। একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ ও খরা দেখা দেয়ায় কোরাইশরা আবু তালিবের কাছে দোয়ার জন্য অনুরোধ করে। আবু তালিব বালক মুহাম্মদের আঙ্গুল ধরে কাবার পার্শ্বে হাত উঠালে মেঘবিহীন আকাশে বৃষ্টির ঘনঘটা শুরু হয়।

বালক মুহাম্মদের বয়স যখন ১২ বছর তখন আবু তালিব তাঁকে সাথে করে সিরিয়ায় রওনা হন এবং পথে একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক বুহাইরা তাঁকে দেখে চিনতে পারেন যে, তিনি আগামী দিনের শেষ নবী। তখন তিনি আবু তালিবকে বলেন, সিরিয়ার ইহুদীরা এই বালককে চিনতে পারলে মেরে ফেলবে। পরে আবু তালেব তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠান।

১৫ বছর বয়সে কোরাইশ ও কানানা গোত্রের সাথে কায়েস গোত্রের যে যুদ্ধ হয় তাতে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও অংশগ্রহণ করেন। কোরাইশরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসকে লংঘন করে সংঘটিত হওয়ায় একে 'হারবুল ফুজ্জার' বা 'পাপীদের যুদ্ধ' বলা হয়।

এই যুদ্ধের পরপরই জিলকদ মাসে সকল কোরাইশ গোত্র মিলে, 'হিলফুল ফুদুল' নামক একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা কায়েম করে। এই সংস্থার লক্ষ্য হল, যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং দুঃস্থ ও অভাবী মানুষকে সাহায্য করা। হযরত মুহাম্মদ (সা) আবদুল্লাহ বিন জাদআনের ঘরে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর জন্য তাঁকে আল আমীন বলা হত। ২৫ বছর বয়সে মক্কার ধনী মহিলা খাদীজা বিনতু খোয়াইলিদ তাঁকে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করেন এবং বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়া পাঠান। ঐ ব্যবসায় বিধবা খাদীজার প্রচুর লাভ হয়। পরে ৪০ বছর বয়স্কা খাদীজার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সিরিয়ায় কাফেলার দু'টো ঘটনা ঘটে। একটি হচ্ছে খাদীজার গোলাম মাইসারা এই সফরে হযরত মুহাম্মদের সাথী ছিল। যাওয়ার পথে বিশ্রাম নেয়ার

সময় একজন ধর্মযাজক মাইসারাকে বলেন, এই লোকটি ভবিষ্যতে নবী হবে। সিরিয়া থেকে মক্কায় ফেরার পথে মাইসারা গরম রোদের সময় দু'জন ফেরেশতাকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাথার উপর ছায়া দিতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ৩৫ বছর বয়সে কা'বায় আগুন লেগে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোরাইশরা কা'বা পুনঃনির্মাণ করে। কিন্তু সম্মান লাভের প্রতিযোগিতায় কোন গোত্রের লোকেরা হাজারে আসওয়াদকে যথাস্থানে রাখবে তা নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। পরে হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি চাদর বিছান এবং নিজ হাতে এর উপর হাজারে আসওয়াদ রেখে সকল গোত্রের লোকদেরকে চাদর ধরে তা উপরে উঠাতে বলেন। পরে তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে যথাস্থানে বসান। এইভাবে একটা কঠিন সমস্যার সমাধান হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও মূর্তিপূজা করেননি, মদ পান করেননি, দেবতার নামে বলি দেয়া পশুর গোশত খাননি, অশ্লীল কোন কাজ করেননি এবং কারোর অপকার করেননি। কোরাইশদের কা'বা নির্মাণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর চাচা আব্বাস (রা) এর সাথে মিলে পাথর টানেন। হযরত আব্বাস বলেন, তোমার লুঙ্গি (ইযার) হাঁটুর উপরে উঠালে তাতে আর ময়লা লাগবে না। কাপড় উঠানোর সাথে সাথে তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং চোখ আকাশের দিকে বড় হয়ে উঠে। হুঁশ আসার পর তিনি চিৎকার করতে থাকেন, আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তারপর তাঁর লুঙ্গি তাঁকে ঠিক করে বেঁধে দেয়া হয়।[১৪]

তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একবার ময়দানে বকরী চরানোর সময় সাথী অন্য রাখালকে বলেন, তুমি আমার বকরীগুলোর দেখাশুনা কর, আমি শহরে গিয়ে চাঁদের আলোতে অন্য যুবকদের সাথে রাতের বেলায় আনন্দ করবো। রাখাল সাথী রাজী হওয়ায় তিনি শহরে এসে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গানের মজলিশে হাজির হন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর শ্রবণশক্তি বন্ধ করে দেন এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। পরের দিন রোদের তাপে তিনি ঘুম থেকে জাগেন। আরেকদিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নবুওতের পূর্বে আমি জীবনে দু'বার জাহেলিয়াতের কাজের ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু দুইবারই আল্লাহ আমার ও সেই মন্দ কাজের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেন। ফলে আমি তা আর করতে পারিনি।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন তিনি একাকীত্ব ভালবাসতেন এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তারপর তিনি হেরা গুহায় বসে ধ্যান করতে থাকেন। তিনি তাঁর কওমের এবাদত উপাসনায় অসন্তুষ্ট এবং মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে হেদায়াত চান। তিনি ৪০ বছর বয়সে রমযান মাসে হেরা গুহায় অপেক্ষা করেন। তখনই হযরত জিবরীল (আ) বলেন, হে মুহাম্মদ পড়। তিনি উত্তরে বলেন, আমি পড়তে পারি না। জিবরীল তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দেন এবং বলেন, পড়। তিনি এবারও বলেন, আমি পড়তে পারি না। এবারও জিবরীল তাঁকে জোরে আঁকড়ে ধরেন এবং বলেন, পড়। তৃতীয়বারও পড়তে বলায় তিনি পড়তে না পারার কথা জানানোর কারণে জিবরীল তাঁকে পূর্বের মত আঁকড়ে ধরেন। তারপর জিবরীল সূরা আলাকের ৫টি আয়াত পড়েন এবং রাসূলুল্লাহও (সা) তাঁর সাথে সেই আয়াতগুলো পড়েন। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা) এর নবুওয়াত ও রিসালতের সূচনা হয়।

জিবরীল চলে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিবরীল, আর আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এসে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়েন এবং হযরত খাদীজা (রা) কে সব কথা খুলে বলেন। খাদীজা তাঁকে আশ্বাস ও অভয় দেন এবং নিজ চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা বলেন। ওয়ারাকা শুনা মাত্রই বলেন যে, এই তো শেষ নবী। লোকেরা তাঁর বিরোধিতা করবে। আমি বেঁচে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম। খাদীজাই প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সা) নতুন দ্বীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। প্রথমে আত্মীয় স্বজনদের কাছেই দাওয়াত পেশ করেন। তিনি কালেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত পেশ করেন। প্রথমে দাওয়াত গোপনে চলতে থাকে। তিন বছর পর আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেন।

কালেমার দাওয়াত শুনে ইসলাম বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কেননা, এই কালেমার অর্থ হচ্ছে মালিক, মনিব, রিযকদাতা, আইনদাতা এবং সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তাঁর আইন ছাড়া আর কারুর আইন মানা যাবে না, তাঁর এবাদত ছাড়া অন্য কারো এবাদত করা যাবেনা এবং তাঁর হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তথা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং

আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামী শরীয়াহ বা আল্লাহর হুকুম ও আইন কানুন কায়েম করতে হবে। এই দাওয়াত শুনে কাফেররা তা বরদাশত করতে রাজী ছিল না। কেননা, তাদের সমাজে একদিকে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং অন্যদিকে ছিল মানুষের উপর মানুষের আইন ও সার্বভৌমত্ব। নিজেদের বর্তমান সামাজিক সুযোগ-সুবিধাকে ত্যাগ করে আল্লাহর পূর্ণ দাসত্বের শৃংখলে নিজেকে সোপর্দ করা– এটা তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়। তাই তারা আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামের শান্তিভবনে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে।

কুরাইশ রীতি অনুসারে একদিন সাফা পাহাড়ে তিনি সবাইকে ডেকে আখেরাতমুখী কালেমার দাওয়াত দেয়ায় আবু লাহাবসহ অন্যরা রাগান্বিত হল। আপন চাচা আবু লাহাব গালি দিল যে, হে মুহাম্মদ, তোমার দুই হাত ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছ? কুরআন তার প্রতিবাদে বলল– না, আবু লাহাবের দুই হাতই ধ্বংস হউক।

এরপর ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতা শুরু হল। কোরাইশরা আবু তালিবের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল যেন রাসূলুল্লাহ (সা) কে ঐ দাওয়াত থেকে বিরত রাখা হয়।

তারা হাজীদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা তদবীর শুরু করল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং নওমুসলিমদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু করে দিল। কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রুপে কাজ না হওয়ায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে, কোরাইশ সরদারদের মধ্য থেকে আবু লাহাবের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রাসূলুল্লাহ ও মুসলমানদের উপর দৈহিক নির্যাতন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে সাফা পাহাড়ের পার্শ্বে সাহাবী দারুল আরকামের ঘরে গোপনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ চলে এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এদিকে মক্কার কাফেরগণ নওমুসলিমদের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। ফলে বহু নওমুসলিম ইথিওপিয়ার নওমুসলিম নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করে চলে যান।

ইতিমধ্যে হযরত হামযাহ এবং উমর বিন খাত্তাব মুসলমান হন। এতে নির্যাতিত মুসলমানদের কিছুটা সাহায্য হয়। কাফেররা আবু তালেবকে বার বার হুমকি দিতে থাকে। অবশেষে কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে দর কষাকষি করতে আসে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, আমার এক হাতে চাঁদ আর অন্য হাতে সূর্য এনে

দিলেও আমি আল্লাহর দীনের দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত হতে পারবো না। কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তা সফল হয়নি। ইতিমধ্যে বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিবের সকল লোক এক বৈঠকে বসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পার্শ্বে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে কাফেররা বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিবের সাথে সর্বাত্মক বয়কট ঘোষণা করে এবং বিয়ে-শাদী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল প্রকার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ৩ বছর পর ঐ বয়কট প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু নবুওয়াতের ১০ বছরের সময় তাঁর চাচা আবু তালিব মারা যান। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দুঃখ-কষ্ট হাজার গুণ বেড়ে যায়। এদিকে কাফেরদের অত্যাচার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

কিন্তু সেখানে তিনি চরমভাবে নির্যাতিত হন। আদাস নামক একজন দাস ছাড়া আর কেউ সেখানে তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি।

নবুওয়াতের ১১ বছরের সময় মদীনা থেকে আগত ৬ জন লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাক্ষাত হয়। তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। আকাবায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনাব ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর নবুওয়াতের ১১ বছরের শাওয়াল মাসে হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকরের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিয়ে হয়।

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচী তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য তাঁকে মিরাজে নেয়া হয়। সেখান থেকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য করণীয় বৃহত্তর এই কাজের জন্য হাতে কলমে শিক্ষার বৃহত্তর প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। নবুওআতের দ্বাদশ বছরের হজ্জ মওসুমে আকাবায় মদীনার ১২ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে। নবুওয়াতের ১৩শ বছরে মদীনার ৭০ জন লোক আকাবায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

এই সকল অবস্থা দেখে কোরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যার ঘোষণা দেয়। তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা) কে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তারা সরাসরি মদীনা না গিয়ে প্রথমে সাওর গুহায় ৩ রাত কাটান। তারপর নিরাপদ অবস্থার বিবেচনা করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং মদীনায় পৌছেন। মদীনায় পৌছে তিনি সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেন।

মক্কা বিজয়

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী যুগের শুভ সূচনা হয়। ৮ই হিজরীর ২০শে রমযান, রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে মক্কার পতন হয় এবং আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্য সবাই মুসলমান হয়। যারা দুর্ভাগ্যের কালিমা নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে তারাই শুধু এই বিশাল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

হুদাইবিয়ার সন্ধিই মক্কা বিজয়ের সূচনা করে। ঐ সন্ধি অনুযায়ী খোযাআ' গোত্র মুসলমানদের সাথে মিত্রশক্তি হিসাবে যোগ দেয় এবং বনি বকর গোত্র যোগ দেয় কোরাইশদের মিত্রশক্তি হিসাবে। ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। সন্ধির পর বনি বকর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং এক রাত্রে খোযাআ' গোত্রের উপর আক্রমণ করে তাদের সহায়-সম্পত্তি লুট-পাট করে। কোরাইশদের লোকেরা এই কাজে বনি বকরকে অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করে।

খোযাআ' গোত্র এই আক্রমণের পর, তাদের মিত্রশক্তি মুসলিম নেতা রাসূলুল্লাহ (সা) কে অবহিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘটনা শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বলেন, نُصِرَتْ خُزَاعَةُ 'খোযাআ' গোত্র বিজয়ী হয়েছে। তিনি এই বাক্য দু'বার উচ্চারণ করেন। কোরাইশরা হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

কোরাইশরা নিজেদের ত্রুটির কথা উপলব্ধি করতে পেরে আবু সুফিয়ানের কাছে এসে তাদের অপকর্ম সম্পর্কে তাকে অবহিত করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে গিয়ে সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ জানানোর দাবী করে। আবু সুফিয়ান উত্তরে বলেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা সর্বনাশ করেছ। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ আমাদের উপর আক্রমণ করবে। আমার স্ত্রী আজ সকালে ঘুম থেকে জেগে একটি খারাপ স্বপ্ন বর্ণনা করেছে। সে স্বপ্নে দেখেছে যে, হুজুনের দিক থেকে এক রক্তবন্যা প্রবাহিত হয়ে খন্দমায় গিয়ে শেষ হয়েছে।(১৬)

তারপর আবু সুফিয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির আহ্বান জানানোর পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে চুক্তির ২ বছর অতিবাহিত হয়েছে।

কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গ মুসলমানদের পক্ষে গেছে। আর এটাই মক্কা বিজয় ও মক্কার লোকদের ইসলাম গ্রহণের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোযাআ' গোত্রের লোকদের আগে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহর দরবারে পৌছার জন্য দ্রুত রওনা হয়ে গেল। এদিকে আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আবু সুফিয়ান সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মদীনায় আসছে এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহর কাছে পৌছে বলেন, আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না। আপনি সন্ধির নবায়ন করুন এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবু সুফিয়ান! তুমি কি এজন্যই এসেছ? তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, তোমরা কেউ কি তোমাদের মত প্রকাশ করবে? সাহাবীরা বললেন, আমরা কৃত চুক্তি ও সন্ধির উপর বহাল আছি। আমরা এর কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন কামনা করি না তারপর আবু সুফিয়ান হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমানের কাছে গিয়ে তাঁদের সুপারিশ কামনা করেন। কিন্তু এতে সফল না হয়ে হযরত আলীর কাছে আসেন এবং বলেন, আমি দেখছি বিষয়টি কঠিন হয়ে গেছে এবং আমার মুখ বন্ধ হয়ে আসছে। আপনি আমাকে উপদেশ দিন। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে তোমার উপকারে আসার মত কোন কিছু দেখি না। তুমি মক্কায় ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করেন, আপনি কি মনে করেন যে, এর দ্বারা আমার চলবে। হযরত আলী বলেন, আমি তা মনে করি না। তবে তোমার জন্য এর চেয়ে ভিন্ন কিছু আমি দেখি না। আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে আসলেন।[১৭]

এ দিকে মক্কায় আবু সুফিয়ানের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতে, মক্কাবাসীরা তাকে গোপনে মুসলিম হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। মদীনা থেকে ফিরে আসার পর কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করল, কি খবর? মুহাম্মদের কাছ থেকে লিখিত কোন কাগজ বা সন্ধি বৃদ্ধি সংক্রান্ত দলিল এনেছ কি? তিনি উত্তরে বলেন, না। আমি বহু চেষ্টা করেও সফল হইনি। তবে আমি তাঁর সাহাবাকে যত বেশী অনুগত দেখলাম অন্য কোন বাদশাহরও এত বেশী আনুগত্যকারী লোক নেই।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের ১০ হাজার যোদ্ধা সহকারে, ১০ই রমযান (৮ম হিজরী) তিনি মক্কার

উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সকলেই রোযা রেখেছিলেন। কাদীদে পৌছার পর তাঁরা সকলে ইফতার করেন, এবং পুনরায় মক্কা অভিমুখে রওনা হন। তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী ওয়াদী ফাতিমায় এসে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এমতাবস্থায় মক্কায় অবস্থানকারী হযরত আব্বাস (রা) মক্কার নিরাপত্তার জন্য মক্কাবাসীদের একজনকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে পাঠানোর চিন্তা করেন এবং আবু সুফিয়ানকে সাথে করে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে রওনা হন। একাধিকবার আলোচনার পর আবু সুফিয়ান মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে বলেন, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। রাসূলুল্লাহ (সা) খালেদ বিন ওয়ালিদকে বিভিন্ন আরব গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে মক্কার নিম্নভূমির দিক থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রথম বাড়ীর কাছে গিয়ে পতাকা উড়ানোর হুকুম দেন। তিনি আরো নির্দেশ দেন, কেউ যুদ্ধ না করলে যেন কারুর সাথে যুদ্ধ করা না হয় এবং কাউকে হত্যা না করা হয়। কিন্তু মক্কার সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং ইকরামা বিন আবু জাহল খন্দমা পাহাড়ের নিকটে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা) এর বাহিনীর সাথে তাদের লড়াই হয়। এতে কিছু মারা যায় এবং অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। আনসার নেতা হযরত সাদ' বিন উবাদাহ বলেছিলেন, আজ যুদ্ধ এবং প্রতিশোধের দিন, আজ নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করার দিন এবং আল্লাহ আজ কোরাইশদেরকে অপমানিত করবেন। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিজয়ের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। এই মক্কাবাসীরাই তাঁকে এবং মুহাজিরদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করে ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা) সাদ বিন উবাদার اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةَ এই কথার জবাবে বলেন, اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةَ অর্থাৎ আজকের দিন দয়া ও করুণার, সম্মান ও ইজ্জত দেয়ার দিন। যুদ্ধের ভয়ে তিনি সাদ বিন আবু উবাদাহ থেকে পতাকা নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কোসওয়া নামক উটে চড়ে পেছনে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) কে সাথে করে মক্কায় প্রবেশ করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার সকাল বেলা। আল্লাহর প্রতি বিনয়ের ভাবে মাথা নত করে তিনি প্রবেশ করেন এবং বলেন, اَللّٰهُمَّ لاَعَيْشَ الاَّ عَيْشُ الْاخِرَةَ 'হে আল্লাহ, পরকালীন যিন্দেগী ছাড়া সত্যিকার কোন যিন্দেগী নেই।' রাসূলুল্লাহ (সা) উটের পিঠে করে হুজুনে আসার পর সবাই প্রশান্ত হল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পাশে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে কথা বলছিলেন এবং সূরা আল ফাতহ পড়তে পড়তে এগিয়ে আসছিলেন। কা'বায় পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীর উপর বসেই তওয়াফ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হাতের লাঠির মাথা দিয়ে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করার জন্য মুহাম্মদ বিন সালামাহ (রা) উটের লাগাম ধরেন। তখন কা'বার ভেতর বিভিন্ন গোত্রের ৩৬০টি মূর্তি ছিল। সীসা গলিয়ে ঐগুলোর পা আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হাতের লাঠি দিয়ে ঐগুলোকে খোঁচা দেয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটা ভেঙ্গে পড়ে গেল। হাতে ধরে ভাঙ্গার প্রয়োজন হল না। তারপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়েন–

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ ঃ 'সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। (সূরা বনি ইসরাইল : ৮১)

রাসূলুল্লাহ (সা) উসমান বিন আবি তালহার কাছ থেকে চাবি এনে কা'বায় প্রবেশ করেন এবং হযরত উমর এবং ওসমানকে (রা) কা'বার ভেতরের অংকিত ছবিগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। কোরাইশরা কা'বার ভেতরে ফেরেশতা, হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ) এর হাতে ভাগ্যের তীর দিয়ে ছবি এঁকেছে এবং হযরত এসহাকসহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মরিয়মের ছবিও অংকন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) কাবায় প্রবেশ করার পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদেরকে ভেতরে ঢুকতে বারণ করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) কাবার দরজায় এসে দাঁড়ান এবং কোরাইশরা তাঁর ফায়সালা শুনার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ـ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করলেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করলেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করলেন এবং একাই সকল দলকে পরাজিত করলেন।' তারপর বললেন, হে কোরাইশ! তোমাদের ব্যাপারে আমার কি সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার বলে তোমরা মনে কর? তারা উত্তরে বলে, আমরা ভাল সিদ্ধান্তই আশা করি। কেননা, ভাই ও ভাতিজা থেকে উত্তম সিদ্ধান্তই প্রত্যাশা করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন, আজ আমিও তোমাদের উদ্দেশ্যে তাই বলবো। হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন, 'আজ কোন প্রতিশোধ নেই। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করুন, তিনি সর্বাধিক দয়ালু।'

(لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ) ـ

(يوسف ـ ٩٢) 'যাও তোমরা মুক্ত।'

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মাকামে ইবরাহীমের কাছে আসেন এবং দু'রাকাত নামায পড়েন। এবার তিনি যমযম কূপের কাছে আসেন। হযরত আব্বাস (রা) তাঁর জন্য এক বালতি পানি উঠান। তিনি পানি পান করেন ও অজু করেন। তাঁর অজুর পানি গ্রহণের জন্য উপস্থিত লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়তে পারেনি। সব মানুষের গায়ে পড়েছে। পান করার পরিমাণ হলে, লোকেরা সেই পানি পান করেছে, নচেৎ তা গায়ে মেখেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় কিছুদিন অবস্থান করেন। পরে, শাওয়াল মাসে তায়েফের হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হোনাইনে যান। যুদ্ধ শেষে, সেখান থেকে জো'রানা যান এবং সেখানে ১৫ রাত অবস্থান করেন। পরে উমরাহর উদ্দেশ্যে এহরাম বেঁধে মক্কায় আসেন ও উমরাহ করেন। মদীনা রওনা হওয়ার আগে উ'তাব বিন উসাইদকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করে, মক্কাবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দেন এবং বলেন, তারা আহলুল্লাহ। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের সমাপ্তি হল।[১৯]

মক্কায় ইসলামী শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নবী করীম (সা) এর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মক্কায় ইসলামী শাসনের সূচনা হয় এবং জাহেলিয়াতের সকল রীতি-নীতি এবং আইনকানুনের পরিবর্তে ইসলামের আইন-কানুন চালু হয়। ইসলাম জাহেলিয়াতের মূর্তিপূজা, শিরক, মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং মানব রচিত আইন ও মতবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সেই স্থানে আল্লাহর একত্ব, সার্বভৌমত্ব, আইন ও বিধি-বিধান চালু করে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পবিত্র মক্কা নগরী তার ইসলামী চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহাল আছে এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকবে।

মক্কা বিজয়ের দু'বছর পর, ১০ম হিজরীতে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে আসেন। হজ্জ শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তনের ২ মাসেরও কিছু বেশী সময় পরে, ১১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তিকালের পর শুরু হয় খেলাফতে রাশেদার যুগ। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা) হিজরী ৪১ সাল পর্যন্ত, নবী করীম (সা) এর অনুসৃত পদ্ধতিতে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। মক্কা ও মদীনার প্রতি তাঁদের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেন। হযরত উসমানও (রা) মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেন এবং ভিড়ের কারণে সৃষ্ট সংকীর্ণতা দূর করে তওয়াফ এবং নামাযের সুবন্দোবস্ত করেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের সর্বশেষ খলীফা। তিনি মসজিদে হারামের সুষ্ঠু সংরক্ষণ করেন। হযরত আলী (রা) এর খেলাফতের সময় মুয়াবিয়া (রা) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন।

হিজরী ৪১ সালে খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তি হয়। হিজরী ৪০ সালের ১৭ই রমযান, ইরাকবাসীরা হযরত আলী (রা) এর ইন্তিকালের দিন, তাঁর ছেলে হযরত হাসানের হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। ঐ একই সালে, সিরিয়াবাসীরা হযরত মুয়াওয়িয়া বিন আবু সুফিয়ানের হাতে খেলাফতের বাইআত নেয়। ফলে একই রাষ্ট্রে দুই খলীফার অস্তিত্বের কারণে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। দুই পক্ষ

যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ায়, কিছু সংখ্যক লোক তাঁদের মধ্যে আপোসের চেষ্টা করেন। এর ফলে, সিদ্ধান্ত হয় যে হযরত হাসান খেলাফতের দাবী প্রত্যাহার করবেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ঐ দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। এইভাবে, হিজরী ৪১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে, খেলাফতে রাশেদার আলো নিভে যায়। সিরিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত এবং হেজায ও নজদের সর্বত্র হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই হচ্ছে উমাইয়া শাসনের ভিত্তি।[২০]

হিজরী ৬০ সালে হযরত মুয়াওয়িয়া (রা) মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ ছেলে ইয়াজিদের পক্ষে বাইআত গ্রহণের নির্দেশ দেন। হেজাযে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইয়াজিদের পক্ষে বাইআত গ্রহণের জন্য হযরত মুয়াবিয়ার চিঠি পড়ে শোনানোর সাথে সাথে, হযরত আবদুর রহমান বিন আবুবকর, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, হোসাইন বিন আলী ও হযরত আয়িশা (রা) সহ অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ইসলামের মাপকাঠি অনুযায়ী খলীফা হওয়ার ব্যাপারে, অন্যান্য বড় বড় সাহাবীরা ইয়াজিদের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। এছাড়া রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, শাসকের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বংশের কারুর জন্য ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। মুসলিম জনতাই তাঁদের শাসক নির্বাচন করবেন। এই কারণে, তাঁরা ইয়াজিদের মনোনয়নের বিরোধিতা করেন। ইরাকের কুফাবাসীরা হযরত হোসাইনকে কুফায় ডেকে নিয়ে তার হাতে বাইআত করেন এবং ইয়াজিদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। হিজরী ৬১ সালে, কারবালার যুদ্ধে হযরত হোসাইন (রা) ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এর পর হিজরী ৬৩ সালে, মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের হাতে লোকেরা বাইআত গ্রহণ করেন এবং তিনি খলীফা নিযুক্ত হন। কিন্তু উমাইয়া শাসক আবদুল মালেক বিন মারওয়ান হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে মক্কা আক্রমণের নির্দেশ দেন। হিজরী ৭৩ সালের ১৭ই জুমাদাল-উলা মাসে, তিনি হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এইভাবে মক্কায় পুনরায় উমাইয়া শাসনের গোড়াপত্তন হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) হিজরী ৬৪ সালে, উমাইয়াদের অবরোধের ফলে, কা'বা শরীফের যে ক্ষতি হয় তা মেরামতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (রা) এর ভিত্তির উপর কা'বা

শরীফকে পুননির্মাণ করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়িশা (রা) কে বলেছিলেন, তোমার কওম যদি কুফরী ত্যাগ করার ব্যাপারে নতুন না হত, তাহলে, আমি কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে হিজরে ইসমাঈলকে এর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। কেননা, তোমার কওম অর্থাভাবে, কা'বা শরীফকে হযরত ইবরাহীম (রা) এর ভিত্তি থেকে ছোট করে তৈরি করেছে। আমি কাবা শরীফের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটো দরজা তৈরি করতাম, যাতে করে লোক এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বের হতে পারে এবং আমি কা'বা শরীফের দরজাকে মাটির সমান করে দিতাম। কেননা, তোমার কওম, যে কোন লোককে ইচ্ছা প্রবেশ করা ও নিষেধ করার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দরজাকে উঁচু করে তৈরি করেছে। এই অর্থে বোখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের ভিত্তিতেই, হযরত ইবনে যোবায়ের কোরাইশদের ভিত্তির পরিবর্তে হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভিত্তির উপর কা'বা পুনঃনির্মাণ করেন।[২১]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা দখলের পর খলীফা আবদুল মালেকের কাছে কা'বা শরীফকে পূর্বের ভিত্তি তথা কোরাইশদের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি চান। খলীফা আবদুল মালেক অনুমতি দিলে তিনি পুনরায়, কা'বা শরীফকে আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের পূর্বের ভিত্তি তথা কোরাইশদের ভিত্তির উপর কাবা পুনর্ণির্মাণ করেন। হিজরী ১৩২ সালে উমাইয়া শাসনের পতন হয়। এই আমলেই, কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্বে নামাযের জামাত অনুষ্ঠান এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়। ওলিদ বিন আবদুল মালেক মসজিদে হারামকে আরো সম্প্রসারিত করেন।[২২]

হিজরী ১৩২ সালের শেষ দিকে, আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহর হাতে দামেস্কের পতন হয়। এর মাধ্যমেই উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি ও আব্বাসীয় শাসনের শুরু হয়। মক্কা-মদীনায় তাদের বাইআত গ্রহণ করা হয়। হিজরী ২৩২ সালে আব্বাসী খলীফা ওয়াসেকের আমলে, আব্বাসীয় আমলের ১ম সোনালী যুগের অবসান হয়। তারপর শুরু হয় বিভেদ-বিচ্ছেদ ও ফেতনা ফাসাদের ২য় আব্বাসীয় যুগ। খলীফা আবু জাফর মনসুর এবং মাহদী বিন মনসুরের সময় ২ বার মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ হয়। তুর্কী মাওয়ালীরা তখন আব্বাসী শাসকদের মক্কাসহ গোটা সাম্রাজ্য শাসন করত। ৩১৭ হিজরীর ৭ই জিলহজ্জ, কারামতিয়া সম্প্রদায়ের হাতে মক্কার

পতন হয়। আবু তাহের কারামতি মক্কার ৩০ হাজার লোককে হত্যা করে এবং তাদেরকে গোসল ও কাফন ছাড়া যমযম ও মসজিদে হারামে দাফন করে। ১৪ই জিলহজ্জ, ঐ মদখোর আবু তাহের কারামতি কা'বা শরীফ থেকে হাজারে আসওয়াদকে খুলে নিয়ে যায়। দীর্ঘ বাইশ বছর পর কারামতিরা পুনরায় ঐ পাথরটি ফেরত দেয়। দ্বিতীয় আব্বাসীয়া আমলে, দারুন নাদওয়ার সম্প্রসারণ করা হয়। ঐ আমলে, শিয়াদের আন্দোলন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত মিসরে শিয়া ফাতেমীয়দের শাসন শুরু হয়। ৩৫৮ হিজরীতে, মক্কায় ফাতেমীয় খলীফা মুয়ে'জ্জের নামে খোতবা দেয়া শুরু হয়। ৫৫১ হিজরীতে তারা কা'বা শরীফের জন্য নকশা করা একটা মীযাব উপহার দেয়।[২৩]

মিসরের ফাতেমীয় শাসকদের পতনের সময় খৃষ্টান ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হয়। সিরিয়ার হলবের শাসক নূরুদ্দিন জংকী মিসরের ফাতেমীয় শাসকদেরকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু ৫৬৯ হিজরীতে, সর্বশেষ ফাতেমীয় শাসক আ'দেদের শাসন নূরুদ্দিন জংকীর মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আইউবীর হাতে সমাপ্ত হয়। এখানে এসেই ফাতেমীয় শাসনের পতন হয়।

মক্কা ও মদীনায় নূরুদ্দিন জংকীর নামে বাইআত গ্রহণ করা হয়। সালাহউদ্দীন আইউবীর প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে আইউবী শাসনের গোড়া পত্তন হয়। আইউবীদের আমল মসজিদে হারামে, ৪ মাজহাবের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হত। মাকামে ইবরাহীমের কাছে, শাফেয়ী মাজহারের ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত নামায শেষে, রোকনে ইয়ামানীর কাছে মালেকী মাজহাবের ইমাম তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে নামায পড়ান। মীযাবের কাছে হাতীমে কা'বায় হানাফী মাজহাবের ইমাম নামায পড়ান। অনারব বিশ্বের বেশীর ভাগ লোক হানাফী মাজহাবের অনুসরণ করায়, এই মাজহাবের নামাযের জামাত সবচাইতে বড় হত। অপরদিকে, হাজারে আসওয়াদের কাছে হাম্বলী মাজহাবের ইমাম নামায পড়ান। তখন, মাকামে ইবরাহীম আজকের মত নির্ধারিত জায়গায় ছিল না। বিভিন্ন মওসুমে, সুষ্ঠু হেফাজতের জন্য এটাকে কা'বা শরীফের ভেতর রাখা হত। ৬৫৫ হিজরীতে তুরস্কের মাওয়ালী শাসকদের হাতে আইউবী শাসনের পতন হয়।

আইউবী ও মাওয়ালী শাসনের পর শারাকেসাদের শাসন শুরু হয়। এই সময় তারা

হারাম শরীফের বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দেয়। শারাকেসা শাসক কায়েতবায় ৮৮৪ হিজরীতে মক্কায় হজ্জ করতে আসেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না বলে মক্কার কাজী ইবরাহীম বিন যোহায়রা তাঁকে তওয়াফ করান ও দোয়া পড়ান। শারাকেসা শাসক কায়েতবায়কে তওয়াফ করানোর মধ্য দিয়ে হাজীদেরকে মোতাওয়েফ দিয়ে الطوافة তথা তওয়াফ করানোর পেশার প্রথম সূচনা হয়। এর আগে এই পেশার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৯২৩ হিজরীতে, কায়রো বিজয়ী তুরস্কের উসমানী শাসকদের হাতে শারাকেসা শাসনের অবসান হয়।(২৪)

তুরস্কের উসমানী সুলতানদের শাসন হিজরী ১২০৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তুর্কী শাসক সুলতান সেলিমের আমলে মসজিদে হারামের গম্বুজ বিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়। তুর্কী শাসক মাসউদ ১০৪০ হিজরী সালে, মক্কায় কফি পান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কেননা, এটাকে মাদক জাতীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করে মক্কার কিছু সংখ্যক আলেম ফতোয়া দেন। ১০৪২ হিজরীর হজ্জ মওসুমে, আমীর যায়েদ অনারব লোকদের হজ্জ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ ১০৩৩ হিজরীতে, অনারব লোকেরা বাগদাদে হামলা চালিয়ে উসমানী শাসকদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার কারণেই তিনি তাদের হজ্জের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১০৮১ হিজরীর ১৬ই রমযা হারাম শরীফের ইমাম সাহেব জুমআর খোতবা দেয়ার সময় একজন পারস খোলা তরবারী নিয়ে ইমাম সাহেবকে হত্যা করতে এগিয়ে আসে এব নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করে। উপস্থিত মুসল্লীরা তাকে কঠোর দেয়ায় সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। পরে মোয়াল্লা কবরস্তানের কাছে নিয়ে তাকে অ জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়।

১০৯১ হিজরীর ২২শে জিলহজ্জ, ইবরাহীম উপত্যকার উপর দিয়ে বিরাট বন প্রবাহিত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে এই বন্যা সৃষ্টি হয়। এর ফলে, কাবা শরীফের দেয়ালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পানি উঠে এবং এতে কা'বা শরীফের কিছু ক্ষতি হয়। বন্যার ফলে বহু ঘর-বাড়ী নষ্ট হয় এবং অনেক লোক মারা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, বন্যার স্রোতে একটি উট ভেসে আসে এবং সকাল বেলায় সবাই মসজিদে হারামের মিম্বারের উপর উটটিকে পড়ে থাকতে দেখে। ১০৯৭ হিজরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, জেদ্দার গভর্নর ও শেখুল হারাম আহমদ

পাশা খৃষ্টানদেরকে জেদ্দা থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ছাড়া তিনি আর সবাইকে জেদ্দা থেকে বিদায় করেন।

১১১২ হিজরীতে ভারতের এক ধনী ব্যক্তি মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বন্টনের জন্য ৫ লাখ ভারতীয় মুদ্রা পাঠায়। এর ফলে, মক্কার দরিদ্র লোকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয়। ১১৪৯ হিজরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, মক্কায় তুর্কী শাসকের প্রতিনিধি শরীফ মাসউদ ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, একই বছর তিনি মক্কা থেকে সকল প্রবাসীকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কেননা, মক্কায় বেশী সংখ্যক প্রবাসীর অস্তিত্বের কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের বাসস্থান এবং অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। (২৫)

১১৫৩ হিজরীর মক্কার স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে, এক বিরাট বন্যার ফলে লোকেরা মসজিদে হারামের জুমআর নামাযের জামাতে হাজির হতে পারেনি। এমনকি ইমাম সাহেবও মিম্বার পর্যন্ত যেতে পারেননি। তিনি মাত্র ৫ জন মুসল্লী নিয়ে জুমার নামায আদায় করেন। ১১৫৯ হিজরীতেও অনুরূপ আরেক ভয়াবহ বন্যা হয়।

১১৯৬ হিজরীতে তুর্কী শাসকের প্রতিনিধি সুরুর বিন মোসায়েদ মক্কার প্রতিরক্ষার জন্য জিয়াদ পাহাড়ের উপরে এক মজবুত কিল্লা নির্মাণ করেন। সে কিল্লাটি এখন পর্যন্ত মওজুদ আছে।

১২০৩ হিজরীর রজব মাসে, হারাম শরীফের ইমাম শেখ আবদুস সালাম আল-হারসী জুমআর নামাযের খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন বাংলা থেকে আগত একজন হাজী ইমাম সাহেবকে ছুরিকাঘাত করায় তাঁর পেটের নাড়ী-ভূড়ি সব বেরিয়ে পড়ে এবং তিনি সাথে সাথে মারা যান। সম্ভবতঃ সে বাঙ্গালী হাজীটি পাগল ছিল। কিন্তু পরে সেই আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। (২৬)

সে সময়, উসমানীয়দের সহযোগিতায় মক্কার বিশিষ্ট আলেমরা বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া দান করতেন। বিচার বিভাগের দায়িত্ব তুর্কীদের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। উসমানী শাসকরা মিসর থেকে সবসময় কা'বা শরীফের গেলাফ পাঠাত।(২৭)

তুর্কী শাসকের প্রতিনিধি শরীফ মাসউদের শাসনামলে, নজদের প্রখ্যাত সংস্কারক শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। তিনি কবরপূজা সহ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোর আওয়াজ তোলেন। তুর্কী শাসকরা শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনকে ভিন্ন চোখে দেখত।

সৌদী শাসন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম সৌদী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মদ বিন ফয়সল বিন সউদ। তিনি শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের মেয়ে বিয়ে করেন এবং পরস্পর শ্বশুর জামাইর সম্পর্কে আবদ্ধ হন। ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের কুসংস্কার ও বেদআত বিরোধী আন্দোলনে প্রভাবিত হন এবং ১৭৪৫ খৃঃ মোতাবেক ১১৫৮ হিঃ স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর সেই সংস্কার আন্দোলনকে বাস্তবায়ন করেন। ১২০৬ হিজরীতে শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ইন্তেকাল করেন। নজদে তখন প্রথম সৌদী রাজত্ব বিদ্যমান আর হেজাযে ছিল তুর্কী শাসন। নজদের সৌদী শাসকরা মক্কার তুর্কী শাসকদের দৃষ্টিতে বৈরি হওয়ায়, হজ্জ পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা মক্কার শাসকদের কাছে বারবার হজ্জ পালনের অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়। পরে হেজাযের তুর্কী গভর্নর গালেবের সাথে এক আপোস চুক্তির ভিত্তিতে ১২১৩ হিজরীতে, নজদের লোকেরা মক্কায় হজ্জ করতে আসে এবং ১২১৫ হিঃ পর্যন্ত ঐ আপোস চুক্তি কার্যকর থাকে। ফলে, নজদবাসীরা ঐ কয়েক বছর হজ্জ করার সুযোগ পায়। তারপর নজদ ও হেজাযের মধ্যে মতানৈক্য হয়। ফলে ঐ চুক্তি আর বেশী দিন টিকেনি। ১২১৮ হিজরীতে, গালেবের বাহিনীর সাথে নজদের সৌদী শাসকদের সংঘর্ষ হয়। ১২২০ হিজরীতে এক আপোস চুক্তি অনুযায়ী, গালেব সৌদী শাসনের অধীনে মক্কার শাসক হিসেবে বহাল তাকে। এইভাবে, মক্কায় তুর্কী শাসনের অবসান এবং প্রথম সৌদী শাসনের সূচনা হয়।[২৮]

১২২৫ হিজরীতে, তুর্কী সুলতানের নির্দেশে মিসরে নিযুক্ত গভর্নর মুহাম্মদ আলী পাশা তাঁর ছেলে তুসুনের নেতৃত্বে মক্কায় বিরাট সেনাবাহিনী পাঠায়। সৌদী শাসকরা আবদুল্লাহ বিন সউদের নেতৃত্বে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করে এবং মিসরীয় বাহিনীকে পরাজিত করে। হিজরী ১২২৮ সাল পর্যন্ত মক্কায় সৌদী শাসন বহাল থাকে। মক্কা ও মদীনা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তা পুনরুদ্ধারের জন্য তুর্কী সুলতানের নির্দেশে মিসরের মুহাম্মদ আলী পাশা গোপনে হেজাযের গভর্নর গালেবের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে অর্থ সম্পদ দিয়ে রাজী করে। এর পর মিসরীয় বাহিনী প্রথমে ইয়াম্বু দখল করে এবং সবশেষে মক্কাও তাদের দখলে চলে যায়। ১২৩৪ হিজরীতে, পুরো হেজায ও নজদ মিসরীয় গভর্নরের দখলে চলে যায় এবং সৌদী শাসকরা মিসরীয় বাহিনীর হাতে

পরাজয় বরণ করে।

১২৫৬ হিজরীতে মুহাম্মদ আলী পাশা এবং উসমানীদের মধ্যে, হেজাযের শাসন তুরস্কের উসমানী সুলতানের কাছে হস্তান্তরের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে মক্কায় ২য় বার তুরস্কের উসমানী শাসনের সূচনা হয়। উসমানী শাসকরা মক্কা থেকে 'আল-হেজায' নামক একটি সরকারী পত্রিকা প্রকাশ করে। এই আমলে, সুলতান আবদুল হামিদ দামেস্ক থেকে মদীনা পর্যন্ত রেল লাইন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৬ হিজরীতে মদীনায় রেল লাইনের কাজ সমাপ্ত হয়। একই আমলে মক্কার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই মক্কায় মাদ্রাসা রশিদিয়া, মাদ্রাসা সোলতিয়া, মাদ্রাসা ফালাহ এবং মাদ্রাসা ফখরিয়াসহ অন্যান্য অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৩৩৪ হিজরীর ৯ই শাবান আরবরা মক্কায় হোসাইন বিন আলীর নেতৃত্বে ইংরেজদের সাথে এক সহযোগিতা চুক্তির ভিত্তিতে, অনারব উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ সময় ইংরেজ বাহিনী জেদ্দায় সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়। হোসাইন বিন আলী মক্কা ও মদীনাসহ জর্দান পর্যন্ত তুর্কী শাসনের অবসান করেন। ঐ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ১৩৩৮ হিজরীতে, মেশিনের সাহায্যে প্রথম মসজিদে হারামে বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু হয়।(২৯)

১৩৩৮ হিজরীতে, মক্কার শাসক হোসাইনের সাথে নজদের মতবিরোধ হয় এবং নজদবাসীদেরকে হজ্জ করার অনুমতি না দেয়ায় ঐ মতবিরোধ চরমে উঠে। ১৩৪৩ হিজরীর ৫ই রবিউল আউয়াল, মক্কা ও জেদ্দার লোকেরা হোসাইন বিন আলীর ছেলে আলী বিন হোসাইনকে নিজেদের বাদশাহ হিসেবে তার হাতে বাইআ'ত গ্রহণ করে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই তার পতন হয়।(৩০)

মিসরীয় বাহিনীর হাতে পরাজিত ও তুর্কী শাসনের অধীন হয়ে পড়ার পর সৌদী শাসক তুর্কী বিন আবদুল্লাহ্ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন এবং তিনি তুরস্কের ওসমানী খেলাফতের কবল থেকে রিয়াদসহ হেজাযের কয়েকটি শহর পুনরুদ্ধার করে ২য় বার সৌদী শাসনের সূচনা করেন। তার ছেলে ফয়সল বিন তুর্কীর আমলে, সৌদী রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ফয়সল বিন তুর্কীর ছেলেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই দেখা দিলে, হায়েলের গভর্নর মোহাম্মদ বিন

রশীদ উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সৌদী শাসক আব্দুর রহমান বিন ফয়সলের কাছ থেকে রিয়াদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে, ২য় বারের মত সৌদী শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

এদিকে, ক্ষমতাচ্যুত সৌদী শাসক আবদুর রহমান বিন ফয়সল রিয়াদের আর-রোবউল খালি মরুভূমিতে সপরিবারে দিন কাটাতে থাকেন। ১১ বছর বয়স্ক ছেলে আবদুল আযীয এখানে ঘোড়াদৌড় শিখেন এবং মরুভূমির প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করার শক্তি সাহস অর্জন করেন। পরে কুয়েতের আমীর শেখ মোবারক আস-সাবাহর আমন্ত্রণক্রমে আবদুর রহমান সপরিবারে কুয়েতে বাস করতে থাকেন।

তখন কুয়েত ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ। একদিকে, জার্মানী বাগদাদ থেকে কুয়েত পর্যন্ত বৃটিশ প্রভাব মুছে ফেলে নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করতে চায়। অপরদিকে, বৃটেন তার ভারতীয় উপনিবেশে পৌছার নিরাপত্তার স্বার্থে আরব উপসাগরীয় নৌপথে অন্য কোন শক্তির প্রভাব বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে, তুরস্কের ওসমানী খলীফা বৃটিশ ষড়যন্ত্রের কারণে আরব উপদ্বীপ থেকে নিজেদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলায় আরব উপসাগরে বৃটিশ প্রভাবের পরিবর্তে জার্মানীর অনুপ্রবেশ কামনা করে। আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান কুয়েতের আমীরের দরবারে বসে এ সকল জটিল বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯০২ খৃঃ মোতাবেক ১৩১৯ হিঃ কুয়েত থেকে ফিরে এসে রিয়াদের উপর আক্রমণ করে তা পুনরুদ্ধার করেন। তখন থেকে নজদে ৩য় সৌদী শাসনের সূচনা হয়।

কুয়েতের নির্বাসন থেকে ফিরে এসে, আবদুল আযীয বিন আবদুর রহমান বিন মুহম্মদ বিন ফয়সল বিন সউদ নিজেকে নজদের সুলতান ঘোষণা করেন। তিনি ১৩৪৩ হিজরীর ৮ই জুমাদাল উলা মক্কায় পৌছেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তারপর ১৩৪৪ হিজরীতে মদীনা ও জেদ্দায় যান এবং সেখানকার লোকেরাও তাঁর হাতে বাইআত নেয়। ১৯৩২ খৃঃ মোতাবেক, ১৩৫১ হিজরীর ২১শে জুমাদাল উলা তিনি মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, তায়েফ, রিয়াদসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করে 'সৌদী আরব রাজতন্ত্র' নামকরণ করেন এবং

নিজেকে এর বাদশাহ ঘোষণা করেন।(৩১)

বাদশাহ আবদুল আযীয কুরআন ও সুন্নাহকে সৌদী আরবের শাসনতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দেশে ইসলামী শরীয়াহ বা আইন প্রবর্তন করেন। ১৩৫৭ হিঃ মোতাবেক ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, দাহরানে ১ম তেল খনি আবিষ্কার হয় এবং সেই বছরই বিদেশে তেল রফতানি শুরু হয়। তেল সৌদী আরবের বিরাট আয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তেলের পয়সার প্রাচুর্যের ফলে হারাম শরীফের উন্নয়ন শুরু হয়।

১৯৪৯ খৃঃ মোতাবেক ১৩৬৮ হিজরীতে বাদশাহ আবদুল আযীয মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। তিনি ১৩৭৩ হিজরীতে মারা যান।(৩২) কিন্তু তাঁর ছেলে বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযীযের সময়, ১৩৭৫ হিজরীতে মসজিদে হারামের প্রথম সৌদী সম্প্রসারণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তুর্কী সুলতান সেলিমের নির্মিত ১ তলা ভবনকে অক্ষুণ্ন রেখে এর পেছনে সুরম্য দোতলা মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং এতে মূল্যবান মার্বেল পাথর লাগানো হয়। সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাসআ' (সাঈ করার জায়গা) কে সম্প্রসারিত করে তাকে দোতলা করা হয়। পরে মসজিদে হারামের দোতলা বরাবর, মাটির নীচে আরেকতলা নির্মাণ করা হয়। মাতাফে তাপ নিয়ন্ত্রিত মার্বেল পাথর বসানো হয়। যমযমে ডুবুরী নামিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এতে করে, যমযম কূপের অজানা বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। যমযম কূপের বর্ণনায় আমরা তা উল্লেখ করেছি। এরপর যমযমের পানিকে ঠাণ্ডা করার জন্য মসজিদে হারামের পার্শ্বে একটি কারখানা নির্মাণ করা হয়। পাইপের মাধ্যমে কূপ থেকে সরাসরি সেখানে পানি নিয়ে, পুনরায় পাইপের মাধ্যমে পানি পান করার কলসমূহে ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করা হয়। মাসআ'র উপর ৬টি ওভারব্রীজ বা পুল নির্মাণ করা হয় যেন ভিড়ের সময় সাঈর ক্ষতি না করে লোক পারাপার করতে পারে। ৭টি বড় মিনারা তৈরি করা হয়। বর্তমানে সম্পূর্ণ মসজিদে হারামকে নাতিশীতোষ্ণ বা এয়ার কণ্ডিশন্ড করার জন্য চিন্তা-ভাবনা চলছে। মসজিদে হারামে বহু পাখা, বাতি ও ঘড়ি লাগানো হয়েছে। মসজিদে হারামের ছাদের উপর নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতে তাপ নিয়ন্ত্রিত মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে যেন সব সময় তাতে নামায পড়া যায়। হারাম শরীফের তিন তলা ও ছাদে উঠার জন্য স্বয়ংক্রিয় ৩টি বৈদ্যুতিক সিঁড়ি চালু

করা হয়েছে। মসজিদে হারামের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কা শহরের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বহু সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো আলোকোজ্জ্বল ও গরম নিয়ন্ত্রিত পাখা সজ্জিত। হারাম শরীফের সংলগ্ন স্থানে হারাম শরীফের একটি বাণিজ্যিক এলাকা নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানকার দোকানপাটগুলো ভাড়া দেয়া হয়েছে।

যমযম কূপের পানি হারাম শরীফের বাইর থেকে সহজে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তিন স্থানে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়াও গাড়ীতে করে প্রতিদিন মদীনার মসজিদে নববীতে যমযমের পানি সরবরাহ করা হয়। হারাম শরীফের ভেতর পানির শত শত বড় বড় পাত্র বসানো হয়েছে। সেগুলোতে যমযমের পানি থেকে তৈরি বরফ সরবরাহ করে ঠাণ্ডা পানি পান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো হারাম শরীফ উন্নত ও মূল্যবান কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত।

১৪০০ হিঃ ১লা মুহররম, মোতাবেক ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর, জোহায়মান বেগের নেতৃত্বে একদল সৌদী নাগরিক সৌদী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পবিত্র মসজিদে হারাম দখল করে নেয়। তাদের দৃষ্টিতে সৌদী আরবে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম নেই। তাই তারা বিদ্রোহ করে এবং অগণিত অস্ত্রশস্ত্র সহকারে মসজিদে হারামে প্রবেশ করে। তারা সৌদী সরকারের পুলিশ ও অন্যান্যদের উপর গুলী ছোঁড়ে। সৌদী বাহিনীর গুলীতে বিদ্রোহীদের অনেকেই মারা যায় এবং অবশিষ্টরা সুদীর্ঘ ১৫ দিন অবরোধের পর, ৫ই ডিসেম্বর মোতাবেক, ১৫ই মুহররম সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা হারাম শরীফের সকল দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ভেতরের মুসল্লীদেরকে বের হতে বাধা দেয়। পরে, তাদের বিরুদ্ধে সৌদী উচ্চ উলামা পরিষদ এক ফতোয়া জারি করে এবং তাদেরকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। দুই পক্ষের গোলাগুলীতে অনেকেই নিহত হওয়ায় বিদ্রোহীদের সবাই গ্রেফতার হয়নি। তাদের ৬০ জন বন্দীকে শরীয়াহ কোর্টের ফয়সালা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

১৪০৭ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখে, এক সংঘর্ষে ৪ শতাধিক ইরানী হাজী মারা যায় এবং আরো কিছু সংখ্যক বিদেশী হাজী এবং সৌদী নাগরিকও মারা যায় বলে সৌদী সরকার ঘোষণা করেন। ইরানে শিয়াপন্থী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর

নেতৃত্বে ইসলামের নামে ১৪০০ হিজরীর শুরুতে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, ইরানী হাজীরা প্রতিবছর হজ্জে তার মহড়া প্রদর্শন করে। তারা মিছিল বের করে ও ইমাম খোমেনীর ছবি সম্বলিত প্লাকার্ড ও পোস্টার বহন করে। তারা ইসলামী বিপ্লব এবং খোমেনীর পক্ষে শ্লোগান দেয় এবং রুশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক মর্মে গগণবিদারী আওয়াজ তোলে।

সৌদী সরকারের আইনে এ সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক বছর ইরান সরকারকে তা বুঝানোর চেষ্টা সত্ত্বেও ইরানী হাজীরা তা মানে না বরং এই বছরও উল্লেখিত তারিখে, তারা মিছিল নিয়ে হুজুন পেরিয়ে আসলে সৌদী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং এতে বেসরকারী হিসেব মোতাবেক, সহস্রাধিক লোক মারা যায়।

সৌদী শাসনামলে মিনার ব্যাপক উন্নয়ন হয়। জামরায় পাথর মারার প্রচণ্ড ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে সেটিকে চারতলা করা হয়। এ ছাড়াও সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্য সেখানে বহু পুল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়। মিনায় হাজীদের ভিড় বেশী হওয়ায়, পাহাড়ের উপরিভাগ তথা ছাদকে সমান করা হয় এবং সেখানে হাজীদের অবস্থানের সুযোগ করে দেয়া হয়।

আ'রাফাতের মসজিদে নামেরাকে প্রশস্ত করা হয়। সেখান থেকে ইমাম হজ্জের দিন খোতবা দিয়ে থাকেন।

মোযদালেফায় 'মাশআরুল হারামে' একটি বড় ও সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

হারাম শরীফের পার্শ্বে বিভিন্ন দেশের সরকারী মেহমানদের জন্য এক বিরাট সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করা হয়। এছাড়াও জাবালে আবু কোবায়েসে বাদশাহ ও রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য তিনটি সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করা হয়।

বর্তমানে, হারামের বাবে আবদুল আযীয থেকে বাবে উমরাহ বরাবর মসজিদে হারামের নতুন সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২রা সফর, ১৪০৯ হিঃ মোতাবেক, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ খৃঃ বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয ৩ তলা বিশিষ্ট সম্প্রসারণ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এতে দুটো স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিঁড়ি লাগানো হয়েছে।

বিভিন্ন শাসকদের আমলে, হারাম শরীফের দরজাসমূহের পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে। বর্তমানে এতে প্রধান ৩টি দরজা এবং ৩৩টি সাধারণ দরজা আছে। নতুন সম্প্রসারিত অংশে, একটি প্রধান ফটক ও ১৪টি সাধারণ দরজা নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়াও এতে বর্তমান ৭টি মিনারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরো দুটো মিনারা তৈরি করা হয়েছে। মাটির নীচতলার জন্য বর্তমানে ৪টি প্রবেশ পথ আছে। সম্প্রসারিত অংশের নীচতলার জন্য আরো ২টি প্রবেশপথ নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রসারিত অংশের ছাদকেও বর্তমান ছাদের অনুরূপ নামায পড়ার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।

হারাম শরীফের বিরাট লাইব্রেরী রয়েছে। এতে দুষ্প্রাপ্য বইসহ অন্যান্য অজস্র বই-পুস্তকের সমাহার। এতে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে।

৯/৩/১৪০৯ হিজরীতে, বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয 'মক্কা নির্মাণ ও উন্নয়ন কোম্পানী'র নতুন কিছু প্রকল্প উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, হারাম শরীফের চারদিক উন্নয়ন করা। এতে হাজীদের জন্য ৬৭টি নতুন ভবন, ৭৬৪ কক্ষ বিশিষ্ট ১২টি বিল্ডিং, ১ হাজার দোকানপাট, ৬৫২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফাইভ স্টার হোটেল, ১২০০ গাড়ী সংকুলানের জন্য পার্কিং এবং ২২ হাজার লোকের নামায পড়ার উপযোগী মসজিদ নির্মাণ করা।

অতীতের যে কোন যুগ ও সরকারের চেয়ে, সৌদী শাসনামলেই হারাম শরীফের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মা'আরেফুল কোরআন, সূরা আস-সাফফাত।
২. তাফহীমুল কোরআন, সূরা আস-সাফফাত।
৩. তারীখে মক্কা, আহমদ আস-সিবায়ী, মক্কা।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. ফী রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেক।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. তাফহীমুল কোরআন, সূরা ফীল, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
১০. হজ্জের হাকীকত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
১১. তারীখে মক্কা, আহমদ আস-সিবায়ী।
১২. হজ্জের হাকীকত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৩. The Life of the Prophet Muhammad, Laila Azzam and Ayesha Governeur, London.
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. ফী রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেক।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. তারীখে মক্কা, আহমদ আস-সিবায়ী।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. তারীখু মামলাকাতিল আরাবিয়া আস-সাউদিয়া, সালাউদ্দীন আল-মোখতার।
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. সাকার আল-জাযীরাহ, আহমদ আবদুল গফুর আত্তার।
৩২. প্রাগুক্ত।

৪. কা'বা শরীফ

কাবা শরীফের ইতিহাস

হযরত ইবরাহীম (আ) এর আগে কা'বা নির্মাণকারীদের বর্ণনা

মক্কার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমে ফেরেশতারা মক্কায় কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে আল্লাহর এবাদত করেন। তখন, যমীনে কোন মানুষ ছিল না। ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে কা'বা তৈরি করে এখানে এবাদত করেন। সে সময় যমীনের একমাত্র বাসিন্দা ছিল জিন।

পরে আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, কখন এই কা'বা মানুষের এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং হযরত আদম (আ) কে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে মক্কাকে তাঁর এবাদতের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। তিনি মক্কার প্রথম আবাদকারী মানুষ ও নবী। তিনি মক্কায় আসার পর শয়তানের ভয় করতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে তার অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করেন। আল্লাহ তখন মক্কার সীমানা পাহারা দেয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে পাঠান। ফেরেশতারা যে সুনির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে পাহারা দেন তাকে 'হুদুদে হারাম' বা 'হারাম এলাকা' বলা হয়। আমরা এ ব্যাপারে, ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ ফেরেশতাদের জন্য, ৭ম আসমানে, যমীনের কা'বা বরাবর আরেকটি সম্মানিত মসজিদ তৈরী করেন। সেটির নাম হচ্ছে মসজিদে 'বাইতুল মামুর'। প্রতিদিন সেই মসজিদে ৭০ হাজার ফেরেশতা তওয়াফ করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা আর ২য় বার এর তওয়াফ করার সুযোগ পাবেন না। এইভাবে প্রতিদিন মসজিদে বাইতুল মামুরের তওয়াফ চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-ই কা'বার প্রথম নির্মাণকারী বলে প্রচলিত আছে। কিন্তু তিনি এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন। তাঁর আগেই এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কুরআনের আয়াতেও একথার ইঙ্গিত মিলে। আল্লাহ বলেন,

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ (البقرة - ١٢٧)

অর্থ ঃ 'স্মরণ কর, যখন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) বাইতুল্লার ভিত্তিকে উপরের দিকে উঠান।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ) নিজে কা'বার ভিত্তি স্থাপন করেননি। বরং পূর্বের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর তিনি উপরের দিকে দেয়াল উঠান। তাহলে, এই ভিত্তি, অবশ্যই পূর্বে কেউ স্থাপন করেছেন। ফেরেশতারা

বায়তুল্লাহর ছবি

অবশ্যই ভিত্তিহীন ঘরে আল্লাহর এবাদত করেননি এবং হযরত আদমও (আ) নয়। তবে ফেরেশতা এবং হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে কে প্রথম এর ভিত্তি স্থাপন করেন তা নিশ্চিত জানা যায় না। ফেরেশতারা যেহেতু আগে এর এবাদত করেছেন, তাই যুক্তিসঙ্গত কারণে তারাই এর ভিত্তিস্থাপন করেন।

পক্ষান্তরে, *তারীখ এমরাতুল মসজিদিল হারাম* বইয়ের লেখক তাঁর বইতে ইবনে সুরাকার একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন যে, কা'বার দরজার সামনে 'মোসাল্লা আদম' অবস্থিত। অর্থাৎ হযরত আদম (আ) সেখানে নামায পড়েছেন।

হযরত আদম (আ)-এর তৈরি কা'বা হয়তো দীর্ঘদিন পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারপর,

আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন নবীদের উপর ওহী নাযিলের মাধ্যমে কা'বার নির্দিষ্ট স্থান জানিয়ে দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী কা'বার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের কাজ চলেছে।

হযরত নূহ (আ) এর মহাপ্লাবনের সময় কা'বা শরীফ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুনরায় কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়।

ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে কা'বা শরীফ নির্মাণকারীদের সংখ্যা ১১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. ফেরেশতা ২. হযরত আদম (আ) ৩. হযরত শীস (আ) ৪. হযরত ইবরাহীম (আ) ৫. আমালেকা সম্প্রদায় ৬. জোরহোম গোত্র ৭. কুসাই বিন কিলাব ৮. কোরাইশ ৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) ১০. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং ১১. সুলতান মুরাদ।

ঐতিহাসিকরা কা'বা শরীফ নির্মাণকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে পুরো একমত হতে পারেননি। তবে তিনজন পুনঃনির্মাণকারীর ব্যাপারে কারুর কোন মতভেদ নেই। সেই তিনজন হচ্ছেন– ১. হযরত ইবরাহীম (আ) ২. কোরাইশ এবং ৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা)। অবশ্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফও পরে কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করেছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কা'বা শরীফ নির্মাণের ঘটনা স্বয়ং আল্লাহ কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَا عِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ (البقرة ـ ١٢٧)

অর্থ ঃ "স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) কা'বার ভিত্তির উপর দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে তা উঁচু করেন, তখন তাঁরা দোয়া করেছিলেন যে, হে আমাদের রব, আমাদের কাজকে কবুল করুন; নিঃসন্দেহে, আপনি মহান শ্রোতা ও জ্ঞানী।"

হাদীসে কোরাইশদের কা'বা শরীফ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কা'বা নির্মাণের ব্যাপারে সকল মোফাস্‌সের ও ঐতিহাসিকরা একমত। আল্লামা আযরাকী, তকীউদ্দিন আল্‌-ফাসী, আল-কোতবী এবং ইবনে জোহায়রা, তাঁদের লিখিত মক্কার ইতিহাসে এ ব্যাপারে ঐকমত প্রকাশ করেছেন। কা'বা শরীফ নির্মাতাদের ব্যাপারে সামঞ্জস্য

বিধানের জন্য একথা বলা যায় যে, ঐ এগার জন কা'বা শরীফের পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও মেরামতের ব্যাপারে কম-বেশী অংশ নিয়েছেন।

তবে তিন জন, মৌলিকভাবে, কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছেন এবং এর ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। ফেরেশতা এবং হযরত আদম (আ) কা'বা শরীফকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন। হযরত শীস (আ), কুসাই বিন কিলাব এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কা'বা শরীফের কোন কোন দেয়াল ভেঙ্গে পুনরায় তার সংস্কার কিংবা মেরামত করেছেন। আল্লামা কোতবী তাঁর تَارِيْخُ الْاَعْلَامِ বইতে এই কথারই উল্লেখ করেছেন।

এখন আমরা প্রধান তিনজন কা'বা শরীফ নির্মাতার ব্যাপারে আলোচনা করবো।

১. হযরত ইবরাহীম (আ) এর কা'বা শরীফ নির্মাণ

আল্লামা আযরাকী লিখেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কাদা ও চূনা ব্যতীত, পাথরের উপর পাথর রেখেই কা'বা শরীফের দেয়াল নির্মাণ করেন। তিনি কা'বা শরীফের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকার সময় হাতের ডান দিকে, ভেতরে তিন হাত গভীর একটি গর্ত খোড়েন। এটি ছিল কা'বা শরীফের অর্থ ভাণ্ডার। কা'বা শরীফের জন্য আসা সকল প্রকার উপহার এতেই রাখা হত। তিনি কাবা শরীফের ছাদ দেননি এবং কাঠ বা কিছু দিয়ে দরজাও তৈরী করেননি। ঘরের ছাদ খোলা ছিল এবং ঘরের পূর্ব দিকে দরজার স্থানটিও ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন। পূর্বদিকে দরজা রেখে তিনি ঘরটি যে পূর্বমুখী, তা বুঝাতে চেয়েছেন। ঘরের দরজা ফাঁকা রাখার কারণ হল, তখন তাঁরা চুরি ও খেয়ানতের সাথে পরিচিত ছিলেন না। স্বয়ং তাঁদের কাছে চুরি হওয়ার মত এরকম কোন সম্পত্তি এবং সোনা-রূপাও ছিল না। বর্তমান যুগের মানুষের মত, সে যুগের মানুষেরা এরকম মজবুত কোন দালান-কোঠায় বাস করত না।

হযরত ইবরাহীম (আ) ৫ পাহাড়ের পাথর দিয়ে কা'বা শরীফ তৈরী করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১. সিনাই পাহাড় ২. বাইতুল মাকদেসের যাইতা পাহাড় ৩. লুবানন পাহাড়দ্বয় ৪. জুদি পাহাড় এবং ৫. হেরা পাহাড়। ফেরেশতারা ঐ সকল পাহাড় থেকে পাথর এনে দিতেন। তিনি পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন। হযরত

ইসমাইল (আ) তাঁকে পাথর তুলে দিতেন। তিনি হযরত আদম (আ) এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর কা'বা শরীফের দেয়াল তৈরি করেন। হযরত আদম (আ) এর সময় ফেরেশতারা হেরা পাহাড় থেকে পাথর এনে দিতেন আর হযরত আদম (আ) সেই পাথর দিয়ে কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেন।[১] সেটাকে আরবীতে اَلْقَوَاعِدْ বা 'মূল ভিত্তি' বলা হয়। উপরোল্লিখিত আয়াতে এই শব্দের উল্লেখ দ্বারাই এই অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফের মাত্র দুটো কোণ তৈরী করেন। একটা হচ্ছে রোকনে ইয়ামানী আর অপরটি হচ্ছে রোকনে আসওয়াদ বা হাজারে আসওয়াদের কোণ।

তিনি হিজরে ইসমাঈলের দিকের দুটো কোণের একটি কোণও তৈরি করেননি বরং সেই দিকটিকে অর্ধবৃত্ত রেখার মত গোলাকার রেখেছেন। সেই দিকটাকে, বর্তমান হাতীমে কা'বার গোলাকার দেয়ালের মতই দেখা যেত। কা'বা শরীফের ঐ দিকেই হিজরে ইসমাঈল বা 'ইসমাঈল (আ) কর্ণার' নির্ধারণ করেন। 'হিজরে ইসমাঈল' বা ইসমাঈল (আ) কর্ণার আরাক কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে তিনি তাঁর ভেড়া বকরী রাখারও ব্যবস্থা করেছিলেন।[২]

হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফের দরজার স্থানটিকে মাটির সমান রেখেছিলেন, উঁচু করেননি। বর্তমানে যে উঁচু দরজা দেখা যায় তা কোরাইশরা তৈরি করেছে।

কাবা শরীফের ইতিহাসগুলোতে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বার দেয়াল ৯ হাত উঁচু করেন। দরজা সংলগ্ন সামনের দেয়ালের দৈর্ঘ ৩২ হাত, এর বরাবর পেছনের দেয়ালের দৈর্ঘ ৩১ হাত, হিজরে ইসমাঈল এবং মীযাবে কা'বার দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ ২২ হাত এবং হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মাঝামাঝি দেয়ালের দৈর্ঘ ২০ হাত নির্মাণ করেন।

কিন্তু সৌদী আমলে, কা'বা শরীফের যে সঠিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে এইরূপ ঃ দরজা সংলগ্ন সামনের দেয়ালের দৈর্ঘ ৩৩ হাত, এর বরাবর পেছনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩২ হাত, হিজরে ইসমাঈল এবং মীযাবে কা'বার দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২৭ হাত এবং হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মাঝামাঝি দেয়ালের দৈর্ঘ ২০ হাত। এটাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর নির্মিত কা'বার সঠিক মাপ বলে সর্বশেষ ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেছেন।

'তারীখুল কা'বা-আল-মোয়াজ্জামার' লেখক উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফের দুটো দরজা রেখেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে, এই তথ্য ঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়। তিনি কেবল কা'বা শরীফের একটি মাত্র দরজাই রেখেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মাটির কাদা দিয়ে গারা তৈরি করে তা দিয়ে দেয়াল তৈরি করেছেন এবং সেজন্য গারা তৈরির স্থানটিকে 'মে-জানা' নাম দিয়ে বলেছেন, সেটি মোসাল্লা জিবরাইলের স্থানে অবস্থিত ছিল। 'মোসাল্লা জিবরাইল' সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু মক্কার সবচাইতে বড় ঐতিহাসিক আল্লামা আযরাকীর মতে, ইবরাহীম (আ) বিনা গারাতেই কাবা শরীফের দেয়াল তৈরি করেছেন এবং শুধু পাথরের উপর পাথর বসিয়ে দিয়েই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছেন।

২. কোরাইশ গোত্রের কা'বা নির্মাণ

এক মহিলার হাতের আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে কাবা শরীফে আগুন লাগে এবং গেলাফ জ্বলে যায়। ফলে চারদিকের দেয়াল দুর্বল হয়ে পড়ে। দেয়ালের বাইর দিয়ে গেলাফে কা'বা ঝুলানো হত এবং উপর থেকে ভেতর দিয়ে তা বাঁধা হত। কোরাইশরা কা'বা পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে তা ভাংগল। কিন্তু কাবার ধ্বংসাবশেষ সরানোর ব্যাপারে তারা ভয়-ভীতির সম্মুখীন হল। পরে ওলীদ বিন মুগীরা কাবা শরীফের ১ম পাথরটি সরিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ, অসন্তুষ্ট হয়োনা। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ।' পরে সব লোক ওলীদ বিন মুগীরাকে অনুসরণ করে পাথর সরানোর কাজে লেগে যায়। তারা কা'বা শরীফকে আরো বড় করে। ফলে, তারা বাড়তি পাথরগুলো, হেরা পাহাড়, সাবির পাহাড়, তায়েফ ও আরাফাতের মধ্যবর্তী পাহাড়সমূহ, খন্দমা এবং বর্তমানে মক্কার যাহেরের নিকটবর্তী হালহালা পাহাড় থেকে কুড়িয়ে আনে।(৩)

নবী করীম (সা) এর নবুওতের ৫ বছর আগে, অর্থাৎ তাঁর ৩৫ বছর বয়সে, কোরাইশরা কাবা শরীফ নির্মাণ করে। তারা হিজরে ইসমাঈলের দিকে, কাবা শরীফের সাড়ে ৬ হাত দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেয়। অর্থের অভাবেই তারা কাবা শরীফের দৈর্ঘ্য কমিয়েছিল। তারা হিজরে ইসমাঈলের চারদিকে একটি ছোট দেয়াল নির্মাণ

করে। লোকেরা এই দেয়ালের পেছন দিয়ে তওয়াফ করত। তারা কা'বা শরীফের দরজা উঁচু করে নির্মাণ করে যেন ভেতরে বন্যার পানি না ঢুকে এবং তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ঢুকতে দেয় এবং যাকে ইচ্ছা তাকে ঢুকতে বাধা দিতে পারে। তারা বিনা জোড়ায় এক অংশ বিশিষ্ট কাবার দরজা তৈরি করে এবং উপহার সামগ্রী রাখার জন্য ভেতরের গভীরে ভাণ্ডারটিকে টিকিয়ে রাখে। তারা ভেতরে দুই সারিতে তিনটি করে মোট ৬টি খুঁটি দেয় এবং কাবা শরীফের ছাদ দেয় ও উত্তর দিকে হিজরে ইসমাঈলের উপর পানি পড়ার জন্য ছাদে নল লাগায়। এই নলটিকে 'মীযাব' বলা হয়। তারা কাবা শরীফের উচ্চতা হযরত ইবরাহীম (আ) এর নির্মিত কাবার উচ্চতার চেয়ে ৯ হাত বেশী বাড়িয়ে ১৮ হাত করে। তারা কাবা শরীফের কোণ তৈরির ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ) এর পদ্ধতিকেই অব্যাহত রাখে। ফলে দুটো কোণ তৈরি করে হিজরে ইসমাঈলের দিককে গোলাকার রেখে দেয়। শুধু তাই নয়, লোকেরা কাবা শরীফের প্রতি সম্মানের উদ্দেশ্যে, নিজেরাও গোলাকৃতির ঘর তৈরি শুরু করে। প্রথমে, হোসাইদ বিন যোহাইর কাবার অনুকরণে মক্কায় গোলাকৃতির ঘর তৈরি করে।

কোরাইশরা কাবা শরীফ নির্মাণের ব্যাপারে রোমের বাকুম নামক একজন কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য নেয়। সে ইয়েমেনের এডেন সমুদ্রোপকূলে ব্যবসা করত। সে নৌকা ভর্তি কাঠ নিয়ে এসেছিল। সে যখন মক্কা থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে লোহিত সাগরের শোয়াইবিয়া উপকূলে পৌছল, তখন তার নৌকা ভেঙ্গে গেল। কোরাইশরা খবর পেয়ে কাবা শরীফের ছাদ নির্মাণের জন্য তার কাছ থেকে কাঠ ক্রয় করল। কোরাইশরা বাকুমের সাথে সিরিয়ান নির্মাণ পদ্ধতিতে, কাবা শরীফ নির্মাণ এবং সে সহ তার সফরসঙ্গীদের সাথে এ মর্মে শর্ত করে যে, তারা মক্কায় প্রবেশ করে তাদের সাথে আনা পণ্যদ্রব্য বিক্রী করে ফিরে যাবে এবং মক্কায় বসবাস করবে না। কাবার নির্মাণ কাজ শেষে বাকুম জিজ্ঞেস করল যে, কাবার ছাদ তৈরি করা হবে কিনা? কোরাইশরা ছাদ তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল। তখন বাকুম কাবার ছাদ তৈরি করে।

কিন্তু কোরাইশদের কাবা নির্মাণের সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে হাজারে আসওয়াদকে তার স্থানে বসানোর ব্যাপারে। কে এই পাথরকে যথাস্থানে বসানোর সম্মান অর্জন করবে, এই নিয়ে কোরাইশদের মধ্যে চরম মতবিরোধ দেখা দেয়। কোরাইশদের ১২টি শাখা বা গোত্রের কেউ একে অপরকে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের

সুবিধে দিতে নারাজ। এই নিয়ে লড়াই এর আশংকা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, পরের দিন ভোরে প্রথম যে ব্যক্তি কাবা শরীফে আগমন করবে সে এই সমস্যার সমাধান করবে। পরের দিন সকালে, সবার নজর সেই আগমনকারী ব্যক্তির দিকে। সেইদিন আরবের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসী বলে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ প্রথম কাবায় আগমন করেন। স্বভাবতঃই ফয়সালার ভার পড়ে তাঁর উপর। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদকে এর উপর রাখেন এবং কোরাইশের প্রত্যেক গোত্রের নেতাদেরকে চাদর ধরে তা উপরে উঠানোর আহ্বান জানান। পরে তিনি নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদকে বসিয়ে ঐ কঠিন সমস্যার বিজ্ঞ সমাধান করেন। এতে সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে খুশী হয়। মক্কার প্রখ্যাত অংকন শিল্পী তাহের কুর্দী হযরত ইবরাহীম (আ) এর নির্মিত কাবা এবং কোরাইশদের নির্মিত কাবার পার্থক্য দেখিয়ে দুটো ছবি বা ডিজাইন অংকন করেছেন। আহমদ আস-সিবায়ী তার تَارِيْخُ مَكَّةَ মক্কার ইতিহাস বইতে সে দুটো ডিজাইন ছেপেছেন। আমরাও পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে সে দুটো ডিজাইন এখানে পেশ করলাম।
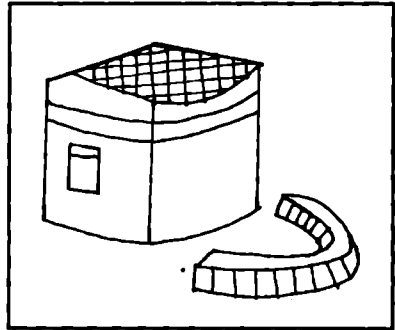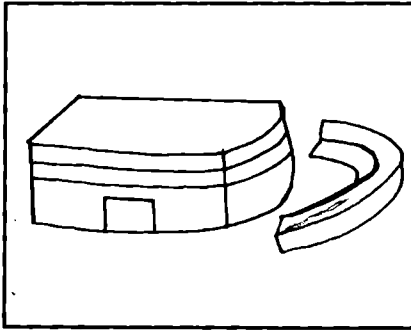
ইবরাহীম (আ) নির্মিত কাবার ছবি বা ডিজাইন

কোরাইশদের নির্মিত কাবার ডিজাইন

৩. আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের কাবা শরীফ নির্মাণ

দুই কারণে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। প্রথমটি হচ্ছে, খেলাফত নিয়ে তাঁর সাথে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার (রা) যুদ্ধ। ইয়াজিদের বাহিনী মক্কা আক্রমণ করলে, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) তাঁর দলবল

নিয়ে কাবা শরীফের চারপাশে তথা মসজিদে হারামে আশ্রয় নেন। তাঁরা রোদ থেকে বাঁচার জন্য মসজিদে হারামে তাঁবু দাঁড় করান। ইয়াজিদের সেনাবাহিনী প্রধান হোসাইন, মেনজানিক দ্বারা হারাম শরীফে পাথর নিক্ষেপ করে। এর ফলে, পাথর কা'বা শরীফের গায়ে লেগে দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং দেয়াল দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ঐ একই সময়ে, এক ব্যক্তি তাঁবুগুলোর একটিতে আগুন জ্বালায়। তখন খুব জোরে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। এর ফলে, আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ কাবা শরীফের গেলাফে লেগে আগুন ধরে যায়। তখন গেলাফ জ্বলে যায় এবং দেয়ালে আরো বেশী ফাটল ধরে।

ইয়াজিদ বাহিনী যখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়েরের বিরুদ্ধে অবরোধ প্রত্যাহার করে, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের কাবা শরীফ ভেঙ্গে একে হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কোরাইশরা অর্থাভাবে, হযরত ইবরাহীম (আ) এর পুরো ভিত্তির উপর কাবা পুনঃনির্মাণ না করে, হিজরে ইসমাঈলের দিকে ৬ হাত ১ বিঘত পরিমাণ কাবার অংশ ছেড়ে দেয়। যাই হোক হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসসহ অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম (রা) এই প্রস্তাবের সাথে একমত হলেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের যখন কাবাঘর ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং কাবাঘর ভাঙ্গার জন্য অগ্রসর হন তখন মক্কার বহু লোক আযাবের ভয়ে মক্কা ছেড়ে মিনায় চলে যান। হযরত ইবনে যোবায়ের একদল নিগ্রোকে কাবা শরীফ ভাঙ্গার জন্য নিযুক্ত করেন তারা সম্পূর্ণ কাবা ভেঙ্গে যমীনের সাথে সমতল করে ফেলে।

হিজরী ৬৪ সালের ১৫ই জুমাদাল উলা, রোজ শনিবার কাবা শরীফকে ভেঙ্গে পরে তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করা হয়। কোরাইশরা হিজরে ইসমাইলের সাথে কাবা শরীফের যে অংশ বাদ রেখেছিল ইবনে যোবায়ের সেই অংশকে পুনরায় কাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত করেন। কোরাইশরা কাবার উচ্চতা, হযরত ইবরাহীম (আ) এর নির্মিত উচ্চতার চাইতে ৯ হাত বেশী বাড়িয়েছিল। ইবনে যোবায়ের সেই উচ্চতাকে আরো ৯ হাত বাড়ান। ফলে, কাবা শরীফের মোট উচ্চতা ২৭ হাতে গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি কাবার দুটো দরজা লাগান। একটি তো এখন পর্যন্তই বিদ্যমান। অপরটি সামনের দরজা বরাবর পেছনের দিকে। পরবর্তীকালে পেছনের দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

তিনি এ ব্যাপারে এবং হিজরে ইসমাঈলের দিক থেকে কাবার যে অংশ কুরাইশরা কাবা শরীফের বাইরে রেখেছিল, সে অংশটুকুকে পুনরায় কাবা শরীফের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাঁর খালা হযরত আয়িশা (রা) এর বর্ণিত একটি হাদীসের উপর নির্ভর করেন। যাই হোক, তিনি ভেতরে, এক সারিতে তিনটি খুঁটি তৈরি করেন এবং রোকনে শামীর ভেতরের কোণে একটি সিঁড়ি তৈরি করেন। ঐ সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠার ব্যবস্থা করেন। ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি নল লাগান। ঐ নল দিয়ে ছাদের পানি হিজরে ইসমাঈল বা হাতীমে কাবায় পড়ে।

কথিত আছে যে, তিনি ইয়েমেন থেকে চুনা সংগ্রহ করে তা দিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি সীসা গলিয়ে এতে ইয়েমেনের ওয়ারস নামক হলুদ রং এর ঘাসের রং মিশ্রিত করে তা দিয়ে পাথরের গাঁথুনী দেন। কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ শেষে তিনি কাবা শরীফের ভেতর মেশ্‌ক আম্বর এবং বাইরের দেয়ালের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত মেশক ছিটান। তারপর রেশমী কাপড় দিয়ে গেলাফ দেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মিসরের তৈরি প্রখ্যাত কাবাতী কাপড় দিয়ে গেলাফ দেন। সেই দিনটি বড়ই উল্লেখযোগ্য। কেননা, সেই দিনের চেয়ে অন্য কোন দিন এত বেশী গোলাম আজাদ হয়নি কিংবা এর চেয়ে অধিক সংখ্যক উট ও বকরী কোরবানী হয়নি। তারপর হযরত ইবনে যোবায়ের খালি পায়ে হেঁটে তানয়ীমের মসজিদে আয়েশায় যান। তাঁর সাথে বহু কোরাইশও পায়ে হেঁটে সেখানে যান। তাঁরা সবাই আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের জন্য সেখান থেকে উমরাহর এহরাম পরেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভিত্তির উপর কাবা নির্মাণ করার সুযোগের জন্য তাঁরা এর শুকরিয়া স্বরূপ এই উমরাহ্ করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবা শরীফের আংশিক মেরামত করেছেন, পূর্ণাঙ্গ মেরামত করেননি। তাও আবার দীনী উদ্দেশ্যের চাইতে অধিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) এর শাহদাতের পর হাজ্জাজ উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের কাছে চিঠি লিখলেন যে, ইবনে যোবায়ের কাবার বহির্ভূত অংশকে কাবার ভেতর ঢুকিয়েছেন এবং কাবার ২য় আরেকটি দরজা নির্মাণ করেছেন। তিনি কাবা শরীফকে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কাবা মেরামতের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবদুল মালেক তাকে অনুমতি দেন। ফলে তিনি কাবা শরীফের কিছু পরিবর্তন করেন

এবং কাবা শরীফকে আরো ছোট করেন। বর্ণিত আছে যে, আবদুল মালেক হাজ্জাজকে ঐ অনুমতি দিয়ে পরে লজ্জিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ হাজ্জাজ, ইবনে যোবায়েরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ স্বরূপ, তাঁর সকল স্মৃতি ও কর্মের প্রভাব মুছে ফেলার উদ্দেশ্যেই ইবনে যোবায়ের নির্মিত কাবার পরিবর্তন সাধন করেন।

এখন আমরা আহমদ আস-সিবায়ী কর্তৃক লিখিত তারীখে মক্কায়, মক্কার প্রখ্যাত অংকন শিল্পী তাহের কুর্দীর অংকিত কাবার দুটো ডিজাইন বা নকশা পেশ করছি। ১মটি হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) এবং ২য়টি হচ্ছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক নির্মিত কাবার ডিজাইন বা ছবি।
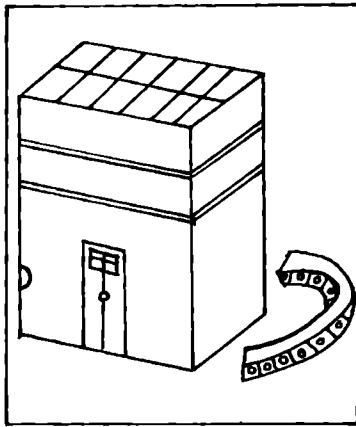
হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) কর্তৃক নির্মিত কাবা শরীফের ছবি
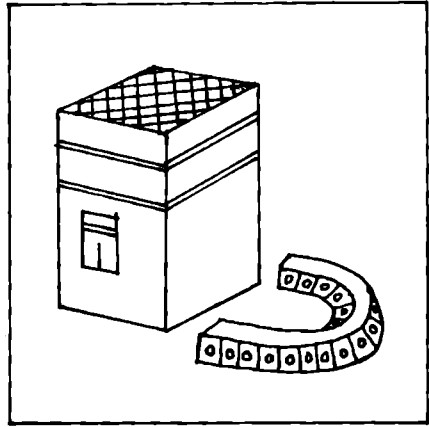
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্মিত কাবার ডিজাইন। এটি এখনও বহাল আছে।

কাবা শরীফের বর্ণনা

১। কাবা শরীফের বিভিন্ন নাম

বাইতুল্লাহ শরীফের মূল ভিত্তি গোলাকৃতির বলে তাকে কাবা বলা হয়। কেননা, কাবা অর্থ গোলাকৃতি। এর অপর নাম হচ্ছে ঃ اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ 'আল-বাইতুল আতিক।' এর অন্য নাম হচ্ছে, আল-বাইতুল হারাম। এর আরেকটি নাম হচ্ছে, اَلْبَنْيَةُ আল বিনইয়াহ। আরবীতে বলা হয় যে, لَاوَرَبِّ هٰذِهِ الْبَنْيَةِ না, এই বিনইয়াহর রব-এর শপথ করে বলছি। এটাকে بِنْيَةُ اِبْرَاهِيْمَ 'বিনইয়াহ ইবরাহীম'ও বলা হয়। بِنْيَة শব্দের অর্থ হচ্ছে ভিত্তি।

২। কাবা শরীফের গঠন প্রকৃতি

কাবা ঘর গোলাকৃতির এবং ভিতরে ফাঁকা। হযরত ইবরাহীম (আ) এর নির্মিত কাবার উচ্চতা ছিল ৯ হাত। তিনি মাটির সাথে সমান্তরাল দরজা তৈরি করেন এবং দরজার স্থানটি ফাঁকা রাখেন। ভিতরে একটি গভীর গর্ত তৈরি করেন। এতে কাবা শরীফের জন্য আসা উপহার সামগ্রীর হেফাজত করা হত। কোরাইশরা কাবার উচ্চতা ১৮ হাত করে এবং দৈর্ঘ্য কমিয়ে ফেলে। তাছাড়া, তারা কাবার উঁচু দরজা নির্মাণ করে, যাতে করে যাকে ইচ্ছা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে। তারা কাবা শরীফের ছাদ নির্মাণ করে এবং ছাদে উঠার জন্য মাঝখানে একটি সিঁড়ি তৈরি করে।

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা)-এর নির্মিত কাবা শরীফের উচ্চতা ২৭ হাত। তিনি মাটির সমান্তরালে ২টি দরজা তৈরি করেন। কোরাইশরা কাবার যে অংশ বাইরে রেখেছিল তিনি সে অংশটি পুনরায় ভেতরে ঢুকান এবং একই সারিতে ৩টি খুঁটি নির্মাণ করেন। তিনি ছাদের পানি সরার জন্য একটি নল লাগান।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের নির্মিত কাবার পরিবর্তন সাধন করে। সে কাবা শরীফের পশ্চিমের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে এবং হিজরে ইসমাঈলে ইবনে যোবায়ের কর্তৃক নির্মিত কাবার নতুন অংশ ভেঙ্গে ফেলে।

কা'বার খুঁটি

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের কর্তৃক নির্মিত কা'বা শরীফের ভেতরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সারিবদ্ধভাবে ছাদ পর্যন্ত প্রায় ১৩ মিটার উঁচু ৩টি খুঁটি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। এগুলোর উপরই কা'বার ছাদ ভর করে আছে। খুঁটিগুলো গোলাকৃতির এবং প্রতিটির আয়তন হচ্ছে আধা মিটার কিংবা সামান্য বেশী। খুঁটির নীচু অংশে আধা মিটার উঁচু কাঠের বর্গাকৃতি কাঠামো রয়েছে। এগুলোতে সোনালী রং-এর অনুপম নকশা করা হয়েছে। প্রতিটি খুঁটিকে কেন্দ্র করে কারুকার্য খচিত ৩টি দেয়াল আছে। মাঝের দেয়ালে এক টুকরো খাঁটি সোনা দ্বারা খুঁটিকে যুক্ত করা হয়েছে। তাতে কোরআনের আয়াত অংকিত আছে।

তিনটি খুঁটির উপরের চতুর্থাংশে লাগানো আছে লম্বা স্টীল। এতে রয়েছে রিং। সে রিং-এর মধ্যে কা'বা শরীফে প্রদত্ত উপহার সামগ্রী ঝুলানো আছে। সে উপহারগুলো হচ্ছে– বদনা, বিভিন্ন পাত্র ও বাতি ইত্যাদি। কিছু জিনিস খাঁটি সোনার তৈরি, আর কিছু রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর তৈরি। এগুলো ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির। কেবলমাত্র হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী সংলগ্ন পূর্ব দেয়াল থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত ১ম খুঁটির মধ্যে (অর্থাৎ কা'বার দরজার বিপরীত দিকে) ১৬টি উপহার সামগ্রী ঝুলানো আছে। সকল খুঁটিতে ঝুলানো উপহার সামগ্রীর সংখ্যা ৫০-এর কম নয়। প্রত্যেকটি উপহারের গায়ে সন-তারিখ উল্লেখ আছে। এগুলোতে শোভা বর্ধক বিভিন্ন ধরনের শিকা এবং শিকায় পাতিল ও কলসীর মত নানা ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে।

কা'বার ভিটি

কা'বার ভেতরে মেঝেতে খুবই মূল্যবান মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে। মেঝেতে ১ম ও ২য় খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে, দামী মার্বেল নির্মিত মেটে রং এর একটি বাক্স আছে। মার্বেল পাথরগুলো কা'বা শরীফের মেঝের পাথরগুলোর অনুরূপ। বাক্সে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি, আতর, আগর কাঠ ও মেশক-আম্বরসহ কা'বা ধৌতকরণের উপাদান– যেমন, গোলাপ জল ও সাদা কাপড়ের ন্যাকড়া সংরক্ষণ করা হয়। মেঝেতে কোন কার্পেট নেই।

মোসাল্লা রাসূল (সা)

কা'বার মেঝেতে দক্ষিণ দেয়ালের কাছে শ্বেত মার্বেল নির্মিত এক টুকরো জায়গা

নিজ মহিমায় ভাস্বর। এটি বাবে কা'বার ঠিক বিপরীতে এবং রোকনে ইয়ামানীর কাছাকাছি। এটিই মহানবী (সা)-এর নামায পড়ার স্থান। মোসাল্লা বরাবর দেয়ালে কুফী অক্ষরে লেখা আছে– 'মোরাববাআতে মোহাম্মাদ (সা)।'

কা'বার আভ্যন্তরীণ দেয়াল

বাদশাহ্ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয ১৯৯৬ সন মোতাবেক ১৪১৬-১৭ হিজরীতে, কা'বার ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি কা'বা শরীফের মেঝে, ছাদ, তিনটি খুঁটি, আভ্যন্তরীণ ও বাইরের দেয়াল, এবং আভ্যন্তরীণ সিঁড়ি সংস্কার করেন। কা'বার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্য বিধান এবং মজবুতী অর্জনই ছিল এ সংস্কারের লক্ষ্য। সংস্কারের সময় বাইতুল্লাহর প্রধান পাথরগুলো ছাড়া আর সকল পাথর খুলে সেগুলোকে ধূয়ে পরিষ্কার করে সাবেক স্থানে পুর্নবহাল করা হয়। হযরত ইবরাহীমের ভিত্তির উপর এগুলো লাগানো হয়েছে। তারপর কা'বার দেয়ালে ৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে।

দক্ষিণ দেয়ালের গায়ে ৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত গোলাপী রং এর মূল্যবান মার্বেল লাগানো হয়েছে। প্রত্যেক দেয়ালে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু কালো মার্বেল পাথরের দুটো ফ্রেম আছে। এগুলোর প্রতিবিম্ব দ্বারা ভেতরের অন্যান্য মার্বেলের সৌন্দর্য সুশোভিত হয়। দেয়ালের ৪ মিটার উপরে সিল্কের তৈরি নীল পর্দা ঝুলানো আছে। এর মধ্যে সমান্তরাল ও খাড়াখাড়িভাবে বহুবার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং আরবী সংখ্যা আট (٨) এর আকারে اَللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ অংকিত আছে। এই ক্যালিগ্রাফী দেখতে খুবই সুন্দর।

৯টি অংকিত পাথর

কা'বার ভেতরের দেয়ালে সযত্নে খোদাই করা ৯টি মার্বেল পাথর আছে। তাতে বিভিন্ন যুগে কা'বা সংস্কারকদের নাম খচিত আছে।

কা'বার ছাদ

কা'বার ছাদে উন্নতমানের সাদা মার্বেল পাথর লাগানো আছে। এ পাথরগুলো সূর্যতাপ নিয়ন্ত্রণকারী। ছাদের মধ্যে চারদিকে আধা মিটার উঁচু দেয়াল আছে। এগুলোতে কা'বার গেলাফ এবং বাবে কা'বার পর্দা আটকানো হয়।

ছাদে উঠার সিঁড়ি

কা'বার ভেতরে ছাদে উঠার জন্য নির্মিত সিঁড়ি খুবই সুন্দর। সিঁড়িটি ক্রিস্টালের মত মোটা গ্লাসের তৈরি। রং আসমানী ও অত্যন্ত স্বচ্ছ। প্রতি খণ্ড গ্লাস আধা মিটার লম্বা ও ২৫ সেঃ মিঃ চওড়া। সিঁড়ির ধাপগুলো এত উন্নত প্রকৌশলমান সম্পন্ন যে পা পিছলানোর কোন সম্ভাবনা নেই। পাশে স্টীলের উপর নির্মিত এক মিটার উঁচু দুটো গ্লাস দ্বারা সিঁড়িটি পরিবেষ্টিত। তা ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা যায়। এটি গোলাকৃতির যা সাধারণতঃ মসজিদের মিনারায় উঠার জন্য তৈরি করা হয়। ছাদের উপরে সিঁড়ির মুখ মজবুতভাবে বন্ধ। মুখের মধ্যে সাদা মার্বেলের তৈরি ঢাকা বিশিষ্ট একটি দরজা আছে। তা হাত দিয়ে ঘুরানো যায় কিংবা বৈদ্যুতিক উপায়ে যান্ত্রিকভাবেও খোলা যায়।

কাবার বর্তমান দরজা

১৩৬৩ হিজরীতে, বাদশাহ্ আবদুল আযীয আল সৌদ কাবা শরীফে একটি সুন্দর কাঠের দরজা লাগান এবং সেটি তৈরি করতে তিন বছর সময় লেগেছিল।

কাবা শরীফের পুরাতন দরজাটি ১৩৯৬ হিজরীতে বাদশাহ্ খালেদ পরিবর্তন করেন এবং সেই স্থানে একটি সোনার দরজা লাগান। এতে ৯৯,৯৯৯ ধরনের মোট ২৮৬ কিলোগ্রাম খাঁটি সোনা লেগেছে। এতে আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াত লেখা আছে। কাবা শরীফের দরজাটি বর্তমানে দুই পাল্লা বিশিষ্ট। এর মাঝখানে তালা আছে।

আভ্যন্তরীণ দরজা

কা'বা শরীফের যে দরজাটি আমরা বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই, এর ডান পাশে ভেতরে আরেকটি দরজা আছে। এটা হচ্ছে, কা'বার আভ্যন্তরীণ দরজা। ১৩৬৩ হিঃ মোতাবেক ১৯৪৩ খৃঃ বাদশাহ্ আবদুল আযীয কা'বার আভ্যন্তরীণ দরজাটি নির্মাণ করেন। আভ্যন্তরীণ দরজাটির নাম হচ্ছে 'বাবুত তাওবাহ' (তওবা দরজা)। তাতেও খাঁটি সোনার তৈরি একটি তালা আছে। এ দরজাটিও বাবে কাবার মতই মানবীয় ভাস্কর্যের নিপুণ স্বাক্ষর। এর কারুকার্যের কাছে মানব কল্পনা হার মানে। বাবুত তাওবাহ ও বাবে কাবার ভেতরে খুবই মজবুত কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর উপর সোনা লাগানো হয়েছে।

১৩৯৭ হিঃ জুমাদাল উলা মাস মোতাবেক ১৯৭৭ খৃঃ বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীয কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়ার সময় লক্ষ্য করেন যে, দরজাটি নষ্ট হওয়ার পথে। তখন তিনি দরজাটি পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। তাও সোনা দ্বারা তৈরি এবং বাইর থেকে দৃশ্যমান ১ম দরজাটির মতই। আভ্যন্তরীণ দরজায়ও কোরআনের আয়াত লেখা আছে।
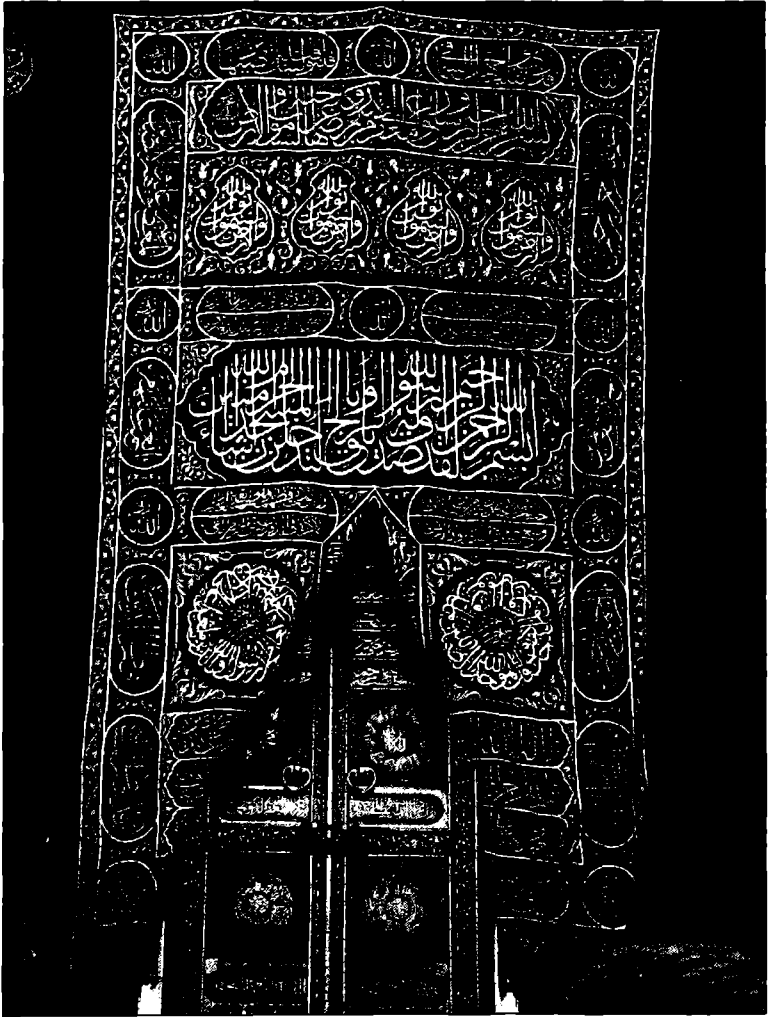
বাদশা খালেদ নির্মিত সোনার দরজা

৩. কাবা শরীফের সেবা এবং চাবি

ইসলামে কাবা শরীফের খেদমত একটি বিশিষ্ট কাজ। এই কাজটি ইসলামের পূর্ব থেকেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত ছিল। ইসলামও ঐ খেদমতকে সেই গোষ্ঠীর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কাবা শরীফের খেদমতকে আরবীতে, হেজাবাহ্ اَلْحِجَابَةُ এবং যারা তা করে তাদেরকে خُدَّامُ الْكَعْبَةِ কিংবা سَدَنَةُ الْكَعْبَةِ বলা হয়। বনি শায়বা গোত্রই হচ্ছে কাবা শরীফের সেবক। তাদের কাছে কাবা শরীফের চাবি থাকে এবং তারাই এর হেফাজত করেন। নবী করীম (সা) তাদেরকে এ সেবার উত্তরাধিকারী হিসেবে বহাল রেখেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাদের কাছ থেকে কাবা শরীফের চাবি নিয়ে আসেন এবং কাবা শরীফের দরজা খুলে মূর্তিগুলোকে বের করেন। তারপর তিনি বনি শায়বা গোত্রের কাছে চাবি ফেরত দেন এবং বলেন ঃ

خُذُوْهَا يَابَنِىْ عَبْدَالدَّارِ خَالِدَةً تَالِدَةً اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ اِلاَّ ظَالِمٌ -

অর্থ ঃ 'হে বনি আবদুদ দার, কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিনের জন্য এই চাবি গ্রহণ কর। জালেম ছাড়া কেউ তোমাদের কাছ থেকে এই চাবি ছিনিয়ে নেবে না।'[৪]

কাবা শরীফের গেলাফ কাবার চাবিরক্ষক বনি শায়বা গোত্রের কাছেই হস্তান্তর করা হয়। পরে তা কাবা শরীফে লাগানো হয়।

৪। পাপমুক্তির স্থান বা আল মোস্তাজার (اَلْمُسْتَجَارُ)

রোকনে ইয়ামনী থেকে কাবা শরীফের পেছনে বিলুপ্ত দরজা পর্যন্ত ৪ হাত জায়গাকে (اَلْمُسْتَجَارُ) বা গুনাহ মুক্তির জায়গা বলা হয়। এটাকে 'বৃদ্ধ কোরাইশদের মোলতাযাম' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাবা শরীফের পেছনে দাঁড়িয়ে দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হয় এবং সে মায়ের পেট থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। নবী করীম (সা) থেকে শুনা ব্যতীত, সম্ভবতঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা) এ জাতীয় বক্তব্য পেশ করতে পারেন না।

ইমাম শাবী (রা) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ও তাঁর ভাই মুসআব, আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) এই স্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন।[৫] ইমাম শাবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে দেখে গেছেন যে, যারাই ঐ জায়গায় কোন কিছুর জন্য দোয়া করেছেন তারাই তা পেয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) জান্নাতের জন্য দোয়া করে এর সুখবর লাভ করে গেছেন। এ ছাড়াও বড় বড় মুসলমানদের অনেকেই ঐ জায়গায় দোয়া করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, হযরত উমর বিন আবদুল আযীয এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর নাতী কাসেম বিন মুহাম্মদ (রা) প্রমুখ। 'আখবারে মক্কার' লেখক আল ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, ওমর বিন আবদুল আযীয ইবনে আবি মোলায়কাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) কাবা শরীফের পেছনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছিলেন কিনা? ইবনে আবি মোলায়কা বললেন, হ্যাঁ করেছিলেন। তিনি কাবার পেছনে দু'হাত বিছিয়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছিলেন।

৫। কাবার ভিত্তিমূল اَلشَّاذْ رَوَانْ

এটি হচ্ছে কাবা শরীফের ভিত্তিমূল বা প্লিনথ লেবেল। অবশ্য এই প্লিনথ লেবেলের সমান সবটুকু অংশের উপর কাবা শরীফের দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি। বরং প্লিনথ লেবেলের ২য় পর্যায়ের উপর দেয়াল নির্মিত হয়েছে। এর বর্ণনা হচ্ছে এরকম যে, কাবা ঘরের তিন দিকের ভিত্তিমূলের সাথে পাথরকে এমনভাবে বাঁকা করে বসানো হয়েছে যে, তা নীচের দিক থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে উঠেছে এবং দেয়ালের সাথে লেগেছে। যমীন থেকে এর উচ্চতা ১১ সেন্টিমিটার এবং প্রশস্ততা ৪০ সেন্টিমিটার। তবে, হিজরে ইসমাঈলের দিকে ঐভাবে পাথর বসানো হয়নি, সেখানে এক স্তর সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এর উপর দাঁড়িয়ে, কাবা শরীফের সাথে বুক লাগিয়ে এবং দু' হাত উপরে তুলে দোয়া করা হয়।

কাবার বর্তমান প্লিনথ লেবেল কাবাঘরের ভেতরই আছে। ১০১৪ হিঃ সালে, তুর্কী সুলতান ৪র্থ মুরাদ যখন কাবা শরীফ মেরামত করেন তখন তিনি এই ভিত্তিমূলকে ভেতরে রাখেন। এটা তাঁর কোন নতুন আবিষ্কার ছিলনা। বরং পূর্ব থেকেই তা কাবাঘরের ভেতর ছিল।

এই ভিত্তিমূলটি কি কাবা ঘরের অংশ না কি এর বাইরের অংশ তা নিয়ে মতভেদ

আছে। শাফেঈ ও মালেকী মাজহাবের আলেমরাসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এটাকে কাবা শরীফের অংশ বলে মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা (রা) এটাকে কাবার অংশ মনে করেন না। তাঁর দলীল হচ্ছে, এর সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস নেই। তাই এটাকে কাবা শরীফের অংশ মনে করা যায় না।

কাবা শরীফ ধৌতকরণ

আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন ঃ

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -

'আমার ঘরকে তওয়াফকারী, এতেকাফকারী এবং রুকু-সাজদাকারী নামাজীদের জন্য পবিত্র কর।'

এ নির্দেশের ভিত্তিতে প্রত্যেক বছর কাবা শরীফ ধোয়ার পদ্ধতি চালু আছে। আল্লাহর এই পবিত্র ঘরকে অধিকতর পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই প্রতিবছর এই ঘরের ভেতরাংশ ধোয়া হয়। বাইরের দেয়ালে গেলাফ থাকার কারণে তা ধোয়া হয় না।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যমযমের পানি দিয়ে কাবা শরীফের ভেতর পরিষ্কার করেন। আবু বকর বিন আল মোনজের হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাবার ভেতর কিছু ছবি দেখতে পান। আমি বালতিতে করে পানি এনে দিতাম, আর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সকল ছবির উপর পানি মেরে তা পরিষ্কার করেন।

বর্তমানে, বছরে দু'বার কাবা ধোয়া হয়। রমযান আসার পূর্বে একবার এবং হজ্জের আগে আরেকবার কাবার ভেতর ধোয়া হয়। যমযমের পানি দিয়ে কাবা ধোয়া হয়। এই পানির সাথে সুঘ্রাণযুক্ত আতর ঢালা হয় এবং কাপড়ের ন্যাকড়া দিয়ে ভেতরের দেয়াল ও ভিটি মোছা হয়।

সৌদী সরকারের একজন প্রতিনিধি, বিশেষ করে মক্কার গভর্নর এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাকেন। সৌদী আরবে নিযুক্ত মুসলিম বিশ্বের কূটনীতিবিদসহ প্রখ্যাত উলামা ও ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সবাই কাবা ধোয়ার কাজে অংশ নেয় এবং অনেকেই এই সুযোগে ভেতরে নামায পড়ে। পরে, অনেকেই সুঘ্রাণযুক্ত কাপড়ের ন্যাকড়া সাথে করে বাইরে নিয়ে আসে।

কালপাথর বা হাজারে আসওয়াদ اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ

হাজারে আসওয়াদের বর্ণনা

কাবা শরীফের পূর্বকোণে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত। এই পাথর বহু মূল্যবান ও বরকতময়। এটি একটি বেহেশতী পাথর। নবী করীম (সা) ঐ পাথরটিকে চুমু দিয়েছেন। এতে চুমু দেয়ার ফজীলত অনেক বেশী। তাই হযরত উমর (রা) হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ "আমি জানি তুমি একখানা পাথর,

কালপাথর বা হাজারে আসওয়াদ

তোমার উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে তোমার গায়ে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনও তোমাকে চুমু দিতাম না।"

মূলত এই পাথরকে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা। এই চুমু খাওয়া সুন্নত। ইসলামের বড় কোন খুঁটি নয়। তাই যারা হাজারে আসওয়াদের চুমুকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করে তারা বিরাট ভুল করে। কেননা, মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে বিশেষ কোন লক্ষ্য হাসিল করা। দেবতার পূজায় সেজদা সহ আরো বহু অযৌক্তিক আচরণ প্রদর্শন করতে হয়। হাজারে আসওয়াদ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা এর পূজা করে না এবং এর কাছ থেকে দুনিয়ায় উপকার-অপকার পাওয়ারও আশা করে না। মূর্তিপূজার মূল লক্ষ্য তাই। মুসলমানরা পাথরটিকে উপাস্য মনে করে এর পূজা করে না। পরকালের কিছু কল্যাণ লাভের জন্য নবীর অনুসরণে, মুসলমানরা এতে চুমু খায়। হযরত উমরের উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে এটিই হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। হাজারে আসওয়াদের সম্মান এক জিনিস আর এর পূজা ভিন্ন জিনিস।

কাবা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ) এই পাথরটি কাবার পূর্বকোণে লাগান। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নবুওয়তের পূর্বে কোরাইশরা যখন কাবা পুনঃনির্মাণ করে, তখনও তিনি নিজ হাতে কাবার দেয়ালে হাজারে আসওয়াদটি লাগিয়ে কোরাইশদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আল্লামা আবু আবদিল্লাহ আল-ফাকেহী তাঁর "আখবারে মক্কা" বইতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ لاَ مَاطَبَعَ اللّٰهُ الرُّكْنَ مِنْ اَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاَرْجَاسِهَا وَاَيْدِى الظَّلَمَةِ وَالْاَثَمَةِ ـ لاَسْتُشْفِىَ بِه مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ ـ وَلاَلْفِىَ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ وَاِنَّمَا غَيَّرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالسَّوَادِ لِئَلاَّ يَنْظُرَ اَهْلُ الدُّنْيَا اِلٰى زِيْنَةِ

الْجَنَّةِ ـ وَلَيَصِيْرَنَّ اِلَيْهَا ـ وَاَنَّهَا لَيَاقُوْتَةُ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ ـ وَضَعَهُ اللّٰهُ حِيْنَ اُنْزِلَهُ لاٰدَمَ فِىْ مَوْضَعِ الْكَعْبَةِ ـ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الْكَعْبَةُ ـ وَالْاَرْضُ يَوْمَئِذٍ طَاهِرَةَ لَمْ يُعْمَلْ فِيْهَابِشَئِى مِّنَ الْمَعَاصِىْ ـ وَلَيْسَ لَهَا اَهْلُ يَنْجِسُوْنَهَا ـ فَوَضَعَ لَهُ صَفًا مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ عَلَى اَطْرَافِ الْحَرَمِ يَحْرِسُوْنَهُ مِنْ سُكَّانِ الْاَرْضِ ـ وَسُكَّانُهَا يَوْمَئِذٍ اَلْجِنُّ ـ وَلَيْسَ يَنْبَغِىْ لَهُمْ آنْ يَنْظُرُوْا اِلَيْهِ ـ لاَنَّهُ شَئِىُ مِّنَ الْجَنَّةِ وَمَنْ نَظَرَ اِلىَ الْجَنَّةِ دَخَلَهَا ـ وَفَلَيْسَ يَنْبَغِىً اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا اِلاَّمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ وَالْمَلاَئِكَةُ يَذُوْدُوْ نَهُمْ عَنْهُ لاَيُجِيْزُ مِنْهُمْ شَئٌ ـ

অর্থ ঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি আল্লাহ জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা ও নাপাকী এবং জালেম ও পাপীষ্ঠদের হাতের কালিমায় হাজারে আসওয়াদ এর রং পরিবর্তন না করতেন তাহলে, এর মাধ্যমে সকল পঙ্গুত্বের চিকিৎসা হত এবং আল্লাহ প্রথম দিন একে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন হুবহু সেই আকৃতিতেই পাওয়া যেত। আল্লাহ এর রং পরিবর্তন করে এই জন্যই কাল করে দিয়েছেন যে, দুনিয়াবাসী মানুষ যেন বেহেশতের সৌন্দর্য (দুনিয়াতে বসেই) দেখতে না পায় এবং তা যেন বেহেশতের মধ্যেই ফিরে আসে। এটি বেহেশতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি। হযরত আদম (আ) কে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তা কাবা শরীফের স্থানে রেখে দিয়েছিলেন। তখন কাবাঘর ছিল না। তখন যমীন ছিল পবিত্র, এতে কোন গুনাহ সংঘটিত হত না। এতে গুনাহ করার মত কোন অধিবাসী ছিল না। আল্লাহ হারাম সীমান্তের চারদিকে একদল ফেরেশতাকে সারি বেঁধে পাহারার কাজে নিয়োজিত করেন। তখন যমীনের অধিবাসী ছিল জিন। এই পাথরের প্রতি নজর করার কোন অধিকার তাদের ছিলনা। কেননা, এটি ছিল একটি বেহেশতী জিনিস। যে বেহেশতের দিকে নজর করবে সে তাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে তারই কেবল ঐ পাথরটি দেখা উচিত।

ফেরেশতারা সবাইকে বিতাড়িত করতে থাকে এবং কাউকে তা দেখার অনুমতি দিচ্ছিল না।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় জিবরাইল (আ) বেহেশত থেকে ঐ পাথরটি এনে দেন। তাই ঐ পাথরটি সাধারণ কোন পাথর নয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের শাসনামলে কা'বা শরীফে অগ্নিকাণ্ডের ফলে হাজারে আসওয়াদও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা ফেটে তিন টুকরো হয়ে যায়। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের পরে তাকে রূপা দিয়ে মুড়িয়ে দেন। এরপর হিজরী ৩১৭ সালের ৭ই জিলহজ্জ, হাজারে আসওয়াদ তার ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছে। ঐ সময় কারামতিয়া সম্প্রদায়ের জালেম শাসক আবু তাহের সোলায়মান বিন হাসান কারামতী হাজারে আসওয়াদকে খুলে নিয়ে যায় এবং কুফার জামে মসজিদের সাথে লাগিয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন হজ্জের জন্য সেখানে যায়। দীর্ঘ বাইশ বছর পর আবুল কাসেম মুতিউ এবং কারো মতে, আবুল আব্বাস ফজল বিন আল মোকতাদির ৩০ হাজার দীনারের বিনিময়ে তা পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনেন ও কা'বায় লাগান।

হাদীস শরীফে হাজারে আসওয়াদকে বেহেশতী পাথর বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَّاقُوْتِ الْجَنَّةِ ۔ (رواه الترمذى واحمد والحاكم وابن حبان)

অর্থ ঃ রোকনে আসওয়াদ অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের দুটি ইয়াকুত পাথর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ ۔ (رواه الطبرانى فى معجمه ۔ الاوسط والكبير)

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ হচ্ছে বেহেশতের পাথর।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ ۔ (الترمذى)

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছে।' সহীহ ইবনে খোযায়মায় অন্য এক সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ শরীফেও পৃথক সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ ـ

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ বেহেশতের পাথর।' ইমাম আহমদ, সাঈদ বিন মনসুর এবং হাকিমও এই হাদীসকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এটি সহীহ হাদীস। বাজ্জার এবং তাবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হযরত আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ ইবনে খোযায়মায় বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْحَجَرُ الاَسْوَدُ يَاقُوْتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَّاقُوْتِ الْجَنَّةِ ـ

'হাজারে আসওয়াদ বেহেশতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি।' তিরমিযী শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

اَلْحَجَرُ يَاقُوْتَةٌ مِّنْ يَّوَاقِيْتِ الْجَنَّةِ ـ

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ বেহেশতের ইয়াকুত পাথরের অন্যতম।' উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, একাধিক হাদীস হাজারে আসওয়াদের বেহেশতী পাথর হওয়ার প্রমাণ বহন করে। হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এই সম্পর্কিত হাদীসগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনে খোযায়মা, সহীহ ইবনে হিব্বান, মোজাম আত-তাবরানী, সুনানে সাঈদ বিন মনসুর, আল্লামা আযরাকীর আখবারে মক্কা, আল্লামা ফাকেহীর আখবারে মক্কা ইত্যাদি। বিশেষ করে, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ও ইবনে খোযায়মা বর্ণনাকারী হাফেজ হাদীসের সূত্রে, ঐগুলোকে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেউ এসকল হাদীসের ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেন না। মতভেদ হচ্ছে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল নিয়ে। সেটি কি হযরত আদম (আ) এর সাথে বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছিল, নাকি হযরত ইবরাহীম (আ) এর কাবা নির্মাণের সময়, এটাই হচ্ছে মতপার্থক্যের বিষয়।

তাবরানী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সেটির সনদ দুর্বল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে-

اِنَّهُ اُنْزِلَ اِلَى الْاَرْضِ حِيْنَ اُنْزِلَ اٰدَمُ ـ

অর্থ ঃ 'হযরত আদম (আ) এর নাযিল হওয়ার সময় হাজারে আসওয়াদও বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছিল।' হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

نَزَلَ الْحَجَرُ اَوَّلَ مَانَزَلَ عَلَى جَبَلِ اَبِيْ قُبَيْسٍ ـ فَمَكَثَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ ثُمَّ وَضَعَ عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ـ (رواه الطبرانى)

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ প্রথম আবু কোবাইস পাহাড়ে নাযিল হয়। সেখানে তা ৪০ বছর পর্যন্ত থাকে। তারপর তা হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভিত্তির উপর লাগানো হয়। এই হাদীসটি মাওকুফ যা শুধুমাত্র সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। তবে এর সনদ সবল ও রাবীরা বিশ্বস্ত।

ইবনে জোহাইরা আল মক্কী বলেছেন, 'যখন ইবরাহীম খলীল কাবা নির্মাণের সময় হাজারে আসওয়াদের জায়গায় এসে পৌঁছেন তখন জিবরাইল (আ) হাজারে আসওয়াদকে নিয়ে আসেন। কেউ বলেছেন, জিবরাইল (আ) বেহেশত থেকে পাথরটি নিয়ে এসেছেন। কারো কারো মতে, জিবরাইল (আ) আবু কোবাইস পাহাড় থেকে পাথরটি নিয়ে আসেন। কেননা, প্লাবনের সময় যখন সবকিছু ডুবে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ হাজারে আসওয়াদকে আবু কোবাইস পাহাড়ে আমানত রাখেন। (الجامع اللطيف لابن ظهيرة)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী শরহে বুখারীতে আবু জাহমের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে-

اِنَّ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ نَزَلَ قَبْلَ اِبْرَاهِيْمَ ، ثُمَّ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ حِيْنَ غَرِقَتُ الْاَرْضُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهٖ جِبْرِيْلُ حِيْنَ بَنَاهُ اِبْرَاهِيْمُ ـ

অর্থ ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) এর আগেই হাজারে আসওয়াদ অবতীর্ণ হয়েছে। বন্যার সময় এটিকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তারপর ইবরাহীম (আ) এর কাবা শরীফ নির্মাণের সময় জিবরাইল তা নিয়ে আসেন।'

উবাই বিন কাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ اَنْزَلَ الْحَجَرَ مَلَكٌ مِّنَ الْجَنَّةِ অর্থ– 'বেহেশত থেকে একজন ফেরেশতা হাজারে আসওয়াদটি অবতীর্ণ করেছেন। এই সকল হাদীসের মূলকথা হল হাজারে আসওয়াদ বেহেশতের একটি পাথর। কাজেই এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আলোচনা দ্বারা মূল বিষয়ে কোন অসুবিধে নেই।

হাজারে আসওয়াদের আকৃতি ও অবস্থান

হাজারে আসওয়াদ কাবা শরীফের পূর্বকোণে মাতাফ থেকে দেড় মিটার উপরে অবস্থিত। আজকে আমরা যে হাজারে আসওয়াদকে চুমু দিচ্ছি কিংবা হাতে স্পর্শ করছি তা তার আগের আকৃতি ও অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। হাজারে আসওয়াদের বর্তমানে আটটি টুকরো দৃশ্যমান। বাকী অংশগুলো দেখা যায় না। প্রতিটি টুকরো বিভিন্ন আকারের। বড় টুকরাটি খেজুরের সমান। হাজারে আসওয়াদের উপর পূর্বের জালেম শাসকদের আগ্রাসনের কারণে তা ভেঙ্গে গেছে। আগে তা একটি মাত্র পাথরই ছিল।

ঐতিহাসিক কুর্দী তাঁর আল কাওয়ীম গ্রন্থে লিখেছেন যে, হিজরী চৌদ্দ শতকের শুরুতে হাজারে আসওয়াদের মোট ১৫টি টুকরা দৃশ্যমান ছিল। হাজারে আসওয়াদের ফ্রেম সংস্কারের সময় ভেতরের চুনার ভেতর এর কয়েকটি টুকরো ঢুকে গেছে। কেননা, ঐ চুনার মাধ্যমে হাজারে আসওয়াদের টুকরোগুলোকে বসানো হয়েছে। সর্বদা এর উপর আতর ও অন্যান্য সুগন্ধি মাখার কারণে এর কাল রং আরো বেড়ে গেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই হাজারে আসওয়াদের অবশিষ্টাংশ কাবা শরীফের দেয়ালের ভেতরে ছিল। এর সামান্য কয়েকটি টুকরোই বর্তমানে গোচরীভূত হয়। সেই টুকরোগুলোও চুনার ভেতরে বসানো। সেই দৃশ্যমান টুকরোগুলো রূপার গোলাকার মোটা ফ্রেমের ভেতরে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পাথরে চুমু দিতে হয়। হাজারে আসওয়াদ পাথরটি কত বড় তা জানার আগ্রহ সবার। এ ব্যাপারে

الاشاعة لاشراط الساعة عند الكلام على القرامطة -

বইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিজরী ৩১৭ সালে, মুহাম্মদ বিন নাফে' আল-খোযায়ী হাজারে আসওয়াদকে দেয়াল থেকে খোলা অবস্থায় দেখেছেন। তিনি

বলেছেন, হাজারে আসওয়াদের মাথায় শুধু কাল রং এবং অবশিষ্টাংশের রং হচ্ছে সাদা। পাথরটির দৈর্ঘ্য এক গজ।

হোসাইন বিন আবদুল্লাহ বা সালামাহ্ তাঁর 'তারীখে কাবা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, হিজরী ১০৪০ সালে সুলতান মুরাদের কাবা সংস্কারের সময় ইবনে আলান নিজ চোখে হাজারে আসওয়াদকে দেখেছেন। তিনি হাজারে আসওয়াদের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বলেছেন যে, তা 'কর্মগজে আধাগজ' এবং প্রস্থ হচ্ছে একগজের তিনভাগের এক ভাগ। কোন কোন দিকে এর কিছু অংশ এক কীরাত পরিমাণ ক্ষয় হয়েছে। এটি ৪ কীরাত পরিমাণ পুরো বা মোটা। এর উপর রূপার কয়েকটি বেষ্টনী রয়েছে। একটি গোলাকার বেষ্টনী হচ্ছে কাবার দরজার দিক থেকে। এর ফলে হাজারে আসওয়াদের উপরিভাগ ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ঐ অংশ আর দেখা যায় না। এ বেষ্টনীটি রোকনে ইয়ামানীর দিকে হাজারে আসওয়াদের মাঝামাঝি পর্যন্ত শেষ হয়েছে। এর উপর আবার রূপার দুটো বেষ্টনী আছে। বিপরীত দিক থেকে এগুলো প্রস্থকে বেষ্টন করে আছে। কিন্তু ১২৬৮ হিজরীতে সুলতান আবদুল হামিদ হাজারে আসওয়াদকে স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়ে দেন। এরপর ১২৮১ হিজরীতে সুলতান আব্দুল আযীয খান রূপা দিয়ে তা মুড়িয়ে দেন। সবশেষে ১৩৬৬ হিজরীতে হাজারে আসওয়াদের ফ্রেমের সংস্কার করা হয় এবং তা এখন পর্যন্ত বহাল আছে।

হাজারে আসওয়াদের উপর বর্তমানে রূপার তৈরি গোলাকার একটি মোটা বেষ্টনী আছে। পাথরটির চতুর্দিকে ঐ বেষ্টনীটি পাথরকে হেফাজত করছে। এর ভেতর হাজারে আসওয়াদের টুকরোগুলো বিদ্যমান। বেষ্টনীর কারণে পাথরটি একটু ভেতরে। অর্থাৎ বেষ্টনী মোটা হওয়ার কারণে পাথর কিছুটা ভেতরে। পুরো মুখমণ্ডল ভেতরে ঢুকিয়ে চুমু দিতে হয়। নচেৎ চুমু দেয়া সম্ভব নয়। পাথরের টুকরোগুলো চুনার মাধ্যমে বসানো হয়েছে। বর্তমানে পাথর ও চুনার রং সম্পূর্ণ কাল।

হাজারে আসওয়াদের রং

বহু সংখ্যক হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসসমূহে হাজারে আসওয়াদের রং সাদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "হাজারে আসওয়াদ" শব্দের অভিধানিক অর্থ হল কালপাথর কিন্তু তা প্রথমে কাল ছিল না। পরে কাল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, মুসনাদে আহমদে বলা হয়েছে أَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ অর্থ ঃ 'পাথরটি বরফ থেকেও সাদা। আল্লামা

আযরাকীর 'আখবারে মক্কা' বইতে বলা হয়েছে ঃ أَبْيَضُ كَأَنَّهُ الْفِضَّةُ অর্থ ঃ 'রূপার মত সাদা'। তিরমিযী শরীফে বলা হয়েছে. اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اَللَّبَنِ অর্থ ঃ 'দুধের চেয়েও সাদা'। আল্লামা ফাকেহীর اخبار مكة বইতে বলা হয়েছে أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ অর্থ ঃ 'বরফের চেয়েও বেশী সাদা এবং ধবধবে।' পাথর যদি সাদা হয়ে থাকে তাহলে, তাকে 'হাজারে আবইয়াদ' না বলে 'হাজারে আসওয়াদ' বলা হয় কেন? আবইয়াদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাদা। এর জবাব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই দিয়েছেন। তিরমিযী শরীফের বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

وَهُوَاَنَّ خَطَايَا بَنِىْ أدَمَ هِىَ الَّتِىْ سَوَّدَتْهُ ـ

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীসটির অর্থ হচ্ছে 'আদম সন্তানের গুনাহই পাথরটিকে কাল করে দিয়েছে।' বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, এই হাদীসের সমর্থনে দ্বিতীয় কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। আল্লামা ফাকেহী ইবনে আব্বাসের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وكَانَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ حَتّٰى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا اَهْلِ الشِّرْكِ ـ

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ বেহেশতের একটি পাথর। এটি বরফের চেয়েও সাদা ধবধবে ছিল। কিন্তু মোশরেকদের গুনাহ একে কাল করে দিয়েছে।' নাসাঈ এবং ইবনে খোযায়মাও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী শরীফেও এটিকে বর্ণনা করে হাসান বলা হয়েছে। এই সাদা পাথরটির কাল হওয়া সম্পর্কে আরো অনেক বক্তব্য পেশ করা হয়। কিন্তু সহীহ হাদীসে এর যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তাই বেশী গ্রহণযোগ্য।

কিছু ঐতিহাসিক আগের কিছু সংখ্যক উলামার বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, তাঁরা নিজ চোখে হাজারে আসওয়াদের মধ্যে সাদা রং দেখেছেন। আল্লামা ইযযুদ্দিন বিন জামাআহ ৭০৮ হিজরীতে বলেছেন যে, আমি হাজারে আসওয়াদের মধ্যে একটি সাদা ফোটা দেখতে পেয়েছি এবং তা সকলেরই দেখার কথা। তারপর সেই সাদা

ফোটাটি ক্রমান্বয়ে এবং পরিষ্কারভাবে হ্রাস পেতে থাকে। আল্লামা ইবনে খলীল তাঁর المنسك الكبير বইতে লিখেছেন যে, তিনি হাজারে আসওয়াদের মাথার মধ্যে কাবার দরজা সংলগ্ন দিকে পরিষ্কার তিনটি সাদা জায়গা দেখেছেন। এর মধ্যে বড়টি হচ্ছে বড় ভূট্টার দানার মত। তিনি বলেন, তারপর আমি ঐ সাদা অংশগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং দেখি যে, সেগুলো সর্বদা হ্রাস পাচ্ছে। (الجامع اللطيف)

উল্লেখ্য যে, পাথরের মাথা তথা উপরিভাগের রংটুকুই কাল। গোটা পাথরের ঐ মাথাটুকুই লোকদের জন্য দৃশ্যমান। অবশিষ্টাংশ তো দেয়ালের ভেতরেই ঢুকে আছে। কিন্তু সেই অংশটুকু যে সাদা সে ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ রয়েছে। মুহাম্মদ বিন নাফে আল খোযায়ী' স্বচক্ষে হাজারে আসওয়াদকে দেয়াল থেকে খোলা অবস্থায় দেখেছেন। তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, এর উপরিভাগ তথা মাথাটুকুই কাল এবং বাকী অংশ সাদা।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাসান আবদুল্লাহ বাসালামাহ তাঁর 'তারীখুল কা'বা' বইতে লিখেছেন যে, ১০৪০ হিজরীতে সুলতান মুরাদ খানের কাবা সংস্কারের সময় আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন আলান আল মক্কী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নিজ চোখে খোলা হাজারে আসওয়াদকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, হাজারে আসওয়াদের যে অংশ দেয়ালের ভেতর রয়েছে তার সবটুকুই সাদা।

হাজারে আসওয়াদের রং সম্পর্কে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রথমে এর রং সম্পূর্ণ সাদা ছিল। ক্রমান্বয়ে এর মাথার রংটুকু কাল হয়ে গেছে। তাও হঠাৎ করে নয়। বরং আস্তে আস্তে, দীর্ঘদিন পর কাল হয়েছে। আদম সন্তানদের গুনাহর কারণেই তা কাল হয়েছে। এর মাথার মধ্যেই চুমু দেয়া হয়। অবশিষ্টাংশ ভেতরে রয়েছে এবং সে অংশের রং এখন পর্যন্ত সাদাই রয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন, কতদিন পর্যন্ত ভেতরের অংশটুকু সাদা থাকে।

হাজারে আসওয়াদের ১১টি বৈশিষ্ট্য

হাজারে আসওয়াদের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ব সম্পর্কে সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনেক বক্তব্য এসেছে। তিনি হাজারে আসওয়াদের ফজীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন।

১। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، انَّ عَلَى الرُّكْنِ الْاَسْوَدِ لَسَبْعِيْنَ مَلَكًا ـ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ بِاَيْدِيْهِمْ ـ وَالرَّاكِعِيْنَ وَالسَّاجِدِيْنَ وَالطَّائِفِيْنَ : واسناده ضعيف (الفاكهى)

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হুরায়রা (রা)-কে বলেছেন, হাজারে আসওয়াদে ৭০ জন ফেরেশতা আছে। তাঁরা হাত তুলে মুসলমান, মোমেন, রুকু-সেজদা দানকারী এবং তওয়াফকারীদের জন্য গুনাহ্ মাফ চায়। হাদীসটির সনদ দুর্বল। (আল-ফাকেহী)।[৭]

২। হাজারে আসওয়াদকে মুখে চুমু দেয়া হয় কিংবা হাতে স্পর্শ করা হয়। বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একে চুমু দিয়েছেন। বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে।

৩। হাজারে আসওয়াদটি বাইতুল্লাহ শরীফের সবচাইতে মর্যাদাবান জায়গায় তথা পূর্বকোণে অবস্থিত। এটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর তৈরি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪। এটি তওয়াফ শুরুর স্থানে অবস্থিত। প্রথমে এখান থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হয়।

৫। যে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে যেন আল্লাহর হাতের সাথে হাত মিলায় এবং মোসাফাহা করে। এছাড়াও সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (স) কাছে বাইআত গ্রহণ করে (ইবনে মাজাহ ও সাঈদ বিন মনসুরের সুন্নাহ এবং আখবারে মক্কা, আযরাকী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ فَاوَضَهُ فَاِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمٰنِ ـ

অর্থ ঃ 'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে, সে যেন আল্লাহর হাত স্পর্শ করে।

৬। প্রথমে হাজারে আসওয়াদের প্রকট আলো ছিল। পরে আল্লাহ ঐ আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। আহমদ, তিরমিযী, এবং ইবনে হিব্বান এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক

হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৭। হাশরের দিন, হাজারে আসওয়াদ, তাকে চুমুদানকারী ব্যক্তিদের পক্ষে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে। তিরমিযী ও তাবরানীতে এ মর্মে হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। আল-ফাকেহী হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِىْ هٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُبِهِمَا - وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ -

অর্থ ঃ 'কিয়ামতের দিন এই পাথরটি এমনভাবে আসবে যে, সে তার দু'চোখে দেখবে, জিহ্বা দ্বারা কথা বলবে এবং যারা তাকে যথার্থভাবে চুমু দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।'(৮)

৮। তবারানী একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসের সনদটি দুর্বল। সেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, হাজারে আসওয়াদ সুপারিশ করবে এবং তাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।

৯। হাদীসে এসেছে ঃ وَالْحَجَرُ يَمِيْنُ اللهِ فِىْ أَرْضِهِ -

অর্থ ঃ 'হাজারে আসওয়াদ যমীনে আল্লাহর ডান হাত।' বিভিন্ন সনদে এ মর্মে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটিকে হাসান বলা হয়।

১০। আল ফাকেহী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেছেন ঃ 'কোন ব্যক্তি যদি ঘর থেকে ভাল করে অজু করে মসজিদে হারামে গিয়ে হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেয়, তারপর তাকবীর, তাশাহহুদ ও দরুদ পড়ে, মোমেন-মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করে, আল্লাহর জেকের করে এবং দুনিয়ার কোন বিষয়ে স্মরণ না করে, তাহলে, আল্লাহ তাঁর প্রতি কদমের জন্য ৭০ হাজার নেক লিখবেন, ৭০ হাজার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তার মর্যাদা ৭০ হাজার গুণ বাড়িয়ে দেবেন। তারপর রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে পৌঁছলে, বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগানের মধ্যে অবস্থান করবে এবং নিজ পরিবারের লোকদের জন্য কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তারপর দু'রাকাত নামায পড়লে এবং ভাল

করে রুকু সেজদা আদায় করলে, আল্লাহ তাঁর জন্য আওলাদে ইসমাঈলের ৬০টি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব দান করবেন।' এই বর্ণনাটির সনদ হাসান। (৯)

১১। আল্লাহ ঈমান ও ইসলামকে সব মুসলমানের কাছে আমানত রেখেছেন এবং এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তাদের কাছ থেকে বাইআত নিয়েছেন। মানুষ এই নৈতিক অনুভূতির স্মারক কোন প্রতীকী জিনিস দেখতে চায়। আল্লাহ তাই, এই পাথরটিকে বাইতুল্লাহ শরীফের কোণে প্রতীকী স্মারক হিসাবে স্থান দিলেন। এইটি দেখে এবং এতে চুমু দিয়ে মুসলমানরা অনুভব করবে যে, তারা আল্লাহর বাইআত গ্রহণ করছে এবং স্বীয় দায়িত্ব ও আমানত পালনের জন্য আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে।

অবশ্য এই হেকমতটি চিন্তা করলে বুঝা যায়। তবে এর মূল রহস্য হচ্ছে, জ্ঞান ও বিবেকের পরীক্ষা নেয়া; এর প্রতি মানব মনের সাড়ার প্রকৃতি জানা এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা অনুষ্ঠান। বান্দাহ, এর মূল কারণ জানুক বা না জানুক, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর ইবাদত ও হুকুম মানা জরুরী। তাই হাজারে আসওয়াদের অস্তিত্ব আল্লাহর সার্বিক আনুগত্য এবং এবাদতের অংশবিশেষ।

হাজারে আসওয়াদে চুমু বা স্পর্শ করার দোয়া

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে,(১০) ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেছেন অর্থাৎ দ্রুতবেগে হেঁটেছেন। তারপর যখন হাজারে আসওয়াদে চুমু দেন বা স্পর্শ করেন কখন এই দোয়াটি পড়েন ঃ

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرْ ، اِيْمَانًا بِاللهِ ، وَتَصْدِيْقًا بِمَاجَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং মুহাম্মদ (সা) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস করি।'

তারপর তিনি রোকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে পড়েছেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِىْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ -

অর্থ ঃ 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে নেক ও কল্যাণ দাও এবং দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা বাকারা- ২০১)

ফাকেহী আরো উল্লেখ করেছেন,(১১) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) হাজারে আসওয়াদকে চুমু বা স্পর্শ করার সময় বলতেন,

امَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوْتِ ـ

অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং তাগুতের প্রতি অবিশ্বাস করলাম'।

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা) হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করার সময় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ تَصْدِ يْقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ তোমার কিতাব ও নবীর সুন্নতের প্রতি বিশ্বাস সহকারে (শুরু করছি)।' হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ বলতেন ঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابً النَّارَ ـ

(البقرة : ٢٠١)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হাজারে আসওয়াদে ভিড় থাকলে কাউকে কষ্ট দেবে না, নিজেও কষ্ট পাবে না এবং এমনিতেই চলে যাও।

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমরের প্রখ্যাত বক্তব্যের মত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)ও বলেছিলেন ঃ (১২)

اِنِّىْ لاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ اَنِّىْ ، رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَاقَبَّلْتُكَ ـ

অর্থ ঃ "আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর। তুমি কারো উপকার ও অপকার করতে পারনা। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমিও তোমাকে চুমু দিতাম না।"

ফাকেহী আরো উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করার পর নিজের হাত চেহারার উপর মসেহ করতেন। হযরত

ওমর বিন আবদুল আযীযও (রা) নিজের চেহারা এবং দাড়ির উপর হাত মুছতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা) কে বলেছেন ঃ 'হে উমর, তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি, দুর্বলকে কষ্ট দিও না। যখন হাজারে আসওয়াদকে ভিড়মুক্ত পাবে তখন স্পর্শ করবে এবং হাতে চুমু খাবে। অন্যথায় তাকবীর বলে অতিক্রম করে চলে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হাজারে আসওয়াদের কাছে, আসমান যমীন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে একজন ফেরেশতা আমীন, আমীন বলছে। তাই তোমরা–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

বল।' অর্থাৎ ফেরেশতার আমীন বলার সাথে এই দোয়া একাকার হয়ে গেলে, তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

রাসূলুল্লাহ (সা) হাজারে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন এবং এর উপর দু'হাত বিছিয়ে দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তওয়াফের প্রত্যেক চক্করে হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীকে হাতে স্পর্শ করতেন এবং পরে সেই হাতে চুমু খেতেন।

হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়া কিংবা স্পর্শ করার সময় যে কোন দোয়াই করা যেতে পারে। দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ যত বেশী পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই ততবেশী দোয়া করা উচিত। এর জন্য বিশেষ কোন দোয়া নেই। আজকাল, অবশ্য অনেক দোয়ার বই বেরিয়েছে এবং সেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো পড়া তেমন কোন জরুরী নয়। দোয়া যে কোন ভাষায় হতে পারে। তবে উত্তম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে তাদের কাছ থেকে বর্ণিত দোয়াসমূহ পাঠ করা। হাজারে আসওয়াদে স্পর্শ কিংবা চুমু দেয়ার সময় যে সকল দোয়া পড়া সুন্নত ও মোস্তাহাব সেগুলো হচ্ছে ঃ

ইমাম শাফেঈ তাঁর اَلْقُرَى কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ কিংবা চুমু দেয়ার সময় কি দোয়া পড়া যায়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা তখন এই দোয়াটি পড়বে ঃ

بِسْمِ اللهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ اِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيْقًا لِاِجَابَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

আরেকজন সাহাবী হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ কিংবা চুমু দেয়ার সময় এই দোয়াটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর দরুদ পাঠ করতেন। হযরত আলী (রা) অনুরূপ দোয়া পড়তেন। তবে তিনি আরো একটু বাড়িয়ে বলতেন ঃ

وَاتِّبَاعًا لِسُنَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) এই দোয়া পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَاهَدَانَا اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اٰمَنْتُ بِاللهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوْتِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى وَمَا يُدْعٰى مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَيَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ

আযরাকী তাঁর আখবারে মক্কা বইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

রোকনে ইয়ামানীর তাৎপর্য ও তাকে স্পর্শ করার ফজীলত

রোকনে ইয়ামানী কা'বা শীফের একটি সম্মানিত কোণ। এই কোণের অনেক ফজীলত ও মর্যাদা আছে। এর সবচেয়ে বড় মর্যাদা হচ্ছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে তা স্পর্শ করেছেন। আবু দাউদ শরীফে হযরত উমর থেকে বর্ণিত আছে

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدَعُ اَنْ يَّسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ فِى كُلِّ طَوَافِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ـ

(ابوداؤد والنسائى)

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক তওয়াফে রোকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ত্যাগ করতেন না, হযরত ইবনে উমর (রা)ও তাই করতেন।'

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

لَمْ اَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ ـ

অর্থ ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনী ব্যতীত অন্যকিছুকে স্পর্শ কিংবা চুমু দিতে দেখিনি।'

উমাইর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে বললাম, আপনি হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা কিংবা চুমু দেয়ার জন্য কেন ভিড় করেন? আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের মধ্যে কাউকে ভিড়ের মধ্যে এদুটোতে গিয়ে চুমু কিংবা স্পর্শ করতে দেখিনি। ইবনে উমর উত্তর দেন যে, আমি তা এইজন্য করি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি–

اِنَّ اِسْتِلاَ مَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا ـ

অর্থ ঃ 'এ দুটোকে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়া হলে গুনাহ মাফ হয়।' উমাইরের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আবদুল্লাহ বিন উমর ভিড়ের মধ্যে নিজের চেহারাকে রক্তাক্ত করে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি উপরোক্ত জবাব দেন।

এইসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করেছেন এবং এটাই সহীহ সুন্নত। তবে মতভেদ হচ্ছে একে চুমু দেয়ার ব্যাপারে এবং একে চুমু দেয়াটা মশহুর রেওয়ায়েতের খেলাফ। তবে ইবনে হাজার বুখারী শরীফের শরহ-ফতহুল বারীতে উল্লেখ করছেন যে, কারো কারো মতে, এতে চুমু দেয়া মোস্তাহাব।

ইবনে জোহাইরা উল্লেখ করেছেন যে, কারমানী ইমাম আহমদের মত উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি এতে চুমু দিতেন। (الجامع اللطيف)

এ ব্যাপারে কিছু সহায়ক হাদীস আছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ قَبَّلَهُ ـ (رواه البخارى فى تاريخه)

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রোকনে

ইয়ামানীকে স্পর্শ করতেন, তখন তিনি এতে চুমু দিতেন।' ইবনুল কাইয়ুম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ -

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দিতেন এবং এর উপর নিজের গাল রাখতেন।'

হাকেম তাঁর মোসতাদরাকে এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এখানে 'রোকনে ইয়ামানী' অর্থ হচ্ছে, 'হাজারে আসওয়াদ।' কেননা, হাদীসের পরিভাষায় উভয় রোকনকে এক সাথে, الرُّكْنَان الْيَمَانِيَان বলা হয়, অর্থাৎ দুই রোকনে ইয়ামানী। অথচ রোকনে ইয়ামানী দুটো নয়, একটি। অপরটি হচ্ছে হাজারে আসওয়াদ। হযরত উমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) শুধুমাত্র হাজারে আসওয়াদকেই চুমু দিয়েছেন। এই হাদীসের কারণেই এই ব্যাখ্যা করা হল।

আল্লামা ফাসী শেফাউল গারামে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেয়ার বিষয়টি সহীহভাবে প্রমাণিত নয়।

রোকনে ইয়ামানীর অনেক ফজীলত আছে। এর প্রথম ফজীলত হচ্ছে, এটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর যথার্থভাবে মওজুদ আছে। রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকী হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভিত্তির উপর নেই। সে অংশে কাবাকে সংকুচিত করে তৈরি করা হয়েছে।

ফাকেহী হযরত আলীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন [১৩]

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض- يَااَبَا هُرَيْرَةَ انَّ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِى لَمَلَكًا مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الدُّنْيَا الَى يَوْمِ يَرْفَعُ الْبَيْتَ يَقُوْلُ لِمَنِ اسْتَلَمَ وَاَوْمَا بِيَدِهِ : فَقَالَ رَبَّنَا آتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، قَالَ الْمَلَكُ

اَمِيْنُ ـ وَتَاْمِيْنُ الْمَلاَئِكَةِ اِجَابَةُ ـ اسناده ضعيف ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হুরায়রা (রা) কে বলেন 'হে আবু হুরায়রা, আল্লাহ যেদিন থেকে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন সেই দিন থেকে যেদিন এই ঘরকে উঠিয়ে নেবেন, সেই দিন পর্যন্ত রোকনে ইয়ামানীতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে এবং থাকবে। যে ব্যক্তি এই পাথর স্পর্শ করবে কিংবা এর প্রতি হাত দিয়ে ইশারা করবে এবং বলবে رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ সেই ফেরেশতাটি আমীন বলবে। ফেরেশতার দোয়া কবুল হয়।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وُكِّلَ بِهِ سَبْعُوْنَ مَلَكًا ، مَنْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، رَبَّنَا اٰتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ قَالَ : اٰمِيْنُ ـ رواه ابن ماجة فى المناسك واسناده ضعيف ـ

অর্থ ঃ 'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রোকনে ইয়ামানীতে ৭০ জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। যে ঐ দোয়াটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، رَبَّنَا اٰتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

'ফেরেশতারা আমীন বলবে।'

ইবনে আবিদ দুনিয়া শাবী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাবী বলেছেন, একদিন আমি, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, মুসআব বিন যোবায়ের এবং আবদুল মালেক বিন মারওয়ান কাবা শরীফের পাশে বসা ছিলাম। আলোচনা শেষে সবাই বলল যে, এখন একজন একজন করে সবাই রোকনে

ইয়ামানী স্পর্শ করে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ নিজের কুদরত থেকে দান করেন। বলা হল, হে আবদুল্লাহ বিন যোবয়ের! প্রথমে আপনি উঠুন। আপনি হিজরতের পর প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তান। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আপনি মহান, মহান কিছুই আপনার কাছে চাওয়া হয়, আমি আপনার চেহারা, আরশ এবং কা'বার সম্মানের উছিলায় প্রার্থনা করছি, আমাকে হেজাযের ক্ষমতা এবং খেলাফত না দিয়ে মৃত্যু দেবেন না। তিনি এসে বসলেন তারপর লোকেরা বলল, হে মুস'আব বিন যোবায়ের! এবার আপনি উঠুন। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী ধরে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ সবকিছুর প্রতিপালক, সবকিছু আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী, সবকিছুর উপর আপনার বিদ্যমান কুদরতের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা জানাই, আমাকে ইরাকের ক্ষমতা দান এবং সোকাইনা বিনত হোসাইনকে বিয়ের আগ পর্যন্ত মৃত্যু দেবেন না। তিনি এসে বসলেন। তারপর লোকেরা বলল, হে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান, এবার আপনি যান। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি সাত আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আপনার আদেশের অনুগত লোকেরা যা দোয়া করে আমিও তাই চাচ্ছি, আমি আপনার চেহারার সম্মান, সমস্ত সৃষ্টির উপর আপনার অধিকার এবং বাইতুল্লাহর তওয়াফকারীদের অধিকারের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করি; আমাকে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের ক্ষমতাদানের আগে মৃত্যু দেবেন না। কেউ এর বিরোধিতা করলে শিরচ্ছেদের পর তার মাথা যেন আমার কাছে হাজির করা হয়। তিনি আসলেন এবং বসলেন। লোকেরা বলল, হে আবদুল্লাহ বিন উমর, আপনি উঠুন। তিনি উঠলেন এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি মেহেরবান, দয়ালু। আমি আপনার গযবের উপর বিজয়ী রহমত কামনা করি; সমস্ত সৃষ্টির উপর আপনার অধিকারের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করি, বেহেশত ওয়াজিব করার আগে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবেন না। শা'বী বলেছেন, আমি দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আগে দেখেছি, উপরোক্ত ব্যক্তিরা যে যা চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন। এমন কি, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) কে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে বেহেশতও দেখানো হয়েছে। শা'বী বলেছেন, এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। (شفاء الغرام)

আযরাকী তাঁর 'আখবারে মক্কা' বইতে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই রোকনে ইয়ামানীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছেন, তখনই একজন ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বলেছে ঃ 'হে মুহাম্মদ, স্পর্শ কর।' হাদীসটির সনদ দুর্বল। আযরাকী আরেকটি দুর্বল আছার উল্লেখ করে বলেছেন যে, হোসাইন মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি রোকনে ইয়ামনীতে হাত রেখে দোয়া করে তার দোয়া কবুল হয়। হোসাইন প্রস্তাব করল, হে আবুল হাজ্জাজ (মুজাহিদ), আমাদেরকে নিয়ে সেখানে দোয়া করুন; পরে আমরা সকলে দোয়া করলাম।' মুজাহিদ ছিলেন প্রখ্যাত তাবেয়ী' এবং সুযোগ্য জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী। এই একই সনদে মুজাহিদের আরেকটি বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, রোকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে ৭০ হাজার ফেরেশতা মওজুদ রয়েছে। কা'বা শরীফ সৃষ্টির পর থেকে এযাবত ঐ ফেরেশতারা কখনও ঐ জায়গা ত্যাগ করে না।' কিন্তু এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের আগে বর্ণিত হাদীসটিও সহায়ক।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন ঃ

عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِى مُؤَكَّلاَنِ يُؤَمِّنَانِ عَلَى دُعَاءِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمَا وَاَنَّ عَلَى الْاَسْوَدِ مَالاَ يُحْصٰى ـ (رواه الازرقى وسنده جيد)

অর্থ ঃ 'রোকনে ইয়ামানীতে দু'জন ফেরেশতা আছেন। তাঁরা দোয়াকারীদের জন্য আমীন বলেন এবং হাজারে আসওয়াদে আছে অগণিত ফেরেশতা।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, দু' রোকন অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানীর মাঝখানে একটি কূপ আছে এবং এর উপর ৭০ হাজার ফেরেশতা আছে। দোয়াকারীদের জন্য তারা আমীন বলে। কেউ দোয়া করতে ভুলে গেলে তারা বলে, 'হে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে মাফ কর।'

(رواه عبد الرزاق فى مصنفه وسنده ضعيف)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর সনদ দুর্বল হলেও সেগুলো মিথ্যা হাদীস নয়। মোটকথা, অনেকগুলো সহীহ ও দুর্বল হাদীস দ্বারা বর্ণিত রোকনে ইয়ামানীর ফজীলত এর মর্যাদার প্রমাণ। তবে এই সকল হাদীসে যেসব বৈপরীত্য আছে সেগুলো অনুধাবন

করা দরকার। একবার এক ফেরেশতা, একবার ২ ফেরেশতা, একবার ৭০ ফেরেশতা, আরেকবার ৭০ হাজার ফেরেশতা মওজুদের বর্ণনায় বৈপিরীত্য রয়েছে। বহু আলেম ঐ বৈপিরীত্য দূর করার চেষ্টা করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে শেখ মুহাম্মদ বিন আলান সিদ্দিকী তাঁর مثير سوق الانام الى حج بيت الله الحرام বইতে যা লিখেছেন তার সার-সংক্ষেপ হল, দুই ফেরেশতা সাধারণভাবে সকল দোয়া, ৭০ জন ফেরেশতা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.........الخ -

এই দোয়া এবং একজন ফেরেশতা শুধু رَبَّنَا اتِنَا.....الخ এই দোয়ার আমীন বলে। সম্ভবতঃ ৭০ হাজার ফেরেশতাও বিশেষ দোয়ায় অংশ নেয়।

রোকনে ইয়ামানীর আরেকটা বিশেষ ফজীলত আছে। তবে এটি বেশী মশহুর নয়। সেটি হচ্ছে, রোকনে ইয়ামানী কিয়ামতের দিন, তাকে যারা স্পর্শ করছে তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। কিছু সংখ্যক বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানীকে দুই চোখ, দুই জিহ্বা ও দুই ঠোঁট সহকারে উঠাবেন তারা তাদের গায়ে চুমুদানকারী ও স্পর্শকারীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

(رواه الطبرانى فى الكبير)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

يَاْتِى الرُّكْنُ الْيَمَانِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مِنْ اَبِىْ قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانَانِ وَشَفَتَانِ - (رواه آحمد باسناد حسن والطبرانى فى الاوسط)

অর্থ ঃ 'কিয়ামতের দিন রোকনে ইয়ামানী আবু কোবাইস পাহাড়ের চেয়েও আরো বড় আকৃতিতে উপস্থিত হবে; এর দু'টো জিহ্বা ও ঠোঁট থাকবে।'

ইবনে জোহাইরা শা'বী থেকে উপরে বর্ণিত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, তাঁর ভাই মুসআব, আবদুল মালেক বিন মাওয়ান এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) এর কা'বার পাশে বসা সংক্রান্ত ঘটনাটি সামান্য পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি সবশেষে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের বেহেশতের সুসংবাদের প্রশ্নের ব্যাপারে

সুন্দর ২টি জবাব দিয়েছেন। ১ম জবাবটি হচ্ছে ঃ তিনি বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, ইবনে উমর শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অপরদিকে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, مَنِ ابْتُلِىَ بِذٰلِكَ بِالْجَنَّةِ 'এইটা দ্বারা পরীক্ষিত লোকেরা জান্নাতে যাবে।'

২য় জবাবটি হচ্ছে ঃ বাকী তিনজনের দোয়া যখন কবুল হয়েছে তখন আবদুল্লাহ বিন উমরের দোয়া কবুল হওয়া আরো বেশী প্রণিধানযোগ্য। কেননা, তিনি আল্লাহর দান ও রহমত পাওয়ার বেশী যোগ্য ছিলেন। তিনি আমল ও তাকওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ লাভের ব্যাপারে এ দু'টো প্রমাণই যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকীকে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ঐ দু'টো রোকনকেও স্পর্শ করতেন। বুখারী শরীফে এসেছে যে, হযরত মুয়াওয়িয়া (রা) রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকীকে স্পর্শ করতেন। ফাকেহী আবুত্ তোফায়েল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত মুয়াওয়িয়া (রা) কে সব রোকন বা কোণ্ স্পর্শ করতে দেখেছেন।

আবি শা'বা বর্ণনা করেছেন যে, আমি হাসান এবং হোসাইন (রা) কে কাবা শরীফের সকল কোণে চুমু দিতে বা স্পর্শ করতে দেখেছি। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) তওয়াফের সময় সকল কোণ স্পর্শ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরও (রা) সকল কোণ স্পর্শ করতেন।

তবে রাসূলুল্লাহ (সা) রোকনে শামী এবং রোকনে ইরাকীকে স্পর্শ করেননি কিংবা চুমুও দেননি। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই কোণ দু'টি হযরত ইবরাহীম (আ) এর মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোরাইশরা ঐ অংশে কাবা শরীফকে সংকুচিত করে তৈরি করেছে। এ ছাড়াও সে কোণগুলোর কোন ফজীলত পৃথকভাবে বর্ণিত হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঠিক আনুগত্য ও অনুসরণ করার করণেই এ কোণ দু'টি স্পর্শ করা কিংবা চুমু দেয়া ঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়ালী বিন উমাইয়া তাঁর বাপের এক ঘটনা উল্লেখ করেন। উমাইয়া বলেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাবের সাথে তওয়াফ করেছি। তিনি হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করেন। তারপর তওয়াফের সময় রোকনে ইরাকীর কাছে গেলে আমি একে স্পর্শ করতে চাইলাম। তখন উমর (রা) বললেন, তুমি কি করতে চাও?

আমি বললাম, আপনি কি একে স্পর্শ করবেন না? তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে তওয়াফ করনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি ঐ কোণ্ দু'টিকে স্পর্শ করেছেন কিংবা চুমু দিয়েছেন? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর জীবনে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত নেই? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেই আদর্শকেই বাস্তবায়ন কর।

হযরত ইবনে উমর রোকনে শামীকে স্পর্শ করেছেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে সে প্রসঙ্গে নাফে'কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আমরা তাঁকে মাত্র ১ বারই দেখেছি যে তিনি একে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরে আবার হাত গুটিয়ে আনেন। তারপর বলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি ভুল করেছি। (ফাকেহী; আখবারে মক্কা)

আবুত্ তোফায়েল বলেন যে, একবার আমি ইবনে আব্বাস এবং মুয়াওয়িয়া (রা) এর সাথে ছিলাম। মুয়াওয়িয়া (রা) তওয়াফের সময় যখনই কোন কোণে যেতেন তখনই সেটাকে স্পর্শ করতেন। তখন ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রোকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত আর কোন রোকনকে স্পর্শ করেননি কিংবা চুমুও দেননি।

তখন মুয়াওয়িয়া (রা) বলেন, আল্লাহর ঘরের কোন অংশই পরিত্যজ্য নয়।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস এক ব্যক্তিকে রোকনে শামী এবং ইরাকীকে স্পর্শ করতে দেখে বলেন, তুমি কেন এই রোকন দু'টিকে স্পর্শ করছ? সেই ব্যক্তি জবাবে বলল, আল্লাহর ঘরের কোন অংশ পরিত্যজ্য নয়। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

'রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও ঐ রোকন দু'টোকে স্পর্শ করেননি। তখন ঐ ব্যক্তি ঐ রোকন দু'টি স্পর্শ করা থেকে বিরত হল।

ইমাম শাফেয়ী (রা) 'আল্লাহর ঘরের কোন অংশ পরিত্যজ্য নয়'– এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা আল্লাহর ঘরকে পরিত্যজ্য করার উদ্দেশ্যে ঐ রোকন দু'টো স্পর্শ থেকে বিরত হইনি। আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করলে কোন অংশকে ত্যাগ করা হয়

না, এবং তা পরিত্যজ্যও হয় না। আমরা সুন্নাহর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই ঐ দু'টো রোকনের স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকি। যদি ঐ দু'টো রোকনকে স্পর্শ না করার নাম পরিত্যাগ হয় তাহলে, দুই রাকনের মধ্যবর্তী স্থানগুলোও পরিত্যজ্য বলে বিবেচিত হবে? কেননা, সেগুলোকেও তো স্পর্শ করা হয় না। অথচ এটা কারোর প্রশ্ন বা বক্তব্যের বিষয় নয়।

মোলতাযামের তাৎপর্য

মোলতাযাম হচ্ছে হাজারে আসওয়াদ এবং কা'বার দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালের স্থানটুকুর নাম। এটাই হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর মত। এর অপর নাম হচ্ছে اَلْمُدَّعَا، দোয়ার জায়গা এবং اَلْمُتَعَوَّذُ আশ্রয় প্রার্থনার স্থান। (আযরাকী, শেফাউল গারাম এবং আল-জামে' আল-লতীফ)। মোলতাযাম শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আঁকড়ে ধরার স্থান।' লোকেরা এটাকে আঁকড়ে ধরে দোয়া করে বলে এর নাম হচ্ছে মোলতাযাম এর ফজীলত অনেক বেশী। যে সকল জায়গায় দোয়া কবুল হয় এটি তার অন্যতম।

হাদীস দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের চেহারা, বুক, দুই হাত ও দুই কব্জা দিয়ে এটিকে আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছেন।

হযরত আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মক্কা বিজয়ের দিন আমি বললাম যে, আমি আমার পোশাক পরবো। আমার ঘরও ছিল রাস্তার উপর। তারপর আমি চললাম। তখন দেখলাম নবী করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম কা'বা শরীফ থেকে বের হন এবং কা'বার দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত দেয়াল স্পর্শ করেন। তারা কা'বার দরজায় নিজেদের গাল বিছিয়ে দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সবার মাঝে অবস্থান করছিলেন। (আবু দাউদ) এই হাদীসের সনদে ইয়াজিদ বিন আবি জিয়াদ নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণযোগ্য রাবী নন।

বজলুল মাজহুদ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, মুসনাদে আহমদ বর্ণিত হাদীসে, হযরত আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে হাজারে আসওয়াদ এবং বাবুল কা'বার মাঝখানে দেয়াল আঁকড়ে থাকতে এবং অন্যান্যদেরকে বাইতুল্লাহর বিভিন্ন অংশ আঁকড়ে ধরতে দেখেছি।

ইবনে মাজাহ হযরত আমর বিন আ'স থেকে বর্ণনা করেছে, হযরত আমর বিন আস মোলতাযাম আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহর কসম,

এটি সেই জায়গা যেখানে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে আঁকড়ে ধরে দোয়া করতে দেখেছি।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে যে, আবদুল্লাহ কা'বার তওয়াফ করেন, হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করেন, পরে হাজারে আসওয়াদ এবং কা'বার দরজার মাঝখানে দাঁড়ান এবং নিজের বুক, কপাল, দুই হাত ও কবজি এইরূপ করেন। এই বলে তিনি নিজে এগুলো বিছিয়ে দেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

হযরত ইবনে উমর নিজের বুক ও কপাল মোলতাযামে লাগিয়ে দোয়া করতেন। বাবুল কা'বা এবং হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানটুকুই হচ্ছে মোলতাযাম। তবে, হযরত আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামকে হাতীম পর্যন্ত বাইতুল্লাহকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যা বলেছেন, তার জবাব হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মোলতাযামে দাঁড়িয়েই দোয়া করেছেন। তবে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং মোলতাযামে সবাইর সংকুলান না হওয়ায় কিছু সংখ্যক তো মোলতাযামেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আর অবশিষ্টরা হাতীম পর্যন্ত বাইতুল্লাহকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মোলতাযাম দোয়া কবুলের একটি পরীক্ষিত জায়গা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَلْمُلْتَزَمُ مَوْضَعٌ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ - مَادَعَا اللّٰهَ فِيْهِ عَبْدٌ دَعْوَةً اِلاَّ اسْتَجَابَهَا -

অর্থ ঃ 'মোলতাযাম হচ্ছে দোয়া কবুলের জায়গা। কোন বান্দাহ এখানে দোয়া করলে, তা অবশ্যই কবুল হয়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম এই হাদীস শুনার পর যখনই আমি মোলতাযামে দোয়া করেছি তখনই আমার দোয়া কবুল হয়েছে। হযরত আমর বিন আস (রা) বলেন, যখন ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদীস শুনেছি তখন থেকেই কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে মোলতাযামে গিয়ে দোয়া করার পর আল্লাহ সে সকল দোয়া কবুল করেছেন এবং সমস্যাগুলো দূর করে দিয়েছেন। এই

হাদীসের সনদের রাবী সুফিয়ান এবং হোমাইদীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়াও এখন পর্যন্ত বহু লোক মোলতাযামে দাঁড়িয়ে দোয়া করার পর তাদের দোয়া কবুল হতে দেখেছেন।

কাজী আ'য়াদ তাঁর শাফা গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বইতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হল–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَعَا اَحَدٌ بِشَئْيٍ فِى هٰذَا الْمُلْتَزَمِ اِلاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ ـ

অর্থ ঃ এই মোলতাযামে দাঁড়িয়ে কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, তাঁর দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।' তারপর কাজী আ'য়াদ বলেন, আমি এবং এই হাদীসের সকল রাবী এই হাদীসটি শুনার পর মোলতাযামে গিয়ে দোয়া করায় আমাদের সবার দোয়া কবুল হয়েছে।

আযরাকী মোলতাযামের ফজীলত বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, হযরত আদম (আ) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসার পর সাতবার বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন এবং বাবুল কা'বার সামনে দু' রাকাত নামায পড়েন। পরে মোলতাযামে এসে এই প্রার্থনা করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيْرَتِىْ وَعَلاَ نِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِىْ وَمَاعِنْدِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى أَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْ يُّصِيْبَنِىْ اِلاَّ مَاكُتِبَتْ لِىْ وَالرِّضَاءُ بِمَاقَضَيْتَ عَلَىَّ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ তুমি আমার প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জান। আমার ওজর আপত্তি কবুল কর, তুমি আমার দেহ ও অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সুতরাং আমার গুনাহ মাফ কর। তুমি আমার প্রয়োজন জান, তাই আমার প্রার্থনা পূরণ কর। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে অন্তর আবাদকারী ঈমান এবং সত্য ও মজবুত বিশ্বাস কামনা করি, যেন এর ফলে আমি বুঝতে পারি

যে, তুমি আমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছ এবং যে পরিমাণ সন্তুষ্টি নির্ধারিত করেছ তা ছাড়া এর বাইরে অন্য কিছু আমাকে স্পর্শ করবে না।' তখন আল্লাহ হযরত আদম (আ) এর কাছে ওহী পাঠিয়ে বলেন, হে আদম, তুমি আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছ আমি তা কবুল করলাম। তোমার সন্তানদের মধ্যেও যদি কেউ আমার কাছে দোয়া করে, আমি তার দুঃখ-পেরেশানী দূর করে দেব। তাকে হারিয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে, তার অন্তর থেকে অভাব-দারিদ্র্য দূর করে দেব। তার সামনে ধন ও প্রাচুর্যের ফোয়ারা সৃষ্টি করে দেব, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যবসা থেকে তাকে দান করবো এবং সে দুনিয়া না চাইলেও দুনিয়া তার কাছে আসবে।

হযরত আদম (আ) এর তওয়াফের পর থেকেই কা'বার তওয়াফের সুন্নাত চালু হয়।'

এই লম্বা হাদীসটির সনদ উত্তম। তবে এটি বনি মাখযুমের গোলাম আবদুল্লাহ বিন আবু সোলায়মান থেকে বর্ণিত মাওকুফ হাদীস। এটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস নয়। তবে আল্লামা আযরাকী অন্য সনদের মাধ্যমে এই হাদীসটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সনদের মধ্যে হাফস বিন সোলায়মান পরিত্যক্ত, এছাড়া অন্য সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

আল ফাকেহী বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ বিন জোবায়ের বলেন, আমি বসরাবাসীদের চেয়ে অন্য কাউকে এই ঘরের প্রতি এত বেশী আসক্ত দেখিনি। তিনি বলেন, বসরা থেকে আগত এক মহিলা কা'বা শরীফে এসে মোলতাযামে দাঁড়ায়, সে দোয়া করে এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত মারা যায়।[১৪]

ফাকেহী আরো উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদ এক ব্যক্তিকে বাবুল কা'বা এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝে দেখে তার কাঁধ কিংবা পিঠের উপর হাত রেখে বলেন, মোলতাযামকে আঁকড়ে ধর। মুজাহিদ আরো বলেন, মোলতাযামে দোয়া করা হয়। এমন মানুষ কমই আছে যে, মোলতাযামে দোয়া ও আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, বরং সবাই পেয়েছে।

মীযাবে কা'বা ও এর নীচে দোয়ার ফজীলত

নবী করীম (সা) এর জন্মের ৩৫ বছর পর, কোরাইশরা যখন কা'বা শরীফ নির্মাণ করে, তখন তারা কা'বার ছাদ দেয় এবং ছাদের পানি সরার জন্য একটি নল লাগায়। এই নলকেই মীযাব বলা হয়। এর আগে কা'বার ছাদ ছিল না এবং মীযাবও ছিল না। তারপর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) কা'বা নির্মাণের সময় ছাদে একটি মীযাব লাগান এবং কোরাইশদের মত তিনিও মীযাবের পানি হিজরে ইসমাঈলে পড়ার ব্যবস্থা করেন। তারপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফও অনুরূপ মীযাব লাগান।

দুই কারণে মীযাবের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। (১) যখন এটি নষ্ট হয়ে যায় তখনই আরেকটি মীযাব লাগানো হয়। (২) বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও ধনী ব্যক্তিরা কা'বার জন্য মীযাব উপহার পাঠায়। তখন পুরাতনটি খুলে নতুন মীযাব লাগানো হয়। নতুন মীযাবগুলো পূর্বের মীযাবের নকশা এবং ডিজাইন থেকে উন্নত হত এবং অনেকগুলোতে সোনা ও রূপার কারুকার্য করা হত।

১২৭৬ হিজরীতে তুর্কী সুলতান আবদুল মজিদ খান, কনস্টান্টিনোপলে একটি সোনার মীযাব তৈরি করেন এবং সেই বছরই তা কা'বায় লাগান। এতে প্রায় ৫০ রতল সোনা লাগানো হয়েছে। সেটিই সর্বশেষ মীযাব। বর্তমান কাবায় মওজুদ মীযাবটিই সেই মীযাব। এরপরে আজ পর্যন্ত ঐ মীযাবের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

মীযাবের নীচে দোয়া করার ফজীলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনদের পক্ষ থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আমরা এখানে সে সকল বর্ণনা সম্পর্কে আলোকপাত করবো ঃ আল্লামা আযরাকী আতা থেকে এবং আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "তোমরা নেক লোকদের নামাযের জায়গায় নামায পড় এবং নেককারদের পানীয় পান কর।" ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করা হল, নেক লোকদের নামাযের জায়গা বলতে কোনটাকে বুঝায়? তিনি জবাবে বলেন, 'সেটি হচ্ছে মীযাবের নীচে।' তারপর জিজ্ঞেস করা হল নেককারদের পানীয় কি? তিনি বলেন, 'সেটি হচ্ছে যমযম'।

আযরাকী আ'তার বরাত দিয়ে বলেছেন, মীযাবের নীচে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে সেই দোয়া কবুল হয় এবং দোয়াকারী ব্যক্তি মায়ের পেট থেকে সদ্যপ্রসূত নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

সহীহ হাদীসগুলোতে তওয়াফের ফজীলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। মীযাব তওয়াফের বৃহত্তর পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তওয়াফের ফজীলতগুলোও এই বিশেষ জায়গার জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা।

গেলাফে কা'বা

গেলাফে কা'বার ইতিহাস

গেলাফে কা'বা আল্লাহর ঘরের প্রতি উত্তম সম্মান প্রদর্শনের উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহর ঘরকে সাজানোর ব্যাপারে এটি হচ্ছে বান্দাহর আপ্রাণ প্রচেষ্টার বাস্তব নজীর। কা'বা শরীফের গেলাফের ইতিহাস খোদ কা'বা শরীফের ইতিহাস থেকেই শুরু হয়েছে। কিছু সংখ্যক ওলামার মতে, স্বয়ং হযরত ইসমাঈল (আ) নিজেই কা'বা শরীফে গেলাফ পরিয়েছেন। অবশ্য অন্য এক ঐতিহাসিক বর্ণনায় বলা হয় যে, ইয়েমেনের শাসক তয় তুব্বা' কা'বা শরীফে সর্বপ্রথম গেলাফ পরান। মক্কায় খোযাআ' গোত্রের শাসনামলে, ইয়েমেনের শাসক ১ম তুব্বা' সৈন্য সামন্ত নিয়ে কা'বা শরীফ ধ্বংস করতে এসে নিজেই ধ্বংস হয়। এর পর দ্বিতীয় তুববা' কা'বা ধ্বংস করতে এসে কোরাইশদের হাতে পরাজিত হয়। তারপর ৩য় তুববা' যাকে 'তুববা' আল হোমায়রী' বলা হয়, সে কা'বা শরীফ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এবং এর ধনভাণ্ডার আত্মসাতের জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু সে এবং তার সৈন্যরা হঠাৎ করে

কা'বা শরীফের গেলাফের নীচের অংশ উপরে তুলে দেয়া হয়েছে।

প্রচণ্ড তুফানের সম্মুখীন হয় এবং অগ্রাভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তারপর তারা কঠিন রোগ-শোকে আক্রান্ত হয়। এটি ছিল আল্লাহর গযব। তার সাথে যে ধর্মযাজক ছিল সে বাদশাহকে ঐ অভিযান বন্ধের পরামর্শ দেয় এবং কা'বা শরীফকে সম্মান প্রদর্শন করা, এর তওয়াফ করা ও নিজ মাথা মুণ্ডানোর উপদেশ দেয়। অতএব বাদশাহ্ ঐ পরামর্শ মেনে নেয় এবং মক্কায় ৬ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। সে ঐ সময় খুবই সুন্দর এবং সর্বোচ্চমানের কাপড় সংগ্রহ করে গেলাফ তৈরি করে কা'বা শরীফের গায়ে পরিয়ে দেয়। এ জন্যই তুববা' আল-হোমায়রীকে কা'বা শরীফে প্রথম গেলাফ পরানোকারী বলা হয়। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে তুব্বা' আসআ'দ আবু কারাব আল-হোমায়রী। অবশ্য একদল ঐতিহাসিকের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর পূর্বপুরুষ আ'দনান বিন উদ সর্বপ্রথম কা'বা শরীফের গায়ে গেলাফ পরান।

এই দুই মতের মধ্যে, তুববা' আল-হোমায়রী কর্তৃক সর্বপ্রথম গেলাফে কা'বা পরানোর ঘটনাটিই বেশী নির্ভরযোগ্য। তুববা' আল-হোমায়রী প্রথমে মোটা কাপড় দিয়ে গেলাফ তৈরি করে। তারপর সে মাআ'ফির, মালা ও ওসায়েল নামক কাপড় দিয়ে গেলাফ তৈরি করে। জাহেলিয়াতের যুগে বহু লোক কা'বা শরীফে গেলাফ পরিয়েছে। তারা এটাকে দীনি ওয়াজিব মনে করত। যে কোন লোক যে কোন সময় ইচ্ছা করলেই গেলাফ লাগাতে পারত। গেলাফের কাপড়গুলো ছিল প্রখ্যাত ইয়েমেনী কাপড়, সিল্ক, ইরাকী সিল্ক, প্রখ্যাত মিসরীয় কাবাতী কাপড় ইত্যাদি। তখন একটার উপর আরেকটা গেলাফ একের পর এক পরানো হত। যখন গেলাফগুলো ভারী কিংবা পুরাতন হয়ে যেত তখন সেগুলোকে সরিয়ে ফেলা হত। এবং দাফন করে দেয়া হত। এই ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, আবু রবীয়াহ বিন আবদুল্লাহ বিন আ'মর আল মাখযুমী বিরাট ধন সম্পদের মালিক ছিল। সে কোরাইশদের কাছে প্রস্তাব করে যে, এক বছর সে নিজের খরচে কা'বা শরীফে গেলাফ লাগাবে এবং অন্য বছর লাগাবে সকল কুরাইশরা মিলে। কুরাইশ নেতারা তা মেনে নেয়। রবীয়া যতদিন জীবিত ছিল ততদিন পর্যন্ত ঐভাবেই গেলাফ লাগানো হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা শরীফে গেলাফ পরানোর কাজকে বহাল রাখলেন। একজন মহিলা কা'বা শরীফে সুঘ্রাণযুক্ত ধুঁয়া দেয়ার সময় গেলাফে আগুন ধরে গেলাফটি পুড়ে যায়। তখন নবী করীম (সা) ইয়েমেনী কাপড় দ্বারা কা'বা শরীফের গেলাফ লাগান।
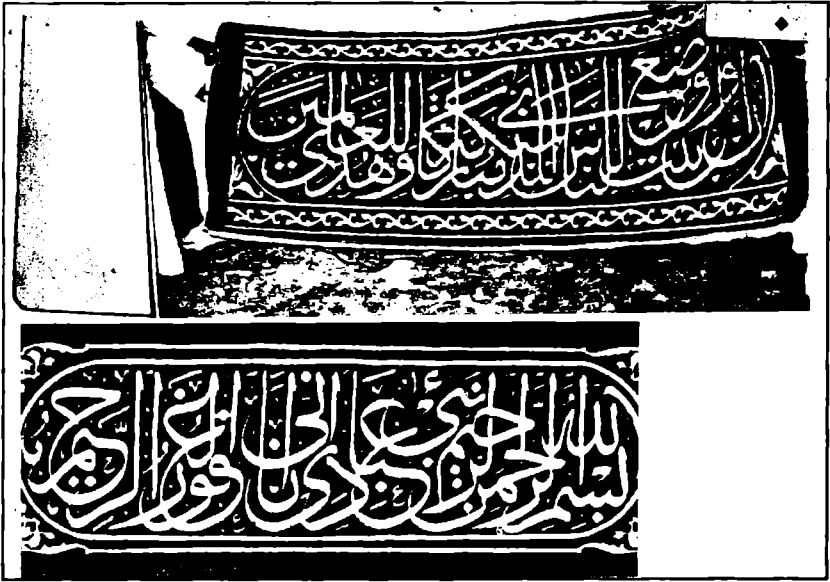
গেলাফে কা'বা

এরপর খোলাফায়ে রাশেদার আমলে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) মিসরের প্রখ্যাত কাবাতী কাপড় দিয়ে গেলাফে কা'বা তৈরি করে তা কা'বা শরীফে পরিয়েছেন। হযরত আলী (রা) গেলাফে কা'বা লাগিয়েছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি গেলাফে কা'বা লাগাতে পারেননি।[১৫]

হযরত মুয়াওয়িয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা) বছরে দু'বার কা'বা শরীফে গেলাফ লাগাতেন। প্রথমবার আশুরার দিন তথা ১০ই মহররম, সিল্কের তৈরি গেলাফ এবং দ্বিতীয়বার রমযানের শেষে মিসরের কাবাতী কাপড় দিয়ে গেলাফ লাগাতেন। তারপর তাঁর ছেলে ইয়াজিদ কা'বা শরীফের গেলাফ লাগিয়েছেন। এরপর গেলাফ লাগিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) এবং আবদুল মালেক বিন মারওয়ান। তাঁরাও সিল্কের কাপড় দিয়ে গেলাফ লাগাতেন। গেলাফের উপর গেলাফ লাগানোর ফলে, এর ওজন বেড়ে যাওয়ায় কা'বা শরীফের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার আশংকা সৃষ্টি হল। ১৬০ হিজরীতে খলীফা মাহদী যখন হজ্জে আসেন তখন আদেশ দেন যে, কা'বা শরীফের গায়ে একই সময়ে একটার বেশী গেলাফ পরানো যাবে না। ঐ নিয়ম আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে। তবে, আব্বাসী খলীফা মামুন বছরে

তিনবার কা'বা শরীফে গেলাফ লাগাতেন। প্রথমবার, ৮ই জিলহজ্জ লাল সিল্ক এর তৈরি গেলাফ, ২য় বার ১লা রজব মিসরীয় সাদা কাবাতী কাপড়ের তৈরি গেলাফ এবং তৃতীয়বার ২৯শে রমযান সিল্ক-এর তৈরি গেলাফ লাগাতেন। এরপর ক্রুসেড যুদ্ধে জেরুসালেম বিজয়ী প্রখ্যাত নেতা সালাহউদ্দীন আইউবীর সমসাময়িক আব্বাসী খলীফা নাসের লি-দীনিল্লাহ, প্রথমে কা'বা শরীফে সবুজ ও পরে কাল গেলাফ পরান। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঐ কাল রং এর গেলাফ সর্বদা কা'বা শরীফে লাগানো হচ্ছে।

আব্বাসী শাসন অবসানের পর যিনি গেলাফে কা'বা লাগান তিনি হচ্ছেন মিসরের শাসক বাদশাহ জাহের বেবরিস। তারপর ইয়েমেনের বাদশাহ মুজাফফর ৬৫৯ হিজরীতে গেলাফ লাগান। এরপর পর্যায়ক্রমে মিসরের শাসকদের সাথে ইয়েমেনের শাসকরা কা'বা শরীফের গেলাফ লাগাতে থাকে।

৮১০ হিজরীতে প্রথম কা'বা শরীফের দরজায় নকশা ও ডিজাইন করা গেলাফ লাগানো শুরু হয়। এর নাম দেয়া হয়েছিল 'বোরকা'। তারপর ৮১৬ থেকে ৮১৮ পর্যন্ত এই দুই বছর ডিজাইন করা বোরকা পদ্ধতি বন্ধ থাকে। তারপর আবার ৮১৯ হিজরীতে বাবে কা'বায় ডিজাইন ও কারুকার্য খচিত গেলাফ লাগানো শুরু হয় যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

৭৫১ হিজরীতে, মিসরের নেককার বাদশাহ ইসমাঈল বিন নাসের মুহাম্মদ বিন কালাউন, কা'বা শরীফের গেলাফ তৈরির জন্য একটি বিশেষ ওয়াকফ ঘোষণা করেন। ঐ ওয়াকফ থেকে প্রতি বছর খানায়ে কা'বার জন্য বাইরের একটি কাল গেলাফ ও একটি আভ্যন্তরীণ লাল গেলাফ তৈরি করা হত এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর, মদীনার মসজিদে নববীর 'হুজরায়ে-নববীর' জন্য একটি সবুজ গেলাফ তৈরি করা হত। কিন্তু হিজরী ১৩ শতাব্দীর শুরুতে মিসরের শাসক মুহাম্মদ আলী পাশা ঐ ওয়াকফটি বন্ধ করে দেন এবং সরকারী তহবিল হতে গেলাফে কা'বা বানানো শুরু করেন। তিনি তুরস্কের উসমানী শাসকদের জন্য কা'বা শরীফের আভ্যন্তরীণ ও হুজরায়ে নববীর গেলাফ বানানোর দায়িত্ব নির্ধারণ করেন। আর মিসর সরকারের জন্য কা'বা শরীফের গায়ে লাগানোর উদ্দেশ্যে বাইরের গেলাফ তৈরির অধিকার রেখে দেন। সৌদী সরকারের শাসনের আগ পর্যন্ত ঐভাবে গেলাফে কা'বা লাগানোর নিয়ম অব্যাহত থাকে। কা'বার গেলাফের রং সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী

চিন্তাবিদ আল্লামা আহমদ আবদুল গফুর আ'ত্তার তার اَلْكَعْبَةُ وَالْكِسْوَةُ مُنْذُ أَرْبَعَةُ اَلاَفُ سَنَةٍ حَتَّى الْيَوْمِ 'আজ থেকে ৪ হাজার বছর আগ পর্যন্ত কা'বা ও কা'বার গেলাফ' নামক বইতে লিখেছেন যে, কা'বা ও কা'বা শরীফের গেলাফের রং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ছিল। কোন সময়ই তা এক রকম ছিল না। আব্বাসী শাসনামলে কাল রং ছিল তাদের জাতীয় প্রতীক। রাষ্ট্রীয় সবক্ষেত্রে কাল রং এর ব্যবহার হত। তাই আব্বাসী খলীফা নাসের লি-দীনিল্লাহ ১ম কা'বা শরীফের গেলাফে কাল রং এর কাপড় ব্যবহার করেন। তিনি ৬২২ হিজরীতে মারা যান। তখন থেকে এ যাবত ঐ কাল রং কেউ আর পরিবর্তন করেনি।

আমরা এখন, বিভিন্ন সময়ে কা'বা শরীফের গায়ে লাগানো বিভিন্ন রং এর গেলাফ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রধানতঃ কা'বা শরীফের গেলাফ তৈরিতে ইয়েমেনী বুরুদ, মিসরীয় কাবাতী এবং খোরাসানী সিল্ক ব্যবহার করা হত। بُرُوْدٌ يَمَنِيَّةٌ হচ্ছে ইয়েমেনের ডোরা বিশিষ্ট কাপড়। اَلْقَبَاطِيْ কাবাতী হচ্ছে, মিসরের কাবাতে তৈরি প্রখ্যাত মূল্যবান কাপড়।

اَلْخَصْفُ وَالْخِصَافُ হচ্ছে মোটা কাপড়।

اَلْمَلاَءُ হচ্ছে পাতলা কাপড়। একখণ্ড কাপড় একই বানায় তৈরি।

اَلْمَعَافِرُ হচ্ছে ইয়েমেনের একটি শহরের নাম। ঐ শহরের তৈরি কাপড় খুবই উন্নতমানের ছিল।

اَلْعَصْبُ হচ্ছে ইয়েমেনের ডোরা বিশিষ্ট কাপড়। রঙ্গীন সুতার সাথে সাদা সুতো মিলিয়ে ঐ কাপড় তৈরি করা হত।

اَلْمَوْحُ হচ্ছে পশমের তৈরি মোটা কাপড়।

اَلْاَنْطَاعُ হচ্ছে চামড়ার তৈরি বিছানা। এটা দিয়েও কা'বার গেলাফ তৈরি করা হয়েছিল। ইয়েমেনের শাসক ৩য় তুববা' আল-হোমায়রী উপরোক্ত কাপড়গুলো দিয়ে গেলাফে কা'বা তৈরি করেছিল।

اَلْحِبْرَاتُ কোরাইশদের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আবু রবীআ-আল মাখযুমী এই কাপড়

দিয়ে গেলাফে কা'বা তৈরি করেন। এটি সম্পূর্ণ সুতার তৈরি ছিল এবং ইয়েমেনে তৈরি হত।

اَلْاَنْمَاطْ এটি পশমের তৈরি রঙ্গীন কাপড়। এটা সাধারণতঃ উটের পিঠের আসনে পাতা হয়।

اَلْمَطَارِفْ এটি ৪ কোণা বিশিষ্ট خَزْ এর তৈরি চাদর কিংবা কাপড়।

হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারীর (রা) মা কা'বা শরীফের গায়ে সবুজ ও হলুদ বর্ণের মাতারেফ কাপড়ের তৈরি গেলাফ, পশমী কাপড় এবং كَرَارْ এর তৈরি গেলাফ দেখতে পেয়েছেন।

اَلْكَرَارُ এক ধরনের বিশেষ কাপড়।

اَلنَّمَارِقُ হচ্ছে বালিশ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে বিছানা এবং কারো কারো মতে বিশেষ কাপড়।

اَلْوَصَايِلُ হচ্ছে ইয়েমেনের লাল ডোরা বিশিষ্ট কাপড়।

উমর বিন হাকাম আস-সোলামী বলেছেন যে, তিনি نَمَارِقْ এবং وَصَايِلُ কাপড়ের তৈরি গেলাফ, কা'বা শরীফের গায়ে দেখেছেন।

اَلْقَزُّ গুটি পোকার চাষ থেকে তৈরি নির্ভেজাল সিল্ক।

اَلْقَيْلَانُ মোটা কাপড়।

স্বয়ং নবী করীম (সা) নিজে ইয়েমেনী কাপড় দিয়ে কা'বার গেলাফ লাগিয়েছেন। হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা) মিসরের কাবাতী এবং ইয়েমেনের বুরুদ কাপড় দিয়ে গেলাফে কা'বা তৈরি করেছেন। খালেদ বিন জাফর বিন কেলাব বিন মুররাহ দীবাজ দিয়ে গেলাফে কা'বা তৈরি করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) খোরাসানের দীবাজ দিয়ে কা'বার গেলাফ দিয়েছেন। সেই দীবাজ লাল, সবুজ, সাদা ও হলুদ রং এর ছিল। হোসাইন আকতাস আল-আলাওয়ী গুটি পোকার অকৃত্রিম সিল্ক দিয়ে দুটো গেলাফ তৈরি করেছেন। একটি হলুদ এবং অপরটি ছিল সাদা। আবদুল আযীযের ছেলে সউদ-আল-কবীর ১২২১ হিজরীতে গুটি পোকার অকৃত্রিম সিল্ক এবং قَيْلَانُ বা মোটা কাপড় দিয়ে কা'বা শরীফের গেলাফ লাগান।

কা'বা শরীফের বাইরের দেয়ালের গেলাফের রং সম্পর্কেই উপরোক্ত আলোচনা প্রযোজ্য। দেয়ালের ভেতরেও একটি গেলাফ পরানো হয়। সেটি বিভিন্ন রং-এর। তা কাল, লাল, সবুজ ও বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে।

সৌদী সরকারের শাসন শুরুর পর বাদশাহ্ আবদুল আযীয আল-সউদ, ১৩৪৬ হিজরীর মুহররম মাসে, মক্কায় একটি বিশেষ গেলাফ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি গেলাফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কায় এটাই ছিল প্রথম কা'বার গেলাফ তৈরির প্রচেষ্টা। ১৩৫৭ হিজরী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ঐ কারখানা থেকেই গেলাফ বানানোর কাজ চালু থাকে। কা'বা শরীফের পবিত্রতার সাথে আরো বেশী খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে, ১৩৮২ হিজরীতে
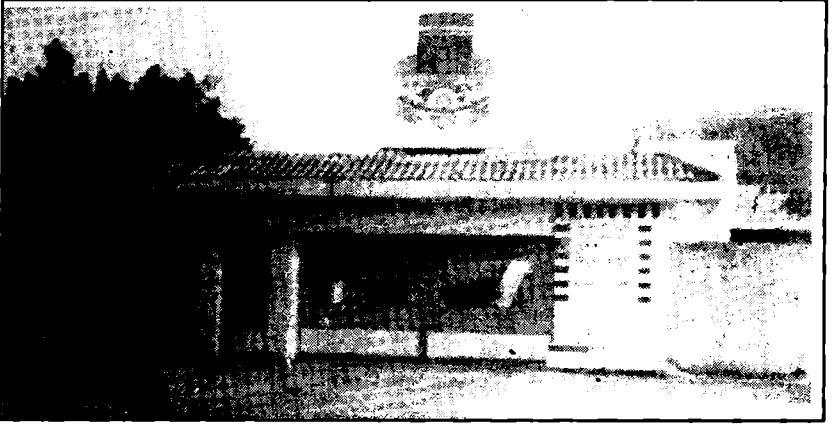
কা'বার গেলাফ তৈরির কারখানা

বাদশাহ্ ফয়সল বিন আবদুল আযীয ঐ কারখানার আধুনিকীকরণের নির্দেশ দেন। সুতরাং ১৩৯৭ হিজরীতে, মক্কার উম্মুল জুদ নামক স্থানে একটি নতুন ভবনে ঐ উন্নততর কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে যান্ত্রিক কাপড় বুনন পদ্ধতি চালু করা হয়। হস্তশিল্পের মর্যাদাকে সামনে রেখে হস্তশিল্পের কাজকেও অব্যাহত রাখা হয়। এই কারখানায় প্রতিবছর সুন্দর গেলাফে কা'বা তৈরি হয়। এতে বর্তমানে ২৪০ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে। এতে ৬টি বিভাগ আছে। যেমন ১. বেল্ট বিভাগ ২. হস্তশিল্প বিভাগ ৩. যান্ত্রিক বিভাগ ৪. ছাপা বিভাগ ৫. রং বিভাগ ও ৬. আভ্যন্তরীণ পর্দা বিভাগ।

বর্তমান গেলাফের বর্ণনা

খাঁটি প্রাকৃতিক সিল্ক দিয়ে কা'বার গেলাফ তৈরি করা হয়। সিল্ককে কাল রং দিয়ে রঙ্গীন করা হয়। পরে গেলাফে কা'বায়, জাকা পদ্ধতিতে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহু জাল্লা-জালালুহু, সোবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী, সোবহানাল্লাহিল আজীম- এইরূপ বাণীসমূহের নকশা আঁকা হয়। গেলাফের উচ্চতা ১৪ মিটার। এর উপরের তৃতীয়াংশে, ৯৫ সেন্টিমিটার চওড়া নির্মিত বেল্টে, (বন্ধনীতে) সংযুক্ত ত্রৈ-আক্ষরিকভাবে কুরআনের আয়াত লেখা হয়। বন্ধনীতে ইসলামী কারুকার্য খচিত একটি ফ্রেম থাকে। বন্ধনীটি সোনার প্রলেপ দেয়া রূপালী তারের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী করা হয়। এই বন্ধনীটা কা'বা শরীফের চতুর্দিকেই পরিবেষ্টিত থাকে। বন্ধনীর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৭ মিটার এবং তা ১৬টি টুকরায় বিভক্ত। বন্ধনীটির নীচে প্রতি কোনায় সূরা ইখলাসকে গোলাকার চতুর্ভূজ বৃত্তের মধ্যে ইসলামী ডিজাইনের প্রতিফলন ঘটিয়ে লেখা হয়।

বন্ধনীর নীচে পৃথক পৃথক ফ্রেমে ৬টি কুরআনের আয়াত লেখা হয়। ঐগুলোর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির জন্য মাঝখানে মোমবাতির আকারে 'ইয়া হাইউ-ইয়া কাইউমু' অথবা 'ইয়া রাহমানু-ইয়া রাহীমু' কিংবা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' কথাগুলো লেখা থাকে। বন্ধনীর নীচের সবগুলো লেখা সংযুক্ত ত্রি-আক্ষরিকভাবে অংকিত। এতে উপযুক্ত এমব্রয়ডারী করা হয় এবং এর উপর সোনা ও রূপার চিকন তার লাগানো হয়। সৌদী শাসনামল থেকেই গেলাফে কাবার কারুকার্যে স্বর্ণের ব্যবহার শুরু হয়। এছাড়াও গেলাফে ১১টি নকশা করা মোমবাতির প্রতিকৃতি আছে। এগুলো কাবার ৪ কোণে লাগানো আছে।

খানায়ে কাবার দরজার পর্দাটিকে বোরকা বলা হয়। তাও কাল রং-এর সিল্ক দিয়ে তৈরী। এর উচ্চতা সাড়ে সাত মিটার এবং প্রস্থ ৪ মিটার। এতেও ইসলামী নকশা ও কারুকার্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে কুরআনের আয়াত লেখা হয়। এই লেখাগুলোও সোনা ও রূপার চিকন তার দিয়ে এমব্রয়ডারী করা হয়।

কাবা শরীফের দরজা ও বাইরের গেলাফ দুটোই মজবুত সিল্কের কাপড় দিয়ে তৈরি। গেলাফের মোট ৫টি টুকরা বানানো হয়। ৪টি টুকরা ৪ দিকে এবং পঞ্চম টুকরাটি দরজায় লাগানো হয়। টুকরোগুলো পরস্পর সেলাইযুক্ত। প্রতিবছরই নতুন গেলাফ পরানোর সময় পুরাতন গেলাফটি সরিয়ে ফেলা হয়।

বর্তমান গেলাফ তৈরীতে, ৬৭০ কেজি সিল্ক ও ১৫০ কেজি সোনা ও রূপার চিকন তার দরকার হয়। গেলাফটির আয়তন ৬৫৮ বর্গমিটার এবং তা মোট ৪৭ থান সিল্কের কাপড় দ্বারা তৈরি। প্রতিটি থান ১ মিটার লম্বা এবং ৯৫ সেন্টিমিটার চওড়া। একটাকে আরেকটার সাথে সেলাই করে দেয়া হয়। ৪ বছর আগে প্রত্যেক বছর ২টি করে (১টি সতর্কতামূলক) গেলাফ তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একটি হাতে তৈরি করা হয় এবং এতে ৮-৯ মাস সময় লাগে। অন্যটি মেশিনে তৈরি করা হয় এবং এতে মাত্র ১ মাস সময় লাগে। এই কারখানায় হুজরায়ে নববীর জন্য একটি এবং উপহার দেয়ার জন্য একখণ্ড গেলাফও তৈরি করা হয়। গেলাফের আভ্যন্তরীণ পর্দাটির দৈর্ঘ্য ৭ মিটার এবং প্রস্থ ৪ মিটার। তাতেও সোনা এবং রূপার সরু তার দিয়ে কোরআনের আয়াত অংকন করা হয়েছে। গোটা গেলাফ, বেল্ট ও আভ্যন্তরীণ পর্দার ১৬টি টুকরায়, সোনা দ্বারা আয়াত খচিত করা হয়েছে। সে ১৬টি টুকরার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৭ মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ৯৫ সেন্টিমিটার।

প্রত্যেক বছর জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে কা'বা শরীফের গায়ে নতুন গেলাফ পরানো হয়। সেইদিন হজ্জের দিন। হাজীরা সব আরাফাতের ময়দানে থাকে এবং মসজিদে হারামে মুসল্লীর সংখ্যা থাকে খুবই কম। বর্তমানকালে হজ্জ উপলক্ষে এবং স্বয়ং হজ্জের দিনই ঐ গেলাফ লাগানো হয়। হাজীরা আরাফাত থেকে ফিরে এসে কাবা শরীফের গায়ে নতুন গেলাফ দেখতে পায়।

গেলাফ নির্মাণ কারখানায় গেলাফ তৈরির পর কাবা শরীফের গায়ে পরানোর আগে কারখানার পক্ষ থেকে তা কাবা শরীফের চাবির রক্ষক তথা বনি শায়বা গোত্রের মনোনীত কাবা শরীফের সেবকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় গেলাফ লাগানো হয়।

হজ্জের কয়েকদিন আগ থেকেই কাবার গেলাফের নীচু অংশ উপরের দিকে তুলে দেয়া হয় এবং এতে কাবা শরীফের দেয়ালের বাইরের অংশ দেখা ও ধরা যায়।

কাবার প্রতি দৃষ্টির ফজীলত

বাইতুল্লাহর প্রতি নজর করা একটি এবাদত। যাঁরা বাইতুল্লাহকে দেখে এবং এর প্রতি নজর দেয় তাঁরা সওয়াব পাবেন। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন اَلنَّظَرُ اِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ অর্থ ঃ কাবা শরীফ দেখা একটি এবাদত। (আবুশ শেখ) আযীযি তাঁর اَلسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ গ্রন্থে এই হাদীসের সনদকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই ঘরের বিভিন্ন প্রকার এবাদতের ব্যাপারে আল্লাহর রহমতের যে বন্টনের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে আল্লাহর ঘরের প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের জন্য ২০টি রহমত নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই হাদীসটি হচ্ছে এই ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْزِلُ عَلَى هٰذَا الْبَيْتِ كُلَّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ عِشْرُوْنَ وَمَائَةُ رَحْمَةٍ سِتُّوْنَ مِنْهَا لِلطَّائِفِيْنَ بِالْبَيْتِ وَاَرْبَعُوْنَ لِلْعَاكِفِيْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَعِشْرُوْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ اِلَى الْبَيْتِ ـ وفى رواية ـ وَاَرْبَعُوْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ وَفِيْهَا يُنَزِّلُ اللّٰهُ عَلَى اَهْلِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ مَكَّةَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةُ رَحْمَةٍ اخرجهما ابوذر وازرقى ـ (كذا فى القرى)

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, এই কাবা ঘরের উপর প্রত্যেক দিন ও রাত্রে ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে তওয়াফকারীদের জন্য ৬০টি, মসজিদে হারামে এতেকাফকারীদের জন্য ৪০টি এবং কাবার প্রতি দৃষ্টিকারীদের জন্য ২০টি রহমত নাযিল হয়। অন্য এক বর্ণনায় নামাযীদের জন্য ৪০টি রহমত নাযিলের কথা এসেছে। ঐ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মক্কার মসজিদের লোকদের জন্য ১২০টি রহমত নাযিল করেন। আবুজর ও আযরাকী এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

সাখাওয়ী তাঁর মাকাসেদ হাসানা গ্রন্থে, তাবারানী তাঁর মায়াযেম গ্রন্থে, আযরাকী, বায়হাকী এবং হারেস তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এই হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কারো কারো বর্ণিত শব্দগুলো হচ্ছে এইরূপ ঃ

مِائَةُ رَحْمَةٍ فَسِتُّوْنَ لِلطَّائِفِيْنَ وَعِشْرُونَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلُهَا لِسَائِرِ النَّاسِ -

অর্থ ঃ ১ শত রহমতের ৬০টি তওয়াফকারীদের জন্য, ২০টি মক্কাবাসীদের জন্য এবং অনুরূপ (বিশটি) অন্যান্য সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়।[১৬]

আল-মোনজেরী ইবনে আব্বাসের উপরোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, বায়হাকী এই হাদীসটি ভাল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ আত তাবারী এই রহমত বন্টনের পদ্ধতি এবং যাদের উপর রহমত নাযিল হবে তাদের সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর ঐ আলোচনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ ঐ রহমত নাযিলের দুটো ব্যাখ্যা আছে ঃ[১৭]

প্রথমটি হচ্ছে, ঐ রহমত বর্ণিত তিন দলের প্রত্যেকের উপর সমানভাবে নাযিল হবে, তা তাদের কম বা বেশী আমলের সাথে সম্পর্কুক্ত নয়। এই আলোকে প্রত্যেক তওয়াফকারী ৬০টি, প্রত্যেক কাবা দর্শনকারী ২০টি এবং প্রত্যেক নামাযী ৪০টি রহমত পাবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই রহমত আমলের পরিমাণ, (কম-বেশ আমল) এবং আমলের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে নাযিল হবে। এই ব্যাখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধ। এই ব্যাখ্যার আলোকে, সকল তওয়াফকারী ৬০টি, সকল কাবা দর্শনকারী ২০টি এবং সকল মুসল্লী ৪০টি রহমত পাবে। এতে করে উপরোল্লিখিত তিনদলের প্রত্যেক দলের বহুসংখ্যক লোক আল্লাহর ঐ রহমতের সুশীতল ছায়া পাবে এবং একজন লোক বহুসংখ্যক রহমতের অধিকারী হবে।

আল-কোরা কিতাবে রহমতের হাদীসটির দুটো বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ রহমত 'এই ঘরের অধিবাসী'দের উপর নাযিল হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে ঐ রহমত, 'মসজিদের অধিবাসী'দের উপর নাযিল হয়।' হাফেজ তাবারী বলেছেন, ঐ দুই বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। তাঁর মতে, 'মসজিদে মক্কা' এই শব্দ দ্বারা কাবা শরীফ বুঝানো হয়ে থাকে। কাবা বা আল্লাহর

এই ঘরকে কুরআনে 'মসজিদ' বলা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (আল বাকারাহ-১৪৩)

অর্থ ঃ 'তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।' এখানে মসজিদে হারাম অর্থ হচ্ছে কাবা শরীফ। অর্থাৎ কাবার দিকে মুখ ফিরাও।

আল-কোরা কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মুসীরুল গারাম' এর লেখক জাফর বিন মুহাম্মদ, তাঁর বাপ থেকে এবং তার বাপ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّظْرُ اِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ عِبَادَةٌ ـ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কাবা শরীফ দেখা এবাদত।' এর সমর্থনে হযরত আয়িশার বর্ণিত হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য।

আমাদের অতীতের বুজুর্গদের অনেকেই এই এবাদতটির ফজীলতের ব্যাপারে নিজেদের রুচি, জ্ঞান এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেছেন। আযরাকী এ বিষয়ে ৪টি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

اَلنَّظْرُ اِلَى الْكَعْبَةِ مَحْضُ الْاِيْمَانِ ـ

অর্থ ঃ কাবার দিকে নজর করা খালেস ঈমানের পরিচয়। মুজাহিদ বলেছেন, কাবার দিকে নজর করা এবাদত। ২. সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, যে ঈমান ও সত্য বিশ্বাসের সাথে কাবা শরীফের দিকে তাকায়, সে গুনাহ্ থেকে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

৩. আতা বলেছেন, কাবার দিকে নজর করা এক বছরের নামায তথা কেয়াম, রুকু ও সেজদা থেকে উত্তম।

৪. ইবনুস সায়েব আল-মদনী বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সত্য বিশ্বাস সহকারে কাবার দিকে তাকায়, গাছ থেকে যেমন পাতা ঝরে পড়ে, তেমনি তার গুনাহ্ও ঝড়ে পড়বে। (মুসীরুল গারাম) তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কাবার দিকে নজর করা এবাদত। কাবার প্রতি নজরকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে, সার্বক্ষণিক রোযাদার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদের সমান।[১৮]

বাইতুল্লাহর ৯টি বৈশিষ্ট্য

বাইতুল্লাহ শরীফের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. পেশাব-পায়খানা করার সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে বসা হারাম। বেশী সংখ্যক আলেমের মতে, ঘর কিংবা মাঠ সর্বত্র এই হুকুম প্রযোজ্য। ইমাম শাফেয়ী (রা) এর মতে এই হুকুম শুধু মাঠের জন্য প্রযোজ্য। ঘরের জন্য নয়। মানুষ দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেন, সর্বত্রই এই হুকুম মেনে চলা জরুরী।

এর কারণ সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কাবার সম্মান ও মর্যাদাকে সামনে রেখেই এই হুকুম দেয়া হয়েছে। হযরত সারাকা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

اِذَا اَتٰى اَحَدُ كُمُ الْبَرَازَ (بِفَتْحِ الْبَاءِ اِسْمٌ لِّلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ مِنَ الْاَرْضِ وَيُكَنّٰى بِهِ عَنِ الْحَاجَةِ) فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللّٰهِ وَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ -

অর্থ ঃ 'তোমাদের কেউ যদি পেশাব পায়খানার জন্য উন্মুক্ত মাঠে যায়, সে যেন আল্লাহর কিবলার সম্মান করে এবং কিবলামুখি হয়ে না বসে।' এটাই হচ্ছে বেশীর ভাগ আলেমের মত। কোন কোন আলেম এর ভিন্ন কারণ বলেছেন যা সমালোচনামুক্ত নয়। বর্ণিত হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গিই বেশী সঠিক বলে মনে হয়।(১৯)

২. কা'বা শরীফে সিল্কের পর্দা বা গেলাফ ব্যবহার করা জায়েয। ইমাম গাযালী (র) তাঁর ফতোয়ায় বলেছেন, কুরআন শরীফকে সোনা দিয়ে এবং কা'বা শরীফকে সিল্ক দিয়ে সাজানো জায়েয আছে। কা'বা ব্যতীত অন্য কিছুতে তা জায়েয নেই। কেননা, পুরুষের জন্যই শুধু সিল্ক ব্যবহার নিষিদ্ধ। বায়হাকী বলেছেন, উসমান থেকে বর্ণিত আছে তিনি এটাকে অপচয় মনে করতেন। ইমাম গাযালী এহইয়াউল উলুম বইতে লিখেছেন, কা'বার দেয়াল সাজানো নিষিদ্ধ নয়। সিল্ক শুধু পুরুষের জন্য হারাম। কা'বার জন্য সিল্ক ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে কা'বা সাজানো নিষিদ্ধ। অথচ কা'বা সাজানো উত্তম। আল্লাহ বলেছেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ

অর্থ ঃ 'বল আল্লাহর সৌন্দর্যকে কে হারাম করেছে? বিশেষ করে অহংকার ও গর্ব প্রকাশের জন্য না হলে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশের বেলায় তা অবশ্যই জায়েয।[২০]

৩. কা'বায় খোশবু বা সুগন্ধি লাগানো

হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, আমার নিকট কা'বা শরীফে সোনা-রূপা উপহার দেয়ার চেয়ে কা'বা শরীফে সুগন্ধি লাগানো অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তম। তিনি বলেছেন, তোমরা কা'বা ঘরে সুগন্ধি লাগাও, এটি কা'বাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার অন্তর্ভুক্ত। এই বলে তিনি কুরআনের একটি নির্দেশের দিকে ইঙ্গিত দেন। সেটি হচ্ছে ঃ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ 'আমার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর'। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) কা'বা শরীফের ভিতরের সকল অংশে সুগন্ধি মেখেছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন যুগে কা'বার বাইরে, তওয়াফের ভেতর সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া দেয়ার প্রথা চালু আছে। ভেতরেও সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া দেয়া হত। এতে করে তওয়াফের লোকদের জন্য বেশ ভালই হত। দেহ ও মনে খুশীর সঞ্চার হত।

৪. আল্লাহ্ কা'বা শরীফকে কুচক্রী ও ধ্বংসাত্মক লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং কা'বা ধ্বংসকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সূরা ফীলে, আবরাহা বাদশাহর হস্তীবাহিনীকে তিনি ধ্বংস করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও যারা কা'বা শরীফে খারাপ আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে চেয়েছে তাদের অনেক ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা এই ঘরের ক্ষতি করতে চাইবে আল্লাহ্ তাদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে ধ্বংস করে দেবেন।'

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমরা শুনে আসছিলাম যে, আসাফ ও নায়েলা জোরহুম গোত্রের দুইজন নারী ও পুরুষ ছিল। তারা কা'বার অঙ্গনে অন্যায় কাজ করায় আল্লাহ্ তাদেরকে দুটো পাথরে পরিণত করে দিয়েছেন। আরেক ঘটনা। জাহেলিয়াতের যুগে একজন মেয়েলোক কা'বায় এসে স্বামীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে খারাপ নিয়তে হাত বাড়ালে তার হাত অবশ হয়ে যায়। আয্‌যাওয়ী বলেছেন, সে ব্যক্তিটি ছিল হুয়াইতাব। আমি তাকে ইসলামী যুগেও অবশ দেখেছি। কেননা সে, কা'বার সম্মান রক্ষা করেনি।

অন্য একটি ঘটনা হচ্ছে, এক ব্যক্তি কাবার তওয়াফ করছিল। তখন তওয়াফে এক সুন্দরী রমণীর খোলা হাত বিদ্যুতের মত চমকাতে দেখে তার হাতের উপর নিজের হাত রেখে যৌনাকর্ষণ উপভোগ করতে লাগলো। এতে দু'জনের হাত এমনভাবে লেগে গেল যে আর খোলা যাচ্ছিল না। ঐ দু'জন অন্য এক নেককার ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাদের হাত খোলার জন্য দোয়ার অনুরোধ জানালো। তিনি দু'জনকে তাদের হাত আটকে যাওয়ার ঘটনাটি জিজ্ঞেস করায় তারা তা খুলে বলল। তিনি দু'জনকে উপদেশ দিলেন, তোমরা যে জায়গায় ঐ পাপ কাজটি করেছ সেই জায়গায় ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও অঙ্গীকার কর যে, তোমরা আর কখনও অনুরূপ কাজ করবে না। তারা ঐ রকম তওবা করার পর শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এমন যা বাদশাহ আবরাহার ঘটনার কাছাকাছি। সেটি হচ্ছে, ইয়েমেনের বাদশাহ তুব্বা'র ঘটনা। তার আসল নাম ছিল আসআদ। তিনি প্রাচ্যের কোন দেশে গিয়েছিলেন। মক্কা ও মদীনার পথে স্বদেশে রওনা হন। মদীনা থেকে বিরাট সেনাবাহিনী সহকারে মক্কার দিকে রওনা হলে পথে হোজাইল গোত্রের একটি দলের সাথে তাঁর দেখা হয়। তারা তাঁকে মক্কার কাবা ধ্বংস করে এর পরিবর্তে ইয়েমেনে অনুরূপ একটি কাবা তৈরির জন্য উৎসাহিত করে এবং বলে যে, এখন থেকে যদি ইয়েমেনে হজ্জের ব্যবস্থা করা হয়, এতে বাদশাহর আয় ও মর্যাদা বাড়বে এবং তাঁর দেশ পূর্ণ আবাদ হবে। একথা শুনে, বাদশাহ রাজী হল এবং কাবা শরীফ ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হল। মক্কার দিকে রওনা হওয়ার জন্য সওয়ারী পশুগুলোকে হাঁকানো হল। কিন্তু একটি পশুও চলে না। ঘোর অন্ধকার নেমে আসল এবং প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বাদশাহ বিভিন্ন রোগ-শোকে আক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তীব্র মাথাব্যথা শুরু হল। বাদশাহর দু'চোখ থেকে পানি বের হল এবং গালের উপর দিয়ে বইতে শুরু করল। তার মাথায় এমন এক বীভৎস রোগ শুরু হল যে, তা থেকে পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হতে লাগল। দুর্গন্ধের কারণে তার কাছে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাঁর সাথে যে সকল পাদ্রী ও ডাক্তার ছিল তিনি তাদের কাছে এই অকস্মাৎ মাথাব্যথা ও রোগের কারণ জানতে চান। তারা বাদশাহর রোগ ও বীভৎস দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মৃত গাধার পঁচা দুর্বিসহ দুর্গন্ধের মতই বাদশাহের মাথার পুঁজের দুর্গন্ধ বের হতে থাকল। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি বাইতুল্লাহর ব্যাপারে কোন খারাপ পরিকল্পনা চিন্তা করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারপর তিনি তার পরিকল্পনা

তাদের কাছে প্রকাশ করলেন এবং হোজাইল গোত্রের একদল লোকের পরামর্শ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন। এসব শুনে তারা বলল, হোজাইল গোত্র আপনাকে, আপনার সেনাবাহিনীকে এবং আপনার সাথে আরো যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছে। এটি হচ্ছে আল্লাহর ঘর। কেউ এই ঘরের ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেই ছাড়েন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন এখন উপায় কি? তারা জবাবে বলল, এখন আপনি এই ঘরের কল্যাণ কামনা করুন, এর সম্মান করুন, এতে গোলাফ পরান, এই ঘরের কাছে কোরবানী করুন এবং এই ঘরের অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। বাদশাহ তাই করলেন। ফলে অন্ধকার চলে গেল, ঝড় বন্ধ হয়ে গেল, সওয়ারী পশুগুলো চলা শুরু করল, চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল, তার মাথা সুস্থ হয়ে উঠল। বাদশাহ খারাপ নিয়ত থেকে তওবা করলেন এবং সেনাবাহিনীকে ইয়েমেনের দিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে মক্কায় কিছুদিন থাকলেন এবং প্রত্যেক দিন একশত উট কোরবানী করে মক্কার বাসিন্দাদেরকে খাওয়ান। তিনি কাবা শরীফে গেলাফ পরান। ইসলাম আসার সাতশত বছর আগে ঐ ঘটনা ঘটে।

আল্লাহ তাঁর ঘরকে যে কোন জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং একে সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত রাখেন। এজন্য এই ঘরের অপর নাম হচ্ছে 'আতীক'। কেউ এই ঘর ধ্বংস করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন,

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِـالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۔ (সূরা হজ্জ-২৫)

অর্থ ঃ 'কেউ অন্যায়ভাবে এতে কুফরী করলে, আমরা তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।'

৫. যে ব্যক্তি কাবা শরীফকে স্বপ্নে দেখবে, তার সেই স্বপ্ন সঠিক বলে তাবারানী তাঁর মোজাম কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ رَآنِىْ فِىْ مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنِىْ ۔ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيَتَمَثَّلُ بِىْ وَلاَ بِالْكَعْبَةِ ۔

অর্থ ঃ 'যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা, শয়তান আমার এবং কাবার ছবি ধারণ করতে পারে না।' অর্থাৎ শয়তান এ দুটো জিনিসের রূপ ধরতে পারে না। তাবারানী বলেছেন, আবদুর রাজ্জাক মুহাম্মদ বিন আবিস সেররী আল-আসকালানী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এতে ছাড়া অন্য কোন বর্ণনায় وَلاَ الْكَعْبَةَ 'কাবার রূপ ধারণ করতে পারে না' এই বক্তব্য আসেনি।

৬. কাবা শরীফ একটি আবাদকৃত ঘর। মানুষ তওয়াফের মাধ্যমে সর্বদা একে আবাদ করে। মুহাম্মদ বিন আব্বাদ বিন জাফর কিবলার দিকে মুখ করে বলতেন, 'আমার রব এর একটি মাত্র ঘর, কি সুন্দর, কি মনোরম! আল্লাহর শপথ, এটি আবাদকৃত ঘর।'

কেউ কেউ বলেছেন, বাইতুল মামুর হচ্ছে সেই ঘর যা হযরত আদম (আ) প্রথমেই দুনিয়ায় এসে নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আ) এর প্লাবনের সময় সেই ঘরটিকে আল্লাহ্ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং দৈনিক ৭০ হাজার ফেরেশতা এর তওয়াফ করে।

আরবীতে, مَلاَئِكَةٌ (ফেরেশতা) শব্দের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে ضراح বা দূরে অবস্থানকারী। ফেরেশতাদের তওয়াফের ঘর যমীন থেকে আসমানে সরিয়ে দেয়ার কারণে, ফেরেশতারাই যেন দূরে সরে গেল। তাই 'তাদেরকে দূরে অবস্থানকারী' বলা হয়।

আবুত তোফায়েল বলেন, হযরত আলীকে 'বাইতুল মামুর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, সেটাতো কাবা শরীফ বরাবর বহুদূরে অবস্থিত। এতে দৈনিক ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে এবং তারা এতে কিয়ামত পর্যন্ত ২য় বার আর প্রবেশ করবে না।

বাইতুল মামুর কোন্ আসমানে অবস্থিত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, প্রথম আসমানে, কারো মতে ৪র্থ আসমানে, কারো মতে ৬ষ্ঠ আসমানে কারো মতে ৭ম আসমানে এবং কেউ কেউ অন্যমত পোষণ করেন।

আবু নায়ীম আল-হাফেজ বুখারী শরীফের বাছাইকৃত হাদীস সংকলনে উল্লেখ করেছেন যে, আমর বিন হামদান হাসান বিন সুফিয়ান থেকে, তিনি হাদবাহ থেকে তিনি হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে এবং

তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَاَىْ الْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ فَلاَ يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিনি বাইতুল মামুরে ৭০ হাজার ফেরেশতাকে প্রবেশ করতে দেখেছেন এবং তাঁরা এতে আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না।' এইভাবে প্রত্যেক দিন ৭০ হাজার ফেরেশতা এইঘরে আসে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর কত অগণিত ও সীমাসংখ্যাহীন ফেরেশতাকুল রয়েছে।

৭. ইবনে হিশাম তাঁর সীরাতুন্নবী বইতে লিখেছেন, হযরত নূহ (আ) এর সময়ের বন্যার পানিতে কা'বা শরীফের আশে-পাশে পানিতে ডুবে গেলে কা'বা শরীফ আসমানের নীচে বাতাসের শূন্য রাজ্যে বিরাজ করতে থাকে। তখন হযরত নূহ (আ) এর নৌকা কা'বা শরীফের চার দিকে তওয়াফ করতে থাকে। নূহ (আ) নৌকার যাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা আল্লাহর হারামে এবং আল্লাহর ঘরের পার্শ্বে আছ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এহরাম কর এবং কেউ যেন কোন মেয়েলোক স্পর্শ না করে। তিনি পুরুষ ও মেয়েলোকের মাঝখানে পর্দা করে দিলেন। যেন, মেয়েলোকেরা একপাশে এবং পুরুষরা অন্যপাশে থাকতে পারে। কিন্তু বনু হাম গোত্র সীমালংঘন করে। এতে নূহ (আ) তাদের শরীরের রং কাল করার জন্য বদদোয়া করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, হাম গোত্রের বিরুদ্ধে নূহ (আ) এর বদ দোয়ার কারণ অন্য কিছু।

৮. হাশরের দিন কা'বা শরীফকে বিবাহিতা সুসজ্জিতা কনের মত উঠানো হবে। যে হজ্জ করেছে সে এর গেলাফ ধরে থাকবে যে পর্যন্ত না কা'বা শরীফ তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ইমাম গাযালী এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এই হাদীসটিকে 'বাইতুল্লাহ ও মক্কার ফজীলত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা 'আসরারুল হজ্জ' নামক বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির ভাষা হচ্ছে এইরূপ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْوَعَدَ هٰذَا الْبَيْتَ اَنْ يَّحُجَّهُ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةَ

اَلْف ـ فَاِنْ نَقَصُوا اَكْمَلَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ـ وَاَنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ كَالْعَرُوْسِ الْمَزْفُوْفَةِ وكُلُّ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ بِاَسْتَارِهَايَسْعَوْنَ حَوْلَهَا حَتّٰى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُوْنَ مَعَهَا ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ এই ঘরের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, প্রতিবছর ৬ লাখ লোক এই ঘরের হজ্জ করবে। যদি এই সংখ্যা থেকে লোক কম হয় তাহলে, আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা তা পূরণ করে দেবেন। হাশরের দিন কাবা শরীফকে বিবাহিতা সুসজ্জিতা কনের মত উঠানো হবে। যত লোক হজ্জ করেছে তারা এর গেলাফ ধরে থাকবে এবং এর চতুষ্পার্শ্বে চলতে থাকবে যে পর্যন্ত না কাবা শরীফ বেহেশতে প্রবেশ করে। তখন তারাও সবাই একই সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আল্লামা হাফেজ ইরাকী বলেন, আমি এই হাদীসের কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি।

(تخريج على الاحياء للعراقى)

৯. এই ঘর সৃষ্টির পর থেকে এযাবত এর তওয়াফ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নেই। মানুষ, জ্বিন কিংবা ফেরেশতাদের কেউনা কেউ এর তওয়াফ করেই যাচ্ছে।

কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশের ফজীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِى حَسَنَةٍ وَّخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَّغْفُوْرًا ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

মুহিব আত-তাবারী বলেছেন, তাম্মাম আর-রাযী এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আতা বিন আবি রেবাহ থেকে বর্ণিত হওয়ায় এটিকে হাসান ও গরীব বলে অভিহিত করা হয়।

আল-ইরাকী বলেছেন, বায়হাকীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনা সূত্রে, রাবী আবদুল্লাহ বিন মোয়াম্মাল দুর্বল বলে পরিচিত। (طَرْحُ التَّثْرِيْبِ)

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা শরীফে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উসামা বিন যায়েদ, উসমান বিন তালহা এবং বিলাল বিন রাবাহ। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

এই দুই হাদীসে, বাইতুল্লাহ শরীফের ভেতর প্রবেশ করা যে উত্তম তা প্রমাণিত হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্যই এই মর্যাদার ভিত্তি। আল-ইরাকী বলেছেন, কাবা শরীফের ভেতরে প্রবেশ করা যে উত্তম এ ব্যাপারে সবাই একমত। (طَرْحُ التَّثْرِيْبِ) এই সওয়াব অর্জনের আগ্রহ সবার মধ্যে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও আল্লাহর এই পবিত্র ঘরের ভেতর দেখার আগ্রহ কার নেই?

ইমাম শাফেয়ী (রা) বলেছেন, কাউকে কষ্ট না দিয়ে কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করা মোস্তাহাব।

ইরাকী বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করেছেন বলে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে একটি

হাদীস বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) ওমরাহ আদায়ের সময় কা'বা শরীফের ভেতর প্রবেশ করেননি। তিনি বিদায় হজ্জের সময়ও কাবা শরীফের ভেতর ঢুকার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ উমরাহ ও হজ্জের সময় তিনি এই আশংকায় কাবার ভেতরে ঢুকেননি, না জানি তা আবশ্যক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু মূল বিষয়টি তা নয়। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসের মর্ম অনুয়ায়ী বুঝা যায় যে, কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করা একটি স্বতন্ত্র সুন্নত। এছাড়া, ইমাম বায়হাকী বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (কাবা) শরীফের ভেতর প্রবেশ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বায়হাকীর বর্ণনা উমরাহর সময় কাবায় না ঢুকা সংক্রান্ত আবি আওফার বর্ণনার বিপরীত নয়।

কারো কারো মতে বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাবা শরীফে প্রবেশের তথ্যটি সঠিক নয়। তাঁদের মতে তিনি শুধু মক্কা বিজয়ের দিনই কাবা শরীফে প্রবেশ করেছেন। ইমাম নওয়ী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যার মধ্যে বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন কাবার ভেতরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রবেশের ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। আলেমগণ উমরার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাবার ভেতর না ঢুকার কারণ হিসাবে বলেন যে, এর ভেতর তখন মূর্তি ও প্রতিকৃতি ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন ভেতরে ঢুকার আগে মূর্তিগুলোকে বের করা হয় এবং পরে তিনি ঢুকেন।

তাবাকাতে ইবনে সা'দ হযরত উসমান বিন তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের আগে, মক্কায় বাস করার সময় কা'বার ভেতরে প্রবেশ করেছেন। তবে, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কা'বার ভেতরে দু'বার প্রবেশ করেছেন বলে জানা যায়। দার কুতনী হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কাবায় প্রবেশ করেছেন এবং বিলাল পেছনে ছিলেন। আমি বিলাল (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি ভেতরে নামায পড়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'না'। পরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও কা'বা শরীফে ঢুকেন। (طَرْحُ التَّثْرِيْب) মালেকী মাজহাবের মুফতী শেখ মুহাম্মদ আবেদ বলেন, কা'বা শরীফের ভেতরে ঢুকা মুস্তাহাব, যদি তা রাত্রেও হউক না

কেন। আল্লামা আমীর তাঁর মানাসেক গ্রন্থে লিখেছেন যে, কা'বা শরীফের ভেতর বহু ভিড় লক্ষ্য করা যায়, যারা ভেতরে ঢুকতে অপারগ তারা হিজরে ইসমাঈলে ঢুকে সেখানে নামায পড়লেই চলে। কেননা, তাতে কা'বা শরীফেরই অংশ রয়েছে।

আস্‌সাওয়ী 'তাওদিহুল মানাসেক' গ্রন্থে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়িশা (রা) কে বলেছেন, তুমি কা'বার ভেতর ঢুকতে চাইলে হিজরে ইসমাঈলে নামায পড়। কেননা, এটি কা'বা শরীফেরই অংশ। তোমার কওম, কা'বা নির্মাণের সময় কা'বাকে সংকুচিত করে এটিকে বাইরে রেখে দিয়েছে।

কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম কা'বার ভেতর ঢুকাকে মাকরূহ বলেছেন। তাদের দলীল হচ্ছে হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক নিম্নোক্ত হাদীসটি।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِىْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ - ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ - فَقَالَ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدَدْتُ اَنِّىْ لَمْ اُكُنْ فَعَلْتُ- اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِىْ مِنْ بَعْدِىْ - اخرجه احمد والترمذى وصححة ابوداؤد -

অর্থ ঃ হযরত আয়িশা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছ থেকে শীতল চোখ ও প্রশান্ত চিত্তে বের হয়ে গেলেন। তারপর পেরেশান হয়ে ফিরে আসেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কাবা শরীফে প্রবেশ করেছি। যদি আমি এটা না করতাম! (তাহলে কতইনা ভাল হত) আমার ভয় হয় যে, আমি আমার পরের উম্মতদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছি নাকি। (আহমদ, তিরমিজী ও আবু দাউদ)

মুহিব আত্‌তাবারী বলেছেন, এই হাদীসটি কা'বায় প্রবেশ না করার প্রমাণ বহন করে না। আমাদের মতে, কাবায় প্রবেশ যে মুস্তাহাব এর জন্য কাবায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রবেশই উত্তম প্রমাণ। তবে উম্মতের কষ্টের আশংকায় তাঁর কা'বায় ঢুকার বিরুদ্ধে আফসোসের ফলে মুস্তাহাবের হুকুম বাতিল হয়নি।

আল্লামা ফাসী তাঁর 'শেফাউল গারাম' বইতে লিখেছেন, ৪ মাজহাবের ইমামগণ প্রত্যেকেই একমত যে, কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করা মুস্তাহাব বা উত্তম। বরং

ইমাম মালেক (রা) বেশী বেশী প্রবেশ করাকে আরো উত্তম বলেছেন। ইবনুল হাজ্জ 'মানাসেক' বইতে লিখেছেন, ইমাম মালেককে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে, যতবার সুযোগ মিলে ততবারই কি কা'বা শরীফে প্রবেশ করা যায়? তিনি উত্তর দেন, তা তো বেশী উত্তম। আল্লামা ফাসী হাসান বসরীর প্রখ্যাত 'রেসালা' বইয়ের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে কাবায় প্রবেশ করে সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আল্লাহর বিশেষ হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ করে, আর যখন বের হয় তখন গুনাহমুক্ত হয়ে বের হয়।

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে কা'বা শরীফে প্রবেশ করা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'এতে প্রবেশ করার মানে, সওয়াব ও নেকীর মধ্যে প্রবেশ করা আর সেখান থেকে বের হওয়ার অর্থ হচ্ছে, গুনাহ থেকে বের হওয়া এবং ক্ষমা লাভ করা।'

কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীনে কেরাম কা'বা শরীফে বেশী বেশী প্রবেশ করাকে উত্তম বলেছেন। আল্লামা আযরাকী তাঁর দাদা থেকে, তিনি মক্কার একজন ফেকাহবিদ মুসলিম বিন খালেদ যানজী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যানজী বলেন, আমি সদাকা বিন ইয়াসার কে প্রতিবারই কা'বা শরীফ খোলার সময় ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কেন এত বেশী কা'বায় প্রবেশ করেন? তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহর কসম, আমি কা'বা শরীফকে খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে নামায না পড়লে আমার কাছে খারাপ লাগে।

আযরাকী উল্লেখ করেছেন, মুসা বিন আকাবা বলেন, আমি সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব (রা) এর সাথে ৭ সপ্তাহ তওয়াফ করেছি। তিনি প্রখ্যাত ৭ জন ফেকাহবিদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেক বারই আমরা সাত চক্কর তওয়াফ শেষে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছি এবং দু'রাকাত করে নামায পড়েছি।

আযরাকী তাঁর দাদা থেকে, তিনি দাউদ বিন আবদুর রহমান আল-আত্তার থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি ইবনে উমরের গোলাম নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর যখন মক্কায় হজ্জ কিংবা উমরাহ করার জন্য আসতেন এবং কা'বা খোলা পেতেন, তখন অন্য কোন কাজ করার আগে, প্রথমে কা'বা শরীফে প্রবেশ করতেন।

কা'বা শরীফে প্রবেশের আদব

কা'বা শরীফের ভেতর ঢুকার আগে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হতে হবে। অন্তরে বিনয়, এবং ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব থাকতে হবে। ভেতরে ঢুকে চতুর্দিকে দেখাদেখি শুরু করে দেয়া ঠিক নয়। এতে লক্ষ্য অর্জনে মনে দুর্বলতা ও অবহেলা সৃষ্টি হতে পারে। বিনা প্রয়োজনে কারো সাথে আলাপ করা ঠিক নয়। প্রয়োজন হলে,

اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কথা বলা যাবে। অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি বাড়ানো এবং আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশায় চোখের পানি ফেলার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, আশ্চর্য লাগে, একজন মুসলমান কা'বার ভেতরে ঢুকে কি করে, নিজ চোখ কা'বা শরীফের ছাদের দিকে উঠায় এবং আল্লাহর সম্মান ও ইজ্জতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকে না? রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার ভেতরে ঢুকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত সেজদার জায়গা ছাড়া তাঁর চোখ অন্য কোন দিকে যায়নি। আবুজর ও ইবনুস সালাহ এটি তাঁদের মানসাকে উল্লেখ করেছেন।

দাউদ বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল করীম বিন আবুল মাখারেখ উপদেশ দিয়েছেন, আমি যেন শুক্রবারে দু'রাকাত নামায পড়ার আগে ঘর থেকে বের না হই এবং গোসল করা ব্যতীত কা'বা শরীফে প্রবেশ না করি। (আযরাকী)

সাঈদ বিন যোবায়ের থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কা'বা শরীফ কিংবা হিজরে ইসমাঈলে প্রবেশের আগে পায়ের জুতা খুলে নিতেন।

আতা, তাউস এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলতেন, জুতা ও চামড়ার মোজা পরে কেউ যেন, কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ না করে। সাঈদ বিন মনসুর থেকে এই দুটো বক্তব্য বর্ণিত।

কেউ যদি কাবা শরীফের ভেতর ঢুকতে চায় সে যেন রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন,

তাই করে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ যখন কাবা শরীফে ঢুকেন, তখন তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ), আল্লাহর প্রশংসা, দোয়া এবং ইস্তেগফারে (গুনাহ মাফ চাওয়া) ব্যস্ত ছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার সকল দিকে গিয়ে দোয়া করেছেন। নাসায়ী শরীফে 'তিনি তাসবীহ ও তাকবীর বলেছেন' এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

নাসায়ী শরীফে উসামা বিন যায়েদের সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বায় (প্রথমে) বসলেন তারপর হামদ, সানা ও ইস্তেগফার আদায় করলেন। তারপর দাঁড়ালেন, এবং কা'বার পেছনের দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দেয়ালে নিজের গাল ও চেহারা রাখলেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা আদায় করে ইস্তেগফার করেন। তারপর কা'বার প্রতিটি কোণে যান এবং তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, সানা, ও প্রার্থনা করেন। তারপর কা'বা শরীফ থেকে বের হন। ইমাম আহমদও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বায় প্রবেশ করেছেন। এতে ৬টি খুঁটি ছিল। তিনি প্রত্যেকটি খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন।

বর্ণিত আলোচনায়, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাজের অনুরূপ কাজ করা যে উত্তম, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কারো মধ্যে দ্বিমত নেই। তবে উলামায়ে কেরাম দু'টি বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন যে, এই দুটো কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত কিনা।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কা'বার দেয়াল ও খুঁটির সাথে তিনি নিজ পেট ও পিঠ লাগিয়েছিলেন কিনা। এ ব্যাপারে এক রেওয়ায়েতে তিনি এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

আল্লামা ফাসী নাফে' থেকে, তিনি শায়বা বিন উসমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শায়বা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই খুঁটির মাঝখানে দু'রাকাত নামায পড়েছেন, তারপর কা'বার সাথে নিজের পেট ও পিঠ লাগিয়েছেন। ফাসী আরো বলেন, আমাদের শেখ হাফেজ ইরাকী কা'বা শরীফে অনুরূপ করাকে উত্তম বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ী' তাঁর মুসনাদে, উরওয়া বিন যোবায়ের থেকে এর সমর্থনে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উরওয়া বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ শেষে সকল কোণ স্পর্শ করেছেন এবং নিজের পেট, পিঠ ও পার্শ্বদেশ বাইতুল্লাহ শরীফের সাথে লাগান। ফাসী বলেছেন, আমি একাধিক আলেমকে দেখেছি তারা এটাকে উত্তম মনে করেন না।

ফাসী যা দেখেছেন তাতে, অনুরূপ কাজ করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় না। তবে বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে তিনি এটা উত্তম না হওয়ার কথাটাই বুঝেছেন।

২য় বিষয়টি হচ্ছে, ভেতরে প্রবেশের সময় সেজদা দেয়া। কেউ কেউ এটাকে সেজদায়ে শোকর বলেছেন। এই সেজদা দান উত্তম কিনা এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেজদা করেছেন।

ফদল বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাবায় প্রবেশ করার পর দুই খুঁটির মাঝখানে সেজদায় পড়ে যান। তারপর বসেন এবং দোয়া করেন, তবে নামায পড়েননি। আত্‌তাবারানী তাঁর আল-কবীর গ্রন্থে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে এটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নয় বলে জানা গেছে।

ইমাম মালেকের মতে, কাবার খুঁটিকে গলার সাথে আঁকড়ে ধরা মাকরূহ।

যাই হোক, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায়না যে, কাবার সাথে পেট ও পিঠ লাগানো নিষিদ্ধ। কেননা কাবার খুঁটির সাথে গলা না লাগিয়ে এবং দেয়ালের সাথে ভর না দিয়ে কিংবা পিঠ দ্বারা ঠেস না লাগিয়েও ঐ কাজ করা সম্ভব।

মূলকথা হলো, এ সকল হাদীস দুর্বল হলেও, এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কোন কিছুর ফজীলত বর্ণনা করা সর্বসম্মত ব্যাপার। সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

কাবা শরীফের ভেতর নামায পড়া

কাবা ঘরের ভেতরে নামায পড়া সুন্নত। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (সা) নিজেই কাবা ঘরের ভেতর নামায পড়েছেন। কেউ নবী করীম (সা) এর অনুসরণে সওয়াবের নিয়তে কাবা শরীফের ভেতর নামায পড়লে, অনেক বেশী সওয়াব ও কল্যাণ লাভ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন উসামা, বিলাল এবং উসমান বিন তালহা আল-হাজাবী (রা)। তারপর তিনি (সা) কাবা শরীফের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ভেতরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ইবনে উমর বলেন, বিলাল বের হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ভেতরে কি করলেন? জবাবে বিলাল বললেন যে, তিনি (সা) ভেতরে নামায পড়েছেন। তাঁর বামে দুটি, ডানে একটি এবং পেছনে ছিল ৩টি খুঁটি। তখন কাবা শরীফে ৬টি খুঁটি ছিল। (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁরা নবী করীম (সা) এর সাথে কাবা শরীফের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ভেতরে দীর্ঘ সময় কাটালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শেষ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, এবাদতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সময় ধরে কাবা শরীফের ভেতর অবস্থান করা যায়, তবে সেই অবস্থান অবশ্যই গল্প-গুজবের উদ্দেশ্যে নয়।

বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম এই সুন্নতটি পালন করেছেন। সাহাবী হযরত আবুশ শাশা বলেন, 'আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। মক্কায় এলাম এবং কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করলাম। তখন ইবনে উমরও (রা) আসলেন। তিনিও আমার পাশে নামায পড়লেন। পরের বছরও আমি হজ্জে আসলাম। আমি কাবার ভেতরে ইবনে উমরের জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলাম। তখন ইবনে যোবায়েরও ঢুকলেন। তিনি আমার পাশে দাঁড়ালেন। তিনি সেখান থেকে আমাকে বের করা পর্যন্ত ভিড় করতে লাগলেন। তারপর তিনি ৪ রাকাত নামায আদায় করলেন। (আহমদ)

আল্লামা আযরাকী শায়বা বিন যোবায়ের বিন শায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) হজ্জ করেছেন এবং কাবার ভেতরে প্রবেশ করেছেন। আল্লামা আল-ফাকেহী আতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আতা বলেছেন, আমি মসজিদে হারামে ৪ রাকাত নামায পড়ার চেয়ে কাবা শরীফের ভেতর দু'রাকাত নামায পড়াকে বেশী পছন্দ করি। আল্লামা আল-ফাকেহী হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, কাবা শরীফের ভেতরের নামায অন্য জায়গায় ১ লাখ নামাযের সমান। ইবনে উমরের বর্ণিত প্রথম হাদীসটিতে, নবী করীম (সা) কাবা

শরীফের ভেতর নামায পড়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঐ হাদীসটি বুখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিপরীত। ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, "নবী করীম (সা) কাবাঘরের ভেতর প্রবেশ করে চতুর্দিকে তাকবীর বলেছেন, তবে তিনি নামায পড়েননি।" হাদীসটি হচ্ছে এই ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِىْ نَوَاحِيْهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ -

মুসলিম শরীফে হাদীসটির শেষাংশে বলা হয়েছে دعا ولم يصل অর্থাৎ 'তিনি দোয়া করেছেন, নামায পড়েননি।' আল্লামা হাফেজ আল-ইরাকী বলেছেন, ইবনে আব্বাস ঐ হাদীসটি উসামা বিন যায়েদ থেকে শুনেছেন এবং শিখেছেন। সহীস মুসলিমে ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে এইরূপ ঃ

اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ -

অর্থ ঃ উসামা বিন যায়েদ আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম (সা) কাবাঘরে ঢুকলেন এবং এর চতুর্দিকে দোয়া করলেন, তবে তিনি নামায পড়েননি।

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, নবী (সা)-এর নামায না পড়ার নেতিবাচক হাদীসটির চেয়ে পড়ার ইতিবাচক হাদীসটিকেই গ্রহণ করা উচিত। আল্লামা তাহাওয়ী তাঁর شَرْحُ مَعَانِى الْاَثَارِ বইতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) কাবার ভেতর নামায পড়েছেন, তবে বিলাল নামায পড়েননি। এছাড়া উমর, জাবের, শায়াবা বিন উসমান এবং উসমান বিন তালহাও (রা) কাবার ভেতর নামায পড়েছেন।

ইমাম নবওয়ী শরহে মুসলিম শরীফে বলেছেন যে, হাদীস বিশারদগণ বিলাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। কেননা সেটি হল ইতিবাচক। তিনি এ বিষয়ে বেশী জানতেন বলে, তাঁর বর্ণিত হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য।

আল্লামা হাফেজ আল-ইরাকী প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিলাল ও উসামা (রা) উভয়ে

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে একই সময়ে কাবা শরীফে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু তাদের একজনের ইতিবাচক ও অন্যজনের বর্ণিত নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব? এই প্রশ্নের কয়েকটি জবাব হতে পারে ঃ

প্রথম জবাবটি হচ্ছে এই যে, ইমাম নবওয়ী শরহে মুসলিম শরীফে বলেছেন, উসামার নেতিবাচক বর্ণনার কারণ হল, যখন তাঁরা কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন কাবার দরজা বন্ধ করা হল এবং সবাই দোয়ায় মশগুল হয়ে পড়লেন। উসামা রাসূলুল্লাহ (সা) কে দোয়া করতে দেখলেন। তখন তিনি নিজেও দোয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন একদিকে আর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন অন্যদিকে। তবে বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে ছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েন এবং বিলাল (রা) নিকটে থাকার কারণে তা দেখেন। তবে উসামা (রা) তা দেখেননি। কেননা তিনি দূরে ছিলেন এবং দোয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) সংক্ষিপ্তাকারে নামায আদায় করেছেন। সেজন্য উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নামায পড়া দেখতে পাননি। তাই তিনি নিজ ধারণা থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েননি। অপরদিকে, বিলাল (রা) নিজে দেখে নামায পড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় জবাবটি হচ্ছে, সম্ভবত উসামা (রা) কাবা শরীফে ঢুকার পর বিশেষ কোন প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নামায দেখতে পাননি। আল্লামা হাফেজ ইরাকী বলেছেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা শরহে তিরমিজী শরীফে এ বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তা আবু বকর বিন মুনজের কর্তৃক উসামা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের সাথে পুরো মিলে যায়। উসামা (রা) এর বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى صُوَرًا فِى الْكَعْبَةِ ـ فَكُنْتُ اٰتِيْهِ بِمَاءٍ فِى الدَّلْوِ يَضْرِبُ بِهَا الصُّوَرَ ـ

অর্থ ঃ "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (রা) কাবা ঘরের ভেতর কয়েকটি প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন। আমি তখন বালতি ভরে পানি আনি এবং তিনি সেই পানি প্রতিকৃতির উপর মারেন।" এই হাদীসে উসামা (রা) নিজে, কাবা ঘর থেকে পানির জন্য বেরিয়ে যাওয়ার খবর দিয়েছেন।

তৃতীয় জবাবটি হচ্ছে صَحِيْحُ ابْنِ حِبَّانَ নামক হাদীস গ্রন্থে ইবনে হিব্বান এই দুটো বর্ণনার বৈপরিত্য দূর করার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরা দু'বার কাবা শরীফে ঢুকেছিলেন। প্রথমবার হচ্ছে মক্কা বিজয়ের দিন। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা শরীফের ভেতর নামায পড়েন। দ্বিতীয়বার ছিল বিদায় হজ্জের দিন এবং সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা শরীফের ভেতর কোন নামায পড়েননি। এই সমাধানের ভিত্তিতে উভয় হাদীসের বৈপরিত্য দূর হয়ে যায়।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা মাহলাবও অনুরূপ সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা) দু'বার কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করেছেন। একবার ভেতরে নামায পড়েছেন এবং দ্বিতীয়বার পড়েননি। মুহিব আততাবারী বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইসমাঈল বিন আবু খালেদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও এই কথার সমর্থন দেয়। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفى اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فِى عُمْرَتِهِ؟ قَالَ لاَ قَالَ ـ فَتَعَيَّنَ الدُّخُوْلُ فِى الْحَجِّ وَالْفَتْحِ ـ

অর্থ ঃ 'আমি আবদুল্লাহ বিন আবি আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি উমরাহ আদায়ের সময় কাবাঘরের ভেতর ঢুকেছিলেন? তিনি বললেন, না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিদায় হজ্জ ও মক্কা বিজয়ের দিন ব্যতীত কাবা শরীফের ভেতর প্রবেশ করেননি।' তিনি বলেন যে, আমার পিতা شرح الترمذى গ্রন্থে বলেছেন যে, ইবনে হিব্বান তাঁর গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন তা সহীহ হাদীসের বিপরীত। কেননা, সহীহ হাদীসে, মক্কা বিজয়ের দিন কাবার ভেতরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নামায পড়ার ব্যাপারেই শুধু বিলাল ও উসামা (রা) মতভেদ প্রকাশ করেছেন এবং সেটা ছিল ঐ একই দিনের প্রবেশের ব্যাপার।

অবশ্য এই প্রশ্নের জবাবে একথা বলা যায় যে, উসামা (রা) এর বর্ণনাটি কাবা শরীফে অন্য সময় প্রবেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য এবং সেটা একই সফর কিংবা দুই সফরেও হতে পারে। তাই ইবনে হিব্বানের বর্ণনাকে সহীহ হাদীসের বিপরীত বলা যেতে পারে না।

৪র্থ জবাবটি হচ্ছে, বিলাল (রা) এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সালাত (নামায) আদায় করেছেন বলে যে বর্ণনা এসেছে তা আনুষ্ঠানিক সালাত নয়। বরং তিনি সালাতের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছেন, নামায পড়েননি। কেননা, অভিধানে 'সালাত' মানে দোআ।

মূলত এই জবাবটি ঠিক নয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلَّى 'আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি যে রাসূলুল্লাহ (সা) মোট কত রাকাত নামায পড়েছেন। বুখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মোট দু'রাকাত নামায পড়েন।

এই আলোচনার দ্বারা দুটো উপকারী বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। প্রথমটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা শরীফের ভেতর যে জায়গায় নামায পড়েছেন তা জানা। রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে, কাবা শরীফের ভেতর ৬টি খুঁটি ছিল। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা) নামাযে এমনভাবে দাঁড়ান যে তাঁর বামে একটি খুঁটি, ডানে ২টি খুঁটি এবং পেছনে ছিল ৩টি খুঁটি। অন্য এক বর্ণনা মতে তাঁর বামদিকে একটিও ডানদিকে একটি খুঁটি ছিল। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনা মতে, বামে ২টি খুঁটি ও ডানে একটি খুঁটি ছিল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাবার ভেতরে ঢুকে দরজাকে পেছনে রাখলেন এবং সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর ও দেয়ালের মাঝে মাত্র ৩ গজ ব্যবধান ছিল। যেন তিনি রোকনে ইয়ামানীকে সামনে রেখে দাঁড়িয়েছেন। অর্থাৎ দরজাকে পেছনে রেখে রোকনে ইয়ামানীর দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তিনি নামায পড়েন। তাঁর ও সামনের দেয়ালের ব্যবধান ছিল ৩ গজ এবং বামদিকের দেয়ালের ব্যবধান ছিল ১ গজ।

দ্বিতীয় উপকারিতা হল, তিনি কয় রাকাত নামায পড়েছেন তা জানা। বুখারী শরীফের নামায অধ্যায়ের শুরুতে ইমাম বুখারী এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَاَلَ بِلاَ لاً عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ بِلاَلٌ : نَعَمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -

অর্থ ঃ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ ব্যাপারে বিলালকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন। বিলাল উত্তরে বললেন, হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ (সা) দু'রাকাত নামায পড়েছেন। এই হাদীসটি নাসায়ী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ শরীফে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কাবার ভেতরে ঢুকে কিভাবে কি করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন যে, তিনি দুই রাকাত নামায পড়েছেন। একই সূত্র পরম্পরায় ইবনে আবী শায়বাও হাদীসটি বর্ণনা করেন। মুসনাদে আহমদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কোরা কিতাবে সাফওয়ানের এই বর্ণনাটি হযরত উমরের নামের উল্লেখ ব্যতীতই বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

বাইতুল্লাহর তওয়াফের ফজীলত

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَاَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ـ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : لاَ يَرْفَعُ قَدَمًا وَلاَ يَضَعُ أُخْرى الأَحَطَّ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةً وكُتِبَتْ لَهُ بِها حَسَنَةً ـ اخرجه الترمذى بهذا اللَّفْظِ وقال حديث حسن ـ

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি হিসেব করে, এক সপ্তাহব্যাপী কাবা শরীফ তওয়াফ করে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।' আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে আরো বলতে শুনেছি, "সেই ব্যক্তির প্রতি কদমে আল্লাহ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁর নেক লেখা হয়।" তিরমিজী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু হাতেম আরো একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ وَرَفَعَ لَهُ بِهَادَرَجَةً অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেটি হল ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ـ

অর্থ ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে কাবার তওয়াফ করবে এবং দু'রাকাত নামায পড়বে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।' ইবনে হিব্বান ও আবু সাঈদ আল-জুনদী এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে জুনদী আরো একটু যোগ করেন, كَعِتْقِ رَقَبَةٍ نَفِيْسَةٍ مِّنَ الرِّقَابِ অর্থ ঃ 'উত্তম গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।'

নাসায়ী শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হল ঃ

مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ -

অর্থ ঃ 'যে সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করবে সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।' হাফেজ আবুল ফারাজ মুসীরুল গারামে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং এর সাথে অতিরিক্ত আরো যোগ করেছেন,

وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ عَدْلٌ مُحَرَّرٌ -

অর্থ ঃ 'এর পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ২ রাকাত নামায পড়ে, সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে মক্কায় আসার পর সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করা। সম্ভবতঃ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সব কাজের আগে কাবা শরীফের তওয়াফ করতেন।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ غُفِرَلَهُ ذُنُوْبُهُ كُلُّهَا بَالِغَةً مَّابَلَغَتْ - اخرجه ابوسعيد الجندى -

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে তার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।'

আমর তাঁর পিতা শোয়াইব থেকে এবং শোয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি তওয়াফের নিয়তে ঘর থেকে বের হলে সে আল্লাহর রহমত পাওয়ার নিকটবর্তী হয়।

সে যখন তওয়াফে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। তারপর প্রতি কদমের উঠা-নামার সাথে সাথে আল্লাহ তার জন্য পাঁচশ' নেক লেখেন, পাঁচশ পাপ মোচন করেন এবং পাঁচশ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তওয়াফ শেষে

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়লে সে সদ্যপ্রসূত নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়, আওলাদে ইসমাঈলের ১০টি গোলাম আযাদ করার বিনিময় পায় এবং হাজারে আসওয়াদের একজন ফেরেশতা তাকে স্বাগত জানায় এবং বলে ঃ যেই কাজে তোমাকে স্বাগত জানানো হয়, সে কাজ পুনরায় কর; তবে যা করেছ তা অতীতের গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট এবং তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করা হবে।'

আমর তাঁর পিতা শোয়াইব থেকে এবং শোয়াইব নিজ পিতা আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'যে ভাল করে অজু করে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্যে আসবে সে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করল। তারপর যখন চুমু দিল এবং নিম্নের দোয়াটি পড়ল তখন রহমত তাকে ঢেকে ফেলল। দোয়াটি হচ্ছে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

তারপর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করলে, তার প্রতি কদমে আল্লাহ সত্তর হাজার নেক লিখবেন, সত্তর হাজার গুনাহ মাফ করবেন, সত্তর হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার বংশের সত্তর হাজার লোকের জন্য সুপারিশ করা হবে। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে দু'রাকাত নামায পড়লে আল্লাহ তার জন্য আওলাদে ইসমাঈলের ১৪ জন গোলাম আযাদ করার সওয়াব লিখবেন এবং সে সদ্যপ্রসূত নিষ্পাপ শিশুর মত গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, একজন ফেরেশতা এসে বলবে, তুমি তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমল কর, যা করেছ তা অতীতের অপরাধের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট।'

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো, আমর তাঁর দাদার দিকে সম্বোধন করেছেন, সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেননি। আযরাকী উপরের ৪টি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُبَاهِىْ بِالطَّائِفِيْنَ مَلاَئِكَتَهُ ـ

অর্থঃ 'আল্লাহ ফেরেশতাদের নিকট তওয়াফকারীদের ব্যাপারে গর্ব করে থাকেন।' আবুযর এবং আবুল ফারাজ এটি মুসীরুল গারামে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ৫০ বার বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ করে সে সদ্য ভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুর মত পাপমুক্ত হয়ে যায়। তিরমিজী এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এটি 'গরীব হাদীস।'

ইমাম বুখারী বলেছেন, এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তবে, আল্লাহই ভাল জানেন, এতে ৫০ সপ্তাহের কথা উল্লেখ আছে। কেননা ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ বিন যোবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَطَافَ خَمْسِيْنَ أُسْبُوْعًا قَبْلَ اَنْ يَّرْجِعَ كَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

অর্থ ঃ 'যে বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করে এবং ফিরে যাওয়ার আগে ৫০ সপ্তাহ তওয়াফ করে সে নিষ্পাপ শিশুর মত পাপমুক্ত হয়ে যায়।'

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, ৫০ সপ্তাহ একাধারে কিংবা পর্যায়ক্রমে তওয়াফ করতে হবে। বরং এর অর্থ হল, তার গোটা জিন্দেগীর আমলনামায় মোট ৫০ সপ্তাহ তওয়াফের রেকর্ড থাকলেই চলবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রতিটি দিন ও রাতে, এই বাইতুল্লাহ্‌র প্রতি ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে ৬০টি হচ্ছে তওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি হচ্ছে এই ঘরের নামাযীদের জন্য এবং ২০টি হচ্ছে এই ঘরের প্রতি নজরকারীদের জন্য।

হযরত আদম (আ) সাত সপ্তাহ রাত্রে এবং পাঁচ সপ্তাহ যাবত দিনে তওয়াফ করেছেন। তিনি তওয়াফের সময় এই দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে এই ঘরের আবাদকারী লোক তৈরী কর। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠান এবং বলেন, 'আমি তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে এই ঘরের আবাদকারী একজন নবী পাঠাবো; তাঁর নাম হবে ইবরাহীম। তাঁর হাতে

আমি এই ঘর নির্মাণ করাবো, এর পানি পান করানোর সেবা আঞ্জাম দেব, তাঁকে এর হারাম ও হালাল এলাকা (হুদুদে হারাম) এবং এই ঘরের যথার্থ স্থান দেখাবো; তাঁকে এখানকার পবিত্র স্থানসমূহ এবং এর এবাদতের বিধি বিধান শিখিয়ে দেবো।'[২১]

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, আমর বিন দিনার বলেছেন, আল্লাহ দুনিয়াতে কোন কাজের জন্য কোন ফেরেশতা পাঠাতে চাইলে, সেই ফেরেশতা আল্লাহর কাছে প্রথমে বাইতুল্লাহর তওয়াফের অনুমতি চায়। পরে সে ফেরেশতা নেমে আসে। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَمْتَعُوْا مِنْ هٰذَا الْبَيْتِ فَاِنَّهُ هُدِّمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِى الثَّالِثَةِ ـ اخرجه ابن حبان ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এই ঘর থেকে উপকৃত হও, এই ঘর দু'বার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তৃতীয়বারে তা তুলে নেয়া হবে।' (ইবনে হিব্বান)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এই ঘর উঠিয়ে নেয়ার আগে এবং এই ঘরের অবস্থান সম্পর্কে মানুষের ভুলে যাওয়ার পূর্বে, তোমরা এই ঘরের বেশী বেশী যিয়ারত কর; কুরআন উঠিয়ে নেয়ার আগে বেশী করে কুরআন তেলাওয়াত কর। তাঁকে লোকেরা প্রশ্ন করল, কাগজে লিখিত কুরআন তুলে নেয়া সম্ভব হলেও মানুষের মন থেকে কিভাবে তা তুলে নেয়া হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মানুষ রাত্রে অন্তরে কুরআন সহকারে থাকবে সকাল বেলায় তাদের অন্তর থেকে কুরআন মুছে যাবে, এমনকি তারা তখন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালেমাটিও ভুলে যাবে। তখন মানুষ আবার জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাবে এবং বিভিন্ন জাহেলী জিনিসের অনুসরণ করবে। (আযরাকী)

হযরত আলী (রা) বলেন, কাবা শরীফ ও তোমাদের মাঝখানে বাধা সৃষ্টি হওয়ার আগে বেশী বেশী করে তওয়াফ কর। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন ইথিওপিয়ার ছোট কান বিশিষ্ট মাথায় টাকপড়া ও সরু পা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে কাবার উপর বসে একে ধ্বংস করতে দেখতে পাচ্ছি।

ফাকেহী হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে তওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ করে তিনি

থেমে গেলেন এবং মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি থেমে গেলেন এবং মৃদু হাসলেন! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার সাথে ঈসা বিন মরিয়মের দেখা হল, তিনি তওয়াফ করছেন এবং তাঁর সাথে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে। তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং আমি সালামের জবাব দিলাম।' এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কা'বার তওয়াফের জন্য সবাই আগ্রহী।[২২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اَلطَّوَافُ بَالْبَيْتِ صَلاَةٌ الاَّ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ اَحَلَّ لَكُمْ فِيْهِ الْمَنْطِقَ ـ فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ الاَّ بِخَيْرٍ ـ

অর্থ ঃ 'বাইতুল্লাহর তওয়াফ নামাযের সমতুল্য। সাবধান! এতে ব্যতিক্রম হচ্ছে এই যে, এতে আল্লাহ কথা বলা জায়েয করেছেন, কেউ কথা বললে সে যেন ভাল কথা ছাড়া খারাপ কথা না বলে।'

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, হাজ্জাজ বিন আবি রোকাইয়া বলেন, আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলাম। তখন আমি ইবনে উমর (রা) কে দেখি। ইবনে উমর বলেন, হে ইবনে আবি রোকাইয়া, বেশী বেশী তওয়াফ কর, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে এই ঘরের তওয়াফ করতে করতে পা ব্যথা করে ফেলেছে, বেহেশতে তার পা'কে আরাম দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। [২৩]

ফাকেহী কা'আব থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনশত রাসূল এই বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন তাদের সর্বশেষ রাসূল। এ ছাড়াও ১২ হাজার বুজুর্গ লোক এই ঘরের তওয়াফ করেছেন; মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার আগে তাঁরা হিজরে ইসমাঈলে নামায পড়েছেন। তাঁদের কেউ তওয়াফে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোন কথা-বার্তা বলেননি। তাঁদের কেউ আসরের নামাযের পর এবং মাগরিবের আগে নামায পড়েননি।[২৪]

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে হযরত আবু হুরাইরার প্রতি বলতে শুনেছি, হে আবু হুরাইরা! তুমি হয়তো তওয়াফে উদাসীন একটি দলকে দেখতে পাবে, তাদের সেই তওয়াফ কবুল হবে না এবং তাদের সেই আমলও

উপরে যাবে না। হে আবু হুরাইরা! তুমি যদি তাদেরকে দলবদ্ধ দেখতে পাও, তাহলে, তাদের সেই দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিও এবং তাদেরকে বলে দিও এই তওয়াফ গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই আমল উপরে উঠবে না। (ফাকেহী)(২৫)

মুসাফে' বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-হাজাবী বলেছেন, আমার ভাই বলেছেন যে, একবার আমি মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি একটি সোনার পাখী দেখলাম। পাখীটির মাথা সবুজ যমরদ পাথরের তৈরি। সেটি যমযম কূপের বাতির উপর কা'বার দিকে মুখ করে বসেছে। সে বলল, হে আল্লাহর কা'বা! আমি তোমাকে কেন রাগান্বিত দেখতে পাচ্ছি? কা'বা উত্তর দিল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু আমি আমার চারপার্শ্বে যা দেখছি যদি নারী-পুরুষ তওয়াফকারী না থাকত তাহলে, আমি এমন জোরে নাড়া দিতাম যে আমার পাথরগুলো সংগৃহীত স্থানে পুনরায় ফিরে যেত। (ফাকেহী)(২৬)

তওয়াফে ভাল কথা বলা এবং দোয়া করা কিংবা দোয়া শিখানো এগুলো জায়েয আছে। মুজাহিদ বলেন, আমি তওয়াফ করার সময়, ইবনে উমর (রা) আমার হাত ধরেন এবং আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেন।

ফাকেহী হযরত আয়িশা (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় আসেন, কা'বা শরীফের ৭ চক্কর তওয়াফ করেন এবং পরে দু'রাকাত নামায পড়েন। এর ফলে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) থেকে তওয়াফ করা এবং দু' রাকা'ত নামায পড়ার সুন্নত চালু হয়। (২৭)

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لاِقَامَةِ ذِكْرِاللهِ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহর জিকর কায়েমের জন্যই বাইতুল্লাহর তওয়াফের বিধান চালু করা হয়েছে। (ফাকেহী)(২৮)

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তওয়াফকারী মানুষের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে মানুষেরা! আল্লাহর হামদ ও তাকবীর বল। তওয়াফকারীরা ঐ কথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ-গান করলেন। (ফাকেহী)

তওয়াফের দোয়া

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) তওয়াফের সময় এই দোয়াটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

হযরত উমর (রা) থেকে তওয়াফের সময় ভিন্ন দোয়া পড়ার প্রমাণও রয়েছে।

তওয়াফের সময় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেউ কেউ এটাকে তওয়াফের বেদআত বলেছেন। তবে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা অন্যায় নয়।

আ'তা বলেন, একবার হযরত আবদুর রহমান বিন আ'ওফ (রা) তওয়াফ করেন এবং তওয়াফ থেকে অবসর নেয়ার আগ পর্যন্ত কারো সাথে কোন কথা বলেননি। এক ব্যক্তি, তিনি তওয়াফে কি পড়েন তা জানার জন্য তাঁকে অনুসরণ করেন, তিনি তওয়াফে শুধু এই দোয়াটি পড়েন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অনুসরণকারী ব্যক্তিটি বলল, আল্লাহ্ আপনাকে সংশোধন করুন। আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম, কিন্তু আপনি উপরোক্ত দোয়াটি ছাড়া তওয়াফে আর কিছুই পড়েননি। তখন তিনি উত্তর দিলেন, এই দোয়াটি কি সকল কল্যাণের উৎস নয়? (ফাকেহী)[২৯]

তওয়াফের চক্করগুলো হিসাব রাখা দরকার। একবার হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে তওয়াফ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কত চক্কর হয়েছে? তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাকে কেন সংখ্যা জিজ্ঞেস করেছি তা কি তুমি জান? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হল তুমি যেন তার হিসেব রাখ। (ফাকেহী)[৩০]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে কা'বা শরীফের ৭ চক্কর তওয়াফ করবে এবং–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

–এই দোয়াটি পড়া ছাড়া অন্য কোন কথা না বলবে, তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, ১০টি নেক লেখা হবে এবং তার ১০টি মর্যাদা বাড়ানো হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তওয়াফ করার সময় কথা বলবে সে ব্যক্তির উদাহরণ হল, সে রহমতকে পা দিয়ে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দেয় যেমন করে পা দিয়ে পানি ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়। (ফাকেহী)[৩১]

ফাকেহী আবি ইয়াযিদ বিন আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম (আ) এর তওয়াফের সময় ফেরেশতারা এসে তাঁকে বলল, হে আদম! আমরা আপনার দু'হাজার বছর আগে এই ঘরের তওয়াফ করতাম। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তওয়াফে কি পড়তেন? তাঁরা বললেন, আমরা তওয়াফে এই দোয়াটি পড়তাম ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه وَلَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

তখন আদম (আ) বললেন, এর সাথে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه এইটুকুও যোগ করুন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) এর কা'বা নির্মাণের সময় ফেরেশতারা আসলেন এবং বললেন, হে ইবরাহীম! আমরা আপনার পিতা আদম (আ) কে বললাম যে, আমরা আপনার দু'হাজার বছর আগে কা'বার তওয়াফ করতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি দোয়া পড়তেন? আমরা উপরোক্ত দোয়ার কথা উল্লেখ করলে তিনি আরো কিছু যোগ করার কথা বলেন। ইবরাহীম (আ) আরো সামান্য যোগ করে বললেন,

لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

এতটুকু পড়া দরকার। তখন থেকে তওয়াফে এই পূর্ণাঙ্গ দোয়াটি পড়ার সুন্নত চালু হয় ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه وَلَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ وَلَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, তওয়াফ শেষে ফরজ নামায কায়েমের একামত হয়ে গেলে, তওয়াফের অতিরিক্ত দু'রাকাত নামায পড়ার দরকার নেই। ফরজ নামাযই সেই দু'রাকাতের বিকল্প এবং যথেষ্ট। আতা,

সালেম, আমর বিন দিনার, মুজাহিদ, ইবনে আবী লায়লা এবং ইবনে উমর (রা)-ও এই একই মত পোষণ করেন।

জীবিত ও মৃত লোকের জন্য তওয়াফ

আ'তা বিন আবী রেবাহ্ বলেছেন যে, জীবিত ও মৃত লোকের পক্ষ থেকে তওয়াফ করা যায়। আ'তা একটি গোলাম ক্রয় করেছিলেন। তিনি মসজিদে হারামে বসে থাকতেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে গোলামটিকে তওয়াফ করার নির্দেশ দিতেন। অবশ্য আতার আরেক বক্তব্যে এসেছে যে, হজ্জের তওয়াফ ছাড়া একজন অন্যজনের পক্ষ থেকে তওয়াফ করতে পারে না। কিন্তু মক্কাবাসীদের কাছে আ'তার প্রথম বক্তব্যটিই বেশী প্রিয়। কোন কোন হানাফী আলেমের মতে, নফল নামাযের মতই, কারুর পক্ষ থেকে নফল তওয়াফ এবং উমরাহ্ আদায় করা যায় না। হাম্মাদ বিন কিরাত বর্ণনা করেন যে, আমি ইবরাহীম বিন তোহ্মানকে সাত চক্কর তওয়াফ করতে দেখি। ইবরাহীম বলেন, এই তওয়াফ আমার বাপের জন্য। পরে আরো সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করে বলেন, এটি আমার মায়ের জন্য।[৩২]

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নফল তওয়াফ শেষে, হাজারে আসওয়াদ বরাবর যমযমের বামে দু'রাকাত নামায পড়তেন।

উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করা

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীর উপর বসে তওয়াফ করেন এবং নিজ হাতে লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি পরে লাঠির নীচের অংশে চুমু দেন।

হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর 'কোসওয়া' নামক উটের উপর সওয়ার ছিলেন এবং একটি কাল চাদর পরা ছিলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তওয়াফের সময় সেই লাঠি দিয়ে তিনি হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। (ফাকেহী)[৩৩]

ফাকেহী আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জাবের (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীর উপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহর তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভিড়ের ভেতর যেন তিনি সবাইকে দেখেন এবং লোকেরা যেন তাঁকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারে।

তওয়াফের ফজীলত অনেক বেশী। আল্লাহর ঘর-বাইতুল্লাহ্ তথা কা'বা শরীফ যমীনে আল্লাহর বিরাট নিদর্শন। এটি একটি পবিত্র ও বরকতপূর্ণ স্থান। এই স্থানের মর্যাদা ও পবিত্রতার জন্যই আল্লাহ্ এখানে এত বেশী ফজীলতের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই ফজীলতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু দুর্বল হাদীসও রয়েছে। কিন্তু ফজীলতের মধ্যে যে সকল সংখ্যার উল্লেখ আছে সেগুলো দ্বারা ফজীলতের আধিক্য বুঝানো হয়েছে যা অন্যান্য এবাদতের ফজীলতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্ যদি বর্ণিত সংখ্যা অনুযায়ী সওয়াব দেন, তাও সম্ভব। কেননা, এই বিশেষ জায়গার এবাদতের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

কা'বার প্রতি শুধু মানুষই নয় বরং পশু-পাখীও আকর্ষণ বোধ করে। এখন আমরা অন্যান্য প্রাণীর তওয়াফ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা উল্লেখ করবো।

জিন-সাপ ও অন্যান্য পশু-পাখীর তওয়াফের ইতিহাস

ইবনুস সালাহ্ লিখেছেন যে, অতীতের এক বুজুর্গ একদিন প্রচণ্ড গরমের সময় বের হন এবং দেখেন যে, একটি সাপ একাকীই কা'বার তওয়াফ করছে।

আল-ফাকেহী আবদুল্লাহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা ওবায়েদ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। ওবায়েদ বলেন, আমরা একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল 'আস (রা) এর সাথে মসজিদে হারামে বসা ছিলাম। তখন সূর্য বেশ খানিকটা উপরে উঠেছে। তখন আমরা একটা পুরুষ সাপকে বাবে বনি শায়বা দিয়ে ঢুকতে দেখি। আমাদের সকলের চোখ ঐ দিকেই নিবদ্ধ এবং আমরা গভীর আগ্রহ সহকারে এর প্রতি লক্ষ্য রাখছিলাম। সে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করল। তারপর সাত বার কা'বার তওয়াফ করল, আমরা তা গুণলাম। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়ল, আমরা তা পরিষ্কার দেখলাম। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল 'আস (রা) বললেন, কেউ এই সাপটির কাছে যেতে চাইলে তোমরা তাকে নিষেধ করবে। আমার আশংকা হয় কেউ একে মেরে ফেলতে পারে কিংবা বিরক্ত করতে পারে। ওবায়েদ বলেন, আমি সাপটির কাছে গেলাম এবং এর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, হে পুরুষটি, আমরা তোমার মর্যাদা বুঝেছি; আল্লাহ্ তোমাকে তওয়াফ করিয়েছেন,

তুমি এখানে মূর্খ ও গোলামদের জনপদে বিরাজ করছ। আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, নির্বোধ লোকেরা তোমাকে হত্যা কিংবা বিরক্ত করতে পারে। তুমি যদি এখান থেকে চলে যেতে! আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তার মাথা ঝুঁকিয়ে আমার সব কথা শুনল। তারপর সে নিজের ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে একটি বালির স্তূপ বানাল এবং এতে ঠেস দিয়ে নিজের লেজের উপর দাঁড়াল। তারপর সে আকাশের দিকে উড়ে চলে গেল। যেতে যেতে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছল যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমরা আর তাকে দেখতে পেলাম না।

আল ফাকেহী হোসাইন বিন হাসান থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন জাফর থেকে, তিনি আবুল মোলাইহ থেকে, তিনি হাবিব বিন আবি মারযুক থেকে এবং তিনি আ'তা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর কাছে ছিলাম। তখন পিঠে দুই ডোরা বিশিষ্ট একটি সাপ মসজিদে হারামে প্রবেশ করল এবং কাবা শরীফের চারদিকে ৭ চক্কর দিয়ে তওয়াফ করল। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়ল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) সাপটির কাছে বাণী পৌঁছালেন যে, আমাদের এখানে কিছু গোলাম আছে। আমরা তাদের কাছ থেকে তোমার নিরাপত্তাহীনতার আশংকা করছি। আল্লাহ তোমার হজ্জ পুরো করেছেন। আ'তা বলেন, তারপর সাপটি কিছু বালি জমা করে একটি স্তূপ বানাল এবং সে আকাশের দিকে উড়ে গেল। আমরা আর তাকে দেখতে পাইনি। এই বর্ণনার সনদটি বিশুদ্ধ।[৩৪]

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, একটি জিন ৭ বার চক্কর লাগিয়ে কা'বার তওয়াফ করে এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায পড়ে। তারপর সে নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসে। তখন বনি সাহামের এক যুবক জিনটিকে হত্যা করে ফেলে। তারপর মক্কায় জ্বিন ও বনি সাহামের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ শুরু হয়।[৩৫]

ফাকেহী এমরান বিন আবী আ'তা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের সময় যখন যুদ্ধ ও ফেতনা শুরু হল, তখন আমি একটি উটকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে দেখি। উটটি কাবার চারদিকে ৭ চক্কর লাগিয়ে তওয়াফ করে এবং পরে বেরিয়ে যায়।[৩৬]

আল ফাকেহী বর্ণনা করেছেন (বর্ণনা সূত্রটি দুর্বল) যে, মুহাম্মদ বিন সালেহ সাঈদ বিন আবি মরিয়ম থেকে, তিনি ইবনে লাহিআ' থেকে, তিনি আবি কোবাইল থেকে, তিনি আবু উসমান আসবাহী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু উসমান আসবাহী বলেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে, উটপাখীর মত দুটো বড় পাখী মক্কার দিকে রওনা দিল। দৈনিক গড়ে দু'মাইল গতিতে রাস্তা অতিক্রম করে তারা মক্কায় আসে এবং কা'বা শরীফের উপর এসে বসে। কোরাইশ রা পাখী দুটোকে পানাহার করায়। তওয়াফে মানুষের ভিড় কমে গেলে তারা নীচে নেমে কাবার চারপাশে চক্কর দিত। মানুষের ভিড় বেড়ে গেলে তারা উড়ে গিয়ে আবার কা'বার ছাদে গিয়ে বসত। এভাবে তারা প্রায় ১ মাস অবস্থান করার পর চলে যায়।(৩৭)

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, একবার একটি পাখী একজন হাজীর কাঁধে বসে তিন সপ্তাহ যাবত কাবার তওয়াফ করে, মানুষ আগ্রহ সহকারে তা দেখে এবং পাখীটিও মানুষ দেখে আনন্দ উপভোগ করে। পাখীটি ২২৭ হিজরীর ২৬শে জিলকদ শনিবারে আসে এবং পরে হারাম শরীফ ছেড়ে উড়ে চলে যায়।(৩৮)

একবার হারাম এলাকার সীমানার ভেতর থেকে একটি হরিণ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে। তখন মুহাম্মদ বিন দাউদ মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, হরিণটি বাইতুল্লাহ শরীফের একটি বা দু'টি তওয়াফ করে হাজারে আসওয়াদের কাছে যায়। তার পর দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে এর উপর নিজের মাথা রাখে। সে এভাবেই দুই কি তিনবার করে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সে পাথরকে চুমু দেয়।

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে, মসজিদে হারামে, আরো বহু সংখ্যক উট, হরিণ বিড়ালসহ অন্যান্য অনেক পশু-পাখী প্রবেশ করে থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক, সব ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই।

কাসির বিন কাসির বিন মুত্তালিব বিন আবি ওদায়াহ ঐ সকল পশু-পাখীসহ অগণিত কবুতরের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সময় পর্যন্তও বহু সংখ্যক কবুতর, ছোট ছোট পাখীসহ অন্যান্য অনেক পাখী মসজিদে হারামে আনাগোনা করে। কে জানে, তাদের এই আসা-যাওয়া হয়তো, পাখীদের স্বাভাবিক বিচরণের মত নয়। এর মাধ্যমে যে, তারা এই ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহর জিকর করছে না তা বুঝার উপায় কি?

পেশাদার মোতাওয়েফ

তওয়াফ নিজে নিজে করারই নিয়ম। কিন্তু অনেক লোক নিজে একা তওয়াফ করতে চান না। তাঁরা মোতাওয়েফের আশ্রয় নেন। আমাদের দেশের লোকেরা মোতাওয়েফকে 'মোয়াল্লেম' বলে থাকে। মূলতঃ মোতাওয়েফ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি অর্থের বিনিময়ে মানুষকে তওয়াফের নিয়ম-কানুন ও দোয়া শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে তওয়াফ করান। মানুষকে তওয়াফ করানো তাদের পেশা।

পেশাদার মোতাওয়েফ ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। তখন প্রত্যেকে নিজেই নিজের তওয়াফ করত। কিন্তু এর উৎপত্তি হয় ৮৮৪ হিজরীতে। তখন সারাকেশা শাসক কায়েতবায়, মক্কায় হজ্জ করতে আসেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না। তাই তদানীন্তন মক্কার কাজী ইবরাহীম বিন যোহায়রা তাঁকে তওয়াফ করান ও দোয়া পড়ান। এখান থেকেই, হাজীদেরকে মোতাওয়েফ দিয়ে তওয়াফ করানোর الطوافة পেশা শুরু হয়। এর আগে এই পেশার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হিজরে ইসমাঈল (হাতীম)

হিজরে ইসমাঈলের বর্ণনা

হিজরে ইসমাঈলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'ইসমাঈল কর্ণার'। পারিভাষিক অর্থে কা'বা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের অর্ধবৃত্ত দেয়ালের ভেতরের গোলাকার স্থানকে হিজরে ইসমাঈল বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বার উত্তর পার্শ্বে ছায়া গ্রহণের জন্য একটি বিশ্রামাগার বা আ'রীস তৈরি করেছিলেন। এটাই পরবর্তীতে হযরত ইসমাঈল (আ) এর ভেড়া-বকরীর খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আযরাকী উল্লেখ করেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) আরাক গাছের কাঠ দিয়ে কা'বার পার্শ্বে ছায়াদার আ'রীস বা বিশ্রামাগার তৈরি করেন এবং তা হযরত ইসমাঈলের ছাগল-দুম্বার খোঁয়াড়ে পরিণত হয়। এ সকল রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরে ইসমাঈল কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং তা কা'বার বাইরে অবস্থিত খোঁয়াড় ছিল।

বিশুদ্ধ ও মশহুর রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত আছে, কোরাইশরা অর্থাভাবে কা'বা নির্মাণের সময় উত্তর পার্শ্বে সাড়ে ছয় হাত কা'বার অংশ ছেড়ে দেয় এবং সেই অংশটুকু হিজরে ইসমাঈলের সাথে যোগ করে দেয়।

পরবর্তীতে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় কোরাইশদের ছেড়ে দেয়া অংশটুকু পুনরায় কা'বার অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু পরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুনরায়, কা'বার সেই সাড়ে ছয় হাত অংশ কেটে হিজরে ইসমাঈলের সাথে যোগ করে দেয়। ফলে, হিজরে ইসমাঈলে কা'বার সাড়ে ছয় হাত অংশ ঢুকে পড়ে এবং তা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে।

তারীখে কা'বার লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শেখ হোসাইন বাসালামাহ লিখেছেন যে, হিজরে ইসমাঈল কয়েক দফা ভাংগা-গড়া হয় এবং বিভিন্ন সময় এর নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। ১২৬০ হিজরীতে, সুলতান আবদুল মজিদ খান উসমানীর আমলে, সর্বশেষ হিজরে ইসমাঈল ভাংগা ও গড়া হয়।

হিজরে ইসমাঈলের অপর নাম হচ্ছে হাতীমে কা'বা। হাতীম শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাঙ্গা বা ভগ্নাংশ। হাতীমে কা'বার অর্থ হচ্ছে কা'বার ভগ্নাংশ তথা কাবার বাইরের অবশিষ্টাংশ।

ইবনুল আসীর 'নেহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে, দু'টো স্থানের নাম হচ্ছে হাতীম। ১মটি হচ্ছে, হাজারে আসওয়াদ এবং বাবুল কা'বার মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ মোলতাযাম। ২য়টি হচ্ছে, কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফকে হাতীম নামকরণের কারণ হচ্ছে এটিকে উপরে উঠানো হয়েছিল এবং নীচে নামানো হয়েছিল। তখন সে তার ভিত্তিমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কা'বাকে হাতীম নামকরণের ২য় কারণ হচ্ছে জাহেলিয়াতের যুগে, আরবরা তওয়াফের কাপড় কা'বার ভেতরে ফেলে যেত এবং কালের আবর্তনে তা পুরাতন হয়ে মিটে যেত। تَنْحَطِمُ অর্থ মিটে যাওয়া।

আযরাকী বর্ণনা করেছেন যে, হাজারে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহীম এবং যমযম কূপের মধ্যবর্তী স্থানকে হাতীম বলা হয়। এখানে দোয়া কবুল হয় বলে লোকেরা বেশী ভিড় করে এবং একে অপরের উপর ভেঙ্গে পড়ে। (৩৯)

অনেক আলেম উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ) কে হিজরে ইসমাঈলে দাফন করা হয়েছে। তিনি ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর মা হাজারকেও একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। হিজরে ইসমাঈলে হযরত ইসমাঈল (আ) এবং হযরত হাজারের কবর সম্পর্কে, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে জরীর তাবারী এবং ইবনে কাসীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

হিজরে ইসমাঈলের মর্যাদা

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার বাইতুল্লাহ শরীফের ভেতর ঢুকে নামায পড়তে চেয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে ইসমাঈলে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং বলেন, "এখানেই নামায পড়, যদি তুমি কা'বার ভেতর নামায পড়তে চাও, কেননা, এটি কা'বারই অংশ বিশেষ।"

হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু হুরাইরা (রা) কে বলেছেন, "হিজরে ইসমাঈলের এক দরজায় একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে এতে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায়কারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, 'তোমার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেছে; এখন থেকে নতুনভাবে আ'মল কর।' এর অন্য দরজায় দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের সময় ঐ ঘর উঠিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত দণ্ডায়মান আরেকজন ফেরেশতা, নামায শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, সকল মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

যদি তুমি উম্মতে মুহাম্মদের সত্যিকার অনুসারী হও, তাহলে তুমি রহমতপ্রাপ্ত।

হযরত হাসান বসরীর 'রেসালা' বইতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কার অতিরিক্ত গরমের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ওহী পাঠান এবং বলেন, আমি তোমার জন্য হিজরে ইসমাঈলে বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেব; কিয়ামত পর্যন্ত সেই দরজা দিয়ে তোমার জন্য বেহেশতের সুশীতল ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

হযরত হাসান বসরীর 'রেসালা' বইতে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিন হযরত উসমান বিন আ'ফফান (রা) আসলেন এবং নিজের সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কোথা থেকে এসেছি তোমরা কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না? তখন তারা প্রশ্ন করল। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি বেহেশতের দরজায় দণ্ডায়মান ছিলাম।' তিনি তখন মীযাবের নীচে দাঁড়িয়ে দোয়া করছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১। ফি রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেক।
২। প্রাগুক্ত
৩। ফি রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেক, মক্কা, দারুল কেবলাহ প্রকাশনী, প্রকাশকাল– ১৯৮৫ খৃঃ
৪। তারীখে মক্কা, আহমদ আস-সিবায়ী।
৫। আখবারে মক্কা, আল-ফাকেহী।
৬। আখবারে মক্কা।
৭। আখবারে মক্কা।
৮। আখবারে মক্কা।
৯। প্রাগুক্ত
১০। আখবারে মক্কা।
১১। প্রাগুক্ত
১২। আখবারে মক্কা।
১৩। আখবারে মক্কা।
১৪। আখবারে মক্কা।
১৫। ফি রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেক
১৬। প্রাগুক্ত

১৭। প্রাগুক্ত
১৮। প্রাগুক্ত
১৯। প্রাগুক্ত
২০। প্রাগুক্ত
২১। ফি রেহাবিল বাইতিল হারাম, ডঃ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেক
২২। আখবারে মক্কা।
২৩। প্রাগুক্ত
২৪। প্রাগুক্ত
২৫। প্রাগুক্ত
২৬। প্রাগুক্ত
২৭। প্রাগুক্ত
২৮। প্রাগুক্ত
২৯। প্রাগুক্ত
৩০। প্রাগুক্ত
৩১। প্রাগুক্ত
৩২। আখবারে মক্কা, আল ফাকেহী
৩৩। প্রাাগুক্ত
৩৪। প্রাগুক্ত
৩৫। প্রাগুক্ত
৩৬। প্রাগুক্ত
৩৭। আখবারে মক্কা।
৩৮। প্রাগুক্ত
৩৯। প্রাগুক্ত

৫. মসজিদে হারাম

কুরআনে মসজিদে হারাম

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মসজিদে হারামের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একমাত্র সূরা বাকারার ৬ জায়গাতেই মসজিদে হারামের কথা উল্লেখ করেছেন।

١. قَدْنَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ـ (১৪৪)

٢. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

٣. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (১৪৯)

٤. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (১৯১)

٥. ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (১৯৬)

٦. وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ ـ (২১৭)

সূরা মায়েদার মধ্যে এসেছে ঃ اِنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ـ

সূরা আনফালে এসেছে ঃ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

সূরা তওবার তিন জায়গায় এসেছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَالْحَرَامَ ـ

সূরা বনি ইসরাইলে এসেছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ ـ

সূরা হজ্জে এসেছে ঃ

وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ ـ

সূরা আল-ফাতহের দু'জায়গায় এসেছে ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَالْحَرَامَ ـ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

মাওয়ারদী তাঁর আল-হাওরী কিতাবের 'জিযইয়া' অধ্যায়ে লিখেছেন, এক জায়গা ব্যতীত কুরআনে উল্লেখিত সকল জায়গায় 'মসজিদে হারাম' বলতে 'হারাম এলাকাকে' বুঝানো হয়েছে।

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (বাকারা-১৪৪)

এই আয়াতে শুধু মসজিদে হারাম বলতে কা'বা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটির অর্থ হচ্ছে ঃ "তোমরা মুখমণ্ডলকে মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।" ইবনে আবিস সাইফ আল-ইয়ামানী কুরআনের এই পনের জায়গার কথা উল্লেখ করে বলেন, এসকল আয়াতের কোনটিতে 'মসজিদে হারাম' বলতে 'কাবা' শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমন উপরোক্ত আয়াত। কোন আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলতে 'মক্কা'কে বুঝানো হয়েছে। যেমন ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ـ (বনি ইসরাইল-১)

অর্থ ঃ "সেই আল্লাহর জন্য পবিত্রতা যিনি তাঁর বান্দাহকে রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মি'রাজে নিয়ে গেছেন।" বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কে উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের ঘর থেকে মি'রাজে নেয়া হয়েছে, মসজিদ (হারাম) থেকে নয়। আবার কোন আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলতে গোটা 'হারাম এলাকা' কে বুঝানো হয়েছে। যেমন

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ـ (তাওবা-২৮)

অর্থ ঃ 'মোশরেকেরা অপবিত্র, তারা যেন (মসজিদে) হারামের নিকটে না যায়।' ইয়ামানী আরো বলেন, ইমাম নাসাঈ তাঁর হাদীসগ্রন্থে হযরত মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ

صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْكَعْبَةُ

অর্থ ঃ 'আমার এই মসজিদের নামায অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ উত্তম। তবে শুধু 'মসজিদে কা'বার নামাযের সওয়াব এর চেয়েও অনেক বেশী।'

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'মসজিদে কা'বা'র পরিবর্তে শুধু 'কা'বা' শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

'আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য মসজিদ অপেক্ষা ১ হাজার গুণ উত্তম।' (বোখারী, মুসলিম)

যে তিন মসজিদ যেয়ারতের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে তার মধ্যে মসজিদে হারাম হচ্ছে ১নং।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ الاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، اَلْمَسْجَدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى -

'তিন মসজিদ ব্যতীত অতিরিক্ত সওয়াবের উদ্দেশ্যে আর কোথাও সফর করা যায় না। সেগুলো হল, মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।' (বোখারী ও মুসলিম)

ইবনে মাজা'র এক রেওয়ায়েতে, মক্কায় নামাযের ফজীলত ১ লাখ গুণ বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মক্কার সকল মসজিদ ঐ ফজীলতের অন্তর্ভুক্ত।

হুদুদে হারামের ভেতরের অন্যান্য মসজিদগুলোর মর্যাদাও যে মসজিদে হারামের মত, তার প্রমাণ হচ্ছে ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় নবী করীম (সা) যখন নামায পড়তেন তখন হোদায়বিয়ার ময়দানে হারাম সীমানায় এগিয়ে যেতেন এবং নামায শেষে পুনরায় حل বা হারাম সীমানা বর্হিভূত এলাকায় ফিরে যেতেন ও অবস্থান করতেন।

ইনসাফ হচ্ছে এই যে, কুরআনে বর্ণিত 'মসজিদে হারাম' শব্দের ভেতর কা'বা, মক্কা এবং পুরো হারাম এলাকা, এই সব কটি অর্থই অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে সাধারণভাবে, মসজিদে হারাম বলতে সে মসজিদকেই বুঝায়, যার তওয়াফ করা হয়। কথিত আছে ঃ 'আমরা মসজিদে হারামে ছিলাম, মসজিদে হারাম থেকে বের হলাম, মসজিদে হারামে এ'তেকাফ করলাম এবং এতেই রাত্রি যাপন করলাম।' مساجد الحرم অর্থাৎ হারাম এলাকার বহু সংখ্যক মসজিদ থেকে المسجد الحرام 'মসজিদে হারামকে' পৃথক করা হয়েছে।

আযরাকী তাঁর 'আখবারে মক্কা' বইতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা

করেন ঃ আমরা আল্লাহর কুরআনে মসজিদে হারামের সীমানা হাযওয়ারা থেকে মাসআ' (সাঈ' করার জায়গা) পর্যন্ত দেখতে পাই।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস' বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মিত মসজিদের ভিত্তি হচ্ছে, হাযওয়ারা থেকে মাসআ তথা জিয়াদের বন্যার পানি সরার মুখ পর্যন্ত।

মসজিদে হারামের ইতিহাস

আইয়ামে জাহেলিয়াতে মসজিদে হারামের রূপ

হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ ছেলে ইসমাঈল (আ) কে নিয়ে কা'বা শরীফ তৈরির পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর ৫ম পূর্বপুরুষ কুসাই বিন কিলাবের হাতে মক্কার শাসনভার আসার আগ পর্যন্ত, মসজিদে হারাম বলতে শুধু কা'বা শরীফকেই বুঝানো হত। কিন্তু কুসাইর হাতে ক্ষমতা আসার পর তিনি কা'বা শরীফের চারদিকে প্রশস্ত কিছু জায়গা খালি রাখেন। সেই খালি জায়গাটুকুকেই তখন মসজিদে হারাম বলা হত। তখন কা'বার চারপাশে বৃহদাকারের ঘর-বাড়ী ছিল না এবং মসজিদে হারামের চার দিকেও সীমানা চিহ্নিতকারী কোন দেয়াল ছিল না।

ইতিপূর্বে, আমালিকা সম্প্রদায়, জোরহোম, খোযাআ' ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝে ঢালু পাদদেশে বাস করত। কাবার সম্মানে, তারা কা'বার পাশে কোন ঘর ও দেয়াল নির্মাণ করার সাহস করেনি।

কিন্তু কুসাই যখন খোযাআ' গোত্রের সাথে লড়াই করে মক্কার ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং কা'বার চাবি হস্তগত করেন, তখন তিনি কোরাইশদেরকে কা'বার চারপাশে ঘরবাড়ী তৈরী করার নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে কা'বা থেকে দূরবর্তী স্থানে বাস না করার জন্য হুকুম দেন। তারা নাপাক অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করত না এবং দিনে ছাড়া মক্কায় অবস্থান করত না। সন্ধ্যা হলে তারা হারাম এলাকার বাইরে চলে যায়। তখন কুসাই তাদেরকে বলেন, তোমরা কা'বার পার্শ্বে বাস করলে লোকেরা তোমাদেরকে ভয় করে শ্রদ্ধা করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই কিংবা তোমাদের জানমালের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে না। কুসাই প্রথমে উত্তর দিকে 'দারুন নাদওয়া' তৈরী করেন। তারপর তিনি অন্যান্য দিকগুলো কোরাইশদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

কোরইশরা কা'বার চারপাশে ঘর তৈরী করে এবং কা'বামুখী দরজা লাগায়। তওয়াফকারীদের তওয়াফের জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে দেয়া হল। প্রতি দুই ঘরের মাঝে রাস্তা নির্মাণ করা হল এবং মাতাফে আসার জন্য একটি দরজা রাখা হল। প্রত্যেক ঘর গোলাকৃতির ছিল, কোনটাই চারকোণ বিশিষ্ট ছিল না। যাতে করে চতুর্ভূজ বিশিষ্ট কা'বার সাথে তাদের ঘরের কোন সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়। তবে তারা কা'বার উচ্চতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু করে ঘর তৈরি করে। কা'বার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নীচু করে ঘর করায়, মক্কার প্রায় সকল দিক থেকে কা'বা শরীফ নজরে পড়ত। কা'বার পাশে যারা ঘর তৈরী করেছে তাদেরকে قريش البواطن 'অভ্যন্তরীণ কোরাইশ' বলা হত। কোরাইশদের বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের বাড়ী-ঘরও বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহর যুগে, মক্কার দুই পাহাড়ের ঢালু পাদদেশ পর্যন্ত তাদের ঘর-বাড়ী সম্প্রসারিত হয়।

আযরাকী, ফাসী, কুতুবুদ্দিন হানাফী এবং মক্কার অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ আইয়ামে জাহেলিয়াতের মসজিদে হারামের উপরোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহেলিয়াতের সময় মসজিদে হারামের কোন উল্লেখ ছিল না। কেননা, তখন নামায পড়ার বিধান ছিল না বলে তাদের মসজিদেরও দরকার হত না। জাহেলিয়াতের শুধু তওয়াফের প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে তারা সকাল সন্ধায় কাবার পার্শ্বে আসর জমাত এবং কাবার ছায়ায় বসত। এ সকল আসরে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাধারণ আলোচনা করত। ছায়া সরে গেলে কোরাইশরাও সরে যেত। মসজিদে হারাম তথা তওয়াফের স্থানটি তাদের জনসাধারণের সাধারণ কাউন্সিলের মত ব্যবহার হত এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ আলোচনা হত। তবে দারুন-নাদওয়া ছিল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী। বিশেষ শর্ত না পাওয়া গেলে, সেখানে কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না।

ইসলামের প্রথম যুগে মসজিদে হারামের রূপ

ইসলামের প্রথমদিকে মক্কার নওমুসলিমগণ মোশরেকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের ঘরে গোপনে নামায আদায় করত। এ অবস্থা দীর্ঘ তের বছর অর্থাৎ হিজরতের আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে খুবই নগণ্য সংখ্যক মুসলমান কাবার পার্শ্বে গিয়ে নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকর (রা) সহ গুটিকতক লোক সেখানে নামায পড়েছেন। নামায পড়ার কারণে

তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হয়। কোরাইশদের অত্যাচারে, অনেকে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা মদীনায় হিজরত করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)ও হিজরত করেন। তখন দুর্বল মুসলমানরা ব্যতীত কেউ মক্কায় ছিল না এবং মক্কা প্রায় মুসলমানশূন্য হয়ে গিয়েছিল। হিজরী ৮ সালে, মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মুসলমানরা মসজিদে হারামে নামায পড়ার সুযোগ পায়নি। মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে মুসলমানদের হিজরত বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন থেকে তারা মসজিদে হারামে প্রকাশ্যে নামায পড়া শুরু করে। মক্কার মুসলমানরা ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করে ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করায় এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাইরে অবস্থান করায়, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় এবং স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর খেলাফত আমলে মক্কায় তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল।

সেজন্য তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামাযের সংকুলান হয়ে যেত। তাই তখন মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকরের আমলেও তওয়াফের জন্য নির্ধারিত স্থানকেই মসজিদে হারাম বলা হত। পবিত্র কুরআন মজীদের ১৫ জায়গায় ঐ স্থানটুকুকেই মসজিদে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তখন মাতাফের (তওয়াফের স্থান) পূর্বদিকে যমযম কূপ ও বাব বনি শায়বা ছিল এবং বাকী তিনদিকের সীমানায় পূর্বে কিছু খুঁটি মওজুদ ছিল। বর্তমানে কোন চিহ্ন নেই। সম্ভবতঃ সে সকল দিকেও পূর্বদিকের সমান পরিমাণ জায়গা ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, মাতাফের চারপাশের স্তম্ভগুলো পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকর (রা) এর সময়ে, মসজিদে হারামের সীমানা ছিল। এ ব্যাপারে শাবরাখীতি 'শরহুল খলীল' নামক বইতে লিখেছেন যে, ঐ স্তম্ভগুলো বলতে মাতাফের সীমান্তে তামার পিলারগুলোকে বুঝায় যেগুলোতে বাতি রাখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেগুলোরও কোন অস্তিত্ব নেই। তাই সেই সময়ের মাতাফ তথা মসজিদে হারামের সঠিক সীমানা এবং আয়তন নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার।

মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ ও নির্মাণ

মসজিদে হারামের প্রথম সম্প্রসারণ : হযরত উমর (রা)

হিজরী ১৭ সালে, হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর থেকে হযরত উমর (রা)-এর আগ পর্যন্ত আর কেউ মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেননি।

মক্কার উচ্চভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে মসজিদে হারামের নিম্নভূমিতে 'উম্মে নহশল' নামক এক ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি হয় এবং বন্যার পানি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে মাকামে ইবরাহীমকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং পানি শুকানোর পর তা মক্কার নিম্নভূমিতে পাওয়া যায়। পরে তা সেখান থেকে এনে কাবা শরীফের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়। এই বন্যাকে 'উম্মে নহশল বন্যা' নামকরণের কারণ হল, এতে উম্মে নহশল বিনত ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আল-আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস মারা যায়।[১]

এই বন্যায় মাকামে ইবরাহীম স্থানচ্যুত হওয়ার খবর খলীফা উমরের কাছে পৌছার পর তিনি এটাকে ভয়াবহ সমস্যা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি ১৭ হিজরীর রমযান মাসে উমরাহর নিয়তে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মসজিদে হারামে ঢুকে মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহর কসম দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তির কাছে মাকামে ইবরাহীমের স্থানের সঠিক জ্ঞান আছে সে যেন তা প্রকাশ করে। তখন আবদুল মুত্তালিব বিন আবি ওদায়া' আস-সাহমী (রা) বলেন, 'হে আমীরুল মোমেনিন! এ বিষয়ে আমি সঠিক ওয়াকিফহাল। আমার একবার এরকম আশংকা হয়েছিল যে, কোন সময় যদি এরকম দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার সঠিক পরিমাপ হেফাজত করা দরকার হবে, তাই আমি মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান থেকে বাবুল কাবা এবং যমযমের দূরত্ব একটি রশি দ্বারা মেপে রাখি। সেই রশিটি আমার ঘরে মওজুদ আছে।' হযরত উমর বলেন, তুমি আমার কাছে বস এবং একজনকে রশিটি আনার জন্য পাঠিয়ে দাও। তিনি বসলেন এবং একজনকে পাঠিয়ে রশি আনালেন। পরে রশি দিয়ে মেপে তা পূর্বের যথার্থ স্থানে রাখলেন। আজকে আমরা যেখানে তা দেখছি এইটিই সেই স্থান। পরে মাকামে ইবরাহীমকে মজবুতভাবে সেখানে বসানো হয়।

আযরাকী এবং মাওয়ারদীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তবে সুয়ূতী তাঁর 'আওয়ায়েল কিতাবে' লিখেন যে, মাকামে ইবরাহীমকে পুনর্বহাল করার পর এর পেছনে সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা) নামায পড়েন।

মাকামে ইবরাহীমের পুনর্বহাল কাজ শেষ করার পর হযরত উমর মসজিদে হারাম তথা তওয়াফের নির্দিষ্ট স্থানে মুসল্লীদের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করেন। তাই তিনি মসজিদে হারামের নিকটবর্তী ঘরগুলো কিনে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেই সকল জায়গাকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে, মসজিদে হারাম পূর্বের চেয়ে বড় ও সম্প্রসারিত হয়। কিছু সংখ্যক ঘরের মালিক ঘর বিক্রি করতে এবং মূল্য নিতে অস্বীকার করায় হযরত উমর (রা) সেই সকল ঘরের মূল্য নির্ধারণ করে সেই অর্থ কাবার অর্থভাণ্ডারে রেখে দেন এবং বলেন ঃ "তোমরা কাবার আঙ্গিনায় এসেছ এবং ঘর বেঁধেছ, তোমরা এর মালিক নও; কিন্তু কাবা তোমাদের আঙ্গিনায় আসেনি।" তারা হযরত উমরের দৃঢ় সংকল্প দেখে পরে মূল্য গ্রহণ করে। এরপর হযরত উমর (রা) মসজিদে হারামের চার পার্শ্বে মাথা থেকে নীচু দেয়াল নির্মাণ করেন এবং পূর্বের ঘরগুলোর কাবামুখী দরজাসমূহ বরাবর দেয়ালের দরজা রাখেন। ঐ দেয়ালের উপর বাতি জ্বালানো হত। হযরত উমর ফারুক (রা) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করেন। তবে ঐতিহাসিকগণ হযরত উমর (রা) কি সংখ্যক ঘর কিনে ভেঙ্গেছিলেন তার সংখ্যা উল্লেখ করেননি।

মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের পর হযরত উমর ফারুক (রা) মসজিদে হারামের উপর দিয়ে প্রবাহিত সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম হাতে নেন। তিনি কাবা শরীফ থেকে আধা মাইল দূরে 'মোদ্দাআ' নামক স্থানে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। সেটি বনি জোমাহ গোত্রের এলাকায় ছিল বলে সেটাকে 'বনি জোমাহ বাঁধ' বলা হয়। সেই স্থানটি বেশ উঁচু ছিল এবং সেখান থেকে কা'বা শরীফ দেখা যেত। বাঁধ নির্মাণের আগে মোদ্দাআ' থেকে পানি মাসআর রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাবুস সালাম দরজা দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করত। বাঁধ নির্মাণের ফলে, লা'লা' পাহাড় এবং মোদ্দাআ'র নিকটবর্তী অন্যান্য পাহাড়ের পানি সোকুল লাইলের উপর দিয়ে ইবরাহীম উপত্যকার পানির নালার সাথে গিয়ে মিশে এবং উভয় স্রোত মসজিদে হারামের দক্ষিণ দিয়ে মেসফালার দিকে প্রবাহিত হয়। যার ফলে,

মসজিদে হারাম বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বড় বড় পাথর ও হাড় দিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয় এবং এর উপর মাটি ফেলা হয়। পরে বন্যায় কোন সময় এই বাঁধের ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। তবে ২০২ হিজরীর বিরাট বন্যা সেই বাঁধের কিছু বড় বড় পাথর খসিয়ে ফেলে। ঐটি মক্কার বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রথম বাঁধ ছিল।[২]

২য় সম্প্রসারণ ঃ হযরত উসমান (রা)

আল্লামা ফাসী তাঁর 'শিফাউল গারামে' হাফেজ নাজমুদ্দিন উমর বিন ফাহাদ কোরাশী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে, ইবনে জারীর, ইবনুল আসীর এবং ইয়াকুত হামাওয়ী তাঁর 'নগর অভিধানে' ২৬ হিজরীতে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আমলে মক্কার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদে হারামে নামাযীদের স্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন হযরত উসমান (রা) পার্শ্ববর্তী ঘরগুলো ক্রয় করে তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেই স্থানকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তিনি কি পরিমাণ ঘর মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন এর কোন সংখ্যা কোথাও উল্লেখ নেই। ঘরের মালিকরা তাঁর কাছ থেকেও মূল্য নিতে অস্বীকার করে। তখন তিনি বলেন, 'আমার ধৈর্য্য শক্তির কারণেই তোমরা এই দুঃসাহস দেখাচ্ছ নচেৎ হযরত উমরের সময় তো কেউ কোন উচ্চ-বাচ্চ করনি।' তারপর তিনি তাদেরকে আটক করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরে আবদুল্লাহ বিন খালেদ বিন উসাইদের সুফারিশক্রমে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

হযরত উসমান (রা) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেন। কেননা, তখন এতে কোন ছাদ কিংবা ছায়াদার অন্য কিছু ছিল না।[৩]

৩য় সম্প্রসারণ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা)

৬৫ হিজরীতে (৬৮৪ খৃঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের নিজ খেলাফতের সময় প্রথমে কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। তারপর তিনি মসজিদে হারামও নির্মাণ করেন। তিনি পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করেন এবং 'আখবারে মক্কার' লেখক আবুল ওয়ালীদের দাদার কয়েকটি ঘর ১৩ হাজারেরও বেশী দীনার দিয়ে ক্রয় করে তা মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মসজিদে হারামের ছাদ নির্মাণ করেন। তবে তিনি সম্পূর্ণ মসজিদে হারামের ছাদ করেছেন, না আংশিক ছাদ করেছেন তা জানা যায় না।

উমরী 'মাসালেকুল আবসার' বইতে লিখেছেন, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের হারাম শরীফে মার্বেল পাথর দিয়ে স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন। উমরী খুবই নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক। আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে যোবায়েরের সময় মসজিদে হারামের আয়তন ছিল ৯ জারীব। মাওয়ারদী, নবওয়ী এবং কালঈ বলেন, এক জারীব হচ্ছে ১০ বর্গ কাসবার সমান এবং এক কাসবা হচ্ছে ৬ গজ। এতে করে এক জারীব হচ্ছে ৩,৬০০ বর্গহাত। ফলে, ইবনে যোবায়ের নির্মিত মসজিদে হারামের আয়তন দাঁড়ায় ৩২,৪০০ বর্গহাত। এই আয়তন বর্তমান মসজিদে হারামের আয়তনের এক চতুর্থাংশ কিংবা সামান্য কিছু বেশী। তবে মসজিদে হারাম ঠিক কোন সালে তিনি নির্মাণ করেন, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা কোন কিছু উল্লেখ করেননি। ধারণা করা হয় যে, ৬৪ হিজরীতে কাবা শরীফ নির্মাণের পরের বছরই ৬৫ হিজরীতে সম্ভবতঃ তিনি মসজিদে হারাম নির্মাণ করেন। কেননা, কাবা ও মসজিদে হারাম মেনজানিক দ্বারা একই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

মসজিদে হারামের নির্মাণ ঃ আবদুল মালেক বিন মারওয়ান

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান, ৭৫ হিজরীতে, মসজিদে হারামের দেয়াল উঁচু করেন। টিন দ্বারা এর ছাদ দেন এবং প্রত্যেক খুঁটির মাথায় ৫০ মেসকাল সোনা লাগান। মজবুত ও সুন্দর কাঠ ছাদে লাগান। এ ছাড়া তিনি ইবনে যোবায়েরের সম্প্রসারণের বাইরে আর কিছু করেননি।

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের সময় মক্কার গভর্নর খালেদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসরী একই ইমামের পেছনে একই জামাতে কাবা শরীফের চতুর্দিকে ফরজ ও তারাবীহর নামায পড়ার পদ্ধতি চালু করেন। ইমাম নবওয়ী তাঁর হজ্জের উপর লেখা 'আল-ঈদাহ' গ্রন্থে এই কথা উল্লেখ করেন। কেননা, খালেদ লক্ষ্য করলেন যে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে শুধু একদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে নামাযীদের সংকুলান সম্ভবপর হচ্ছিল না। আতা বিন আবি রেবাহ এবং আমর বিন দীনারের মত অন্যান্য বড় বড় আলেমরা এটাকে অস্বীকার করেননি। এর আগে কাবার অবশিষ্ট তিন অংশে নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হত না, সেই দিকগুলো জামাতের সময় মুসল্লীশূন্য থাকত। খালেদ কাবার চতুর্দিকে নামাযের জামাতের কাতারবন্দীর যে ব্যবস্থা করলেন তা অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা। তাবেঈদের মধ্যে বড় বড় আলেমরা সবাই এটাকে সমর্থন করেছেন। যদি এই কাজ ইসলাম বিরোধী

হত, তাহলে উলামায়ে কেরাম অবশ্যই এর বিরোধিতা করতেন। সুয়ূতী এক বর্ণনায় বলেছেন, খালেদই প্রথম এই পদ্ধতি চালু করেন। কিন্তু সুয়ূতীর অপর এক বর্ণনায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই পদ্ধতির প্রবর্তক বলা হয়েছে। প্রথম মতটিই বেশী বিশুদ্ধ।

৪র্থ সম্প্রসারণ ঃ ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক বিন মারওয়ান

হিজরী ৯১ সালে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন এবং নিজের বাপের সংস্কারকর্মকে ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি মসজিদে হারামের মজবুত ইমারত নির্মাণ করেন এবং মিসর ও সিরিয়া থেকে মার্বেল পাথরের নির্মিত খুঁটি আনেন। কারুকার্য খচিত কাঠ দ্বারা তিনি মসজিদে হারামের ছাদ নির্মাণ করেন। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় সোনার চওড়া পাত লাগান, মসজিদে হারামের ভেতর মার্বেল পাথর লাগান, সৌন্দর্যের জন্য মাঝে মাঝে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করেন এবং দেয়ালের মধ্যে নকশা অংকন করেন। উঁচু দেয়ালের মাধ্যমে কিছুটা ছায়ার ব্যবস্থা হত, এ ছাড়াও ছায়াদানের জন্য উঁচু ছাতা নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদে হারামের শুধু পূর্বদিকেই সম্প্রসারণ করেছিলেন।

৫ম সম্প্রসারণ ঃ আবু জাফর মনসুর আব্বাসী

১৩৭ হিজরীতে, আবু জাফর মনসুর আব্বাসী মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করার জন্য মক্কার শাসককে আদেশ দেন। তিনি দারুন-নাদওয়া এবং বাবে ইবরাহীম থেকে বাবুল উমরার দিকে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করেন। দক্ষিণ দিকে, ইবরাহীম উপত্যকার পানির নালা থাকায় সেদিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করেননি এবং পূর্বদিকেও মসজিদ বাড়াননি।[৪]

আবু জাফর মনসুর উত্তর ও পশ্চিম দিকের ঘর-বাড়ীগুলো কিনে, সে যমীনগুলো মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। আবু জাফর মনসুরের পক্ষে যিয়াদ বিন ওবায়দুল্লাহ হারেসী মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন।

মনসুর উত্তর-পশ্চিম সম্প্রসারিত কোণে মিনারা তৈরির নির্দেশ দেন এবং সেখানে একটি মিনারা নির্মাণ করা হয়। তিনি পূর্বদিকে একটি ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেন। তিনি এই ছাতাটিকে কারুকার্য খচিত করেন এবং হিজরে ইসমাঈলে মার্বেল পাথর

লাগান। তিনিই সর্বপ্রথম এর বাইর, ভেতর এবং উপরে মার্বেল পাথর বসান। এই সম্প্রসারণ কাজে তিন বছর সময় লেগেছিল। যে বছর সম্প্রসারণ কাজ শেষ হয় সে বছর মনসুর হজ্জে আসেন। তাঁর আমলে মসজিদে হারাম পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ বড় করা হয়।

৬ষ্ঠ সম্প্রসারণ ঃ মুহাম্মদ আল-মাহদী আব্বাসী

আব্বাসী খলীফা মুহাম্মদ আল-মাহদী বিন আবু জাফর মনসুর ১৬০ হিজরীতে হজ্জে আসেন। তিনি মসজিদে হারামে মুসল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। হযরত উমর (রা) এর আমল থেকে আবু জাফর মনসুরের আমল পর্যন্ত যতটুকু সম্প্রসারণ হয়েছে, মুহাম্মদ মাহদীর আমলে একাই সেই পরিমাণ সম্প্রসারণ হয়েছে এবং তা ৯৭৯ হিজরী পর্যন্ত ৮১০ বছরব্যাপী বিদ্যমান ছিল।

মাহদী তিন কোটি ৫ লাখ দীনার হারামের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যয় করেন। তিনি মক্কার কাজী মুহাম্মাদ আওকাস বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান মাখযুমীকে মসজিদে হারামের উঁচু দিকের ঘরগুলো ক্রয় করে তা ধ্বংস করে দিতে এবং সেই যমীনগুলো মসজিদে হারামে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দেন। কাজী সে অনুযায়ী মসজিদে হারাম এবং মাসআর মাঝের সবগুলো ঘর কিনেন এবং বিভিন্ন হেবা ও ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলোর পরিবর্তে অন্যত্র জায়গা দিয়ে দেন। প্রতিগজ হুকুম-দখলকৃত যমীনের ক্ষতিপূরণ দেন ২৫ দীনার করে। পশ্চিম দিকেও সম্প্রসারণ করেন এবং নিম্নদিকের ঘরগুলো কিনে তা মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। প্রথমে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ করেন এবং পরবর্তীতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করেন। ১৬০ হিজরীতে প্রথম সম্প্রসারণ হয়। মাহদী ১৬৪ হিজরীতে ২য় বার হজ্জে আসেন এবং মুসল্লীদের স্থান সংকুলান না হওযায় তিনি পুনরায় মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। হিজরী ১৬৭ সালে ২য় সম্প্রসারণ শুরু হয়। কাবা শরীফকে মসজিদে হারামের মাঝামাঝি করার জন্য ২য় দফা মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু ১৬৯ হিজরীতে মাহদীর মৃত্যুতে তাঁর জীবদ্দশায়, সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়নি। তাঁর ছেলে খলীফা হাদী বিন মুহাম্মাদ মাহদী খলীফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁর বাপের অসমাপ্ত কাজ কিছু সমাপ্ত করেন। পরে মুসা আল হাদীর আমলে মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মাহদীর সম্প্রসারণের পর মসজিদে হারামের আয়তন দাঁড়ায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গহাত। মাহদী প্রথম দফা সম্প্রসারণের সময় মসজিদে হারামের পূর্ব ও পশ্চিমের ৪০৭ হাত দৈর্ঘ্য এবং ২য় দফা সম্প্রসারণের সময় দক্ষিণ দিকে ৯০ হাত প্রস্থ বাড়ান। দৈর্ঘ্য ৪০৭ হাতকে প্রস্থ ৯০ হাত দিয়ে পূরণ দিলে, মাহদীর সম্প্রসারণের আয়তন দাঁড়ায় ৩৬,৬৩০ বর্গহাত। প্রতি বর্গহাতের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ দীনার মূল্য দান করলে, মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১৫,৭৫০ দীনার। এই পরিমাণ অর্থ, তিনি ঘরের মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি হারামের উন্নয়নে বিরাট অংক ব্যয় করেন।

মাহদী সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে মসজিদে হারামের খুঁটির জন্য মার্বেলের তৈরি স্তম্ভ আনেন। তিনি নকশা করা কাঠ দিয়ে মসজিদে হারামের ছাদ নির্মাণ করেন। তিনি কাঠের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর ডিজাইন করান। এতেও তার বহু অর্থ ব্যয় হয়।

ইতিপূর্বে আবু জাফর মনসুর বাবুল উমরায় একটি মিনারা তৈরি করেন। পরবর্তীতে মাহদী বাবুস সালাম, বাবে আলী এবং বাবুল অদা' তথা হাযওয়ারায় তিনটি মিনারা নির্মাণ করেন। ফাসী গুরুত্বসহকারে মাহদীর মিনারা তৈরির তথ্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাজী বিন জোহাইরা কোন প্রমাণ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন যে, এই মিনারাগুলো পূর্বের নির্মিত। মাহদী শুধু সেগুলোর সংস্কার ও মেরামত করেন।

মো'তামেদ 'আলাল্লাহর নির্মাণ কাজ

২৭১ হিজরীতে আব্বাসী খলিফা আবু আহমদ বিন মোতায়াক্কাল 'আলাল্লাহ (বিন মোতাসেম বিল্লাহ বিন হারুনুর রশীদ) 'মোতামেদ আলাল্লাহ' উপাধি ধারণকারীর আমলে মসজিদে হারামের পশ্চিম দেয়ালে ফাটল ধরে। সেটি ছিল বাবুল খাইয়াতিন বরাবর। পার্শ্ববর্তী বাবে ইবরাহীম সংলগ্ন যোবায়দা বিনতে জাফর বিন মনসুরের ঘর ভেঙ্গে মসজিদে হারামের উপর এসে পড়ায় ছাদের কাঠ ভেঙ্গে যায় এবং দুটো স্তম্ভও নষ্ট হয়ে যায়। ছাদের নীচে পড়ে ১০ জন নেককার লোক মারা যায়। তখন মক্কার শাসক ছিলেন হারুন বিন মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং কাজী ছিলেন ইউসুফ বিন ইয়াকুব। হারুন বাগদাদে এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানালে, খলীফা মো'তামেদের ভাই মোয়াফফাক বিল্লাহ মসজিদে হারামের বিধ্বস্ত দেয়াল ও ছাদ নির্মাণের আদেশ দেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ পাঠান। আদেশ মুতাবিক ভগ্ন ছাদ এবং স্তম্ভ পুনঃনির্মাণ করা হয়। ২৭২ হিজরীতে ঐ নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

৭ম সম্প্রসারণ ঃ খলীফা মো'তাদেদ বিল্লাহ

২৮১ হিজরীতে, খলীফা মো'তাদেদ বিল্লাহ মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেন। খলীফা মাহদী কর্তৃক বর্গাকৃতির মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের বাইরে মাত্র আর দু'টো সম্প্রসারণ হয়। একটি হচ্ছে পশ্চিম দিকের বাবে ইবরাহীম বরাবর আর ২য়টি হচ্ছে উত্তর দিকের দারুন নাদওয়াহ। দারুন নাদওয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত পানির প্রবল স্রোতের কারণে সেখানে প্রায়ই ময়লা-আবর্জনা জমে থাকত এবং সর্বদা তা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হত। দারুন নাদওয়াহ উঁচু থাকায়, কাবা শরীফের ভিটি ও দেয়ালের উপর পানির চাপ বেশী পড়ত। খলীফা মোতাদেদ দারুন নাদওয়াকে খুঁড়ে এর সংলগ্ন দক্ষিণাংশের নিম্নভূমির সমান করে তাকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থও পাঠান। যাতে করে কাবার উপর বন্যার পানির চাপ কমে এবং দারুন নাদওয়ায়ও কোন ময়লা আবর্জনা না জমে। এ ছাড়াও এতে নামাযের জায়গার প্রশস্ততা বাড়বে। ৩ বছর যাবত এই সম্প্রসারণ কাজ চলে এবং ২৮৪ হিজরীতে তা সমাপ্ত হয়। ফলে বন্যার পানি পশ্চিমের নিম্নভূমির দিকে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় কাবা শরীফ নিরাপদ হয়ে উঠে।

খলীফা মোতাদেদের আমলে এই সম্প্রসারণ ছাড়াও মসজিদে হারামের সার্বিক মেরামত এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ করা হয়। দারুন নাদওয়ার মাটি কেটে মক্কার বাইরে ফেলা হয়। এইভাবে, কুসাই বিন কিলাবের প্রতিষ্ঠিত দারুন নাদওয়া মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যা ইসলামী যুগেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে ছিল।

৮ম সম্প্রসারণ ঃ খলীফা মোকতাদের বিল্লাহ

আব্বাসী খলীফা মোকতাদের বিল্লাহ বাবে ইবরাহীম সংলগ্ন অংশকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। ৩০৬ হিজরীর ঐ সম্প্রসারণ মসজিদে হারামে সর্বশেষ আব্বাসী সম্প্রসারণ। এরপর আব্বাসী আমলে আর কোন সম্প্রসারণ হয়নি।

সারাকেশা শাসকের মসজিদে হারাম নির্মাণ

আব্বাসী খলীফা মাহদী কর্তৃক মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের পর সুদীর্ঘ ৬৩৮ বছরের মধ্যে, সামান্য কিছু সংস্কার ও নির্মাণ কাজ ব্যতীত, মসজিদে হারামের ব্যাপক কোন উল্লেখযোগ্য নির্মাণ ও সংস্কার কাজ হয়নি। এই দীর্ঘ সময়টুকুকে মসজিদে হারামের ইতিহাসে একটি মহান যুগ বললে অত্যুক্তি হয় না।

৮০২ হিজরীর ২৮শে শাওয়াল, শনিবার রাতে, মসজিদে হারামের পশ্চিমাংশে বাবুল অদা এবং বাবে ইবরাহীমের মাঝে অবস্থিত রামাস্ত মুসাফিরখানায় আগুন ধরে। শেখ আবুল কাসেম ইবরাহীম বিন হোসাইন ফার্সী, ৫২৯ হিজরীতে, দরবেশদের উদ্দেশ্যে ঐ মুসাফিরখানাটি ওয়াক্ফ করেন। মুসাফিরখানার একজন লোক বাতি জ্বালিয়ে বাইরে গেলে, ইঁদুর এসে বাতির শলিতা (সুতার গোছা) টেনে কামরার বাইরে নিয়ে যায়। ফলে মুসাফিরখানায় আগুন ধরে এবং সেই আগুন মসজিদে হারামের ছাদে লাগে। ছাদ উঁচু হওয়ায়, লোকেরা কিছুতেই ছাদের আগুন নিভাবার ব্যবস্থা করতে পারল না। ছাদের পশ্চিমাংশ জ্বলে, আগুন এবার ছাদের উত্তরাংশেও ছড়িয়ে পড়ে। বাবুল আজালা পর্যন্ত পৌছে আগুন নিভে যায়। আল্লাহর কুদরতের ফলে, সেই বছর এক ভয়াবহ বন্যায় মসজিদে হারামের দুটো স্তম্ভ আগেই ধসে পড়ে। ফলে, ঐ বিধ্বস্ত ছাদে গিয়ে আগুন আর সামনে সম্প্রসারিত না হয়ে নিভে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে মসজিদে হারামে বিরাট ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি হয়।

৮০৩ হিজরীতে মিসরের আমীরে হজ্জ ইয়াসাক জাহেরী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসেন। হজ্জ শেষে তিনি থেকে যান এবং মসজিদে হারামের ময়লা আবর্জনা ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার অভিযান চালান। এরপর তিনি ক্ষতিগ্রস্ত স্তম্ভদ্বয় ও দেয়াল নির্মাণ করেন। তিনি প্রাথমিক নির্মাণ কাজ সেরে ৮০৫ হিজরীতে মিসর ফিরে যান।

সেই সময় মিসরে সারাকেশা শাসক নাসের যয়নুদ্দিন আবুস সায়াদাত ফারাজ বারকুকের শাসন বিদ্যমান ছিল। ইয়াসাক জাহেরী, নাসের যয়নুদ্দিনের অনুমোদনক্রমে, মসজিদে হারামের পশ্চিমাংশের পুড়ে যাওয়া ছাদ পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে ৮০৭ হিজরীতে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি মিসর থেকে প্রয়োজনীয় কাঠ এবং অন্যান্য সরঞ্জামও সাথে আনেন। তিনি ঐ বছরই অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করেন এবং মসজিদে হারামের উন্নয়নের জন্য আরো বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মসজিদে হারামে উল্লেখিত অগ্নিকাণ্ডের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে তা পরিষ্কার করা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশের পুনঃনির্মাণ করার কারণে লোকেরা ইয়াসাক জাহেরীর প্রশংসা করেন।

সুলতান কায়েতবায়ের নির্মাণ

মিসরের সুলতান সারাকেশা শাসক কায়েতবায় ৮৮২ হিজরীতে (১৪৭৭ খৃঃ) খাজা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমর শাহীর বাবন যামানকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান, তিনি যেন

সংগর জামালী বিল্ডিংকে মজবুত করে নির্মাণ, সুলতানের জন্য মসজিদে হারামে একটা স্থান উন্নত করে নির্মাণ, চার মাজহাবের আলেমদের ফেকাহ শাস্ত্র শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ, ফকীর-মিসকীনদের বাস করার জন্য একটি রাবাত বা বোর্ডিং নির্মাণ, গরীব ছাত্রদের মধ্যে আয় বন্টনের জন্য লাভজনক মুসাফিরখানা তৈরি এবং মিসকীনদের জন্য একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাসহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন।

খাজা শামসুদ্দিন সুলতানের নির্দেশমত উপরোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করেন। পরে সুলতান ছাত্রদের জন্য বহু কিতাবপত্র পাঠান এবং ৪ মাজহাবের ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করেন। ৮৭৪ হিজরীতে, সুলতান কায়েতবায় মিনার মসজিদে খায়ফ খুব মজবুত করে নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদে হারামের খেদমতের জন্য যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

তুর্কী সুলতান সোলায়মান নির্মাণ কাজ

৯৭২ হিজরী মোতাবেক ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে, তুরস্কের উসমানী খলীফাদের মধ্যে প্রথম যিনি মসজিদে হারামের সংস্কার করেন তিনি হচ্ছেন সুলতান সোলায়মান। তিনি নতুন করে কা'বা শরীফের ছাদ তৈরি করেন এবং মাতাফের বিছানা পরিবর্তন করেন। তিনি মসজিদে হারামের কিছু দরজার সংস্কার করেন, বাবুল কা'বার উন্নয়ন ও মীযাবেরও সংস্কার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মার্বেলের তৈরি মিম্বার আনেন। ইতিপূর্বের মিম্বারগুলো কাঠের নির্মিত ছিল। তিনি হানাফী ইমামের নামাযের জায়গা নির্মাণ করেন এবং পূর্বে বাবুস সালাম ও পশ্চিমে দারুন নাদওয়া বরাবর উত্তর পার্শ্বে, ৪ গম্বুজ বিশিষ্ট ৪টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ মাদ্রাসাগুলোর মাঝে তিনি সর্বোচ্চ মিনারা তৈরী করেন এবং কিছু মসজিদের পার্শ্বে কিছুসংখ্যক মুসাফিরখানা তৈরি করেন। ৪ মাদ্রাসায় ৪ মাজহাবের মক্কী আলেমরা শিক্ষা দান করতেন। মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে ভাতা দেয়া হত। সুলতান সোলায়মানের আমলে ঐ ৪টি মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর ছেলে সুলতান সেলিমের আমলে মাদ্রাসার কাজ সমাপ্ত হয়।

সুলতান সেলিমের মসজিদে হারাম নির্মাণ

আব্বাসী খলীফা মাহদী কর্তৃক ১৬৯ হিজরীতে মসজিদে হারামের যে নির্মাণ ও সম্প্রসারণ হয় তা ৯৭৯ হিজরী পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৮১০ বছর বহাল থাকে। তাঁর নির্মিত

ভিত্তিতে কোন দুর্বলতা দেখা দেয়নি এবং গোটা মসজিদে হারাম ৮০২ হিজরীর অগ্নিকাণ্ড ব্যতিরেকে, বন্যার মোকাবিলা, তাপ থেকে মুসল্লীদেরকে রক্ষা, বৃষ্টি ও ঝড় তুফান থেকে তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে হেফাজত করে যাচ্ছিল।

কিন্তু ৯৭৯ হিজরীতে, পূর্বদিকের ছায়াদার গম্বুজ কাবা শরীফের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয় এবং মসজিদের দেয়ালের উপর ছাদের কাঠ বেরিয়ে পড়ে। বাবুল আব্বাস এবং বাবুন নবীর মাঝে অবস্থিত, মসজিদের পূর্বাংশে নির্মিত সুলতান কায়েতবায়ের মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসায়ে আফদালিয়ার দেয়ালের বাইরে ছাদ বিছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, ছায়াদার গম্বুজের মাথা মসজিদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তা সংস্কারের সকল চেষ্টা নিরর্থক হয়ে পড়ে।

৯৭৯ হিজরীতে, এই ঘটনা সুলতান সেলিম বিন সোলায়মানের কাছে পৌছানোর পর সুলতানকে বলা হয় যে, কায়েতবায়ের নির্মিত মাদ্রাসার দেয়ালের কারণেই এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। মাহদীর নির্মিত মজবুত দেয়াল অক্ষুণ্ন আছে এবং এর কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। ঐ ঘটনা না ঘটলে, আজ পর্যন্ত হয়তো, মসজিদে হারামে খলীফা মাহদীর নির্মিত ছাদ, দেয়াল ও অন্যান্য কার্যক্রম অক্ষুণ্ন থাকত।
যাই হোক, সুলতান সেলিম ঐ খবর পেয়ে পুরো মসজিদে হারাম অত্যন্ত মজবুতি ও দক্ষতার সাথে নির্মাণের আদেশ দেন এবং কাঠের নির্মিত ছাদের পরিবর্তে গোলাকার গম্বুজ তৈরি করেন। এই গম্বুজ তাপ থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। সুলতান সেলিম মিসরের গভর্নর সানান পাশার কাছে মসজিদে হারাম নির্মাণের জন্য অত্যন্ত ধার্মিক, আমানতদার, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন লোক নির্বাচনের নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক, মিসরের সাবেক গভর্নর আহমদ বেগকে ঐ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়। তাঁকে মসজিদে হারাম নির্মাণের দায়িত্ব অর্পনের সাথে সাথে জেদ্দার গভর্নর বানিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ৯৭৯ হিজরীতে, মক্কায় পৌছেন এবং মসজিদে হারামের তত্ত্বাবধায়ক বদরুদ্দিন হোসাইনীর সাথে যথেষ্ট আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি ৯৮০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে, বাবুস সালামের অংশে, মাহদীর নির্মিত ইমারত ভাঙ্গা শুরু করেন। ৯৮০ হিজরীর ৬ই জুমাদাল উলায় বাবুস সালামের দিক থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আহমদ বেগ নিরলসভাবে মসজিদে হারামের পূর্ব ও উত্তর দিকের নতুন ইমারত তৈরি সম্পন্ন করেন। ঠিক সেই সময়ে সুলতান সেলিমের ইন্তেকাল হয়।

সুলতান মুরাদ কর্তৃক সুলতান সেলিমের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ

সুলতান সেলিমের মৃত্যুতে উদ্যমী আহমদ বেগ মোটেও বিচলিত হননি এবং হারাম শরীফের নির্মাণ কাজের উৎসাহেও তাঁর কোন ভাটা পড়েনি। তিনি কাজ অব্যাহত রাখেন।

সুলতান মুরাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর আহমদ বেগের কাছে নির্দেশ পাঠান, তিনি যেন সুলতান সেলিমের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। ফলে, ৯৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে, মসজিদে হারামের অবশিষ্ট দুটো দিক– দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। দীর্ঘ ৪ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মসজিদে হারামের নতুন ইমারত গড়ে উঠে যা আজ পর্যন্ত বহাল আছে। বর্তমান মসজিদে হারাম, সৌদী বাদশাহ আবদুল আযীয এবং সুলতান সেলিমের নির্মিত।

আল্লামা কুতুবুদ্দিন হানাফী তাঁর الاعلام বইতে এ সকল তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তিনি সেই যুগের সমসাময়িক বলে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, আহমদ বেগ আমাকে জানিয়েছেন, এই বিরাট নির্মাণ কাজে সরকারের ১ লাখ সোনার দীনার ব্যয় হয়েছে। মিশর থেকে মক্কায় নিয়ে আসা বিভিন্ন উপকরণ ও সরঞ্জামাদি এই হিসেবেরে অতিরিক্ত।

মসজিদে হারামের স্তম্ভ, গম্বুজ এবং দরজার সংখ্যা

সুলতান সেলিম এবং সুলতান মুরাদ খান কর্তৃক ৯৮৪ হিজরীতে, মসজিদে হারাম নির্মাণের আগ পর্যন্ত, এতে মোট ৪৯৬টি স্তম্ভ ছিল। পূর্বদিকে ৮৮টি ও উত্তরে ১০৪টি, দক্ষিণে ১৪০টি এবং পশ্চিমে ৮৭টি স্তম্ভ ছিল। তবে ৯৮৪ হিজরীর নির্মাণের পর, স্তম্ভের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১১টি। পূর্বদিকের ছাদে ৬২টি, উত্তর দিকে ৮১টি, পশ্চিম দিকে ৫৮টি এবং দক্ষিণ দিকে ৯০টি। দারুন নাদওয়ার সম্প্রসারিত অংশে ১৪টি এবং বাবে ইবরাহীমের সম্প্রসারিত দিকে ৬টি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। এই মিলে স্তম্ভ বা ছাদের খুঁটির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১১।

৯৮৪ হিজরীর নির্মাণের পর মসজিদে হারামের গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২ টিতে। এর মধ্যে পূর্বদিকে ২৪টি, উত্তরে ৩৬টি, হাযওয়ারার মিনারা সংলগ্ন ১টি এবং

দারুন নাদওয়ার সম্প্রসারিত অংশে ১৬টি। কুতুবুদ্দিন হানাফী তাঁর الإعلام বইতে এই সংখ্যা উল্লেখ করেন। কিন্তু হোসাইন আবদুল্লাহ বাসালামাহ তাঁর تاريخ عمارة المسجد الحرام বইতে লিখেন যে, আমি গুণে দেখেছি, পশ্চিমে ২৪টি, বাবে ইবরাহীমের সম্প্রসারিত অংশে ১৫টি এবং দক্ষিণ দিকে ৩৬টি গম্বুজ রয়েছে।

খলীফা মাহদীর নির্মিত মসজিদে হারামের দরজা সংখ্যা ১৯ এবং জানালা সংখ্যা ছিল ৩৮। এতে অবশ্য পূর্বের নির্মিত কিছু দরজা-জানালাও ছিল। প্রত্যেক দরজার মধ্যে কুরআনের আয়াত ও তা নির্মাণের সন তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ ছিল। অবশ্য পরবর্তীতে ঐ সকল দরজা-জানালার বহু পরিবর্তন হয়েছে।

সুলতান রাসাদের নির্মাণ কাজ

তুর্কী সুলতান মুহাম্মদ রাসাদ খান বিন সুলতান আবদুল মজীদ খানের আমলে, ২৩শে জিলহজ্জ ১৩২৭ হিজরীতে, মসজিদে হারামে এক বন্যা হয়। সেই বন্যাকে 'খাদইউ' বন্যা বলে। কেননা, সেই বছর মিসরের সাবেক খাদিউ আব্বাস হেলমী পাশা হজ্জ করতে আসেন। বন্যার পানিতে কাবার দরজার চৌকাঠ, হাজারে আসওয়াদ এবং হিজরে ইসমাঈল ডুবে যায় এবং মসজিদে হারাম একটি দীঘির রূপ ধারণ করে। একদিন ও একরাত পর্যন্ত পানি বিদ্যমান থাকে।

পানি সরে যাওয়ার পর তদানীন্তন মক্কার গভর্নর শরীফ হোসাইন বিন আলী, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমভিব্যহারে, মসজিদে হারামে ঢুকেন এবং বন্যার সাথে আসা স্তূপীকৃত ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন।

এই বন্যার ফলে, মসজিদে হারামের দেয়াল, মার্বেল পাথরের তৈরি স্তম্ভ ও ভিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যায় ২২টি স্তম্ভের ক্ষতি হয়। ১৩৩৪ হিজরীতে, সুলতান মুহাম্মদ রাসাদ খান হেজাযের গভর্নর এবং মসজিদে হারামের তদারককারী গালেব পাশাকে মসজিদে হারামের ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহের সংস্কারের নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহের সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ শুরু হয়।

শরীফ হোসাইন, ১৩৩৪ হিজরীর ৮ই শাবান (১১ জুন, ১৯১৬) হেজাযের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর সাথে হেজাযে অবস্থানকারী তুর্কীদের লড়াই হয় এবং লড়াইর কারণে হারামের সংস্কার বন্ধ থাকে। ১৩৩৮ হিজরীতে, বাদশাহ শরীফ

হোসাইন পুনরায় মসজিদে হারামের সংস্কারের নির্দেশ দেন। পরে অবশিষ্ট সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়।

৯ম সম্প্রসারণ ঃ সৌদী বাদশাহ্ আবদুল আযীয

আজ আমরা যে মসজিদে হারাম দেখছি, তা বহু পরিবর্তন ও সংস্কারের সিঁড়ি অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমান হারাম শরীফে তুর্কী সুলতান সেলিমের নির্মাণ কাজ ব্যতীত অতীতের অন্য কারো কর্ম ও স্মৃতি অবশিষ্ট নেই। মসজিদে হারামের বর্তমান ইমারতে, মাতাফ সংলগ্ন গম্বুজ বিশিষ্ট ৪ দিকের এক তলা বিল্ডিংটিই সুলতান সেলিম খানের নির্মাণস্মৃতি বহন করছে। পরবর্তী তিন তলা মসজিদ বাদশাহ্ আবদুল আযীযের সংস্কার ও সম্প্রসারণ।

১৩৪৪ হিজরীতে, হেজাযের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর বাদশাহ আবদুল আযীয মসজিদে হারামের প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। দেয়াল ও স্তম্ভের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করেন। ১৩৪৬ হিজরীতে, তিনি নিজের ব্যক্তিগত অর্থে, মসজিদে হারামের অবশিষ্ট সংস্কার কাজও সম্পন্ন করেন। ঐ সময় হাজীদের ছায়াতে নামায পড়ার জন্য কিছু ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেন। এতে ১০ হাজার লোকের নামায পড়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান হাজীদের প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য ব্যাপার। মসজিদে হারামে তখন মোট ৫০ হাজারের বেশী লোকের নামায পড়ার সংকুলান হত না। সবকিছু মিলিয়ে মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ এবং ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

তাই ১৩৬৮ হিজরীতে, বাদশাহ আবদুল আযীয মুসলিম বিশ্বের প্রতি মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। সে অনুযায়ী কাজ অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু, সম্প্রসারণের কাজ শুরুর আগেই, ১৩৭৩ হিঃ মোতাবেক ১৯৫৩ সালে, বাদশাহ আবদুল আযীয ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছেলে সউদ বিন আবদুল আযীয সৌদী আরবের বাদশাহ্ নিযুক্ত হন এবং তাঁর পিতা কর্তৃক মসজিদে হারামের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।

১৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে, মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ ও নির্মাণ কাজ তদারক করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ কমিটি গঠন করা হয়। বাদশাহ্ সউদ নিজে সেই কমিটির প্রথম বৈঠকে উপস্থিত হন। বৈঠকে সম্প্রসারণ কাজ শুরুর বিস্তারিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৩৭৫ হিজরীতেই সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়।

মসজিদে হারামের পবিত্রতার উপযোগী ডিজাইন এবং ইসলামী আর্কিটেকচারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সৌদী আরবের বিন লাদিন কোম্পানী এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং অন্যান্য কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত করে। পাকিস্তানী কনসালটেন্ট ইনিঞ্জনিয়ারিং ইউনিয়ন এই নির্মাণ কাজের প্রকৌশলগত দিক দেখাশুনা করে।

দীর্ঘ বিশ বছর পর, ১৩৯৬ হিজরীতে এই সম্প্রসারণ শেষ হয়। বেজমেন্টসহ তিন তলা মসজিদের আয়তন হচ্ছে ১ লাখ ৬০ হাজার ১৬৮ বর্গমিটার। এই সম্প্রসারণের আগে মসজিদে হারামের আয়তন ছিল ১৯ হাজার ১২৭ বর্গমিটার। এই সময় মসজিদে হারামের দেয়ালের ভেতর ও বাইরে মার্বেল পাথর লাগানো হয়। এতে ২ লাখ বর্গমিটার সাদা ও বিভিন্ন রং এর মার্বেল ও কৃত্রিম পাথর এবং ১ লাখ ৭৫ হাজার বর্গমিটার টাইলস লাগানো হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণের সময় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের পূর্ণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই সম্প্রসারণে, মোট ৬২১ মিলিয়ন ৬ লাখ ৪২ হাজার রিয়াল ব্যয় হয়। সম্প্রসারণের পর এতে ৪ লাখ লোক একসাথে নামায পড়তে পারে। সাফা পাহাড়ের উপর ছোট একটি মিনারাসহ এতে ৯০ মিটার উঁচু ৭টি মিনারা তৈরি করা হয়েছে। মাতাফকে আগের চেয়ে ৩শ' গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এতে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী সাদা মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে। ফলে, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তওয়াফের সময়ও মাতাফের পাথরগুলো ঠাণ্ডা থাকে। পূর্বে মাতাফে একসাথে সাড়ে তিন হাজার লোক তাওয়াফ করতে পারত। এই সম্প্রসারণের পর ৭ হাজার লোক একসাথে মাতাফে তওয়াফ করতে পারে।

মসজিদে হারাম নির্মাণের সময় সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঈ করার জায়গাকেও মসজিদের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাকে দোতালা করা হয়। ফলে, এখন দুই তলাতেই সাঈ করা যায়। ভিড়ের সময় তা বেশী উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। দোতালায় উঠার জন্য দুটো সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মসজিদে হারামের দোতালা দিয়েও এতে আসা যায়। মসজিদ ও মাসআকে একত্রীভূত করা হয়েছে। বর্তমানে ছাদের উপরও সাঈ' করা যায়।

মসজিদে হারামের দক্ষিণ পার্শ্বে, একতলার উপর এবং দোতলার নীচে আযানের স্থান নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে রেডিও-টেলিভিশনের যন্ত্রপাতিও বসানো হয়েছে। সেখান থেকেই রেডিও এবং টিভিতে হারাম শরীফের নামায প্রচার করা হয়।

মসজিদে হারামের উত্তর পার্শ্বেও দক্ষিণ পার্শ্বের আযান খানার মত আরেকটি স্থান বানানো হয়েছে। সেটিও নীচতলার উপর এবং দোতলার নীচে। মসজিদে হারামের নীচতলা থেকে দোতলার উচ্চতা অনেক বেশী যা সাধারণ বিল্ডিংগুলোর উচ্চতা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। লক্ষ লক্ষ মুসল্লীর স্বাস্থ্যগত দিক এবং হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজনকে সামনে রেখে দোতলাকে এত উঁচু করা হয়েছে।

মসজিদে হারামে, কয়েক হাজার পাখা এবং ৪ হাজার মাইক্রোফোন আছে যেগুলো ৩৫ হাজার মিটার তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। মসজিদে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ৫৫ হাজার ৩২২টি বিদ্যুত বাতি আছে, এর প্রত্যেকটি ২৫০০ ওয়াট সম্পন্ন, ১৩৬৪টি ঝাড়বাতি এবং ২১ হাজার বাল্ব আছে। দৈনিক মসজিদে হারামে মোট ৮ মেগাওয়াট শক্তির প্রয়োজন হয়। কেননা, বিদ্যুতের মাধ্যমে, বাতি, পাখা, মাইক, স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিঁড়ি, যমযমের পানির হিমাগার এবং অন্যান্য কাজে এই পরিমাণ বিদ্যুত খরচ হয়। নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের জন্য পৃথক বিদ্যুত জেনারেটর বসানো হয়েছে। মসজিদে হারামে সাধারণতঃ বিদ্যুত বিভ্রাট সংঘটিত হয় না। কচিৎ বিদ্যুত বিভ্রাট দেখা যায়। হজ্জ মওসুমে প্রচুর বিদ্যুত খরচ হয়। ১৪০৯ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৮ খৃঃ থেকে প্রতিবছর মক্কায় প্রায় ৯ লাখ ৪৮ হাজার, মিনায় ৮৬ হাজার এবং আরাফাতে ১৯ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুত খরচ হয়।

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের সংস্কার

১৪০৪ হিজরীতে, বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের আমলে, মসজিদে হারামের ২য় দফা সংস্কার হয়। তিনি মাতাফকে সম্প্রসারিত করেন এবং মাতাফে অবস্থিত অন্য সবকিছু সরিয়ে ফেলেন। ফলে মাতাফে একযোগে ২৮ হাজার লোক তওয়াফ করতে পারে। হাজারে আসওয়াদের কোণ নির্ধারণের জন্য, বড় আলেমদের মতামত অনুযায়ী, মাতাফের শেষ সীমানা পর্যন্ত ২০ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট কাল রং এর পাথর বসানো হয়েছে। আগে এই কোণের চিহ্ন কিছুটা পশ্চিমে, অর্থাৎ রোকনে ইয়ামানীর দিকে ছিল। পরবর্তীতে সেই চিহ্ন কিছুটা পূর্বদিকে সরিয়ে আনা হয় এবং হাজারে আসওয়াদের কোণ যথার্থভাবে নির্ণয় করা হয়। লোকেরা চিহ্নের উপর দাঁড়িয়ে ভিড় করায় তা নিশ্চিহ্ন করা হয়।

মসজিদে হারামে বর্তমানে ৬ হাজার ৫৫৮টি পাখা আছে। এর মধ্যে কতগুলো পাখা বেশী শক্তিশালী এবং সেগুলো বেশী ঠাণ্ডা বাতাস সরবরাহ করে। এছাড়াও মসজিদে হারামে ৪৫০টি ঘড়ি আছে। এর মধ্যে ২২৫টি ঘড়ি গ্রীনিচ মান অনুযায়ী সময় দেয়, আর অবশিষ্ট ২২৫টি ঘড়ি স্থানীয় আরবী সময় নির্দেশ করে। এগুলো একটা MASTER ঘড়ি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। MASTER ঘড়িটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। মসজিদে হারামের বাইরে ৬০ মিটার উঁচু ৩টি বড় ঘড়ি আছে। সেগুলো তিনটি ভাষায় সময় ঘোষণা করে।

সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাসআর নীচতলায় ২৮টি এয়ারকুলার দ্বারা গরমের সময় ঠাণ্ডা বাতাস সরবরাহ করা হয় যেন সাঈকারীদের আরাম হয়। ভিড়ের সময়, মাসআর ওপর থেকে আগত লোকদের মসজিদে পারাপারের জন্য ৬টি ওভারব্রীজ তৈরি করা হয়েছে। হজ্জ মওসুমে এগুলো খোলা হয়। এতে সাঈকারীরা বিনা বাধায় ভিড়ের সময় তাদের সাঈ শেষ করতে পারে।

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয, ১৪০৬ হিজরীতে ২৫ মিটার উপরে অবস্থিত মসজিদে হারামের ছাদ নামাযের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। এতে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী সাদা মার্বেল পাথর বসানো হয়। যার ফলে, মাতাফের মত প্রচণ্ড গরমের সময়ও ছাদের পাথর ঠাণ্ডা থাকে এবং মুসল্লীদের নামায পড়তে কোন কষ্ট হয় না। ছাদে ও দোতালায় সহজে উঠার জন্য স্বয়ংক্রিয় ৪টি বৈদ্যুতিক সিঁড়ি চালু করা হয়েছে। প্রতিঘন্টায় একটি সিঁড়ির পরিবহন ক্ষমতা হচ্ছে ৮ হাজার মুসল্লী। হজ্জ এবং রমযানের ভীষণ ভিড়ের সময় ছাদ ও স্বয়ংক্রিয় সিঁড়িগুলো ব্যবহার করা হয়। এতে অতিরিক্ত ৮০ হাজার মুসল্লীর নামাযের ব্যবস্থা হয়েছে। নারীদেরও ছাদে নামায পড়ার ব্যবস্থা আছে। ছাদকে নামাযের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ৩শ' মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক লোকদের দোতালায় উঠার জন্য বাবুস সাফায় ২টি, বাবে আবদুল আযীযে ১টি এবং অন্যদিকে আরো ৩টি বৈদ্যুতিক লিফট রয়েছে।

মসজিদে হারামের মাতাফ, হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানী বরাবর দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চলছে। কেননা, রমযান ও হজ্জের সময় ঐ দিকে প্রচণ্ড ভিড় হয় এবং

তওয়াফকারীদের সংকুলান হয় না। অপর দিকে, গরমের সময় গোটা মসজিদে হারামে এয়ারকণ্ডিশন চালু করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে। দোতালায় উঠার জন্য মাসআর ২টি সিঁড়িসহ সর্বমোট ১৩টি সাধারণ সিঁড়ি রয়েছে।

মসজিদে হারামের সব তলায় মূল্যবান কার্পেট বিছানো হয়েছে এবং প্রতিদিন তা পরিষ্কার করা হয়।

মসজিদে হারামের বর্তমান দরজা

মসজিদে হারামে বর্তমানে ৩৬টি দরজা আছে। ৩৬টি দরজার মধ্যে ৫টি দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকে এবং সেগুলো দিয়ে মসজিদে হারামে কোন লোক প্রবেশ কিংবা বের হয় না। এর মধ্যে তিনটা দরজা খুবই বড়। সেগুলো মসজিদে হারামের প্রধান দরজা। দরজাগুলোর নাম ও বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব-দক্ষিণ দিক ঃ ১। আযইয়াদ ২। বিলাল ৩। হোনাইন ৪। ইসমাঈল ৫। সাফা। এদিকে কোন দরজা নেই।

উত্তর-পূর্ব দিক ঃ ১। দারুল আরকাম ২। বনি হাশেম ৩। আলী ৪। আব্বাস ৫। আন-নবী ৬। আস সালাম ৭। বনি শায়বা ৮। হুজুন ৯। মোয়াল্লাহ ১০। মোদ্দাআ ১১। মারওয়া। এদিকেও কোন প্রধান দরজা নেই।

মারওয়া থেকে বাবুল ফাতহ এর মাঝে ৫টি দরজা পড়ে। এগুলো সর্বদা বন্ধ থাকে। শুধু বাবে কোরাইশ মাঝে মাঝে খোলা থাকে। এদিকের দরজাগুলোর নাম হচ্ছে ঃ ১। মুরাদ ২। মোহাসসাব ৩। আরাফাহ ৪। মিনা ৫। কোরাইশ।

পশ্চিম-উত্তর দিক ঃ ১। আল-ফাতহ, প্রধান দরজা। এটি উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ২। উমর ফারুক ৩। নাদওয়াহ ৪। শামীয়াহ ৫। আল কুদস ৬। মদীনা মোনাওয়ারা ৭। হোদায়বিয়া ৮। উমরাহ। এটি একটি প্রধান দরজা এবং তা উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঃ ১। শোবেকা ২। ইবরাহীম ৩। আবু বকর সিদ্দিক ৪। হিজরত ৫। আল-ওয়াদা ৬। উম্মেহানী ৭। বাবে আবদুল আযীয। এটি একটি প্রধান দরজা; এটি মসজিদে হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। তিনটি প্রধান দরজার মধ্যে এটি প্রধান সড়কের সাথে জড়িত হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেশী। এই দরজা দিয়ে সরকারী মেহমান ও বেশী সংখ্যক লোক প্রবেশ করে। নতুন সম্প্রসারণের

৯টি দরজাসহ মসজিদে হারামের মোট দরজার সংখ্যা হচ্ছে ৪৫টি।

মসজিদে হারামের দোতলায় আরো ৪টি দরজা আছে। একটি হচ্ছে, মারওয়া পাহাড়ের উপর। বাইরের পাহাড়ের উপর দিয়ে তৈরি উঁচু রাস্তার সাথে এই দরজাটি সংযুক্ত। ফলে বাইরে থেকে ঐ রাস্তা ও দরজা দিয়ে মুসল্লীরা সরাসরি দোতলায় প্রবেশ করতে পারে। অন্য একটি দরজা হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম দিকের দোতলার সাথে জড়িত। সেটিও পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে আসা পাহাড়ী রাস্তার সাথে সংযুক্ত। আরেকটি দরজা হচ্ছে, উত্তর-পশ্চিম দিকে বাবে উমরাহর সাথে। সেটিও বাইরের উঁচু পাহাড়ী রাস্তার সাথে সংযুক্ত। মুসল্লীরা এই দরজা দিয়েও সরাসরি দোতলায় প্রবেশ করে।

এছাড়াও নীচতলা থেকে দোতলায় উঠার জন্য মোট ৭টা সিঁড়ি আছে। পূর্বে দরজাগুলোর বিভিন্ন নাম ছিল এবং দরজার সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু মসজিদ সম্প্রসারণের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে দরজা বেড়েছে এবং সেগুলোর নতুন নতুন নামকরণ করা হয়েছে। অনেক দরজার নামও পরিবর্তন করা হয়েছে।

মসজিদের বর্তমান স্তম্ভ ও ভিঁটি

মসজিদে হারামে অনেক স্তম্ভ আছে। এগুলোর উপর প্রথম তলাও দোতলার ছাদ দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো মার্বেল পাথরের তৈরি কিংবা মোজাইক করা। সেগুলোর গোড়া এবং মাথায় আশ্চর্য ধরনের কারুকার্য করা হয়েছে। মসজিদে হারামের ভিঁটি বেশ উঁচু-নীচু। মাতাফ হচ্ছে সর্বনিম্ন এবং মাতাফের উপরে ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে উঁচু যমীন কেটে, সমান না করে, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

বেজম্যান্ট বা মাটির নীচের তলা

মাটির নীচতলার মসজিদের আয়তন ১ম তলা থেকে কম। ১ম তলার সৌদী সম্প্রসারণ বরাবর নীচে একতলা নির্মাণ করা হয়েছে। তাও মসজিদের তিন দিকে মাত্র। উত্তর-পূর্ব দিকে নয়। বর্তমানে নীচতলা বন্ধ, এতে কেউ নামায পড়ে না। রমযান ও হজ্জের সময় নামাযের জন্য তা খুলে দেয়া হয়।

১০ম সম্প্রসারণ ঃ বাদশাহ্ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয, ১৪০৯ হিজরীর ২রা সফর মোতাবেক ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, রোজ মঙ্গলবার মসজিদে হারামের ১০ম সম্প্রসারণ উদ্বোধন করেন। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক হাজীর আগমন এবং মসজিদে হারামে সংকুলানের
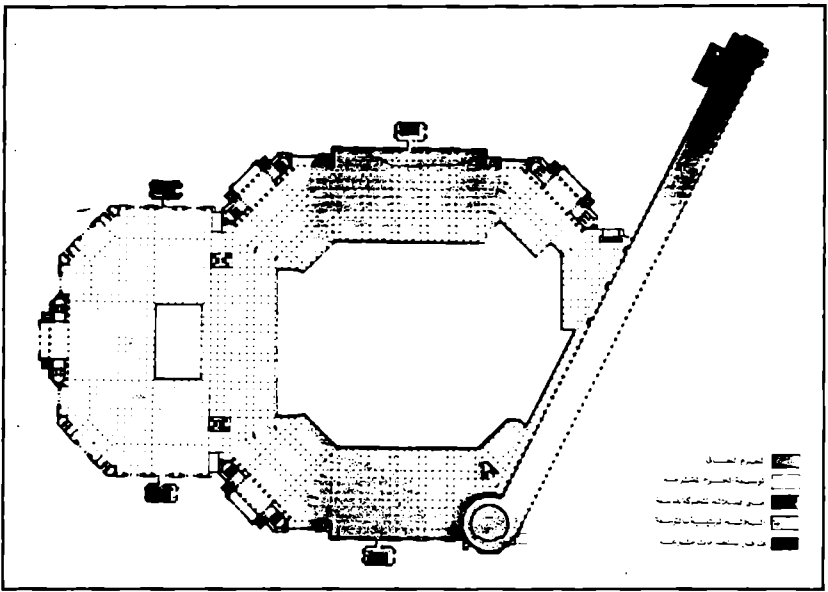
মসজিদে হারামের ১০ম সম্প্রসারণের ডিজাইন

অভাবে এই নতুন সম্প্রসারণের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়।

আগেই মসজিদে হারামের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'সোকে সগীর' নামক একটি বাজার ও পার্শ্ববর্তী ঘর ভেঙ্গে ২১ হাজার ৭৩০ বর্গমিটার জায়গা, ৬শ' মিলিয়ন রিয়াল ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমে হুকুমদখল করা হয়। এই জায়গাটি বাবুল মালেক আবদুল আযীয এবং বাবে উমরার মাঝে অবস্থিত। এই পরিকল্পনার আওতায়, মাটির নীচে একতলা এবং প্রথম ও দোতলা ইমারত নির্মাণের সাথে, মসজিদের ছাদকেও নামাযের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। মসজিদে হারামের বর্তমান ইমারতের সাথে হুবহু মিল রেখে এই নতুন ইমারত তৈরি করা হয় এবং এতেও ইসলামী কারুকার্যের মান রক্ষা করা হয়। এই সম্প্রসারিত অংশের মোট আয়তন হচ্ছে, ৭৬ হাজার বর্গমিটার। সম্প্রসারিত অংশের প্রতি তলায় ৪৯২টি স্তম্ভ আছে। এগুলোতে অন্যান্য স্তম্ভের মত মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে। নীচতলার স্তম্ভের উচ্চতা হচ্ছে, ৪.২০ মিটার এবং দোতলার স্তম্ভের উচ্চতা হচ্ছে ৪.৭০ মিটার। এতে অতিরিক্ত একলাখ চল্লিশ হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারে। মসজিদে হারামের ছাদের আয়তন হচ্ছে ১৭ হাজার বর্গমিটার। সোকে সগীরের অবশিষ্টাংশ

এবং সাফা-মারওয়ার পূর্বে মোট ৪০ হাজার মিটার আঙ্গিনা নির্মাণ করা হয় এবং এতে অতিরিক্ত আরও ৬৫ হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারে।

বর্তমান সম্প্রসারণ শেষে মসজিদে হারামের পুরো আয়তন দাঁড়ায় ৩ লাখ ৯ হাজার বর্গমিটার এবং এতে মোট ৬ লাখ ৫ হাজার মুসল্লী একসাথে নামাজ পড়তে পারে। এই নতুন সম্প্রসারণে ১৪টি সাধারণ দরজা এবং একটি প্রধান দরজা আছে। মাটির নীচতলার জন্য ২টি নতুন প্রবেশ পথ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মাটির নীচতলার জন্য আরও ৪টি প্রবেশ পথ রয়েছে। নতুন সম্প্রসারিত অংশে দুটো মিনারা তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটির উচ্চতা হচ্ছে ৮৯ মিটার। পূর্বের ৭টি মিনারাসহ মোট মিনারার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৯। মসজিদের ছাদে উঠার জন্য ২টি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। ১টি নতুন সম্প্রসারিত অংশের দক্ষিণে এবং অন্যটি উত্তরে নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি সিঁড়ি ঘন্টায় ১৫ হাজার লোক পরিবহন করতে সক্ষম। এছাড়াও সাধারণ সিঁড়ি রয়েছে। নতুন অংশে রেডিও-টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাইক্রোফোন আছে। এছাড়াও অন্যান্য সকল সেবা এবং সুযোগ সুবিধে পুরোপুরি বিদ্যমান আছে।

মসজিদে হারামের মিম্বার

জুমা ও ঈদের নামাযের খোতবা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারে উঠেছেন মর্মে হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন এবং মক্কার শাসকরা মক্কায় পায়ের উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দিয়েছেন, তাঁরা মিম্বার ব্যবহার করেননি। তাঁরা কাবা শরীফের দরজার সামনে কিংবা হিজরে ইসমাঈলে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। আযরাকী বলেন, মসজিদে হারামে সর্বপ্রথম হযরত মুয়াওবিয়া (রা) মিম্বার আনেন। তাঁর ছোট মিম্বারটি তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট ছিল। তিনি সিরিয়া থেকে হজ্জে আসার সময় ঐ মিম্বারটি সাথে আনেন।

এই মিম্বারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর খলিফা হারুনুর রশীদ হজ্জে আসার সময় সাথে একটি মিম্বার নিয়ে আসেন। এটা তাঁকে তাঁর মিসরের গভর্নর মুসা বিন ঈসা উপহার দিয়েছিলেন। পুরাতন মিম্বারটি আরাফাতের মসজিদে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং নতুনটি মসজিদে হারামে ব্যবহার করা হয়। পরে আব্বাসী খলিফা ওয়াসেক মক্কা, মিনা এবং আরাফাতের জন্য তিনটি মিম্বার তৈরি করেন।

ফাকেহী আযরাকীর বর্ণনার সাথে আরো একটু যোগ করে বলেন, আব্বাসী খলিফা মোনতাসের তাঁর পিতা মোতাওয়াক্কেলের আমলে মক্কায় হজ্জ করতে আসার সময় এক বিরাট মিম্বার তৈরী করে আনেন এবং এর উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দেন। পরে তা মসজিদে হারামের জন্য রেখে যান।

আল্লামা ফাসী বলেন, এরপর মসজিদে হারামের জন্য অনেকগুলো মিম্বার তৈরি করা হয়। আব্বাসী খলীফা মোকদীরের মন্ত্রী এক হাজার দীনার ব্যয়ে এক মূলবান মিম্বার মক্কায় পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল এর উপর খলীফা খুতবা দিবেন। কিন্তু মিসরীয়রা তা জ্বালিয়ে ফেলে এবং মিসরের শাসক মোস্তানসের ওবায়দীর নামে খুতবা পাঠ করে।

মিসরের শাসক আশরাফ শা'বানের আমলে ৭৬৬ হিজরীতে একটি মিম্বার তৈরি করে তা মক্কায় পাঠানো হয়। দীর্ঘ ৩১ বছর এর উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দেয়া হয়। এরপর মিসরের বাদশাহ জাহের বারকুক ৭৯৭ হিজরীতে আরেকটি মিম্বার পাঠান। ৮১৮ হিজরীতে মিসরের বাদশাহ মোয়াইয়েদ একটি মিম্বার পাঠান। অপরদিকে ৮১৫ হিজরীতে মিসরের বাদশাহ শেখু আরেকটি মিম্বার পাঠান। মিনায় এর উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দেয়া হয়। ৮৬৬ হিজরীতে মিসরের বাদশাহ খাসাকদম একটি

মিম্বার পাঠান। অপরদিকে ৮৭৭ হিজরীতে বাদশাহ্ আশরাফ কায়েতবায় জাহেরী কাঠের তৈরি একটি মিম্বার পাঠান। এরপর ৮৭৯ হিজরীতে মক্কায় কাঠের তৈরি আরেকটি মিম্বার আসে। এটাই মসজিদে হারামের সর্বশেষ কাঠের মিম্বার ছিল।

এরপর তুর্কী সুলতান সোলায়মান খান বিন সুলতান প্রথম সেলিম খান একটি মিম্বার তৈরি করে পাঠান। ৯৬৬ হিজরীতে সুলতান সোলায়মান সাদা উজ্জ্বল মার্বেল পাথর দিয়ে মিম্বারটি তৈরি করেন। এটি ১৩ সিঁড়ি বিশিষ্ট এক বিরাট মিম্বার। এর উপরে ৪ খুঁটির উপর কাঠের তৈরি গম্বুজে সোনালী প্রলেপ দেয়া হত। দেখতে মনে হয় এটি সোনার তৈরি। প্রায় ৫শ' বছর যাবত এর সোনালী রং বিবর্তন হয়নি। মাতাফ থেকে এর গম্বুজ ২০ হাত উঁচু ছিল। এতে সূর্যের আলো পৌছতে পারত না। এটি হারাম শরীফের সবচাইতে শানদার ও সুনিপুণ পদ্ধতির তৈরি মিম্বার ছিল। এটি এত মজবুত ছিল যে, এতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়নি। হযরত মুয়াওবিয়া (রা) সর্বপ্রথম মিম্বার স্থাপন করেন। তারপর এটি ছিল সর্বশেষ মিম্বার। তবে সৌদী শাসনামলে, ঐ মিম্বারের পরিবর্তন করে অন্য মিম্বার দেয়া হয়। বর্তমানে মসজিদে হারামের মিম্বারটিও বড়। মিম্বারের নীচে চাকা লাগানো আছে। খোতবার সময় মিম্বারকে মাকামে ইবরাহীমের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং খোতবা শেষ হলে, যমযমের সাথে পানি পানের জায়গার পার্শ্বে রেখে দেয়া হয়। হজ্জ ও রমযানের ভিড়ের সময় বাবুল কাবার সাথে মিম্বার লাগানো হয় এবং ইমাম সেখান থেকেই খোতবা দেন।

বর্তমান যুগে, প্রচণ্ড গরমের মওসুমে যখন বেশী ভিড় থাকে না তখন কাবার পূর্ব-দক্ষিণে, মাতাফের উপর আযানের স্থানের নীচে ছায়ার মধ্যে মিম্বার বসানো হয় এবং ইমাম এখান থেকেই খোতবা দেন।

অপরদিকে, কাবা শরীফের ভিটি বেশী উঁচু হওয়ার কারণে সিঁড়ি ছাড়া কাবার ভেতরে প্রবেশ করা যায় না। তাই কাবা শরীফের ভেতর উঠার উদ্দেশ্যে আরেকটি সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। সেই সিঁড়িটি কয়েকটি স্তর বিশিষ্ট। দরজার সাথে মিল করে তা তৈরি করা হয়েছে।

চার মাজহাবের নামাযের স্থানের বর্ণনা

মসজিদে হারামে ৪ মাজহাবের লোকদের পৃথক নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হত। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী এবং হাম্বলী মাজহাবের আলাদা আলাদা নামাযের জামাত

ছাড়াও শিয়া যায়েদীয়া সম্প্রদায়ের পৃথক নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হত। হিজরী ৪র্থ কিংবা ৫ম শতাব্দীতে মাজহাব ভিত্তিক পৃথক নামাযের জামাত পদ্ধতি চালু হয়।

আবুল হোসাইন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন যোবায়ের কানানী স্পেনী ৫৮৮ হিজরীতে তাঁর সফর-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে পৃথক নামাযের জামাতের এই বর্ণনা দেন।

শাফেঈ মাজহাবের অনুসারীরা মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায পড়তেন। মালেকী মাজহাবের অনুসারীরা রোকনে ইয়ামানী বরাবর নামায পড়তেন। হানাফী মাজহাবের অনুসারীরা মীযাব বরাবর হাতীমে কাবার দিকে নামায পড়তেন। এই মাজহাবের নামাযের জামাত সবচাইতে বড় এবং শানদার ছিল। কেননা, অনারব বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ হানাফী মাজহাবের অনুসারী। হাম্বলী মাজহাবের অনুসারীরা হাজারে আসওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামানী বরাবর নামায পড়তেন। তারা মালেকী মাজহারের লোকদের সাথে একই সময় নামায শুরু করতেন। শিয়া যায়েদীয়া মাজহাবের অনুসারীরা আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পর 'হাইয়া আলা খাইরিল আমল' এই বাক্যটি যোগ করত। তারা জোহরের নামায ৪ রাকাত পড়ত এবং সব মাজহাবের নামায শেষ হয়ে গেলে মাগরেবের নামায পড়ত। বর্তমানে, একই জামাতে সবাই নামায পড়ে এবং মাজহাব ভিত্তিক পৃথক জামাত পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে।

মাকামে ইবরাহীমের অর্থ ও তাৎপর্য

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

وَاِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى - (البقرة : ١٢٥)

অর্থ ঃ 'স্মরণ কর, আমরা যখন বাইতুল্লাহকে লোকদের জন্য কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে তৈরি করেছি এবং নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়।' আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে, মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা অনেক বেশী।

হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে ইসলামিয়ার জন্য দুটো অতি প্রাচীন নিদর্শন। মুসলিম উম্মাহ্ ছাড়া এ জাতীয় প্রাচীন নিদর্শন অন্য কোন জাতির নেই। এর একটিকে তওয়াফ শুরুর জায়গায় স্থাপন এবং অপরটির কাছে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে এগুলোকে চির স্মরণীয় করে দেয়া হয়েছে। তিরমিযী শরীফে আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ - طَمَسَ اللّٰهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْلَمْ يَطْمَسْ نُوْرَهُمَا لَاَضَاءَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের দুটো ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ্ এই দুটো পাথরের নূর মিটিয়ে দিয়েছেন। নূর না মিটালে, এগুলোর আলোতে পূর্ব থেকে পশ্চিম ভূখণ্ড পর্যন্ত আলোকোজ্জ্বল হয়ে যেত।'

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন, জিবরাঈল (আ) মাকামে ইবরাহীমকে নিয়ে এসে হযরত ইবরাহীম (আ) এর পায়ের নীচে রেখে দেন।

মাকামে ইবরাহীম বলতে কি বুঝায় সে বিষয়ে উলামায়ে কেরাম এবং মুফাসসেরীনদের মধ্যে মতভেদ আছে। বেশী নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে, কুরআনে মাকামে ইবরাহীম বলতে সেই ঐতিহাসিক পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যার উপর
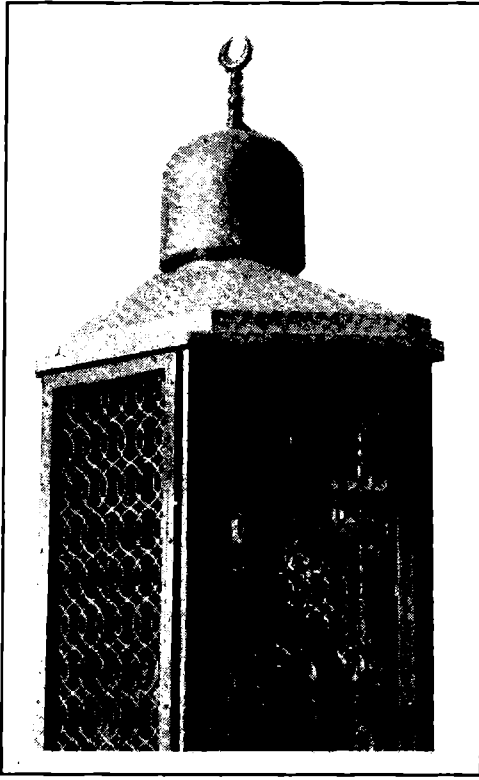
মাকামে ইবরাহীম

দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। তিনি যখন উপরে উঠতেন, পাথরটিও আল্লাহর কুদরতে উপরে উঠত। কেননা, দেয়ালের উঁচু অংশ তৈরির সময় তাকে উপরে উঠতে হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ) ইবরাহীম (আ) এর কাজে পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আ) নিজ হাতে সেই পাথর দেয়ালের উপর বসিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচু দেয়াল তৈরি করেন। একদিক শেষ হলে, অন্যদিকে যেতেন এবং বাকী দিকগুলোর দেয়াল নির্মাণ করার আগ পর্যন্ত পাথরটি ইবরাহীম (আ) কে নিয়ে কাবার চারপাশে চক্কর লাগাত। এটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ) এর প্রকাশ্য মো'জেযা। এই পাথরটি যেখানে রাখা হয়েছে তার কাছে নামায পড়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে জারীর তাবারী মুজাহিদ থেকে তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনে বর্ণিত 'মাকামে ইবরাহীম' বলতে 'গোটা হারাম এলাকাকে বুঝায়। তাবারী ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা বিন আবি রেবাহ এবং শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের মতে এর অর্থ হচ্ছে 'হজ্জের স্থানসমূহ।' হযরত উমর বিন খাত্তাব, জাবের বিন আবদুল্লাহ এবং ইবনে আব্বাসের অন্য এক রেওয়ায়েতে, কাতাদাহ ও সুদ্দীর মতে এই আয়াতে বর্ণিত মাকামে ইবরাহীম বলতে, কাবা নির্মাণের সময় ব্যবহৃত পাথরটাকেই বুঝানো হয়েছে।

এই কথার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হজ্জের ব্যাপারে জাবের বিন আবদুল্লাহর

বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ বহন করে। হাদীসটির অর্থ হচ্ছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তওয়াফ শেষ করেন, তখন উমর (রা) জিজ্ঞেস করেন, এটা কি আমাদের পিতার (ইবরাহীমের) মাকাম? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। তারপর উমর (রা) আবারও জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি এখানে নামায পড়বো না? তখন কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

অর্থঃ 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়।' (বাকারা ঃ ১২৫) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মাকামে ইবরাহীম বলতে, সেই ঐতিহাসিক পাথরটিকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাকামে ইবরাহীমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত উমর (রা)। তিনি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমাদের পিতা ইবরাহীমের মাকাম নয়? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। উমর আবারও প্রশ্ন করেন, আমরা কি এখানে নামায পড়বো না? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এ ব্যাপারে আমাকে কোন আদেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু সূর্যাস্তের আগেই তখন উপরাক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাজারে আসওয়াদে চুমু দিলেন। তারপর তওয়াফের প্রথম তিন চক্করের রমল করলেন এবং অবশিষ্ট ৪ চক্করে স্বাভাবিকভাবে চললেন। পরে মাকামে ইবরাহীমের কাছে এসে পড়লেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى। তারপর তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও কাবার মাঝখানে রেখে দু'রাকাত নামায পড়লেন।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর বলেন, আমি তিন বিষয়ে আমার রবের সাথে কিংবা আমার রব তিন বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়তেন! তখন ঐ আয়াতটি নাযিল হয় যে তোমরা মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়। এইটি একটা লম্বা হাদীসের অংশবিশেষ।

উপরোক্ত ৪টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাকামে ইবরাহীম বলতে সেই ঐতিহাসিক পাথরটিকেই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও ৫ম প্রমাণ হচ্ছে, আইয়ামে

জাহেলিয়াত থেকে ইসলামী যুগ পর্যন্ত এবং আজ পর্যন্তও মাকামে ইবরাহীম বলতে মক্কার লোকেরা ঐ পাথরটিকেই বুঝে থাকেন। ৬ষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের সাথে গোটা হারাম এলাকায় নামায পড়ার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। বরং এই পাথরের কাছে নামায পড়াই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ৭ম প্রমাণ হচ্ছে, তখনকার এই নরম পাথরটিতে হযরত ইবরাহীম (আ) এর পায়ের ছাপ লেগেছে। এজন্য এ পাথরটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর দিকে সম্বোধন করে মাকামে ইবরাহীম বলাটা বেশী যুক্তিযুক্ত। ৮ম প্রমাণ হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর দাঁড়িয়ে গোসল করেছেন বলে এক হাদীসে এসেছে। তাই এটিকে ইবরাহীম (আ) এর দাঁড়াবার স্থান বা মাকাম বলা হয়। কেননা, মাকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে দাঁড়াবার স্থান।
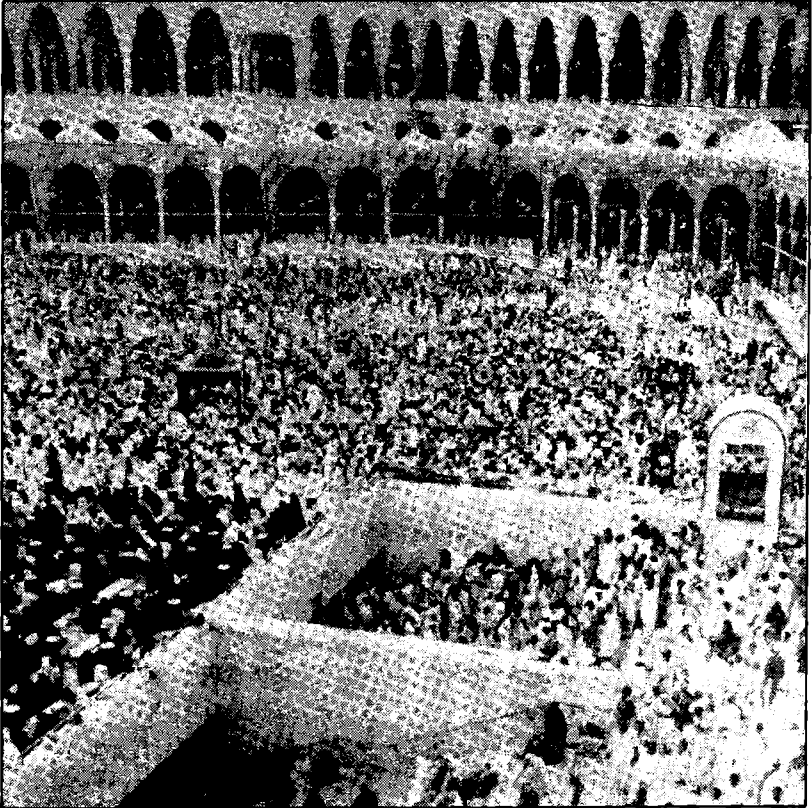
মাকামে ইবরাহীমের দৃশ্য

হযরত ইবরাহীম (আ) এই পাথরকে কি কাজে ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তিনি এর উপর নিজ মাথা ধুয়েছেন। কারুর মতে, তিনি এর উপর নিজ পা ধুয়েছেন। এইসব তথ্যের ভিত্তিতেও একে মাকামে ইবরাহীম বলা যায়। তবে তিনি এর উপর দাঁড়িয়ে যে কাবা নির্মাণ করেছেন এটিই বেশী নির্ভরযোগ্য। মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়তে হবে। সুন্নত হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম ও কাবা শরীফকে সামনে রেখে নামায পড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) এইভাবেই মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়েছেন। তবে হুবহু মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রাখতে হবে কিংবা সেই সোজা বরাবর পেছনে দাঁড়াতে হবে এটা জরুরী নয়। কেননা, মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি এত ছোট যে, একজন মুসল্লীও এর পেছনে হুবহু দাঁড়াতে পারেনা। তাই এর নিকটবর্তী জায়গায় নামায পড়লেই চলে। ভিড় থাকলে মসজিদে হারামের যে কোন জায়গায় তওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায পড়লেই চলে। এ ছাড়াও ৫ ওয়াক্ত নামাযের জামাতের সময় ইমাম সাহেবের মাকামে ইবরাহীমের পেছনেই দাঁড়ানো উত্তম। অবশ্য প্রয়োজনে, যেমন ভিড়ের কারণে, নামাযের জায়গা বৃদ্ধির জন্য মাকামে ইবরাহীমের সামনে অর্থাৎ কাবার দেয়ালের সাথে লেগে দাঁড়ালেও কোন আপত্তি নেই।

হযরত ইবরাহীম (আ) এর মো'জেযার কারণে, তাঁর পায়ের নীচের পাথরটি ভিজে এতে তাঁর পায়ের দাগ বসে যায়। কাবা তৈরির পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর পায়ের ছাপ এতে লেগে আছে। যদিও মানুষের মসেহ অর্থাৎ হাতের স্পর্শে যুগ যুগ ধরে এর আসল রূপ বা ছাপ অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ ৪ হাজার বছর পর্যন্ত কোন জিনিসকে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাতে স্পর্শ করলে, সেই জিনিসটি তার আসল রূপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকা মুশকিল। তামা ও আয়নার তৈরি বাক্সে রাখার আগ পর্যন্ত, মানুষ তা হাতে ধরে দেখত এবং তাতে হাত মুছে বরকত হাসিল করার চেষ্টা করত, যদিও এতে মসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং আদেশ দেয়া হয়েছিল এর পার্শ্বে বা পেছনে নামায পড়ার জন্য।

পূর্বের সকল দর্শকরাই এই পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আ) এর পায়ের দাগ বা চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। আবদুল্লাহ বিন ওহাব হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস বলেন, আমি মাকামে ইবরাহীমে হযরত ইবরাহীম

(আ) এর আঙ্গুল ও তাঁর পায়ের পাতার মর্ধবর্তী অংশের দাগ দেখেছি। কিন্তু মানুষের হাতের স্পর্শে ক্রমান্বয়ে তার চিহ্ন লোপ পেতে থাকে।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের মূর্তি ও পাথর পূজার সময়ে লোকেরা হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের পূজা করেনি। হারাম সীমানার ভেতরের পাথরের মর্যাদা তাদের কাছে অনেক বেশী ছিল। তারপরও তারা এই দুটো পাথরের পূজা না করায় বুঝা যায় যে, এগুলোর শাশ্বত ও চিরন্তন মর্যাদা অক্ষুণ্ন আছে এবং পাথর ও মূর্তিপূজার প্রভাব থেকে এ দুটো পাথর সম্পূর্ণ মুক্ত আছে। তাই, যারা অভিযোগ করে যে, এই দুটো পাথরের মর্যাদা দিয়ে ইসলাম পাথর ও মূর্তিপূজার সাথে কিছুটা আপোস করেছে, তাদের ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, স্বয়ং মূর্তিপূজার সময়ও এগুলোর পূজা না করে, প্রাচীনকাল থেকেই যখন এগুলোকে সম্মান করে আসা হচ্ছে, তখন ইসলাম তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মূর্তিপূজার সাথে তার আপোস করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) কে মাকামে ইবরাহীমের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেন, মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি বর্তমানে যা আছে তাই ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে বিশেষ নিদর্শন বানাতে চেয়েছেন। আল্লাহ যখন ইবরাহীম (আ) কে লোকদের প্রতি হজ্জের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দেন তখন তিনি এই পাথরের উপর দাঁড়ান। পাথরটি তাকে নিয়ে সর্বোচ্চ পাহাড়ের সমান উঁচুতে উঠে। তিনি বলেন, হে লোকেরা, তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও। লোকেরা সাড়া দিয়ে বলল لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ।

অর্থ ঃ 'আমরা হাজির। হে আল্লাহ! আমরা হাজির।' তখন পাথরটির উপর তাঁর পায়ের দাগ পড়ে যায়। তিনি ঐ কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর পাথরটিকে তাঁর সামনে রাখার জন্য নির্দেশ দেন এবং পাথরটিকে সামনে রেখে তিনি বাবুল কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়েন।[৫]

ইবনে জরীর হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইবরাহীম (আ) কাবা নির্মাণ শেষ করার পর আল্লাহ তাঁকে মানুষের প্রতি হজ্জে আসার আহ্বান জানানোর নির্দেশ দেন। তখন তিনি উঁচুতে উঠেন এবং বলেন, 'হে লোকেরা। তোমাদের রব তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরি

করেছেন, তোমরা সেই ঘরের হজ্জ কর এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।' মানুষ তখন বাপের পৃষ্ঠদেশ এবং মায়ের পেট থেকে সাড়া দিয়ে বলেছে, 'আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিলাম। হে আল্লাহ, আমরা হাজির।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আজ যারা হজ্জ করে তারা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ) এর ডাকে কম বেশী সাড়া প্রদানকারী।

ফাকেহী উল্লেখ করেছেন যে, বোরাইদা বলেন, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর ৪২ জন সাহাবীর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায পড়ছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। নামায শেষে তিনি নিজের ও কা'বার মাঝে অবস্থিত স্থান থেকে কিছু একটা ধরার উদ্দেশ্যে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে আসলেন, তাঁরা সবাই উঠে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে হাতের ইশারায় বললেন, তোমরা সবাই বস। তাঁরা সবাই বসলেন। নবী করীম (সা) প্রশ্ন করেন, আমি নামায শেষে আমার ও কাবার মাঝখানের স্থান থেকে কিছু একটা ধরার জন্য ঝুঁকেছিলাম, তা কি তোমরা দেখেছ? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার সামনে বেহেশত পেশ করা হয়েছিল। আমি এতে এমন কল্যাণ, সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্যজনক জিনিসসমূহ দেখেছি, যা আর কোথাও দেখিনি। আমার পাশ দিয়ে এমন একটি সুন্দর আঙ্গুরের ছড়া অতিক্রম করেছে যা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি তা ধরার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু তা আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল। যদি আমি তা ধরতে পারতাম তাহলে তোমাদের সামনে আমি তা মাটিতে পুতে চাষ করতাম এবং তোমরা বেহেশতের ফল খেতে পারতে।(৬)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা ও গুরুত্ব কত বেশী তা ফুটে উঠেছে।

মাকামে ইবরাহীমের পাথরের বর্ণনা

মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি নরম এবং জলীয় পদার্থপূর্ণ পাথরশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তা কঠিন পাথরশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে লোহা দিয়ে আঘাত দিলে আগুন বের হয়। পাথরটি বর্গাকৃতির এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় একহাত।

মক্কার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হোসাইন বা সালামাহ বলেন, 'আমি ১৩৩২ হিজরীতে কাবা শরীফের চাবিরক্ষক মুহাম্মাদ সালেহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মাদ শায়বীর বিশেষ

অনুমতিক্রমে তাঁর সাথে মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি দেখি। সেটি রূপার তৈরি বিশেষ কেসের মধ্যে রাখা হয়েছে। পাথরটি বর্গাকৃতির, এর রং সাদা-কাল ও হলুদ রং মিশ্রিত। আমি এতে হযরত ইবরাহীম (আ) এর পায়ের চিহ্ন দেখতে পাই।'(৭)

পাথরের মাঝখানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর দুই পায়ের চিহ্ন রয়েছে। এতে ডিম্বাকৃতির গর্ত আছে। মানুষের হাতের স্পর্শে এবং যমযমের পানি দিয়ে ধোয়াতে ঐ গর্তটি সৃষ্টি হয়। অধিক পরিমাণে মানুষের হাতের স্পর্শে পায়ের চিহ্নের জায়গাটি গর্তে রূপান্তরিত হয়।

মক্কার আরেকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শেখ তাহের কুর্দী সর্বশেষ নিজ চোখে ঐ পাথরটি দেখেন। তাঁর উদ্দেশ্যে মাকামে ইবরাহীমের কেস খোলা হয়। তিনি ভেতরে যা দেখতে পান তা হচ্ছে এই ঃ

মাকামে ইবরাহীমের পাথরটিকে মার্বেল পাথরের তৈরি একটি ছোট পাকা ভিত্তির উপর রাখা হয়েছে। মার্বেল নির্মিত পাকা ভিত্তিটির আয়তন, পাথরের আয়তনের সমান। এর উচ্চতা হচ্ছে ১৩ সেন্টিমিটার। পাথরটিকে রূপা দিয়ে পাকা ভিত্তির সাথে মজবুত করে বসানো হয়েছে।

ছোট পাকা মজবুত ভিত্তিটুকু আবার চতুর্দিকে মার্বেল পাথর নির্মিত বড় পাকা ভিত্তির মাঝে অবস্থিত। বড় ভিত্তিটির চারদিকের দৈর্ঘ্য এক মিটার। যমীন থেকে এর উচ্চতা হচ্ছে ৩৬ সেন্টিমিটার। এর মারবেল পাথর দু'টোর রং হচ্ছে সাদা। ঐ বড় ভিত্তিটির চতুর্দিকে, মাথা সমান উঁচু চার কোণ বিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির একটি বাক্স ছিল। কোন জানালা ছিল না। তবে এর রং হলুদ ও লালের মাঝামাঝি এবং কিছুটা সাদা রং মুখী।

মাকামে ইবরাহীমের পাথরের আকৃতি ঘনত্বপূর্ণ। এর উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার। উপরের দিক থেকে তিন বাহুর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৬ সেন্টিমিটার এবং ৪র্থ বাহুটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৮ সেন্টিমিটার। উপরের দিক থেকে এর আয়তন ১৪৬ সেন্টিমিটার এবং নীচের দিকটা উপরের দিকের চাইতে কিছুটা চেপ্টা। ফলে, নীচের দিকের আয়তন হচ্ছে ১৫০ সেন্টিমিটার। এটি শক্ত পাথর নয়। যে কোন দুর্বল লোকও পাথরটি বহন করতে পারবে। এর ওজন কম।

পাথরটিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের দাগের গভীরতা, পাথরটির উচ্চতার অর্ধেক পরিমাণ। একটি পায়ের দাগের গভীরতা হচ্ছে ৯ সেন্টিমিটার। আমরা এতে

আঙ্গুলের কোন চিহ্ন দেখিনি। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ায় এবং এর উপর মানুষের হাতের স্পর্শে পায়ের আঙ্গুলের চিহ্নগুলো মুছে গেছে। পায়ের গোড়ালীর চিহ্ন তেমন একটা বুঝা যায় না। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে তা বুঝা যায়।

পাথর ও রূপার উপর দিয়ে প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৭ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১৪ সেন্টিমিটার। পাথরের নীচের অংশে রূপাসহ প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১১ সেন্টিমিটার। দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে প্রায় এক সেন্টিমিটার। বরকতের উদ্দেশ্যে লোকদের হাতের অধিক স্পর্শে এ ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। হাতের স্পর্শের কারণে উপর থেকে পায়ের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দীর্ঘায়িত হয়েছে। দীর্ঘ ৪ হাজার বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মাকামে ইবরাহীমে এখন পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন অপরিবর্তিত রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা, আল্লাহ একে স্থায়ী নিদর্শন হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সেই আয়াতটি হচ্ছে ঃ

فِيهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ -

অর্থ ঃ 'এতে মাকামে ইবরাহীমের সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।'

মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি রূপা দ্বারা মোড়ানো। প্রকৃত পাথরটির সব অংশ দেখা যায় না। শুধু ভেতরে পায়ের গর্ত এবং দুই পায়ের পাশ দেখা যায়। তবে দুই পায়ের নীচ সমতল নয়। এতে কিছু ছোট ছোট উঁচু অংশ আছে।

এই পাথরটি তামার তৈরি একটি বর্গাকৃতির বেষ্টনীর মধ্যে, ৪ খুটির উপর নির্মিত একটি গম্বুজের নীচে ছিল। ঐটির আয়তন ছিল ৩×৬ মিটার।" (৮)

তাহের কুর্দীর ঐ বর্ণনা বেশ দীর্ঘ। ৫৭৮ হিজরীতে, স্পেনের ইবনে যোবায়ের মক্কায় হজ্জ করতে এসে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মাকামে ইবরাহীমের পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ) এর আঙ্গুল ও পায়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি আরো বলেন, পাথরটি রূপা দ্বারা মোড়ানো এবং পাথরের উপরের অংশ নীচের অংশের চেয়ে চওড়া।(৯)

মাকামে ইবরাহীমের সংরক্ষণ

১৬০ হিজরীতে, খলীফা মুহাম্মাদ মাহদী হজ্জে আসেন। তিনি যখন দারুন নাদওয়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর কাছে দুপুরে নিরিবিলি সময়ে ওবায়দুল্লাহ বিন ইবরাহীম হাজাবী উপস্থিত হন এবং তাঁকে মাকামে ইবরহীমের পাথরটি দেখান।

মাহদী এতে খুশী হন। তিনি এতে চুমু দেন, মসেহ করেন, পানি ঢালেন, সেই পানি পান করেন, নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে দিয়েও তা স্পর্শ করান এবং সবাই ঐ পানি পান করে। তারপর সেই পাথরটি পুনরায় মাকামে ইবরাহীমের স্থানে ফেরত পাঠান। মাহদী ওবায়দুল্লাহকে বিরাট পুরস্কার এবং নাখলা উপত্যকায় অনেক যমীন দেন। পরে ঐ যমীন বিক্রি করে তিনি ৭ হাজার দীনার লাভ করেন।

১৬১ হিজরীতে, কাবার খাদেম খলীফা মাহদীকে লেখেন যে, আমরা মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি ভেঙ্গে গিয়ে নষ্ট হওয়ার আশংকা করছি। খলীফা মাহদী ১ হাজার দীনার পাঠান। তখন পাথরটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রূপা দিয়ে মজবুত করে মোড়ানো হয়। খলীফা মাহদীই সর্বপ্রথম মাকামে ইবরাহীমের পাথরটিকে রূপা দিয়ে মজবুত করে মুড়িয়ে দেন। এর আগে পাথরটি প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হত।

খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে, ১৭৯ হিজরীতে দেখা গেল যে, মাকামে ইবরাহীমের পাথরে বাঁধানো রূপা নড়বড়ে হয়ে গেছে। তখন পুনরায় মজবুত করে রূপা দিয়ে পাথরটি মোড়ানো হয়। তারপর ২৩৬ হিজরীতে, খলীফা মোতাওয়াক্কেল আব্বাসী রূপার উপর পুনরায় ৮ হাজার মেসকাল সোনা এবং রূপার ৭০ হাজার দেরহাম দিয়ে তা মোড়ান ও মজবুত করে বসিয়ে দেন। তারপর, মক্কার গভর্নর জাফর বিন ফদল এবং মুহাম্মাদ বিন হাতেম, মোতাওয়াক্কেলের মোড়ানো ও লাগানো সোনা-রূপাগুলো ২৫১ হিজরীতে খুলে মক্কায় ফেতনা সৃষ্টিকারী ইসমাঈল বিন ইউসুফ আলাওয়ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করে। ২৫৬ হিজরী পর্যন্ত খলীফা মাহদী কর্তৃক মোড়ানো রূপা দ্বারা মাকামে ইবরাহীম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২৫৬ হিজরীতে, কাবার সেবক, মক্কার গভর্নর আলী বিন হাসান আব্বাসীকে বলেন, মাকামে ইবরাহীমের অবস্থানের মজবুতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পাথরটি নষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই একে মজবুত করে মুড়িয়ে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। গভর্নর ঐ আহ্বানে সাড়া দেন এবং ১৯৯২ মেসকাল সোনা দিয়ে একটি বেষ্টনী ও আরেকটি রূপার বেষ্টনী তৈরি করেন। তারপর পাথরটিকে মজবুত করে লাগান ও মাকামে ইবরাহীমে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফাসী বলেন, এখন মাকামে ইবরাহীম পাথর খোদাইকৃত সরু ৪ খুঁটির উপর নির্মিত কাঠের তৈরি উঁচু একটি গম্বুজের নীচে অবস্থিত। এতে লোহার তৈরি ৪টি

জানালা ছিল। এবং প্রতি দুটো খুঁটির মাঝে একটি করে জানালা অবস্থিত ছিল। পূর্বদিকে ছিল ভেতরে প্রবেশ করার দরজা। গম্বুজটির ভেতরে সোনা এবং উপরে অন্যান্য কারুকার্য ছিল। উপরে সাদা রং এর প্রলেপ ছিল।

৮১০ হিজরীতে, মিসরের বাদশাহ নাসের ফারাজ মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামাযের স্থানে একটি ৪ পা বিশিষ্ট ছায়াদার গম্বুজ তৈরি করেন। এর নীচে সোনা এবং উপরে সাদা প্রলেপ দেন। মাকামে ইবরাহীমের জন্য দুটো গম্বুজ ছিল। একটি কাঠের এবং অন্যটি লোহার তৈরি। হজ্জের ভিড়ের সময় লোহার তৈরি গম্বুজটি ব্যবহার করা হত। কেননা, ভিড়ের সময় লোহার তৈরি গম্বুজটি মাকামে ইবরাহীমের হেফাজতের জন্য বেশী উপযোগী।

৫৭৯ হিজরীতে, স্পেনের ইবনে যোবায়ের মক্কায় হজ্জ শেষে তাঁর বইতে লেখেন যে, মাকামে ইবরাহীম সর্বদা তার নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না। এক সময় মাকামে ইবরাহীম তার সুনির্দিষ্ট স্থানে থাকে, অন্য সময় কাবার ভেতরে ছাদে উঠার সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে রাখা হয়। আজকাল, এর উপর কাঠের তৈরি একটি গম্বুজ আছে। হজ্জ মওসুমে কাঠের গম্বুজটি খুলে ফেলা হয় এবং লোহার গম্বুজটি লাগানো হয়। ফাসী বলেন, কবে মাকামে ইবরাহীমকে তার নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসানো হয় তা জানা যায় না।

৯০০ হিজরী এবং ৯১৫ হিজরীতে, খাজা মুহাম্মদ বিন এবাদুল্লাহ রুমী মাকামে ইবরাহীমের গম্বুজ পুনর্নির্মাণ করেন এবং গম্বুজে অনেক সোনা লাগান। এছাড়াও গম্বুজের খুঁটি এবং কাঠের মধ্যেও সোনা লাগান।

হিজরী ১,০০০ সালে, শরীফ সুলতানের নির্দেশক্রমে, শেখ আলী আল-খালাওতী মাকামে ইবরাহীমের ছাদ নষ্ট হতে দেখেন। তিনি ১০০১ হিজরীতে ছাদের সকল কাঠ পরিবর্তন করে এর সংস্কার করেন।

সানজারী উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান মুরাদ বিন আহমদ খানের নির্দেশক্রমে, ১০৪৯ হিজরীতে, মাকামে ইবরাহীম পুনর্নির্মাণ করা হয়, এতে সোনার নকশা এবং বিভিন্ন রং এর প্রলেপ দেয়া হয়। মক্কা ও জেদ্দার গভর্নর সোলায়মান বেগ, আগা মুহাম্মদ কুযলারের খরচে ঐটি নির্মাণ করেন।

১০৭২ হিজরীতে, সুলতান মুহম্মাদ বিন ইবরাহীম খানের নির্দেশক্রমে, মাকামে ইবরাহীমের পুনরায় সংস্কার করা হয়। ১০৯৯ হিজরীতে, মুহাম্মদ বেগ মাকামে ইবরাহীমের উপরিভাগ সংস্কার করেন। ১১১২ হিজরীতে, ইবরাহীম বেগ মাকামে

ইবরাহীমের সকল নির্মাণ কাজ ভেঙ্গে ফেলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের স্থানটি মার্বেল পাথর দ্বারা তৈরি করেন। তিনি রূপা ও পাথরের মাঝখানে শীশা ঢেলে, রূপাকে আরো মজবুত করেন এবং পাথরটিকে মজবুত করে আটকিয়ে দেন। কাঠের তৈরি গম্বুজ পরিবর্তন করেন, রূপা সরিয়ে ফেলেন এবং সোনালী পাত ও রং দিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করেন।

১১৩৩ হিজরীতে, মুহাম্মাদ আফেন্দী, মাকামে ইবরাহীমের পাথরের বাক্সটি নতুন কাঠ দিয়ে তৈরি করেন এবং পুরাতন রূপা সরিয়ে নতুন রূপা দিয়ে তা মুড়িয়ে দেন। উল্লেখ আছে যে, সুলতান আবদুল আযীয উসমানী মাকামে ইবরাহীমের গম্বুজ দেড় হাত উঁচু করেন।

উসমানী শাসকদের আমলে কাবায় গেলাফ লাগানোর সময়, তারা মাকামে ইবরাহীমেও কাল গেলাফ লাগায়। কাবার গেলাফের অনুসরণে, এতে দরজার গেলাফ এবং বেষ্টনী দেয়। গেলাফে সোনালী মিশ্রণযুক্ত রূপার তার দেয়া হয় এবং তা কাঠের বাক্সের উপর পরানো হয়। বাক্সটি লোহার জানালার ভেতরে পাথরের উপর অবস্থিত ছিল।

মাকামে ইবরাহীমের উপর যে সকল গম্বুজ ও ঘেরাও ছিল, সেগুলো হাজী ও তওয়াফকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাতাফে সংকীর্ণতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। পরে ১৩৮৪ হিজরীতে, রাবেতা আলমে ইসলামীর এক প্রস্তাব মোতাবেক, মাকামে ইবরাহীমের বর্তমান সকল অতিরিক্ত জিনিস ও নির্মাণ কাজ সরিয়ে তার পরিবর্তে সেখানে পরিমাণমত মোটা ও শক্তিশালী ক্রিস্টাল গ্লাসের একটি বাক্স যাতে তওয়াফকারীদের গায়ে ধাক্কা না লাগে এবং দেখতেও সুন্দর দেখা যায় এমনটি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আযীয উৎকৃষ্ট ক্রিস্টাল পাথরের বাক্স তৈরী এবং তা চতুর্দিক থেকে লোহা দ্বারা বেষ্টন করার নির্দেশ দেন। ভেতরে, মার্বেল পাথরের একটি ভিত্তি তৈরি করে তার উপর পাথরটি রাখা হয়। ভিত্তিটির আয়তন ১৮০×১৩০, এবং উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটারের বেশী নয়। হিজরী ১৩৮৭ সালে তা সম্পন্ন হয়। এর ফলে, মাতাফের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায় এবং তওয়াফকারীরা আরামের সাথে তওয়াফ করতে সক্ষম হন।

মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান

কা'বা শরীফ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে আযরাকীসহ আরো অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, হাজারে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব হচ্ছে ২৯ হাত ৯ আঙ্গুল। কা'বা শরীফের ভিত্তি (প্লিন্থ লেবেল) থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব হচ্ছে সাড়ে ২৬ হাত। রোকনে শামী থেকে মাকামের দূরত্ব হল ২৮ হাত ১৭ আঙ্গুল। যমযমের পাশ থেকে মাকামের দূরত্ব হচ্ছে ২৪ হাত ২০ আঙ্গুল।

ইবনে আবদুর রব আন্দালুসী তাঁর العقد الفريد বইতে লিখেছেন। মাকামে ইবরাহীম কা'বা শরীফের পূর্বদিকে ২৭ হাত দূরে। মুসল্লীরা এর পেছনে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে। তখন তার ডানে থাকে রোকনে ইরাকী এবং বামে থাকে রোকনে হাজারে আসওয়াদ। মাকামে ইবরাহীমের পাথরটিকে একটি মিম্বারের উপর তুলে রাখা হয়েছে যেন, বন্যার পানি এর উপর দিয়ে গড়াতে না পারে। হজ্জের সময় এটিকে একটি লোহার সিন্ধুকে রাখা হয় যেন মানুষ হাত দিয়ে তা স্পর্শ করতে না পারে।

আযরাকী বিশুদ্ধ সনদসহকারে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা) এর সময় মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে যে জায়গায় অবস্থান করছে, সেখানেই ছিল। তবে হযরত উমর (রা) এর খেলাফতের সময় বন্যায় পাথরটি মক্কার নিম্নাঞ্চলে ভেসে যাওয়ায় তাকে এনে পুনরায় কাবার গেলাফের সাথে বেঁধে রাখা হয়। হযরত উমর (রা) খবর পেয়ে মদীনা থেকে ছুটে আসেন, মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে রাখেন এবং মাকামে ইবরাহীমের চারদিকে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন যেন পানি একে ভাসিয়ে নিতে না পারে। তাছাড়াও তিনি মক্কায় উঁচু অংশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়েও মাকামে ইবরাহীম বর্তমান স্থানে অবস্থিত ছিল। বন্যার পর হযরত উমর (রা) একে শুধু সাবেক স্থানে পুনর্বহাল করেন।

আল্লামা মুহিব আত্ তাবারী ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন, মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে যে জায়গায় আছে, হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময়ও একই জায়গায় ছিল। কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে, লোকেরা বন্যার ভয়ে ঐটিকে কাবা শরীফের সাথে লাগিয়ে রাখে। ফলে তা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর সময়ও কাবা শরীফের সাথেই লাগা ছিল।

ইমাম বায়হাকী হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবু বকর (রা) এর সময় মাকামে ইবরাহীম কাবা শরীফের সাথে লাগানো ছিল। হযরত উমর (রা) একে দূরে সরিয়ে বর্তমান স্থানে বসিয়েছেন।

আযরাকী ইবনে আবি মোলায়কা থেকে বর্ণনা করেন, মাকামে ইবরাহীম বর্তমানে যে জায়গায় আছে, জাহেলিয়াতের সময়ও একই জায়গায় ছিল এবং তা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকরের সময়ও একই স্থানে অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু হযরত উমরের সময় বন্যায় তা স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর হযরত উমর তা সাবেক জায়গায় পুনর্বহাল করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময় মাকামে ইবরাহীম কাবার সাথে লাগানো ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা) একে পিছিয়ে দিয়েছেন।

হাফেজ এমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, মাকামে ইবরাহীম আগে কাবা শরীফের দেয়ালের সাথে লাগানো ছিল। সেই জায়গাটি আজও পরিচিত। সেটি হচ্ছে, কাবার দরজা থেকে বের হওয়ার সময় ডানে হাজারে আসওয়াদের দিকে, কাবার দরজা সংলগ্ন একটি পৃথক জায়গায়। হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা নির্মাণ শেষে ঐ পাথরটি সেখানে কাবার দেয়ালের সাথে রেখে দেন কিংবা পাথরটি সেখানেই থেমে যায় এবং তিনি সেটাকে সেখানেই রেখে দেন। তওয়াফ শেষে, সেখানেই নামায পড়ার জন্য আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন। যুক্তির দাবীও তাই যে, যেখানে কাবার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, মাকামে ইবরাহীম সেখানেই থাকবে। হযরত উমর (রা) একে সেখান থেকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ২য় খলীফা ছিলেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরামের কেউ তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করেননি।

আল্লামা ইবনুল জাযারী আশ-শাফেঈ (রা) মাকামে ইবরাহীমের ব্যাপারে ৫টি মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করার আদেশ দেন। (২) হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীম বর্তমান স্থানেই আছে। কিন্তু জাহিলিয়াতের সময় এটাকে কাবার সাথে লাগানো হয় যা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকরের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হযরত উমর (রা) সেটিকে সাবেক স্থানেই পুনর্বহাল করেন। (৩) রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বাইতুল্লাহর কাছ থেকে এটিকে বর্তমান জায়গায় স্থানান্তর করেন। (৪) হযরত

উমর (রা) নিজেই সর্বপ্রথম ঐ পাথরটি বর্তমান স্থানে সরিয়ে আনেন। বন্যার পরে লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি তা সাবেক জায়গায় পুনর্বহাল করেন। (৫) হযরত ইবরাহীম (আ) এর যুগ থেকেই পাথরটি বর্তমান জায়গায় ছিল। উম্মে নহশল বন্যার সময় তিনি এটাকে সাবেক জায়গায় পুনর্বহাল করেন মাত্র।

ইবনে সোরাকা বলেন, কাবার দরজা এবং মোসাল্লা আদম এর মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ৯ হাতের একটু বেশী। হযরত আদম (আ) তওয়াফ শেষে সেখানে নামায পড়েন এবং আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন। সেখানেই মাকামে ইবরাহীম অবস্থিত। তওয়াফ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে দু'রাকাত নামায পড়েন এবং সেখানেই তাঁর উপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمُ مُصَلًّى -

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেটিকে এর বর্তমান স্থানে সরিয়ে আনেন এবং বর্তমান স্থানটি কাবা শরীফ থেকে ২০ হাত দূরে অবস্থিত। যাতে করে তওয়াফকারীদের তওয়াফে কোন অসুবিধা না হয়। বন্যার পর হযরত উমর (রা) সেটিকে এর সাবেক স্থানেই বহাল করেন মাত্র। (১০)

উম্মে নহশল নামক বন্যার ব্যাপারে মুহিব আত-তাবারী সাহাবী আবদুল মুত্তালিব বিন আবু ওয়াদাআ কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন। আবদুল মুত্তালিব মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছেন। তিনি বলেন, মসজিদে হারামের বড় দরজা– বাবে বনি শায়বা দিয়ে ভেতরে বন্যার পানি প্রবেশ করে। হযরত উমর (রা) এর খেলাফতের সময় (হিজরী ১৭ সালে), উম্মে নহশল নামক বন্যার পানিতে মাকামে ইবরাহীম ভেসে যায় এবং তা মক্কার নিম্নাঞ্চলে নিয়ে যায়। সেটিকে লোকেরা কুড়িয়ে এনে কাবার দরজার সামনে গেলাফে কাবার সাথে বেঁধে রাখে। এই ঘটনা উমরকে জানানোর পর তিনি রমযানে মদীনা থেকে উমরাহর এহরাম পরে মক্কায় রওনা হন। বন্যার পানিতে মাকামে ইবরাহীমের নির্দিষ্ট স্থানের চিহ্ন মুছে যায়। ফলে, তিনি লোকদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কে মাকামের ইবরাহীমের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল আছে। তখন আবদুল মুত্তালিব বিন আবু ওয়াদাআ বলেন, আমি ঐ সম্পর্কে জ্যানি। আমি অনুরূপ আশংকার ভিত্তিতে, হাজারে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইবরাহীম, বাবে কাবা থেকে মাকামে ইবরাহীম এবং যমযম থেকে মাকামে ইবরাহীমের দূরত্ব মেপে

রাখি। আমি একটি পাকানো মজবুত রশি দিয়ে তা মাপি এবং রশিটি ঘরে রেখে দেই। হযরত উমর বলেন, আপনি আমার কাছে বসুন এবং একজন লোককে তা আনার জন্য পাঠিয়ে দিন। একজন লোক পাঠিয়ে রশিটি আনা হল। রশি দিয়ে মেপে দেখা হল, বর্তমান স্থানটি এর যথার্থ সাবেক স্থান। তিনি অন্যান্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের পরামর্শ নেন। সবাই এই জায়গার ব্যাপারেই রায় প্রকাশ করেন। হযরত উমরের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর তিনি বর্তমান স্থানে, মাকামে ইবরাহীমের নীচে ও চতুষ্পার্শ্বে মজবুত ভিত্তি তৈরি করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীম ঐ জায়গাতেই বিদ্যমান রয়েছে। হযরত উমর মাকামে ইবরাহীমের চতুর্দিকে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করেন [১১]

যে সকল বর্ণনায় এসেছে যে মাকামে ইবরাহীম হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময় থেকেই কাবা সংলগ্ন ছিল এবং হযরত উমর (রা) তাকে পিছিয়ে এনে বর্তমান স্থানে বসান, এই সকল বর্ণনা বেশী যুক্তিযুক্ত নয়। বরং তা প্রথম থেকেই বর্তমান স্থানে ছিল এবং বন্যার পর হযরত উমর তাকে সাবেক স্থানে বহাল করেন মাত্র। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে এবং এই মতটিই বেশী জোরদার। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেকগুলো যুক্তি রয়েছে। আমরা এখন সেগুলো আলোচনা করবো।

হযরত উমর (রা) কখনও কোন ব্যাপারে নিজে একাকী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। বরং সব ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসরণ করতেন এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সাথে তিনি পরামর্শ করাকে জরুরী মনে করতেন। তারীখুল কাবা বইতে উল্লেখ আছে যে, খলীফা হওয়ার পর একবার তিনি কা'বায় ঢুকলেন এবং কা'বার অর্থ-ভাণ্ডারের সম্পদ মুসলমানদের বাইতুলমালে জমা দেয়া কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ইচ্ছে পোষণ করলেন। তখন কা'বার সেবক শায়বা বিন উসমান হাজাবী তাঁকে বললেন, আপনার দুই সাথী রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবু বকর (রা) তো তা নেননি। তখন উমর বললেন, আমি তো তাদেরই অনুসরণ করি। তারপর তিনি ঐ সম্পদ নেয়া ছেড়ে দিলেন। এই ঘটনা সামনে রেখে কিভাবে চিন্তা করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময় মাকামে ইবরাহীম যেখানে ছিল, সেখান থেকে তিনি তা পিছিয়ে দিয়েছেন? অথচ সেখানেই নামায পড়ার জন্য কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে। তদুপরি, হযরত উমরের ইচ্ছা অনুযায়ীই আল্লাহ সেখানে

নামায পড়ারও আদেশ দিয়েছেন। তাহলে, উমর কি করে সেই পবিত্র জায়গাটি পরিবর্তন করতে পারেন? সেখান থেকে পাথর সরানোর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা যেখানে তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐ আয়াত নাযিলের পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)ও সেখানে নামায পড়েন। উমর তা পরিবর্তন করে থাকলে কুরআন ও নবীর বিরোধিতা করেছেন। নাউজুবিল্লাহ! তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে থেকে সবকিছু নিজ চোখে দেখেছেন। তারপরও, অধিকতর নিশ্চয়তা হাসিলের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে মাকামে ইবরাহীমের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তখন, মক্কায় বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউ হযরত উমরের এই কাজের বিরোধিতা করেননি। উমর অন্যায় করলে, অবশ্যই সাহাবায়ে কেরাম চুপ করে না থেকে এর বিরোধিতা করতেন। তাঁর খেলাফতের সময় যখন একজন সাহাবী তলোয়ার দেখিয়ে বলেছিলেন, তুমি ভুল পথে চললে, এই তলোয়ার দিয়ে তোমাকে সোজা করে দেব। সেখানে এত বেশী সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম কি করে চুপ করে থাকতে পারেন? এছাড়াও হযরত উমর (রা) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে মাকামে ইবরাহীমের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পেছনে তাঁর যে আগ্রহ ছিল, সেটি হচ্ছে, যে স্থানটি সম্পর্কে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়েছেন তা ভাল করে জানা। ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে এই মতটিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোই সহীহ। আযরাকীও সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকরের যুগে মাকামে ইবরাহীম বর্তমান জায়গাতেই বিদ্যমান ছিল।

আহমদ ও তিরমিজী উকবা বিন আমের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لَوْكَانَ نَبِيٌّ بَعْدِىْ لَكَانَ عُمَرُبْنِ الْخَطَّابِ.

অর্থ ঃ 'আমার পরে কোন নবী আসলে, উমরই নবী হতেন।' এমন উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং ইসলামের ২য় খলীফা হযরত উমর কি করে নিজের ইচ্ছায় মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর যথার্থ স্থান থেকে সরিয়ে আনতে পারেন? এটা কখনও সম্ভব নয়।

মোসাল্লা আদম (আ)

হযরত আদম (আ) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসার পর কা'বাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর এবাদত করতেন। তখন দুনিয়ায় তাঁর স্ত্রী হাওয়া ছাড়া আর কোন মানুষ ছিল না। পরে ক্রমান্বয়ে তাঁর বংশ বিস্তার হয়। তখন তিনি কা'বার চারদিকে তওয়াফ করতেন। কিন্তু বিশেষ কোন্ জায়গায় নামায পড়তেন সে সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না।

'তারীখ এমারতুল মসজিদিল হারাম' বই এর লেখক লিখেছেন যে, ইবনে সোরাকা উল্লেখ করেছেন, কা'বার দরজার সামনে, দরজা বরাবর ৯ হাতের সামান্য বেশী দূরত্বে মোসাল্লা আদম অবস্থিত। তিনি এই জায়গায় নামায পড়েছেন। বর্তমানে, এই জায়গায় তওয়াফের ভিড়ের কারণে নামায পড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।[১২]

মোসাল্লা জিবরাইল (আ)

কা'বার দরজা থেকে রোকনে ইরাকীর মাঝে মোসাল্লা জিবরাইল অবস্থিত। হযরত জিবরাইল (আ) এই জায়গায় নামায পড়েছেন।

মসজিদে হারামে নামাযের বর্ণনা

মসজিদে হারামের এক রাকাত নামায, অন্য জায়গায় ১ লাখ রাকাতের সমান। অন্যান্য এবাদতের সওয়াবও ১ লাখ গুণ বেশী। তাই মসজিদে হারামে নামায পড়ার জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আগ্রহ। এই জন্যই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানরা ছুটে আসে এই পবিত্র মসজিদে নামায পড়ার জন্য।

বর্তমানে, মসজিদে হারামের ৫ জন ইমাম ও খতীব আছেন। তারা ৫ ওয়াক্ত নামায, জুমআ ও ঈদের নামায পড়ান। একজন প্রধান ইমাম থাকেন। তিনি সাধারণতঃ দুই ঈদের নামায পড়ান ও খোতবা দেন।

মসজিদে হারামের ৫ ওয়াক্ত নামাযের জামাতে, এক-একজন ইমাম সাহেব নামায পড়ান। নামায আউয়াল ওয়াক্তেই পড়া হয়। নামাযের সময় মসজিদে হারামের বিভিন্ন কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকেন। ইমাম সাহেবদের অনেকেই নামাযের আগে তওয়াফ করেন, তারপর ইমামতী করেন। ইমাম সাহেবদের নামায পড়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তব্যরত পুলিশরা ইমাম সাহেবের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত থাকে।

নামাযের জামাতের সময় ইমাম সাহেব মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়ান এবং সেই দিকে, ইমাম সাহেবের পেছনে প্রথম কাতার দাঁড়ায়। অবশিষ্ট তিনদিকে, কাবা শরীফের গা ঘেঁষে ১ম কাতার অনুষ্ঠিত হয়। ১ম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য মুসল্লীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে। এজন্য অনেকেই আগে জায়নামায বিছিয়ে স্থান দখল করে রাখে। যদিও আলেমদের দৃষ্টিতে এটা ঠিক নয়। কেননা, যে আগে আসবে সে-ই প্রথম কাতারে শামিল হবে এবং প্রয়োজনে সে বসে অপেক্ষা করবে। জায়নামায বিছিয়ে জায়গা দখল করে চলে গিয়ে পরে নিজে এসে সেই জায়গায় দাঁড়ালে অন্য জনের অগ্রাধিকার নষ্ট হয়।

মহিলারা মসজিদে হারামের ভেতরে পেছনের অংশে নামায পড়ে। কিন্তু বর্তমানে যমযমের সামনে থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, সাফা পাহাড়ের আগ পর্যন্ত সবটুকু অংশেই মহিলারা নামায পড়ে। আযানের কিছু আগ থেকেই মহিলাদেরকে তওয়াফ থেকে বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু আযানের সাথে আর কোন মহিলাকে তওয়াফ করতে দেয়া হয় না। তারা পরে তাদের অসম্পূর্ণ তওয়াফ সম্পূর্ণ করে।

মহিলাদেরকে তওয়াফ থেকে সরানোর জন্য বেশ কয়েকজন হিজড়া নিয়োগ করা হয়েছে। এরা নপুংশক। আরবীতে তাদেরকে 'খুনসা' বলে। যে সমস্ত মহিলা

আযানের পর তওয়াফ বন্ধ রাখার অনুরোধ মানে না, তারা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে মাতাফ থেকে বের করে দেয় এবং তারা মহিলাদের শরীর স্পর্শ করতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা তো আর পূর্ণাঙ্গ পুরুষ নয়।

মসজিদে হারামে তারাবীহর নামাযের দৃশ্য বড়ই মনোরম। এতে দুইজন ইমামের ইমামতিতে ১০, ১০ রাকাত করে বিশ রাকাত নামায পড়া হয় এবং খতমে কুরআন করা হয়। রমযানে, সেহরী খাওয়ার আগ পর্যন্ত সবাই জেগে থাকে এবং হাট বাজার ও দোকান-পাটসমূহ খোলা থাকে। রমযান মাসের রাতকে দিনের মত মনে হয়। সেহরীর পর ফজরের নামায শেষে সবাই ঘুমায় এবং দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত গোটা সৌদী আরব ঘুমিয়ে থাকে। তারপর অফিস আদালতের কাজ চলে। ২১শে রমযান থেকে শেষ ১০ দিন তারাবীহ্ শেষে প্রায় ২ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর শুরু হয় জামাতে তাহাজ্জুদের ১০ রাকাত নামায। এই নামাযের কেরাত, রুকু ও সেজদা অতি দীর্ঘ হয়ে থাকে। তারাবীহ্ ও তাহাজ্জুদের নামায দুটো শুরুর আগে মুয়াজ্জিন উভয় নামাযের জন্য 'সালাতুল কেয়াম' পড়ার ঘোষণা দেয়। হাদীসের পরিভাষায় এই দুটো নামাযকেই সালাতুল কেয়াম বলে। হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী বিতরের তিন রাকাত নামায ২ নিয়ত ও দুই সালামে পড়া হয়। ইফতারের সময় সোলাইমানিয়া, শিশশা, যাহের ও যমুমে তোপধ্বনি করা হয়।

রমযানের অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে ভীষণ ভিড় হয় বিশেষ করে কদরের রাত্রের মর্যাদা লাভের জন্য শেষ ১০ রাত প্রচণ্ড ভীড় হয় এবং ২৭শে রমযান এই ভিড় চূড়ান্তে পৌঁছে। ২৯ শে রমযান তারাবীর খতমে কুরআন অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত লোক শেষ দশকের দিনগুলোতে এতেকাফ করে। রমযানে মসজিদে হারামের দৃশ্য বড়ই মনোরম।

বিভিন্ন নামাযের জামাত শেষে প্রায়ই জানাযার নামাযের ঘোষণা আসে। মুয়াজ্জিন আরবীতে বলেন, اَلصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ অথবা اَلصَّلاَةُ عَلَى الْاَمْوَاتِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ এখন মৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে, আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। লাশ মহিলা হলে মুআজ্জিন বলেন যে, اَلصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتَةِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ।

কোন কোন সময়, জুমআর নামাযের পর, অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে মসজিদে

হারামের বাবে আবদুল আযীযের সামনের রাস্তায়, শরীয়াহ্ কোর্টের রায় অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকদের কেসাস বা গর্দান কাটা হয়। শরীয়তের এই বিধানটি মানুষ বড় ঔৎসুক্যের সাথে অবলোকন করে।

রমযান ও হজ্জ মওসুম, উমরাহ্ এবং হজ্জ আদায়কারীদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষ পর্যবেক্ষক, বক্তা এবং উপদেশদানকারী নিযুক্ত করা হয়। তারা মসজিদে হারামে বক্তৃতা করেন এবং লোকদের কাছে হজ্জের মাসলা-মাসায়েল বর্ণনা করেন। হিজরে ইসমাঈল, মসজিদে হারামের বিভিন্ন দরজা, মোলতাযাম, বাবে কা'বা এবং যমযম ও সাফা মারওয়া পাহাড়ে তারা অবস্থান করে। মহিলা গাইডগণ নারীদের পথ প্রদর্শন করে।

এ ছাড়াও সারা বছর মসজিদে হারামের ভেতর আসর থেকে এশা পর্যন্ত কিছু ওয়ায-নসীহত এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা রয়েছে।

এশার নামাযের পর মসজিদে হারামের বড় তিনটি দরজা ব্যতীত বাকী দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

বছরের খরা মওসুমে, বৃষ্টিপাতের অভাবের সময়, সৌদী বাদশাহর আহ্বানক্রমে, এস্তেশ্কার নামায তথা 'বৃষ্টি প্রার্থনা'র নামায অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও চন্দ্রগ্রহণের সময় কিংবা সূর্য গ্রহণের সময়ও বিশেষ নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা বিশেষ কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে, লাশবিহীন গায়েবানা জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।

জুমআর নামায পালাক্রমে, বিভিন্ন ইমাম সাহেবরা পড়ান। জুমআর খোতবায় সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের সমস্যা, মুসলমানদের ঈমান আকীদা, আমল, ইসলামের বিশেষ পর্বসমূহের উপর আলোকপাত করা হয় এবং বেদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করা হয়। মসজিদে হারামের সকল নামায ও আযান রেডিও এবং টিভিতে প্রচারিত হয়। রাষ্ট্রীয় মেহমানদের জন্য আযানের স্থানে কিংবা এর নীচে নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এ আযানের স্থানে একটি রেডিও ষ্টুডিও আছে।

মসজিদে হারামের নামাযের সালাম ফিরনোর পর ইমাম সাহেব সবাইকে নিয়ে একসাথে দু'হাত তুলে দোয়া করেন না। কেননা নামাযের অধিকাংশ অংশই দোয়া। এ ছাড়াও নামাযের সালাম ফিরানোর পর সবাইকে নিয়ে দু'হাত তুলে নিয়মিত দোয়া করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন হাদীস এবং আমল বর্ণিত নেই।

মসজিদে হারামের খোতবা দানের পদ্ধতি

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মসজিদে হারামের ইমাম জুমআর নামাযের খোতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে কাল জামা ও পাগড়ী পরে আসতেন। মিসরের বাদশাহ্ নাসের এই সকল পোশাক ইমাম সাহেবের জন্য পাঠাতেন। ইমাম সাহেব দুটো ঝাণ্ডার মাঝখানে ধীরে ধীরে চলতেন এবং দু'জন মুয়াজ্জিন ঐ ঝাণ্ডা দুটো আঁকড়ে ধরতেন। সামনে একজন হাতে ফটকা নিয়ে এগিয়ে যেতেন। তিনি তা বাতাসে ফুটিয়ে আওয়ায দিলে, মুসল্লীরা বুঝতে পারত যে ইমাম সাহেব আসছেন। তিনি মিম্বারের কাছে আসার আগ পর্যন্ত এইভাবেই চলত। ইমাম সাহেব প্রথমে হাজারে আসওয়াদ চুমো দিতেন, সেখানে দোয়া করতেন এবং পরে মিম্বারের দিকে এগুতেন। প্রধান মোয়াজ্জিনও কাল পোশাক পরে কাঁধে তলোয়ার নিয়ে তা হাতে ধরে থাকতেন। তারপর ঝাণ্ডা দুটো মিম্বারের দুই পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। ইমাম সাহেব, মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে উঠার পর মুয়াজ্জিন তাঁর কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিতেন। ইমাম সাহেব তলোয়ারের গোড়া দিয়ে মিম্বারের সিঁড়িতে আওয়ায দিতে দিতে মিম্বারের উপরে গিয়ে বসতেন এবং সবাইকে সালাম জানাতেন। ইমাম সাহেব বসার পর মুয়াজ্জিন যমযমের গম্বুজ থেকে আযান দিতেন। খোতবা শেষে, তিনি আগের মত আওয়ায দিয়ে দিয়ে নীচে নেমে আসতেন। এরপর মিম্বারটি সরিয়ে ফেলা হত। কিন্তু ৯৬৬ হিজরীতে, সুলতান সোলায়মান খানের মিম্বারটি মাকামে ইবরাহীমের উত্তর পার্শ্বে স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করার পর প্রায় ৫শ' বছর পর্যন্ত এইভাবে মিম্বার অনড় থাকে এবং ইমাম সেখানে বসেই খোতবা দেন। বর্তমান সৌদী আমলে শুধু এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

হেজাযে, তুরস্কের উসমানী সুলতানের আমলে, ইমাম সাহেব বাবে বাযান এবং বাবে আলীর মাঝখানে অবস্থিত মাদ্রাসায় প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ে নিতেন। তখন, সেখানে সময় নির্ধারণের জন্য দুটো বড় ঘড়ি ছিল। তখনকার অভ্যাস অনুযায়ী, ইমাম সাহেব ফরজিয়া নামক প্রশস্ত ঢিলা জুব্বা পরিধান করতেন এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে সুতা ও সিল্ক মিশ্রিত সাদা পাগড়ী পেঁচিয়ে মাথায় বাঁধতেন। তারপর হাতে লাঠি নিয়ে মোবাল্লেগদের জন্য নির্ধারিত 'মোরাক্কায়' এসে পাগড়ীর উপর তাইলাসান নামক একটি টুপি পরতেন। হাতের লাঠির মাথা তীরের

দাঁতের মত ধারাল ছিল। এটাকে গাদ্দারা বলা হত। তারপর সামনের দিকে রওনা হলে, অপেক্ষমান ৪ জন ব্যক্তি তাঁকে মিম্বারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন এবং একজন ইমাম সাহেবের লাঠি বহন করতেন। তারপর মিম্বারের উপর থেকে সোনার প্রলেপযুক্ত রূপালী তারের নেট সরানো হত এবং ইমাম গিয়ে মিম্বারের উপর বসতেন। তারপর দ্বিতীয় আযান দেয়া হত। একজন মোবাল্লেগ, আযানের মুহাম্মদ শব্দ শুনলে জোরে দরুদ পড়তেন, খোতবায় সাহাবাদের নাম শুনলে তাদের উদ্দেশ্যে রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলতেন এবং ইমাম কোন খলীফার নাম উচ্চারণ করলে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন। তখন খলীফাদের নাম উল্লেখ করে খোতবায় তাদের জন্য দোয়া করা হত। এই অবস্থা বাদশাহ শরীফ হোসাইন বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল মুঈন বিন আ'ওন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। মসজিদে হারামের ইমামগণ বিভিন্ন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। সুনির্দিষ্ট কোন মাজহাবের ইমাম নিতে হবে এমন কোন ব্যাপার ছিল না। মসজিদে হারামের সব ইমাম খতীব নয়। অর্থাৎ সবাই জুমআর নামায পড়ান না। ফলে, তাদের খোতবাও দিতে হয় না।

ঈদুল ফিতরের খোতবার পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। ঈদের খোতবা দেয়ার পালা যার উপর আসত, তিনি নিজ ঘরে ফজরের নামাযের পর, তাঁর কাছে আগত মেহমানদের জন্য মিষ্টান্ন এবং পানীয় তৈরি করতেন। সকাল বেলা ফর্সা হয়ে গেলে তাঁর কাছে প্রথমে মসজিদে হারামের প্রধান খতীবসহ অন্যান্য খতীব, পরে প্রধান মুয়াজ্জিনসহ অন্যান্য মোয়াজ্জিন, তারপর হারাম শরীফের খাদেমগণসহ সবাই আসতেন এবং তারা সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে খতীবের সাথে একসাথে রওনা হতেন। তিনি কাল পোশাক, পাগড়ী এবং তাইলাসান টুপী পরে জায়নামাযে আসা পর্যন্ত সবাই তাঁকে এগিয়ে দিতেন। মোসাল্লা জিবরাঈলেই সাধারণতঃ ইমাম দাঁড়াতেন। মোসাল্লা জিবরাঈল হচ্ছে, বাবুল কাবা এবং রোকনে ইরাকীর মধ্যে। খতীব নামাযে দাঁড়ালে, যমযমের গম্বুজের উপর থেকে মুয়াজ্জিন ৩ বার বলতেন اَثَابَكُمُ اللّٰهُ এবং পরে বলতেন اَلصَّلَاةُ ، رَحِمَكُمُ اللّٰهُ তারপর ইমাম নামায পড়ে খোতবা দিতেন।

সৌদী শাসনামলে, ইমাম সাহেবদের চালচলন অত্যন্ত সাদা-সিধে। ইমামগণ হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী। যেহেতু হাম্বলী মাজহাব রাষ্ট্রীয় মাজহাব হিসেবে স্বীকৃত। তাঁরা মিম্বারে উঠার পর সালাম দেন। তারপর ২য় আযান দেয়া হয়।

আযানের পর খোতবার আগে আর কোন সুন্নাত নামায পড়ার সুযোগ দেয়া হয় না। ইমাম সাহেব খোতবা শুরু করেন। ইমাম সাহেবরা সাধারণভাবে, মুসলিম বিশ্বের সকল শাসকদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন। তবে, সৌদী শাসকদের নামে খোতবা দেয়া হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের নামে খোতবা দিতেন না। কিন্তু আব্বাসী শাসনামল থেকে খলীফাদের নামে খোতবা দেয়ার পদ্ধতি চালু হয় এবং তা প্রায় সৌদী শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে।

বর্তমানে মসজিদে হারামের জুমআর নামাযে দুই আযান এবং এক একামত দেয়া হয়। জুমআর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকর ও উমরের সময় এক আযানের পদ্ধতিই চালু ছিল। কিন্তু ৩য় খলীফা হযরত উসমানের শাসনামলে, লোকদেরকে তাকিদ দেয়ার উদ্দেশ্যে, সূর্য হেলে যাওয়ার সাথে সাথে, সোকে মদীনার পার্শ্বে যাওরায় অবস্থিত তাঁর বাড়ীতে, আরেকটি আযান প্রবর্তন করেন। এই মিলে মোট আযান সংখ্যা দুই এবং একামত সংখ্যা ১-এ দাঁড়ায়। এটাই পরে সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হিসেবে গৃহীত হয়। হযরত উসমানের সময় মুসল্লী বেড়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ঐ আযানের ব্যবস্থা করা হয়। ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর الام বইতে সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবু বকর এবং উমর (রা) এর সময় ইমাম মিম্বারে বসার পর প্রথম আযান দেয়া হত। তারপর হযরত উসমান (রা) এর সময় মানুষ বেড়ে যাওয়ায়, হযরত উসমান দুই আযানের নির্দেশ দেন। তারপর থেকে দুই আযানের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর الام বইতে আরো উল্লেখ করেছেন যে, জুমআর দুই আযান হযরত উসমান প্রবর্তন করেছেন বলে আতা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, মুয়াওবিয়াই (রা) ঐ পদ্ধতি চালু করেন।

জুমআর খোতবায় লাঠির উপর ভর দিয়ে খোতবা দেয়া সুন্নত। ইবনে মাজাহ আম্মারাহ বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেন যে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ فِى الْحَرْبِ خَطَبَ عَلٰى قَوْسٍ وَاِذَا خَطَبَ فِى الْجُمْعَةِ خَطَبَ عَلٰى عَصَاهُ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের ময়দানে খোতবা দেয়ার সময় ধনুকের উপর এবং জুমআর খোতবা দেয়ার সময় তাঁর লাঠির উপর ভর দিতেন।'

মসজিদে হারামের প্রাসঙ্গিক সুবিধাসমূহের বর্ণনা

মসজিদে হারামের সেবামূলক কাজ

মসজিদে হারাম দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ হওয়ার কারণে তার মধ্যে শুধু নামায পড়াকেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং অন্যান্য নেক কাজেরও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া মসজিদে আগমনকারী হাজী ও যিয়ারতকারীদের নিরাপত্তা আরো বেশী প্রয়োজন। এই সকল বিষয়সমূহকে সামনে রেখে মসজিদে হারামে নিম্নোক্ত কিছু সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১. তাহফীজুল কুরআন মাদ্রাসা

বর্তমানে বাদশাহ আবদুল আযীয দরজা এবং উম্মে হানী দরজার মধ্যবর্তী স্থানে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত। বহু ছাত্র এখানে পবিত্র কুরআন মজীদ মুখস্থ করে। মাদ্রাসায় মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। বাইরের লোকেরাও ছাত্রদের তেলাওয়াত শুনতে পায়। মসজিদের ১ তলা ও দোতলার মাঝামাঝি স্থানে কয়েকটি কক্ষে মাদ্রাসাটির ক্লাস বসে। এর দরজা ও সিঁড়ি বাইরের দিক থেকে তৈরি করা হয়েছে। নামাযের সময় সেখান থেকেই মসজিদে হারামের জামাতে অংশগ্রহণ করা যায়। এছাড়াও মসাজিদের বিরাট অংশ জুড়ে এর ক্লাশ বসে।

২. মাধ্যমিক মাদ্রাসা

মসজিদে হারামের ভেতর একটি মাধ্যমিক মাদ্রাসা (স্কুল) আছে। সৌদী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী এখানে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এতেও অনেক ছাত্র লেখাপড়া করে। এই দুইটি মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো পবিত্র মসজিদে হারামে অবস্থিত এবং এর শিক্ষকরা এজন্য গর্বিত। তাদের শিক্ষা লক্ষ গুণ সওয়াবের আশায় তাৎপর্যপূর্ণ। মসজিদের বিরাট এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত ঐসকল ক্লাশে কোন চেয়ার-টেবিল নেই। মেঝেতে কার্পেটের উপর শিক্ষাদান করা হয়।

৩. মসজিদে হারামের নিরাপত্তা বিভাগ

মসজিদে হারামের হাজী, উমরাহ আদায়কারী এবং যিয়ারতকারী তথা মুসল্লীদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সৌদী সরকার মসজিদের ভেতর একটি পুলিশ ফাঁড়ি সৃষ্টি করেন। মসজিদের ভেতরে দায়িত্বপালনকারী পুলিশরা দুই ভাগে

বিভক্ত। সশস্ত্র ও নিরস্ত্র। ১ জন সশস্ত্র পুলিশ প্রত্যেক দরজায় বসা আছে। সাথে বেসামরিক দুইজন দারোয়ানও আছে। মসজিদের ভেতরে দায়িত্বপালনকারী পুলিশরা নিরস্ত্র। যেমন হাজারে আসওয়াদ, মাতাফ, হিজরে ইসমাইল এবং অন্যান্য স্থানে নিয়োজিত পুলিশ নিরস্ত্র। তবে আযানখানার উপরে রেডিও-টেলিভিশন ইউনিট থাকায় সেখানে সশস্ত্র পুলিশ আছে। বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দরজাগুলোতে একাধিক পুলিশ কর্তব্যরত থাকে। মসজিদের ভেতর কোন গোলমাল হলে কিংবা মুসল্লীদের নিরাপত্তার আশংকা দেখা দিলে তারা সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হাজারে আসওয়াদের পার্শ্বে ১ হাত উঁচুতে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে এবং ভিড়ের সময় প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করে। মসজিদে হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র কিংবা শিশুদেরকে পুলিশ হেফাজত করে এবং লোকেরা হারানো জিনিস সেখানে গিয়ে তালাশ করে। কেউ কোন জিনিস পেলে তা পুলিশের কাছে জমা দেয়। হারামের কর্তব্যরত পুলিশদের ব্যবহার যথেষ্ট অমায়িক। তারা লোকদের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করে। জানাযার নামাযের জন্য মসজিদে লাশ ঢুকাতে হলে পুলিশের উদ্দেশ্যে লেখা হাসপাতালের একটি ছাড়পত্রের কপি দরজায় কর্তব্যরত পুলিশকে দিতে হয়। প্রত্যেক দরজায় নিয়োজিত বেসামরিক দারোয়ানগণ মুসল্লীদের ব্যাগ ও বিভিন্ন কিছু পরীক্ষা করে দেখে। তবে আজকাল মসজিদের ভেতর ব্যাগ বা ভারী কিছু ঢুকাতে দেয়া হয় না। বাবে আবদুল আযীয ও বাবে বেলালের মাঝে পুলিশ অফিস রয়েছে। হারাম শরীফের পুলিশ প্রধান বড় বড় অতিথিদেরকে বাবে আবদুল আযীযে অভ্যর্থনা জানান।

৪. মহিলাদের জন্য সেবা

মসজিদের প্রধান দরজাসমূহে মহিলা দারোয়ান থাকে। তারা মহিলাদের ব্যাগ চেক করে। মসজিদে সাধারণত কোন খাবার নিতে দেয়া হয় না। মহিলাদের নামাযের স্থান পুরুষদের থেকে পৃথক। তওয়াফে পুরুষদেরকে কাবার নিকটবর্তী অংশে এবং মহিলাদেরকে এর পরবর্তী অংশে স্থান করে দেয়া এবং নারী-পুরুষকে পৃথক লাইনে রাখার জন্য কিছুকর্মী স্থায়ীভাবে পথ দেখান। এ ছাড়াও যমযমে মহিলাদের জন্য তৈরি পৃথক কক্ষে যেন কোন পুরুষ প্রবেশ করতে না পারে, এবং টয়লেটগুলোতেও পুরুষরা যেন মহিলাদের নির্ধারিত টয়লেটে না যেতে পারে সেজন্য সে সকল জায়গায় দারোয়ান নিযুক্ত করা হয়েছে। হিজরে ইসমাইল, কাবার

নিকটবর্তী অংশে পুরুষ এবং পরবর্তী অংশে মহিলাদের নামায পড়ার পৃথকীকরণের জন্যও তদারককারী রয়েছে। মহিলাদের নির্ধারিত নামাযের স্থানে এবং হিজরে ইসমাঈলে মহিলা তদারককারিণী রয়েছেন। মাকামে ইবরাহীমের পেছনেও পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে পৃথক করার জন্য কর্তব্যরত লোকেরা দায়িত্ব পালন করেন।

৫. অক্ষম লোকদের জন্য সেবা

তওয়াফ এবং সাঈ করার ক্ষেত্রে অক্ষম, পঙ্গু, বুড়ো ও অসুস্থ লোকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। তওয়াফের জন্য রয়েছে খাটিয়া। নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকরা অক্ষম লোককে খাটিয়ার উপর রেখে মাথায় করে ঘুরে ঘুরে তওয়াফ করায়। সাঈর ক্ষেত্রে রয়েছে হুইল গাড়ী। এখানেও নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাঈ করানো হয়। তবে বিন লাদীন কোম্পানীর বাবুস সাফার কাছে অবস্থিত অফিস থেকে বিনা-পয়সায়ও এক ধরনের হুইল গাড়ী পওয়া যায়। সেখানে পরিচয়পত্র কিংবা পাসপোর্ট জমা দিয়ে তা আনতে হয় এবং কাজ শেষে তা ফেরত দিয়ে নিজের পরিচয়পত্র ফেরত আনতে হয়। ভাড়ার জন্য নির্ধারিত হুইল গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৫০টি এবং খাটিয়ার সংখ্যা ২৫টি হবে। তবে বিনা পারিশ্রমিকের হুইল গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১০০০টি।

৬. খাবার বিতরণ

কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মসজিদে হারামের সামনে রুটি খাবার বিতরণ করে। রুটি সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যায় বিলি করা হয়। বিয়ে, আকীকা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত খাবার মসজিদের মুসল্লীদের মধ্যে বিরতণ করা হয়। বর্তমানে মসজিদের পশ্চিমে প্রধান সড়কে রুটি কোম্পানীর গাড়ীগুলো থেকে রুটি বিতরণ করা হয়।

'মক্কা কল্যাণ সংস্থা' এক্ষেত্রে উত্তম নজীর স্থাপন করেছে। সম্প্রতি গঠিত এই বেসরকারী জনকল্যাণ সংস্থাটি বহুমুখী লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে মক্কার রোসাইফায় শাহজাদা আহমদ হাউজিং সোসাইটিতে এর সদর দফতর অবস্থিত। জনগণের দানের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতা চলছে।

বিয়ে, আকীকা ও অন্যান্য আনন্দ-উৎসবে উদ্বৃত্ত খাদ্য মক্কা ও মসজিদে হারামের

গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য এই সংস্থা বিভিন্ন হল ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ঐ সকল খাবার সংগ্রহ করে। পরে ঐ খাবারকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করে বিলি করা হয়। ১৯৭০ এর দশকে সৌদী আরবে তেলের প্রাচুর্যের কারণে, দেশের আয় অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যায়। ফলে, 'অর্থই সব অনর্থের মূল' এই প্রবাদের কার্যকারিতা দেখা দেয়। যে কোন অনুষ্ঠানে খাবারের ব্যাপারে অকল্পনীয় অপচয় শুরু হয়। অপচয় যেন একটা আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এক্ষেত্রে কে কতবেশী অপচয় করতে পারে সে ব্যাপারে অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত একশ' ব্যক্তির জন্য যে খাবার তৈরি করা হয় তা অনায়াসে ৫/১০ গুণ বেশী লোকে খেতে পারে। যাই হোক কল্যাণ সংস্থা সে সকল উদ্বৃত্ত খাবার সংগ্রহ করে তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এর আগে উদ্বৃত্ত খাবারগুলো ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হত। অবশ্য বর্তমানে মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে, তেলমূল্য কমে যাওয়ায় সৌদী আরবে অর্থের প্রাচুর্য কমে এসেছে। তাই এখন অপচয়ের মাত্রাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সম্পদের অপচয় আল্লাহ বরদাশত করেন না। সৌদী ওলামা সমাজ অপচয়ের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছেন।

মক্কা কল্যাণ সংস্থা মক্কা শহরের বিভিন্ন স্থানে হাজীদের সেবা আঞ্জাম দিচ্ছে। হজ্জ ও রমযানের সময় মক্কা শহরের প্রবেশপথে ছোট গাড়ীর বাধ্যতামূলক পার্কিং এলাকায়, বহিরাগত যিয়ারতকারীদের মধ্যে ইফতার ও সেহরী বিতরণ করে। তাছাড়াও রমযান মাসে মসজিদে হারামের মুসল্লীদের মধ্যে ইফতার ও সেহরী বন্টন করে। হজ্জের সময় হাজীদের মধ্যে প্রস্তুত খাবার, ঠাণ্ডা পানি ও বরফ বিতরণ করে। বিশেষ করে মিনা ও আরাফাতে এই সেবাকে আরো বেশী জোরদার করে। সংস্থা ১৪০৯ হিজরীর হজ্জে হাজীদের জন্য ৭০টি শিবির কায়েম করে। এর মধ্যে একটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক শিবিরে ২ হাজার হাজীর সংকুলানের ব্যবস্থা করা হয়। গরম থেকে বাঁচার জন্য হাজীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সংস্থা ঠাণ্ডা পানি সম্বলিত অনেক থার্মস হাজীদের মধ্যে বিতরণ করে এবং দাতাদের কাছ থেকে পোষাক ও কাপড় চোপড় সংগ্রহ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে। গরীব ও দুঃস্থ পরিবারের কেউ মারা গেলে কিংবা দুর্ঘটনার শিকার হলে, সংস্থা সে সকল পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক মিনার কোরবানীর পশুর গোশত বিতরণ প্রকল্প থেকে এই সংস্থাকে প্রয়োজনীয়

সংখ্যক কোরবানীর পশুর গোশত সরবরাহ করে। ব্যাংক বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ৭০টি ছাগল-দুম্বা ও ভেড়া সরবরাহ করছে এবং হজ্জ ও রমযানে আরো অনেক বেশী গোশত সরবরাহ করে। পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি সরবরাহ বিভাগ 'বাদশাহ ফাহাদ পানি প্রকল্প' থেকে সংস্থাকে বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করছে।

রান্না-বাড়ার জন্য সংস্থার নিজস্ব ভবনের নীচতলা নির্ধারিত রয়েছে। খাবার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বড় ফ্রিজও রয়েছে।

কল্যাণ সংস্থা ভবিষ্যতে আরো কিছু নতুন প্রকল্প হাতে নেয়ার চিন্তা করছে। তার মধ্যে মসজিদ সংস্কার, এবং উদ্বৃত্ত ওষুধ সংরক্ষণ ও বন্টনের জন্য একটি দাতব্য ফার্মেসী প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম। ওষুধের দোকান থেকে অনেক সময় ক্রেতারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ কিনতে বাধ্য হয়। পরে তারা উদ্বৃত্ত ওষুধ ফেলে দেয়। ফার্মেসীগুলো কোন কোন ওষুধ প্যাকেট ভেঙ্গে খুচরা বিক্রী করেনা। অনেক সময় ব্যবহারের জন্য ওষুধ সংগ্রহ করে ও তা ব্যবহার করা হয়না কিংবা আংশিক ব্যবহার করা হয়। মোটকথা, ঐ সকল উদ্বৃত্ত ওষুধ সংগ্রহ করে মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বিলি করার জন্য ফার্মেসী কায়েম করা হবে। উপরোক্ত সকল সেবা বিনামূল্যে দান করা হয়।

মক্কা কল্যাণ সংস্থা নিজস্ব ভবন তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রস্তাবিত ভবনে একই সময়ে ৪শ' লোকের খাবার তৈরির উপযোগী একটি রন্ধনশালা, ২শ' ফকীর-মিসকীনের থাকার জায়গা, শ্রমিকদের আবাসস্থল, গরীব লোকদের মধ্যে রেডিমেড পোষাক বিতরণের জন্য পুরুষদের জন্য একটি এবং মহিলাদের জন্য ১টি করে সেলাইঘর, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের জন্য ফার্মেসী নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রখ্যাত দাতা হাসান আব্বাস শরবতলী মসজিদে হারামের নিকট একখণ্ড জমীন কল্যাণ সংস্থাকে দান করায় সংস্থা তাতে ফকীর গরীবদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

৭. অন্যান্য বিষয়

মসজিদে আসার পথে তওয়াফ এবং উমরাহর মাসআলা সম্বলিত বই পুস্তক বিক্রির জন্য কিছু লোক দাঁড়িয়ে থাকে। তারা পবিত্র কুরআন মজীদও বিক্রী করে। যারা মসজিদে কুরআন দান করতে চায় তারা অনেকে সেখান থেকেই তা ক্রয় করে।

মসজিদের বাইরে স্থায়ীভাবে কিছু টেলিফোন আছে। এগুলো, স্থানীয়, আন্তঃশহর ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য নির্ধারিত। এজন্য যে ধাতব মুদ্রার প্রয়োজন, টেলিফোন বিভাগ তা সরবরাহ করে।

ফকীর-মিসকীনদের মক্কা শহরে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। তাদেরকে পেলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তারপরও ছদ্মবেশী ফকীরগণ, মসজিদের ভেতর মাতাফ ও অন্যান্য স্থানে ভিক্ষা করে। দাতারা ফকীর-মিসকীন পায় না। কিন্তু এদেরকে পেয়ে কিছু দান করার সুযোগ পায়।

৮. মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষন বা Maintenance

বর্তমানে মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষন বা Maintenance তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মসজিদে হারামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কার্পেট বিছানো এবং যমযমের পানি পান করানো। এই উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানীর সাথে ৩ বছর ব্যাপী ৫৪ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয়ে চুক্তি করা হয়েছে। (২) বৈদ্যুতিক সংস্থাপনের জন্য ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৯ হাজার রিয়ালের চুক্তি এবং (৩) সাধারণ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য তিন বছর মেয়াদী ২১ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয়ে আরেকটি কোম্পানীর সাথে চুক্তি হয়েছে।

মসজিদে হারামের পরিচ্ছন্নতা, কার্পেট এবং যমযমের পানি সরবরাহ বিভাগ, মসজিদের ভেতর বাবুস সাফার কাছে, সংশ্লিষ্ট কাজের ময়দানী তৎপরতা তদারকীর জন্য একটি অফিস খুলেছে। খোলা জায়গায় অবস্থিত ঐ অফিসটি খুবই সাদামাটা ধরনের। এতে, সামান্য কিছু আসবাবপত্র আছে। কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট তদারককারীরা সেখানে বসে তাদের কাজ পরিচালনা করেন।

মসজিদে হারামের অজু, টয়লেট ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা

মসজিদে হারামের অগণিত মুসল্লী এবং হজ্জের সময়ে লক্ষ লক্ষ হাজীর অজুর জায়গা এবং পেশাব পায়খানার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। একেতো মরুভূমি, কোন নদী-নালা নেই। অপরদিকে মসজিদে হারামের পার্শ্বে জায়গার অভাবের কারণেও এগুলো বড় কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে, ঐসব অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে, মসজিদে হারামে ৭টা বড় বড় অজুখানা এবং পায়খানা আছে। এগুলোর প্রত্যেকটিতে, নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রত্যেক টয়লেটের মধ্যেই সাথে অজুর জায়গা আছে। মোট টয়লেটের সংখ্যা হচ্ছে, ১৭০০। টয়লেট এবং অজুখানার পানি শহরের বাইরের উপত্যকাগুলো থেকে আনা হয়। একমাত্র মালকান উপত্যকা থেকেই বার্ষিক ১৬ কোটি ৭৫ লাখ রিয়াল ব্যয়ে ৫ হাজার টয়লেটে দৈনিক ৩৩ হাজার ঘন মিটার পানি সরবরাহ করা হয়।

উন্নত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হারামের টয়লেটের পানি নাক্কাসার অদূরে ফেলা হয়। এতে করে হারাম শরীফের পরিচ্ছন্নতা বহাল থাকে।

নহরে যোবায়দা

মক্কায় যমযম ছাড়া আর পান করার মত কোন পানি ছিল না। পরে খলীফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী যোবায়দা মক্কার অদূরে অবস্থিত নোমান ও হোনাইন উপত্যকার কূপের মিষ্টি পানি মক্কায় সরবরাহের জন্য একটা সরু নালা প্রবাহিত করেন ও পানি সরবরাহ করেন। এর পেছনে একটি ঘটনা কাজ করে।

একদিন যোবায়দা এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন, তার সাথে অজস্র লোক সঙ্গম করছে। তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চান। তিনি নিজ দাসীকে পাঠিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চান এভাবে যে, দাসী নিজেই ঐ স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারী শুনে বলেন, 'এ স্বপ্ন কে দেখেছে ঠিক করে বল, এটা অবশ্যই তুমি দেখনি'। তখন দাসী সত্য প্রকাশ করে বলে, 'যোবেদাই তা দেখেছে।' একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন, 'যোবায়দা এমন এক মহান কাজ করবেন যার দ্বারা অজস্র লোক উপকৃত হবে'। কিন্তু সেটি কি কাজ ছিল তা বুঝা যাচ্ছিল না।

৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কায় হজ্জে আসেন এবং মক্কাবাসীর পানির সমস্যা দেখতে পান। তখন তিনি ঐ নালা খনন করার পরিকল্পনা আঞ্জাম দিয়ে স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়ন করেন।

একদিকে, মক্কায় বহিরাগত হাজী ও যিয়ারতকারীদের ভীড় অপরদিকে, সেখানে রয়েছে পানির স্বল্পতা। নদী-নালা ও পুকুর না থাকায় পানির ক্রমবর্ধমান সমস্যা লেগেই আছে। তদুপরি কূপভিত্তিক পানি সরবরাহ পদ্ধতি ছিল সংকটজনক। কূপের পানি ভারী ও লবণাক্ত ছিল। তাই মক্কার স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথম থেকেই উটের পিঠে বোঝাই করে ওয়াদী ফাতেমা (বর্তমান জুমুম) থেকে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করত। কিন্তু এটা ছিল ব্যয়বহুল।
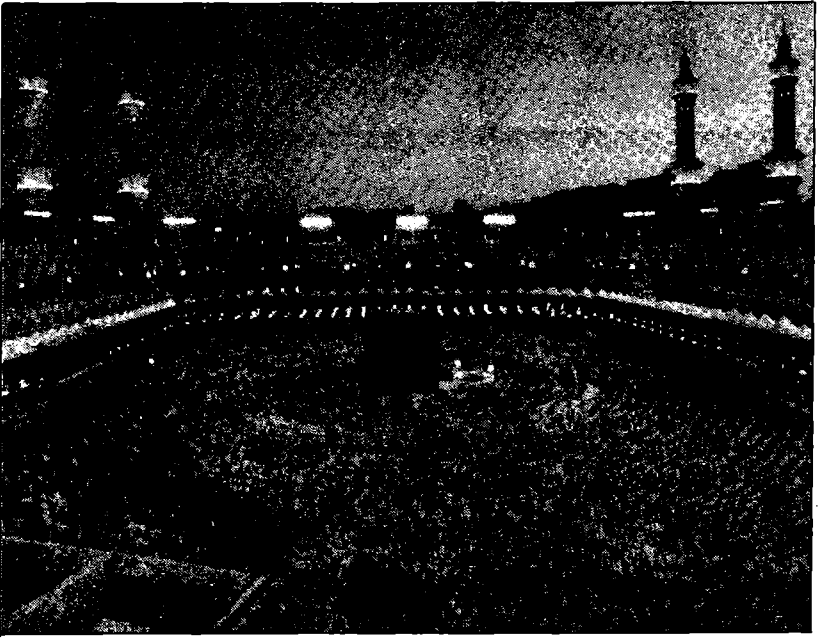
মসজিদে হারামের পূর্ণাঙ্গ ছবি

আল্লামা আযরাকীর 'আখবারে মক্কা' বই এর টীকা লেখক রুশদী সালেহ্ মালহাস ১৩৫৭ হিজরীর মুদ্রিত সংখ্যায় নহরে যোবায়দা সম্পর্কে একটি পরিশিষ্ট যোগ করেন। তিনি বলেন, হোনাইন ঝর্ণা কিংবা নহরে যোবায়দা তাদ পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়েছে। এই পাহাড়টি পুরাতন মক্কা-তায়েফ রোডের নিকট বর্তমান শারায়ে' কৃষি খামারের নিকটবর্তী। তাদ পাহাড়ের পানি হোনাইনে এসে পড়ত। যোবায়দা হোনাইনের সেই পানির ধারাটি কিনে তা থেকে সরু খালের মাধ্যমে মক্কায় পানি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আযরাকী নহরে যোবায়দা বলতে শুধু এটাকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু যোবায়দা ওয়াদী নোমান থেকে আরাফাতের উপর দিয়ে আরেকটি নালা প্রবাহিত করেছিলেন, আযরাকী সেটার কথা উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু হোনাইনের নালার কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

ওয়াদী নোমানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কারা পাহাড় থেকে নোমান ঝর্ণাধারাটি প্রবাহিত করা হয়। সেখান থেকে ওয়াদী নোমানের আওহার নামক জায়গায় উক্ত পানি এসে জমা হত। সেখান থেকে পানি দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে আরাফাতে

এসে কূপে মিলিত হয়। আরাফাতের ঐ পানিই হাজীরা পান করত। সেখান থেকে মোযদালেফা হয়ে মিনার পেছনে যোবায়দা কূপে এসে পানি পড়ত। এতে তার ১৭ লাখ দীনার খরচ হয়। যোবায়দা এই নহরটি মিনা পর্যন্ত নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হন।

৯৬৯ হিজরীতে মক্কায় বৃষ্টিপাত কমে যায় এবং ঝর্ণা ও কূপগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। শুধু আরাফাতের নহরের পানি বিদ্যমান থাকে। এতেও আবার পানি সরবরাহ কমে গিয়েছিল। তখন উসমানী খলীফা সুলতান সোলায়মানের কাছে মক্কার খরা ও কূপগুলো শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা পেশ করা হয়। এই সমস্যার কথা শুনে সুলতান সোলায়মানের মেয়ে ফাতেমা খানম নিজস্ব তহবিল থেকে উক্ত নহর সংস্কারের প্রস্তাব করেন। সুলতান তাতে রাজী হন। শাহজাদী ফাতেমা খানম উক্ত খাল সংস্কার করেন। এতে ১০ বছর সময় লেগে যায়। ৯৭৯ হিজরীতে উক্ত সংস্কার কাজ শেষ হয়। তিনি মিনা পর্যন্ত সংস্কার করে পরে তাকে মক্কা পর্যন্ত যোবায়দার নির্মিত হোনাইন ঝর্ণাধারার সাথে সংযুক্ত করেন। তখন দুটো ধারা একসাথে মক্কা পর্যন্ত প্রবাহিত হয় এবং এর ফলে মক্কার পানি সমস্যার সমাধান করা হয়। মক্কা অঞ্চলের ৬০টি এবং মিনা, মোযদালেফা ও আরাফাতের ৩০টি কূপে এসে এই পানি জমা হত।

২০ কিলোমিটার দীর্ঘ নহরে যোবায়দা, একটি সরু ও সংকীর্ণ নালা বা খালের নাম, যার মাধ্যমে হোনাইন এবং ওয়াদী নোমানের পানি মক্কায় সরবরাহ করা হয়। এই নালাটি উপর নীচসহ চতুর্দিক থেকে পাথর দ্বারা তৈরি এবং এতে চূন দ্বারা প্লাস্টার করা হয়েছে। ফলে, ঝর্ণার পানি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। নহরে যোবায়দাকে উপর থেকে দেখলে বুঝা যায় না যে, এটি একটি সরু নালা। ঢেকে রাখার কারণে এটাকে সরু সুড়ঙ্গের সাথে তুলনা করা যায়। এটি আরাফাত, মোযদালেফা ও মিনার মধ্য দিয়ে মোয়াল্লা পর্যন্ত এসে শেষ হয়। বিভিন্ন সময় এই নালার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে, এক পানি বন্টন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মক্কায় নহরে যোবায়দার পানি সরবরাহ করা হয়। মোয়াল্লা থেকে সাফা পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে এর একটি সরবরাহ লাইন নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বদিকের পাহাড়ে সরবরাহ করা হয়। এর সর্বশেষ সংস্কার করা হয় ১৯৬৭ সালে।

অন্যান্য উৎস থেকে মক্কায় ক্রমবর্ধমান পানি সরবরাহের কারণে বর্তমানে নহরে

যোবায়দার পানি অব্যবহৃত। তাই ভবিষ্যতে এই পানিকে কি কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। সম্ভবতঃ কৃষি কাজ, পশুর পানীয় ও গাছ উৎপাদনের কাজে তা ব্যবহার করা হতে পারে।

বর্তমানে, আযিযিয়া থেকে মোযদালেফা পর্যন্ত মক্কা শহর সম্প্রসারণের কারণে নহরে যোবায়দা হুমকীর সম্মুখীন। এটি উপত্যকার এক পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মিনার উন্নয়ন তৎপরতার জন্য বিভিন্ন সময় উপত্যকায় বহু খননকার্য চালানো হয়েছে। এ পর্যন্ত তা অক্ষত থাকলেও ভবিষ্যতে তা আশংকামুক্ত নয়।

শোয়াইবিয়ার বাদশাহ ফাহাদ লবণমুক্ত পানি প্রকল্প

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয মক্কা থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের শোআইবিয়া উপকূলে ১৯৮৮ সালের ২২শে জুন নতুন একটি লবণমুক্ত পানির প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। এতে দৈনিক ৪০ মিলিয়ন গ্যালন পানি লবণমুক্ত করে পান করার উপযোগী করা হয়। ২৫ মিলিয়ন গ্যালন পানি মক্কায় এবং ১৫ মিলিয়ন গ্যালন পানি তায়েফে সরবরাহ করা হচ্ছে। সাগর থেকে মক্কা পর্যন্ত দু'টো স্থানে পাম্প কেন্দ্র স্থাপন করে নীচ থেকে পাম্পিং এর মাধ্যমে উপরে পানি উঠানো হচ্ছে। এ পানি মক্কায় সরবরাহ করা হচ্ছে এবং মক্কার লোকেরা তা ব্যবহার করছে।

মক্কায় ১২০ কিলোমিটার দূর থেকে পানি আনতে হলে এক বিশাল পাইপ লাইনের প্রয়োজন। শোয়াইবিয়া থেকে তায়েফ পর্যন্ত ৪২ কিলোমিটার এবং সেখান থেকে আরাফাত পর্যন্ত আরো ৬৬ কিলোমিটার পর্যন্ত পাইপলাইন বসানো হয়েছে। শোয়াইবিয়া থেকে তায়েফে পানি নিতে ১৩ কিলোমিটার পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে। এটি মধ্যপ্রাচ্যের সবচাইতে বড় সুড়ঙ্গপথ।

তায়েফ সমুদ্রের স্তর থেকে ১৭৪৫ মিটার উঁচু। সেখানে পানি তুলতে ৪টি পাম্প স্টেশন কায়েম করা হয়েছে। ৫ বিলিয়ন সৌদী রিয়াল ব্যয়ে নির্মিত উক্ত বিশাল প্রকল্পে পানি উৎপাদনের সাথে সাথে ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এমন একটি বিশাল প্রকল্পের আয়ু সর্বোচ্চ ২০ বছর। তারপর তা নষ্ট হয়ে যায় এবং বিকল্প আরেকটি নতুন প্রকল্প দাঁড় করাতে হয়।

সাধারণ মওসুমে মক্কায়, দৈনিক ৬০-৭২ হাজার ঘনমিটার পানি এবং হজ্জ মওসুমে ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার ঘনমিটার পানির প্রয়োজন পড়ে। ১৪০৯ হিজরীর

হজ্জ মওসুমে মক্কায় মোট ৩২ লাখ ঘনমিটার পানি এবং মিনা-মোযদালেফা ও আরাফাতে ৭৭৭ হাজার ঘনমিটার পানি ব্যবহৃত হয়।

মক্কার পানি চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। সেজন্য মক্কার অদূরে ওয়াদী মালাকানে 'মালাকান উপত্যকা প্রকল্প' নামে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেই প্রকল্পের আওতায় ২২টি কূপ খনন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে মক্কায় পানি সরবরাহ লাইন ও রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। এই উপত্যকার পানি মক্কার প্রধান রিজার্ভার কাওয়াশেকে সংরক্ষণ করা হয় এবং সেখান থেকে মক্কার অধিকাংশ এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয়। এই রিজার্ভার থেকে দৈনিক ৩৩ হাজার ঘনমিটার পানি সরবরাহ করা হয় যা মক্কার বর্তমান পানি চাহিদার অর্ধেক পূরণ করে।

তাছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি সরবরাহ বিভাগ ওয়াদী ফাতেমার পানি হাদ্দার মধ্য দিয়ে কাওয়াশেক রিজার্ভারে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে। হজ্জের সময় পানি সরবরাহ বিভাগ পাহাড়ের উপর অবস্থিত মোট ১৭টি রিজার্ভার চালু করে এবং সেগুলোতে পানি উত্তোলনের জন্য মোট ৩২টি পাম্পিং স্টেশন কায়েম করে। পানি সরবরাহ বিভাগ মক্কায় পানি সরবাহের মাধ্যমে মসজিদে হারাম এবং হাজীদের পানি সেবার নিশ্চয়তা বিধান করার চেষ্টা চালায়। ওয়াদী ফাতেমায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে, ২ কোটি ঘনমিটার পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এই পানি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি ও কৃষি কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়াও, মক্কার অদূরে ওসফান, জোরানা এবং নাখলাসহ অন্যান্য উপত্যকায় প্রচুর মিষ্টি পানির কূপ আছে। পানির অভাব দেখা দিলে মক্কার পানি ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে পানির পাত্র ভর্তি করে মক্কায় পানি বিক্রী করে। গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেগুলো থেকে পানি উঠানো হয় এবং সেখানে ভূগর্ভস্থ পানির প্রাচুর্যের কারণে গভীর নলকূপ দ্বারা পানি সেচ করে কৃষিকাজ করা হয়।

বাদশাহ ফাহাদ পানি কল্যাণ প্রকল্প

১৪০৪ হিজরীতে বাদশাহ ফাহাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মক্কার অদূরে রাহজান উপত্যকায় বাদশাহ ফাহাদ পানি কল্যাণ প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল হাজী ও মসজিদে হারামের যিয়ারতকারীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুবিধেজনক স্থানে ১২০টি কুলার বসানো হয়েছে। এই

প্রকল্পের ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, ১. উৎপাদন ২. সংরক্ষণ ও ৩. সুষ্ঠু বিতরণ।

বিভিন্ন কূপ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাম্পিং করে পানি তুলে তা মূল প্লান্টে নেয়া হয়। তারপর অতিবেগুনি আলো দ্বারা পানি পরিশুদ্ধ করা হয়। ৪টি মেশিনের সাহায্যে এতে ঘন্টায় ১ লিটার বিশিষ্ট ১৪ হাজার ৪শ' প্যাকেট তৈরি করা হয়। জমুম উপত্যকার ৪টি বিশাল রিজার্ভারে এবং মিনায় ৬৪টি রিজার্ভারে উক্ত পানি সংরক্ষণ করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চলীয় জোনের পানি সরবরাহ বিভাগ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব হাতে নিয়ে রমযান ও হজ্জ মওসুমে হাজীদেরকে ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করছে। ১৪১০ হিজরীতে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০ মিলিয়ন লিটার ঠাণ্ডা পানির প্যাকেট বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি শুরুর পর থেকে ক্রমান্বয়ে প্রতিবছর এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মসজিদে হারামের চারপার্শ্বে মিনা, মোযদালেফা, আরাফাত, এবং মক্কার বিভিন্ন প্রবেশ পথে এই ঠান্ডা পানি বিতরণ করা হয়। এজন্য শতশত এয়ারকণ্ডিশন্ড গাড়ী ব্যবহার করা হয় যেন পানি ঠাণ্ডা থাকে।

মসজিদে হারামের প্রশাসন

আগে, মক্কার গভর্নর ও শাসকরাই মসজিদে হারামের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। খেলাফতে রাশেদা, উমাইয়া, আব্বাসী এবং সারাকেশা শাসনামলে মক্কার গভর্ণর এবং শাসকরাই সরাসরি মসজিদে হারামের সেবার ত্রুটির জন্য খলীফা, বাদশাহ ও সুলতানদের কাছে জবাবদিহী করতেন।

কিন্তু তুরস্কের উসমানী খেলাফতের সময় থেকে মক্কার শাসক বা গভর্নরকে 'শেখুল হারাম' এই বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাঁর একজন সহকারী নিয়োগ করা হয়। মূলতঃ এই সহকারীই সরাসরি মুয়াজ্জিন, পিয়ন, ঝাড়ুদার, দারোয়ানসহ অন্যান্য সকল বিভাগের কাজের তদারক করতেন। তারপর তুর্কী সুলতানরা ওয়াকফ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই বিভাগের প্রধানকে 'ওয়াকফ বিভাগের পরিচালক' উপাধিতে ভূষিত করে। এই বিভাগের কাজ হচ্ছে, মসজিদে হারামের নামে সকল ওয়াকফ সম্পত্তির দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করা, মসজিদে হারামের সকল কর্মচারীর বেতন দেয়া এবং বিদেশ থেকে আগত সাহায্য সামগ্রী, পূর্ব নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক বিলি-বন্টন করা। এই বিভাগ মসজিদে হারামের ইমাম ও মুয়াজ্জিন থেকে শুরু করে, সকল কর্মচারীর নাম একটি দফতরে লিপিবদ্ধ করে এবং কা'বার সেবক ও চাবি রক্ষকসহ অধীনস্থ কর্মচারীদের নামও লিপিবদ্ধ করে। কা'বার সেবককে কা'বা ধৌতকরণ এবং সুগন্ধিজাত দ্রব্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে। ওয়াকফ বিভাগ 'শেখুল হারাম' তথা মক্কার গভর্নরের অধীন কাজ পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরাসরি কনস্টান্টিনোপলের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তুর্কী সুলতান ১ম সেলিম খানের আমল পর্যন্ত এইভাবেই মসজিদে হারামের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

১৩৩৪ হিজরীর ৯ই শাবান, বাদশাহ শরীফ হোসাইন বিন আলী, হেজাযের স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজে যখন এর বাদশাহ হন, তখনও তিনি এই পদ্ধতিতেই মসজিদে হারামের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে তিনি একটি পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করেন। পুলিশ বিভাগের কাজ হল চোর ও ফেতনা সৃষ্টিকারীদের দমন করা এবং মসজিদে হারামে হারিয়ে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে তা প্রকৃত মালিকের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা।

তারপর বাদশাহ আবদুল আযীয, হেজাজের ক্ষমতা লাভ করার পর 'হারাম প্রশাসনিক পরিষদ' গঠন করেন এবং এর উপর মসজিদে হারামের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও অন্যান্য সকল সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। উসমানী খেলাফতের সময় মুসলিম বিশ্বের শাসকদের পক্ষ থেকে আসা উপহার, দান ও ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে মসজিদে হারামের কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেয়া হত। কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সৌদী সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে হারাম শরীফের সকল কর্মচারীদের বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং তুর্কী আমলের চেয়ে কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

পরবর্তীতে হারাম প্রশাসনিক পরিষদের নাম পরিবর্তন করে এর নামকরণ করা হয়- اَلرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ لِشُئُوْنِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ

অর্থাৎ হারামাইন শরীফাইন সংক্রান্ত সাধারণ প্রেসিডেন্সী। এই সংস্থার উপর মক্কার মসজিদে হারাম এবং মদীনার মসজিদে নববীর প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

হারামাইন প্রশাসনের বিল্ডিং

এতে একজন প্রেসিডেন্ট এবং দুই হারাম সম্পর্কে দু'জন ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছে। সৌদী বাদশাহ সরাসরি প্রেসেডেন্ট নিযুক্ত করেন। এই সংস্থা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর সকল সমস্যার সমাধান, উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিভিন্নমুখী সেবা প্রদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে। মারওয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে সাধারণ প্রেসিডেন্সীর বহুতল বিশিষ্ট ভবনটি অবস্থিত। এতে মোট ১৪টি বিভাগ আছে।

মসজিদে হারামের পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন

মসজিদে হারামের ব্যাপক উন্নয়নের অংশ হিসেবে এর পারিপার্শ্বিক উন্নয়নও জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বেশী সংখ্যক হাজী ও উমরাহকারী লোকদের আগমনের সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের থাকা-খাওয়ার সুযোগ-সুবিধাও বাড়াতে হবে। তাই খাদেমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের আমলে, বেসরকারী উদ্যোগে 'মক্কা উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কোম্পানী' গঠিত হয় এবং তারা মসজিদে হারামের বাইরের নিকটবর্তী এলাকাসমূহের উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে।

কোম্পানীর প্রকল্পগুলো মেসফালামুখী হিজরাহ সড়ক এলাকায় অবস্থিত। এখানকার সবগুলো ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পে, ৬৪,৭২২ বর্গ-মিটার এলাকা জুড়ে ৩২ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

এতে ৬৪৪টি ফ্লাট এবং ৬৫০ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। হোটেলটির আয়তন হচ্ছে ৩২,৭৫৭ বর্গমিটার। এ ছাড়াও ৪,১০০ বর্গমিটার এলাকায় অফিস ও চিকিৎসাকেন্দ্র, ২৩,৭৯০ বর্গমিটার এলাকায় নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক নামাযের স্থান নির্মাণ করা হয়েছে। এতে গাড়ীর পার্ক এবং রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে।

মসজিদে হারামের সাথে মক্কার রাস্তাঘাট ও সুড়ঙ্গ পথের সংযোগ

মক্কায় প্রচুর রাস্তা-ঘাট রয়েছে। মক্কাকে, উন্নত রাস্তা-ঘাটের বিচারে পৃথিবীর যে কোন আধুনিক শহরের সাথে তুলনা করা যায়। শহরের সর্বত্র সব অলি-গলির রাস্তাসমূহ পাকা। তবে মক্কার মত পাহাড়ী শহরে রাস্তাঘাট নির্মাণ বহু কঠিন কাজ। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির জোরে উঁচু পাহাড়ের উপরও পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। গাড়ীর মাধ্যমে সেই সকল উঁচু দুর্গম স্থানে উঠতে হয়। তারপরও পাহাড়ের কারণে অনেক জায়গায় রাস্তা নির্মাণ সম্ভব হয়নি। শহরের কোন কোন অংশ থেকে সরাসরি হারামে আসার পথ ছিল না, দূর দিয়ে ঘুরে আসতে হত।

তাই ১৪০০ হিজরী সনে মক্কার বিভিন্ন উপকণ্ঠ থেকে সরাসরি মসজিদে হারামে আসার জন্য পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়। এতে করে বর্তমানে শহরের যে কোন এলাকা থেকে হাজী এবং স্থানীয় জনগণ সরাসরি মসজিদে হারামে আসতে পারে।

মসিজেদ হারামের সম্মুখের রাস্তাঘাটে গাড়ী চলাচল বন্ধ করে তা পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছ। এতে করে মুসল্লীরা ভীড় ও যানজট থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তাই সাবেক সোকে সগীর এলাকায় মাটির নীচে একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে এবং তাতে গাড়ী চলাচল করছে। সুড়ঙ্গটি শোবেকা থেকে জিয়াদের ১ম রিং রোডের মাথা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে এবং এটি বাবে আবদুল আযীযের সামনে দিয়েই অতিক্রম করেছে। সুড়ঙ্গের ভেতর গাড়ীর রাস্তায় ফুটপথ রয়েছে। মসজিদে হারামের নূতন সম্প্রসারিত ভবন থেকে ও তায়বিয়া সড়ক এবং সারে' মানসুর অভিমুখী দু'টো অতিরিক্ত সুড়ঙ্গ তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তা বাস্তবায়িত হলে মসজিদে হারামে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিড় আরও হ্রাস পাবে।

১৯৯৩ সালের শেষ নাগাদ পবিত্র মক্কা নগরীতে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছে। সুড়ঙ্গ পথগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ২৮ কিলোমিটার। সুড়ঙ্গগুলোতে পর্যাপ্ত বাতাস, আবহাওয়া ঠাণ্ডা রাখা এবং আগুন নিভানোসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোন্ সুড়ঙ্গপথে গাড়ী এবং কোন্ সুড়ঙ্গপথে লোকেরা পায়ে হেঁটে চলবে তা সুড়ঙ্গপথের মুখে সাইনবোর্ডে লিখে দেয়া হয়েছে।

একমাত্র মিনা ও মোযদালেফার পবিত্র স্থানসমূহেই মোট ২৮টি সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল, সেখানে হাজীদের চলাচল যেন সহজসাধ্য হয়।

১ম রিং রোড ঃ (চারদিক থেকে মসজিদে হারাম পরিবেষ্টনকারী)

মসজিদে হারামের চারদিক থেকে মুসল্লীদের হারাম শরীফে আসার উদ্দেশ্যে হারামের পাশ ঘেঁষে ১ম রিং রোড তৈরি করা হয়েছিল। এখন শুধু বাবে আবদুল আযীযের সামনে মাটির নীচ দিয়ে এবং বাবে উমার থেকে বাবে ফাত্হ বরাবর মারওয়ার সামনের রিং রোডের অংশটুকু বাকী আছে। বাবে আবদুল আযীয থেকে কাসাসিয়া হয়ে গাজ্জা অভিমুখী অংশটুকু আবু কোবায়েস পাহাড়ে রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা এবং সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত অংশটুকু আঙ্গিনা সম্প্রসারণের কারণে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। লোহার তৈরি ওভারব্রীজের মাধ্যমে ঐ দুই স্থানে রিং রোড তৈরি করা হয়েছিল।

আভ্যন্তরীণ ২য় রিং রোড

দীর্ঘদিন যাবত ১ম রিং রোডের মাধ্যমে যানজট ও ভীড় কমানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকে। কিন্তু সৌদী আরবের ব্যাপক উন্নয়ন, গাড়ীর সংখ্যা ও হাজীর সংখ্যা বাড়ার কারণে উক্ত ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। তাই মসজিদে হারামের প্রায় ১ কিলোমিটার দূর দিয়ে চতুর্দিকে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ২য় রিং রোড নির্মাণ করা হয়। এই রিং রোড তৈরিতে ৬টি প্রধান দ্বিমুখী সুড়ঙ্গ, ৪টি পার্শ্ব সুড়ঙ্গ, ৭টি ক্রসিং এবং কয়েকটি ওভারব্রীজ তৈরি করতে হয়েছে। এর মধ্যে মেসফালার সাথে তানদুবাঈ এবং সোলায়মানিয়া থেকে শো'বাতুল মাগরেবা পর্যন্ত দীর্ঘ ২,১৬১ মিটার লম্বা দু'টো দ্বিমুখী সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। শে'বে আমের থেকে জিয়াদ পর্যন্ত ৩,০৭৭ মিটার দীর্ঘ আরেকটি সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।

জিয়াদের রাই বখশ এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১,৮২৪ মিটার দীর্ঘ আরও ৩টি প্রধান সুড়ঙ্গ পথ এবং ৪টি পার্শ্বসুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে, ৬,৭০০ মিটার দীর্ঘ ওভারব্রীজসহ ৭টি ক্রসিং তৈরি করা হয়েছে।

২য় রিং রোডের আওতায়, মসজিদে হারামের বাবে আবদুল আযীয থেকে মেসফালার বিরকা এলাকা পর্যন্ত ৭শ' মিটার লম্বা একটি সুড়ঙ্গ পথ এবং কুদাই পর্যন্ত ১৮০০ মিটার লম্বা আরেকটি সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করা হয়েছে। দুই সুড়ঙ্গের মাঝে ১শ' মিটার খালি জায়গা রয়েছে।

শে'বে আলী থেকে আজইয়াদ সাদ এবং সেখান থেকে মিনা অভিমুখে মাহবাসুল জিন পর্যন্ত দু'টো দ্বিমুখী সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে। হাজীরা এ সুড়ঙ্গপথে মিনায় আসা-যাওয়া করে। এ সুড়ঙ্গ পথটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব অনেক কমে গেছে।

বাবুল মালেক আবদুল আযীয থেকে কুদাই পর্যন্ত এবং একই সুড়ঙ্গ পথের মাঝখান থেকে মেসফালা অভিমুখী আরেকটি সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আজইয়াদ কবীর থেকে জাবালে সাওর অভিমুখী আরেকটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছে। মেসফালা থেকে সারে' মনসুর, সোলায়মানিয়া থেকে জারওয়াল এবং শে'বে আমের থেকে মালাওয়ী পর্যন্ত দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছে।

মধ্যবর্তী রিং রোড বা ৩য় রিং রোড

মক্কা শহরের সাথে মসজিদে হারামের যোগাযোগকে আরো বেশী সুষ্ঠু ও নিশ্চিত করার স্বার্থে ৩য় রিং রোড নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মসজিদে হারাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরত্ব দিয়ে ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং দুই ভাগে বিভক্ত উক্ত রিং রোডের প্রতিভাগে গাড়ী চলাচলের জন্য ৩টি করে ট্রাক থাকবে। এতেও কিছুসংখ্যক সুড়ঙ্গ এবং ক্রসিং নির্মাণ করা হবে। মিনার একটি সড়ক এই রিং রোডের সাথে এসে মিলিত হবে এবং মসজিদে হারামগামী প্রতিটি রাস্তা এর সাথে সংযুক্ত হবে।

মক্কা শহরের বাইরের রিং রোড বা ৪র্থ রিং রোড

সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্য মক্কা শহরের বাইরে একটি রিং রোড নির্মাণ করা হয়েছে। এই রোডটি অন্যান্য শহর যেমন, জেদ্দা, তায়েফ ও মদীনার রাস্তাগুলোর সাথে সংযুক্ত। শুধু তাই নয়, মক্কার সাথে পবিত্র স্থানসমূহের যোগাযোগ উন্নয়নের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা চলছে। বর্তমানে মক্কা থেকে, মিনা, মোযদালেফা এবং আরাফাত পর্যন্ত রেলগাড়ী চালুর ব্যাপারে গবেষণা চলছে। অনুরূপভাবে জেদ্দা থেকেও মক্কা পর্যন্ত ব্যাপক যোগাযোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, লক্ষ লক্ষ হাজীর ব্যাপক ও সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্য রেল যোগাযোগ বেশী উপকারী হবে।

মোট কথা, মক্কা শহরের দুর্গম যোগাযোগকে সৌদী শাসনামলে সুগম করার ব্যাপক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মক্কার সাথে আন্তঃশহর যোগাযোগ এবং মক্কা গেট

মক্কা শহরে পাহাড়-পর্বতের কারণে আগে হারাম শরীফে আসতে অনেক ঘুরে আসতে হত। কিন্তু, পরবর্তীতে পাহাড় কেটে ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ করাতে এখন আর দূর দিয়ে ঘুরে আসার প্রয়োজন হয় না। বরং বলা যায় যে, মক্কার সব এলাকার সাথে সমজিদে হারামের দূরত্ব কমে এসেছে। এই হচ্ছে শহরের ভেতর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

কিন্তু শহরের বাইরে, আন্তঃশহর যোগাযোগের জন্য রয়েছে বিরাট বিরাট প্রশস্ত সড়কসমূহ। চারদিক থেকে ঐসব সড়ক এসে মক্কার সাথে মিলিত হয়েছে। ঐ বিরাট সড়কগুলো আধুনিক যুগের সর্বোত্তম সড়ক।

মক্কার সাথে তায়েফের দুটো সড়ক আছে। একটি হচ্ছে পুরাতন সড়ক। অর্থাৎ মক্কা-সায়েল-তায়েফ সড়ক। সেটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১২৫ কিলোমিটার; অন্যটি হচ্ছে মক্কা-হাদা-তায়েফ রিং রোড। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭৫ কিলোমিটার। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা কেটে ও সমতল করে ঐ রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আসা ও যাওয়ার জন্য সবগুলো সড়কই দুই ভাগে বিভক্ত। পুরাতন তায়েফ রোডে ২টি এবং রিং রোডে ৪টি করে ট্র্যাক আছে। প্রত্যেক ট্র্যাকে একটি করে গাড়ী চলতে পারে।
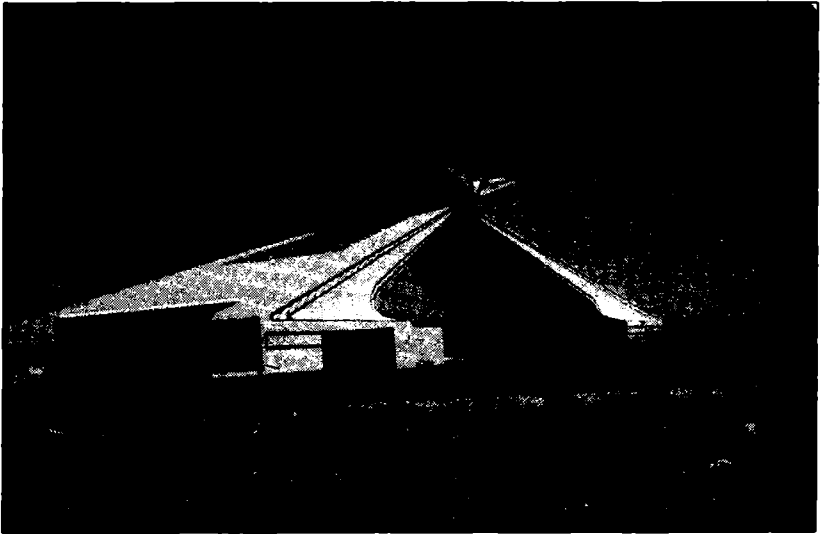
মক্কা গেট

অপরদিকে, মক্কা থেকে মদীনাগামী দুইভাগে বিভক্ত রাস্তার প্রতিটিতে ৪টি করে ট্র্যাক আছে। সেটি পরে জেদ্দা-মদীনা হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে এবং মসজিদে কুবার পাশ দিয়ে মদীনায় গিয়ে লেগেছে। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব ৪৩০ কিলোমিটার।

মক্কা থেকে জেদ্দাগামী দুটো সড়ক আছে। পুরাতন সড়কটির প্রতিভাগে ২টি করে ট্র্যাক আছে। অপরদিকে নতুন সড়কটির প্রতিভাগে ৪টি করে ট্র্যাক আছে। এটি মক্কা থেকে জেদ্দা পর্যন্ত সর্বত্র বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা সজ্জিত। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭৩ কিলোমিটার। মক্কা থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে, এক্সপ্রেস রোডের উপর কুরআনের স্ট্যাণ্ড এর আকৃতিতে মক্কা গেট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৪৮ মিলিয়ন রিয়াল খরচ হয়েছে। লীচ এবং জীযানের সাথে যোগাযোগের জন্য আরেকটি এক্সপ্রেস রোড নির্মিত হয়েছে। আসা-যাওয়ার পথে প্রতিটিতে একাধিক ট্র্যাক আছে। পুরাতন জীযান সড়কটি এখন অকেজো। সম্প্রতি আরও ৪টি আন্তঃশহর সড়কে ৪টি গেট নির্মিত হয়েছে। সেগুলো হল ঃ ১. পুরাতন মক্কা-জেদ্দা রোড ২. মক্কা-লীচ রোড ৩. মক্কা-মদীনা সড়ক এবং ৪. মক্কা-সায়েল-তায়েফ সড়ক।

মসজিদে হারামের লাইব্রেরী

ইসলাম জ্ঞান শিক্ষাকে ফরয ঘোষণা করেছে। লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানসমুদ্র বা জ্ঞান সংগ্রহের চৌরাস্তা। তাই লাইব্রেরীর গুরুত্ব ইসলামে সর্বাধিক।

দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ্জ ও উমরাহর জন্য যারা মক্কায় ছুটে আসে, তারা এখানে কিছু সময় কাটায় এবং অবসর থাকে। এছাড়াও মুসলিম গবেষকদের জ্ঞান গবেষণার জন্যও এখানে একটি লাইব্রেরী প্রয়োজন। তাই মসজিদে হারামের জেনারেল প্রেসিডেন্সী একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন।

মক্কার সম্মান ও মর্যাদার কারণে, বিভিন্ন যুগে মুসলিম খলীফা ও বাদশাহগণ মসজিদে হারামের লাইব্রেরীর জন্য বহু কিতাব এবং পুস্তক উপহার দিয়েছেন। তাই মসজিদে হারামের ভাণ্ডারে হিজরী ৫ শতাব্দীতে অসংখ্য কিতাব এসে জমা হয়। কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐসব বই হিজরী ৫ শতাব্দীরও আগে এসে জড়ো হয়। এটাই মসজিদে হারামের লাইব্রেরীর সূচনার জন্য দায়ী। তবে মসজিদে হারামের লাইব্রেরীর সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ জানা যায় না। সম্ভবতঃ ৪শ' হিঃ থেকে এর সূচনা হয়।

১২৬২ হিজরীতে লাইব্রেরীটিকে 'সোলায়মানিয়া লাইব্রেরী' কিংবা 'মজিদিয়া লাইব্রেরী' বলা হত। তুর্কী সুলতান সোলায়মান এবং আবদুল মজীদের নামানুসারে ঐ নামকরণ করা হয়। পূর্বে এর নাম ছিল কুতুবখানা। তারাই মক্কার বিভিন্ন ওয়াকফ থেকে ঐসব কিতাব সংগ্রহ করে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর এতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব লাইব্রেরী এসে যোগ হওয়ায় ক্রমান্বয়ে লাইব্রেরীর উন্নতি হতে থাকে।

১৩৫৭ হিজরীতে বাদশাহ আবদুল আযীয মক্কার উলামায়ে কেরামকে নিয়ে লাইব্রেরীর অবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করেন। তারপর এতে বাদশাহ আবদুল আযীযের নিজস্ব লাইব্রেরীও যোগ করেন। ফলে, লাইব্রেরীর কিতাব সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। এরপর লাইব্রেরীটির নামকরণ করা হয় 'মাকতাবাতুল হারাম আল-মক্কী আশ শরীফ'। এরপর এসে সৌদী আরবের বিভিন্ন আলেম ও মাশায়েখের বড় বড় নিজস্ব লাইব্রেরীসমূহ যোগ হয়। ইতিপূর্বে লাইব্রেরীটি জারওয়ালে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে তা শারে' মনসুরে অবস্থিত। এতে বর্তমানে ১৫টি বিভাগ আছে। বক্তৃতা অনুষ্ঠানের হলে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বক্তৃতা হয়।

লাইব্রেরীতে বর্তমানে বই-এর সংখ্যা ২ লাখেরও বেশী। এছাড়াও এতে দুষ্প্রাপ্য ৬৯১৮টি মূল পাণ্ডুলিপি, ৩ হাজার মাইক্রো ফিল্ম, ৬শ' খণ্ডের ফটোকপি এবং সাড়ে ৬ হাজারেরও বেশী সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা রয়েছে। নারী পুরুষের লেখা-পড়ার জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৬ হাজার ক্যাসেট রয়েছে।

বর্তমানে, লাইব্রেরীর বই-এর তালিকা তৈরিতে কম্পিউটারের ব্যবহার, বই এর হেফাজতের ব্যাপারে টেলিভিশন ক্যামেরার দ্বারা পর্দায় পাঠকদের গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে অন্ধ পাঠকদের সুবিধা দানের ব্যাপারে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ চিন্তা ভাবনা করছেন।

পাবলিক লাইব্রেরী

মক্কা পৌরসভা মসজিদে হারামের পূর্ব পার্শ্বে কাসাসিয়ায় ৮শ' বর্গমিটার এলাকার উপর হারাম শরীফের যেয়ারতকারীসহ ছাত্রদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য একটি পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করবে। কাসাসিয়া হচ্ছে, বর্তমান মসজিদে হারামের বাবে আলী ও বাবুস সালাম বরাবর হারাম শরীফের সম্প্রসারিত আঙ্গিনা সংলগ্ন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। তারীখ এমরাতুল মসজিদিল হারাম, হোসাইন আবদুল্লাহ বাসালামাহ।
২। প্রাগুক্ত
৩। প্রাগুক্ত
৪। প্রাগুক্ত
৫। আখবারে মক্কা।
৬। প্রাগুক্ত
৭। তারীখ এমরাতুল মাসজিদিল হারাম, হোসাইন আবদুল্লাহ বাসালামাহ।
৮। প্রাগুক্ত
৯। প্রাগুক্ত
১০। প্রাগুক্ত
১১। প্রাগুক্ত
১২। প্রাগুক্ত।

৬. সাফা-মারওয়া

সাফা-মারওয়ার বর্ণনা

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটি আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে সাঈ করা হানাফী মাজহাবে ওয়াজিব এবং শাফেঈ, হাম্বলী এবং মালেকী মাজহাবের এক রেওয়ায়েতে ফরজ ও হজ্জের অন্যতম রোকন।

সাফা পাহাড় অপেক্ষাকৃত কম উঁচু এবং পার্শ্ববর্তী উঁচু জাবালে আবু কোবায়েসের একটি অংশ। এটি বর্তমানে বাবুস সাফা সংলগ্ন। এটি মসজিদে হারামের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

অপরদিকে, মারওয়া হচ্ছে, মসজিদে হারামের পূর্ব-উত্তরে কুআইকাআন পাহাড়ের একটি অংশ। মারওয়া পাহাড়ও অপেক্ষাকৃত নীচু। এটি বাবুল মারওয়া সংলগ্ন।

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটিকে মাসআ' বলা হয়। এই রাস্তা দিয়েই দুই পাহাড়ের সাঈ করতে হয়। এই রাস্তাটির (মাসআ') দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০৫ মিটার। সাধারণতঃ এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় পর্যন্ত একবার সাঈ করতে ৬/৭ মিনিট এবং মোট ৭ বার সাঈ করতে ৪০/৪৫ মিনিট সময় লাগে। ভিড়ের সময় এবং বয়স্ক লোকদের সাঈতে আরো বেশী সময় লাগে।

জাহেলিয়াতের যুগে সাফা পাহাড়ে আসাফ নামক একটি মূর্তি এবং মারওয়ার উপর নায়েলা নামক অন্য আরেকটি মূর্তি ছিল। লোকেরা তখন বাইতুল্লাহর তওয়াফ শেষে ঐ মূর্তি দুটো মাসেহ করত। ইসলাম আসার পর মুসলমানরা সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে ইতস্তত বোধ করে। কেননা, এর সাথে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের যদি সামঞ্জস্য হয়ে যায়। এইজন্য আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করে মুসলমানদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করেন। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ
فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًافَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌعَلِيْمٌ

অর্থ ঃ 'সাফা এবং মারওয়া নিশ্চয়ই আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি
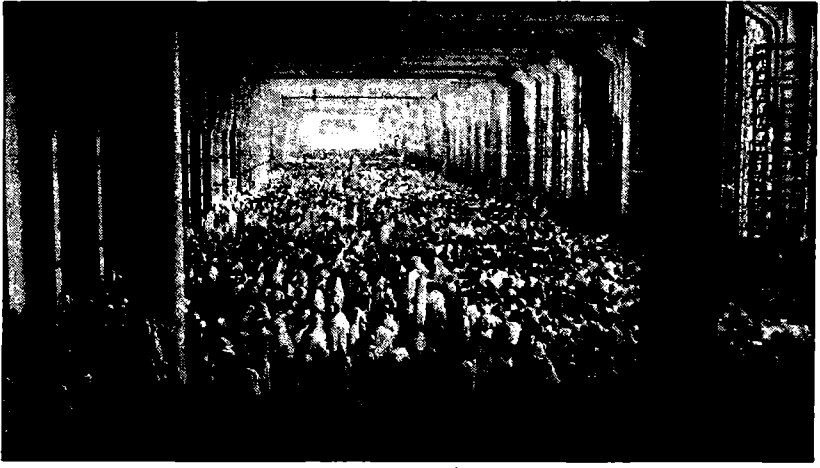
সাফা-মারওয়ায় সাঈ'র দৃশ্য

হজ্জ কিংবা উমরাহ করে, তার জন্য এই পাহাড়দ্বয়ে সাঈ করা গুনাহর বিষয় নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা ও উৎসাহে কোন মঙ্গল কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং এর মূল্য দান করবেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা ও মারওয়ার সাঈর ব্যাপারে বলেন, اِبْدَأُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ অর্থাৎ প্রথমে সাফা থেকে সাঈ শুরু কর। কেননা, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজেও প্রথমে সাফার কথা উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ فَاسْعَوْا

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর সাঈ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা সাঈ কর।

ইমাম আহমদ সফিয়া বিনতে শায়বা থেকে এবং তিনি হাবীবা বিনতে আবী তাজরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হাবীবা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে দেখেছি। তিনি পেছনে এবং লোকেরা তাঁর সামনে ছিল। দ্রুত সাঈ করার সময় তাঁর ইযার সরে যাওয়ায় আমি তাঁর হাঁটু মোবারক দেখি। তিনি বলেন, তোমরা সাঈ কর। আল্লাহ সাঈকে তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

সাফা-মারওয়া ঃ অতীত থেকে বর্তমান

আল্লামা উমরী তাঁর مسالك الابصار কিতাবে লিখেছেন, সাফা পাহাড় নীল পাথর বিশিষ্ট এবং জাবালে আবু কোবায়েসের মূল থেকে উৎসারিত। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠার জন্য পাথর কেটে ১২টি সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সাঈকারীরা ইচ্ছা করলে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে পারতেন। মারওয়া কুআইকাআন পাহাড়ের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। দুটোর মধ্যে একটু খালি জায়গা আছে। এখানেও পাহাড়ের চূড়ায় উঠার জন্য অনেকগুলি সিঁড়ি আছে।

রাদি বিন খলীল আল মালেকী বলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠার জন্য ১২টি সিঁড়ি এবং মারওয়ায় উঠার জন্য ১৫টি সিঁড়ি আছে।

ইবনে বতুতা তাঁর সফর অভিজ্ঞতায় লিখেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠার জন্য ১৪টি সিঁড়ি এবং মারওয়া পাহাড়ে উঠার জন্য ১৫টি সিঁড়ি আছে।

আযরাকী উল্লেখ করেছেন, আব্বাসী খলিফা আবু জাফর মনসুরের সময় মক্কার গভর্ণর আবদুস সামাদ বিন আলী সাফা পাহাড়ে ১২টি এবং মারওয়ায় ১৫টি সিঁড়ি নির্মাণ করেন। তারপর খলীফা মামুনের সময় সেগুলোতে সাদা চুনার প্রলেপ দেয়া হয়। লোকেরা ইচ্ছামত উপর পর্যন্ত উঠানামা করতে পারত। কিন্তু বিগত ১৩০০ বছর পর্যন্ত কোন শাসক কিংবা ধনী ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাসআকে পাকা করা কিংবা রোদের তাপ থেকে সাঈকারীদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কোন ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেননি এবং এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। শুধু সাফা-মারওয়ায় সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই দুটো পাহাড়ে উকুদ বা সৌন্দর্যের প্রতীক ছোট মিনারা তৈরি করা হয়েছে।

১৩৩৯ হিজরীতে, বাদশাহ শরীফ হোসাইন বিন আলীই সর্বপ্রথম মাসআয় ছায়াদার ছাতা নির্মাণ করেন। এতে নীচে লোহার খুঁটি দিয়ে উপরে কাঠের ছাদ তৈরি করা হয়।

১৩৪৫ হিজরীতে, বাদশাহ আবদুল আযীযের নির্দেশক্রমে মাসআ'কে পাকা করা হয়। এতে সাঈকারীদের সাঈ করতে যথেষ্ট আরাম হয়। হজ্জ ফরজ হওয়ার পর থেকে এই প্রথম এই রাস্তা বা মাসআ পাকা করা হল। এতে মূল্যবান মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে।

সৌদী শাসনামলে ১৩৭৫ হিজরীতে, যখন মসজিদে হারামের বৃহত্তর সম্প্রসারণ করা হয় এবং তিন তলা বিশিষ্ট মসজিদে হারাম নির্মাণ করা হয়, তখন সাফা-মারওয়ার উপর দোতলা বিল্ডিং তৈরি করা হয়। ফলে, নীচতলা এবং দোতলার উপর দিয়ে মাসআয় সাঈ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। হজ্জের মওসুমে ভিড়ের সময় এই দোতলা মাসআর কারণে সাঈকারীদের খুব বেশী উপকার হয়।

মাসআর নীচতলার দেয়ালে ২৮টি এয়ারকুলার বসানো হয়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে গরমের সময় আবহাওয়া ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও মাসআর উপর দিয়ে ৬টি ওভারব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ভিড়ের সময় লোকেরা ওভারব্রিজ দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করে এবং ঐদিকে পারাপারকারী লোকদের কারণে, সাঈকারীদের সাঈতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। ওভারব্রিজ নির্মাণের পূর্বে ঐ দিকের মুসল্লীরা, সাঈকারীদের সাঈতে বাধা সৃষ্টি করে মসজিদে যাতায়াত করত।

সৌদী আমলে, সাফা-মারওয়ার মাঝের যে অংশে একটু জোরে হাঁটতে হয় সেই অংশটুকুর দুই প্রান্ত সীমানায় সবুজ বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হয়েছে। এগুলো ২৪ ঘন্টা আলো দিচ্ছে। সাঈকারীরা সেই আলোর কাছে এসেজোরে হাঁটা শুরু করে এবং অন্য বাতিটির কাছে গিয়ে জোরে হাঁটা বন্ধ করে।

মাসআর রাস্তার মাঝখানে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ ও বয়স্ক লোকদের হুইল গাড়ীতে বসে সাঈ করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক-দেড় হাত উঁচু তিনটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং এগুলোতে মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে। অসুস্থ ও বয়স্ক লোকেরা পয়সার বিনিময়ে ঐ সব গাড়ীতে করে সাঈ করে। আবার নিজের সাহায্যকারী লোক থাকলে বিনা পয়সায় হুইল গাড়ী এনে সাঈ করা যায়। হারাম প্রশাসনের পক্ষ থেকে, লোক মারফত সাঈ করলে, তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে এবং যারা হুইল গাড়ী বিনা পয়সায় নিতে চায় তাদেরকে তা সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ১ হাজার হুইল গাড়ী মওজুদ ও কর্মরত আছে।

সাফা-মারওয়াকে আজকাল মসজিদে হারামের বিল্ডিং এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে, ভেতরে না আসলে এটি যে মসজিদে হারাম থেকে ভিন্ন জিনিস তা বুঝা যায় না। তবে মসজিদে হারামের ঐ অংশের দৈর্ঘ্য সাফা-মারওয়ার দৈর্ঘের চেয়ে কম।

সাঈর হেকমত

সাঈর অর্থ হচ্ছে, সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া। সাফা থেকে মারওয়ায় গেলে ১ সাঈ এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসলে ২য় সাঈ সমাপ্ত হয়। এভাবে ৭ বার সাঈ করতে হয়। উমরাহ এবং হজ্জের জন্য এই সাঈ জরুরী।

ইসমাঈলের মা হাজার সাফা-মারওয়ায় পানির সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে যমযমের পানি দান করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বিবি হাজার ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে এক মশক পানি এবং এক প্যাকেট খেজুর দিয়ে মসজিদে হারামের পূর্বদিকে একটি বড় গাছের নীচে রেখে চলে যান। পানি শেষ হয়ে গেলে মা ও শিশু ছটফট করতে থাকে। তখন হাজার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায় কিনা দেখতে থাকেন। তারপর নীচের উপত্যকায় নেমে কাপড়ের এক কোণা উপরের দিকে তুলে, ক্লান্ত মানুষের মত ছুটতে থাকেন। তারপর মারওয়ায় আসেন। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। এভাবে তিনি ৭ বার ছুটাছুটি করেন।

হযরত হাজারের অনুসরণে সাফা-মারওয়ায় ৭ বার সাঈ করার আদেশের পেছনে যে হেকমত রয়েছে তা হচ্ছে, এর মধ্যে যে শিক্ষা, আনুগত্য, নবীদের সুন্নতকে জীবিতকরণ এবং আল্লাহর পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়সমূহ রয়েছে সেগুলোকে আত্মস্থ করা, অনুশীলন করা এবং বাস্তব জীবনকে সেই আলোকে গড়ে তোলা। এ মর্মে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

انَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِاَقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ رواه احمد وابوداؤد والدارمى والترمذى ـ

অর্থ ঃ 'বাইতুল্লাহর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সাঈ এবং শয়তানকে কংকর মারার মধ্যে আল্লাহর জিকর ও স্মরণ প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য।' তবে সাঈর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জোরে হাঁটতে হয়। তওয়াফের ১ম তিন চক্করেও জোরে হাঁটতে হয়। এই জোরে হাঁটা অর্থাৎ রমল করা এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল

হয়ে পড়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মক্কায় উমরাহ্ করতে আসেন। তখন মক্কার মোশরেকরা বলল, মুসলমানরা মদীনার জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা এখন তোমাদের কাছে মক্কায় আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা শুনে নির্দেশ দেন, সাহাবায়ে কেরাম যেন তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করে অর্থাৎ জোরে হাঁটে। মোশরেকরা হাজারে আসওয়াদ বরাবর, একটু দূরে বসে সব লক্ষ্য করছে। এবার তারা বলাবলি শুরু করছে যে, যাদেরকে তোমরা জ্বরাক্রান্ত দুর্বল লোক বলে মন্তব্য করেছিলে, আজকে তারা আমাদের চাইতেও বেশী শক্তিশালী মনে হচ্ছে। ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক চক্করেই রমল করার নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু পরে তা স্থায়ী হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি এ নির্দেশ থেকে বিরত থাকেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী)।

সাঈর দোয়া

পবিত্র স্থানসমূহের যে সকল জায়গায় দোয়া কবুল হয়, সাফা-মারওয়া তার অন্যতম। এই জন্য এই দুই স্থানে দোয়া করা উচিত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ের উপর উঠেন এবং বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া করেন।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা পাহাড়ের কাছে এসে এই আয়াতটি পড়লেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

তারপর বললেন, আল্লাহ যেভাবে আয়াতে শুরু করেছেন আমিও সেইভাবেই শুরু করবো। তারপর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন, বাইতুল্লাহ দেখে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে এই দোয়াটি পড়লেন ঃ

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ اَنْجَزَوَعْدَهُ ـ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক

নেই, বাদশাহী ও প্রশংসা শুধু তাঁরই, তিনি সকল জিনিসের উপর শক্তিবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দল ও গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছেন।' এই দোয়াটি তিনি তিনবার পড়েন এবং আরো দোয়া করেন। তারপর তিনি মারওয়ায় আসেন এবং সাফা পাহাড়ের অনুরূপ করেন।

হযরত ইবনে উমর (রা) সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে তাকবীর বলতেন। তারপর এই দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ بِدِيْنِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُوْلِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِمَّنْ يُّحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْنِىْ لِلْيُسْرٰى وَجَنِّبْنِىْ لِلْعُسْرٰى وَاَغْفِرْلِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ " اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ وَاَنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ اَللّٰهُمَّ اِذْهَدَيْتَنِىْ لِلاِسْلاَمِ فَلاَتَنْزِعْنِىْ مِنْهُ وَلاَتَنْزِعْهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا عَلَى الْاِسْلاَمِ ـ اَللّٰهُمَّ لاَتُقَدِّمْنِىْ لِلْعَذَابِ وَلاَتُؤَخِّرْنِىْ لِسُوْءِ الْفِتَنِ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার দীন এবং তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্য দ্বারা আমাকে হেফাজত কর। হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যারা তোমাকে, তোমার ফেরেশতা ও নেক বান্দাহদেরকে ভালোবাসে। হে আল্লাহ! নেক ও সহজ কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কঠিন কাজ থেকে আমাকে দূরে রাখ। পরকাল ও দুনিয়ায় আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে মোত্তাকীদের ইমাম এবং বেহেশতের ওয়ারিশ বানাও। শেষ বিচারের দিন আমার গুনাহ মাফ করে দিও। হে আল্লাহ! তুমি বলেছ, 'আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' তুমি নিশ্চয়ই ওয়াদা খেলাফ করবেনা। হে আল্লাহ! আমাকে যেহেতু ইসলামের হেদায়াত দান করেছ সেহেতু ইসলামকে আমার থেকে এবং ইসলাম থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিওনা যে পর্যন্ত না ইসলামের উপর আমার মৃত্যু হয়। হে আল্লাহ! আমাকে আজাবে নিপতিত করো না এবং ফেতনার জন্য আয়ু বৃদ্ধি করো না।'

৭. হুদুদে হারাম (হারাম এলাকা)

মক্কা নগরীকে 'হারাম' বা 'সম্মানিত এলাকা' ঘোষণার কারণ

মক্কাকে কেন 'হারাম এলাকা' ঘোষণা করা হল সে ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে সহীহ কোন হাদীস নেই।

شفاء الغرام এর লেখক আল্‌ফাসী বলেছেন, মক্কাকে 'হারাম' ঘোষণা করার পেছনে কি কারণ, সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যখন হযরত আদম (আ) মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি শয়তানের ভয় করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর কাছে শয়তানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করেন। আল্লাহ্ তখন মক্কার সীমানা পাহারা দেয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে পাঠান। তারা 'হুদুদে হারাম' বা হারাম এলাকার সীমান্ত ঘিরে ফেলেন এবং পাহারা দিতে থাকেন। হযরত আদম ও পাহারাদার ফেরেশতাদের চারদিকের অবস্থানের স্থানটুকুকে 'হারাম' বলা হয়।

আরেক বর্ণনায় এসেছে যে, কাবাঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ) যখন হাজারে আসওয়াদকে কাবাঘরে স্থাপন করেন, তখন পাথরটির আলো উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হাজারে আসওয়াদের আলো চতুর্দিকে যে পর্যন্ত পৌঁছেছে সে পর্যন্তকার এলাকাকে 'হারাম এলাকা' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সোহায়লী উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে হুকুম করেছিলেন–

اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ -

অর্থ ঃ তোমরা উভয়েই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, আস। তখন তারা জবাব দিয়েছিল যে, আমরা আনুগত্য স্বীকারকারী হিসাবে আসলাম।

এই জবাবটি দিয়েছিল আসমান এবং হারাম এলাকার যমীন। ভূপৃষ্ঠের অবশিষ্ট যমীন এই আদেশ পালন করেনি। তাই আল্লাহ্ ঐ অনুগত এলাকাটিকে হারাম এলাকা হিসাবে ঘোষণা করলেন।

আখবারে মক্কার লেখক আল্লামা আযরাকী, প্রথম দুটো কারণের কথা উল্লেখ

করেছেন। অন্যান্যদের মতে, হারাম এলাকা ঘোষণার আরও বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

আমাদের মতে, যেহেতু এক্ষেত্রে আলোচিত বিভিন্ন বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধ নয়, সেহেতু মক্কাকে 'হারাম' করার কারণ হল স্বয়ং আল্লাহর ঘর-কাবা শরীফের অস্তিত্ব। এটি বর্ণিত অন্যান্য কারণ থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। কেননা, আল্লাহর ঘর সম্মানিত। তাই তার পার্শ্ববর্তী এলাকাও অনুরূপ সম্মান ও মর্যাদার দাবী রাখে।

হারাম এলাকার সীমানা ঃ (হুদুদে হারাম)

মসজিদে হারামের চারদিকে, এর সমান মর্যাদা সম্পন্ন সুনির্দিষ্ট একটি বিরাট গোলাকার এলাকাকে 'হারাম এলাকা' (হুদুদে হারাম) বলা হয়। এই এলাকায় গাছ কাটা, শিকার করা সহ অন্যান্য আরো বহু কাজ নিষিদ্ধ। আবার এর অনেক ফজীলত ও মর্যাদা রয়েছে, যা আমরা হারাম এলাকার '৩২টি বৈশিষ্ট্য' এই শিরোনামে একটু পরে আলোচনা করবো। এর মর্যাদা حَلٌّ বা 'হারাম এলাকা বহির্ভূত' এলাকার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই সুনির্দিষ্ট এলাকার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ـ (العنكبوت : ٦٧)

অর্থ ঃ 'তারা কি দেখে না, আমরা একটি নিরাপদ হারাম তৈরি করেছি, এর চারপাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা সত্ত্বেও তারা কি বাতিলের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর নেয়ামতের সাথে কুফরী করে? আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (القصص : ٥٧)

অর্থ ঃ 'তারা বলে, আমরা যদি আপনার সাথে মিলে এই দীনের হেদায়েতের

অনুসরণ করি, তাহলে, আমাদেরকে সাথে সাথে আমাদের এই যমীন ও জনপদ থেকে বের করে দেয়া হবে। আমরা কি তাদেরকে এমন নিরাপদ হারাম দান করিনি যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে রিযক হিসেবে সব ফল ফলাদি নিয়ে আসা হয়? কিন্তু তাদের অধিক সংখ্যক লোক তা জানে না।' এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ হারাম এলাকার নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। হজ্জ এবং উমরাহসহ অন্যান্য কারণে হারাম এলাকার সীমানা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী।

হারাম এলাকার সীমানা সর্বপ্রথম কে নির্ধারণ করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে হযরত জিবরাইল (আ), করো মতে, হযরত আদম (আ) এবং কারো মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) এই সীমানা নির্ধারণ করেন।

হযরত ইবরাহীমের (আ) সময় থেকেই হারাম এলাকাকে "حل" 'অ-হারাম এলাকা' থেকে বিভিন্ন চিহ্ন যেমন, ইটের তৈরি দেয়াল, খুঁটি এবং মাইলের হিসেবের মাধ্যমে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোরাইশরা হিজরতের পূর্বে হারাম এলাকার চিহ্ন উঠিয়ে, পুনরায় তা নির্মাণ করে। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তামীম বিন আসাদ (রা) কে নতুন পিলার লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তা নতুন করে বসিয়ে আসেন।

আযরাকী লিখেছেন, সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) হারাম সীমানার খুঁটি বসান। এরপর কুসাই বিন কিলাব, কোরাইশ, হযরত মুহাম্মদ (সা), হযরত উমর বিন খাত্তাব, উসমান বিন আফ্ফান, মুয়াওবিয়াহ বিন আবি সুফিয়ান এবং আবদুল মালেক বিন মারওয়ান ঐ সব খুঁটি পুনঃনির্মাণ করেন।

আল্লামা ফাসী থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, সর্বপ্রথম হযরত ইসমাঈল (আ) হারাম সীমান্তের খুঁটি বসান। এরপর আদনান বিন আদ্দ এবং মুহাম্মদ আল্ মাহদী এর পুনঃনির্মাণ করেন। ৩২৫ হিজরীতে, আব্বাসী খলীফা আর-রাদীর আমলে, তানঈমের সমতল ভূমির দুটো পিলার নতুন করে নির্মাণ করা হয়। ঐ আমলে, তানঈমের পাহাড়েও দুটো পিলার ছিল। তবে মসজিদে তানঈমের সাথে পাহাড়ের দুটো পিলার বর্তমানে নেই। পাহাড়ের ঐ দুটো পিলার কেন ধ্বংস করা হল এবং কে করল, এ সম্পর্কে কিছু জানা যাচ্ছে না।

ফাসী বলেছেন, ৬১৬ হিজরীতে আরাফাতের দিকের দু'টো পিলার আরবলের

শাসক মুজাফফর নির্মাণ করেন এবং ৬৮৩ হিজরীতে ইয়েমেনের শাসক মুজাফফর নতুন করে ঐ দুটো পিলার পুনরায় নির্মাণ করেন।

ইবনে হাজার তাঁর 'আল-ঈদাহ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুজাফফর আরাফাতের সীমানা নির্ধারণ করে তিনটি পিলার নির্মাণ করেন। এর আগে তিনি আরাফাতের সঠিক সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আলেমদের একটি দলের মতামত নেন এবং তার ভিত্তিতে পিলার বসান। বর্তমান যুগে ঐ তিনটি পিলারের দুটো অবশিষ্ট আছে এবং মসজিদে নামেরা সংলগ্ন পিলারটি নেই। কবে এবং কারা ঐ পিলারটি ধ্বংস করল তারও কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরাফাতের পশ্চিম সীমান্তে উরানা উপত্যকা রয়েছে। মসজিদে নামেরা উরানা উপত্যকা এবং আরাফাতের মাঝে অবস্থিত।

সৌদী শাসনামলে, বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযিয এবং বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীযের সময়, আরাফাহ, শারায়ে' এবং শোমাইসীর হারাম এলাকার সীমানার পিলারগুলো পুনঃনির্মাণ করা হয়। বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের আমলে তানঈমের হারাম সীমান্তে একটি নতুন পিলার নির্মাণ করা হয় এবং পুরাতন পিলারটির সংস্কার করা হয়।

এখন আমরা হারাম সীমান্তের পিলার নির্মাণকারীদের একটি তালিকা পেশ করছি।

ক্রমিক নং	পিলার নির্মাণকারীর নাম	সন	মন্তব্য
১.	হযরত ইবরাহীম (আ)	প্রায় ৪ হাজার বছর আগে	এখানে হযরত আদম (আ) এর কথা উল্লেখ করা হয়নি।
২.	কুসাই বিন কিলাব	....	তিনি কোরাইশদের আগে একবার কা'বা সংস্কার করেছিলেন।
৩.	কোরাইশ	হিজরতের আগে	কোরাইশরা পিলার পুনঃনির্মাণ করেছিল।
৪.	রাসূলুল্লাহ (সা)	মক্কা বিজয়ের সময়	পিলার নির্মাণের আদেশ দেন।
৫.	উমর বিন খাত্তাব (রা)	হিঃ ১৭ সনে	....
৬.	উসমান বিন আফফান	২৬ হিজরী সনে	....
৭	মুয়াওবিয়া (রা)	তারিখ জানা নেই	....
৮.	আবদুল মালেক বিন মারওয়ান	....	....

৯.	আল-মাহদী	১৫৯ হিঃ	আব্বাসী খলীফা
১০.	আররাদী বিল্লাহ	৩২৫ হিঃ	আব্বাসী খলীফা
১১.	আল-মোক্তাদির বিল্লাহ	....	আব্বাসী খলীফা
১২.	মুজাফফর	৬১৬ হিঃ অথবা ৬২৯ হিঃ	আরবলের শাসক
১৩.	মুজাফফর	৬৮৩ হিঃ	ইয়েমেনের শাসক
১৪.	১ম সুলতান আহমদ বিন মুহাম্মদ আল্ উসমানী	১০২৩ হিঃ	....
১৫.	বাদশাহ সউদ বিন আঃ আযীয	১৩৮৬ হিঃ	শোমাইসীতে জেদ্দাগামী পথে, ১৯ কিঃ মিঃ দূরত্বে দু'টো পিলার নির্মাণ করেন। একই বছর শারায়ে'তে অবস্থিত পিলারটিও পুনঃনির্মাণ করেন।
	বাদশাহ সউদ বিন আঃ আযীয	১৩৮৬ হিঃ	তিনি আরাফার পিলারও নির্মাণ করেন।
১৬.	বাদশাহ খালেদ বিন আঃ আযীয	১৩৯৯ হিঃ	জেদ্দার পুরাতন রাস্তায়, শোমাইসীর দুটো পিলার নির্মাণ করেন।
১৭.	বাদশাহ ফাহাদ বিন আঃ আযীয	১৪০৬ হিঃ	তানঈমে নতুন পিলার নির্মাণ করেন এবং পুরাতনটির সংস্কার করেন।

আল্লামা তকী ফাসী বলেন, ঐতিহাসিকদের কাছে মসজিদে হারাম থেকে হারাম সীমান্তের পিলারসমূহের দূরত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মসজিদে হারাম থেকে–

(ক) আরাফাতের পিলারের দূরত্ব সম্পর্কে ৪টি বক্তব্য আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১৮ মাইল, ১১ মাইল, ৯ মাইল এবং ৭ মাইল।

(খ) নজদের দিকের সীমান্ত (সায়েল-তায়েফ সড়ক পথে) সম্পর্কে ৪টি বক্তব্য আছে। সেগুলো হল ঃ ৬ মাইল, ৭ মাইল, ৮ মাইল এবং ১০ মাইল।

(গ) জো'রানার দিকের সীমান্তের ব্যাপারে ২টি বক্তব্য আছে। সেগুলো হচ্ছে, ৯ মাইল এবং ১২ মাইল।

(ঘ) তানঈমের দিকের সীমান্তের ব্যাপারে ৪টি বক্তব্য আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ ৩ মাইল, পৌনে ৪ মাইল, ৪ মাইল এবং ৫ মাইল।

(ঙ) জেদ্দার পুরাতন রাস্তায় হোদায়বিয়ার দিকের সীমানা সম্পর্কে ২টি বক্তব্য আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১০ মাইল এবং ১৮ মাইল।

(চ) ইয়েমেনের দিকের সীমানা সম্পর্কেও ২টি বক্তব্য আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ ৬ মাইল এবং ৭ মাইল।

মসজিদে হারাম থেকে হারাম এলাকার দূরত্ব সম্পর্কে যে মতপার্থক্য দেখা যায় তা সীমানার পিলারের পরিবর্তনের কারণে সৃষ্টি হয়নি। পিলারগুলো, সুনির্দিষ্ট জায়গাতে প্রথম দিন থেকেই বহাল রয়েছে এবং সে স্থানগুলোও সবার কাছে পরিচিত। তবে এই মতভেদের কারণ হচ্ছে দু'টো ঃ

১মটি হচ্ছে পরিমাপের উৎসস্থল। কেউ মসজিদে হারামের দরজাগুলো থেকে দূরত্ব মেপেছেন, কেউ মক্কার প্রাচীন ঘেরাওকারী দেয়াল থেকে মাপ শুরু করেছেন। যেমন কেউ শোবায়কা থেকে দূরত্ব মেপেছেন যা হাররাতুল বাব নামে খ্যাত। আবার কেউ হুজুনের নিকটবর্তী মোয়াল্লার গেট থেকে দূরত্ব মাপেন।

২য় কারণটি হচ্ছে ঃ মাইলের পরিমাণ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য। করো কারো মতে, ৬ হাজার হাতে এক মাইল, কারো মতে, ৪ হাজার হাতে এক মাইল। কারো মতে, সাড়ে ৩ হাজার হাতে এক মাইল এবং আরেক দলের মতে, ২ হাজার হাতে এক মাইল।

এছাড়াও হাতের পরিমাণের মধ্যেও পার্থক্য আছে। মানুষের আকার আকৃতির পার্থক্যের কারণে হাতের পরিমাপেরও পার্থক্য হয়। সাধারণতঃ মানুষের হাতের পরিমাপ ৪৬ সেঃ মিঃ থেকে ৫২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, মাইলও আপেক্ষিক। বর্তমান যুগে, স্থলপথের মাইল নৌপথের মাইল থেকে ভিন্ন এবং অনুরূপভাবে, ভৌগোলিক মাইলও স্থল এবং নৌপথের মাইল থেকে ভিন্ন ধরনের।

এইসব মতভেদ সত্ত্বেও ঐতিহাসিকরা সবাই বিভিন্ন দিকে সুনির্দিষ্ট স্থান থেকে এহরাম বাঁধার ব্যাপারে একমত। তাঁদের মতে, মদীনার পথে তানঈমের আগে বনি গিফারের বাড়ি, ইয়েমেনের পথে সানিয়াতু লাবানের এদায়াতুলাবান, জেদ্দার পথে মোনাকাতে আ'সাস, তায়েফের পথে আরাফাতের আগে নামেরা উপত্যকা, ইরাকের পথে মোকাত্তা এর সানিয়াতু খাল এবং জো'রানার পথে শে'বে আল-আবদাল্লাহ বিন খালেদ বিন উসাইদ এর বাসস্থান হচ্ছে পুরো হারাম এলাকার সীমানা। এটাই সেই হারাম এলাকা যার মর্যাদা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকার হুকুম পৃথিবীর আর সকল জায়গা থেকে ভিন্ন।

মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের শিক্ষক প্রখ্যাত ভূগোলবিদ জনাব মে'রাজ মির্জা বলেন, বর্তমান যুগে মক্কার বসতি অনেক বেড়ে গেছে এবং অনেক জায়গায় তা হারাম এলাকার সীমানাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই এ মুহূর্তে খুবই সূক্ষ্মভাবে হারাম এলাকার সীমানা চিহ্নিত করা জরুরী। চতুর্দিক থেকে এই সীমানা এখন যথার্থভাবে চিহ্নিত করা না হলে পরে তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। মক্কা শহর ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে এবং চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। যে সকল নির্দিষ্ট স্থানে হারাম সীমানার চিহ্ন ও পিলার রয়েছে সে সকল স্থান ছাড়া অন্য স্থানের সীমানা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন ব্যাপার। অথচ এখন সকল স্থানেই বসতি বেড়ে চলেছে এবং নতুন নতুন পথ ও রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে। সেগুলোতেও হারামের সীমানা চিহ্নিত করা দরকার। তাঁর মতে, এজন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ঐ কমিটিতে আলেম, হারাম সীমান্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্থার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা সদস্য থাকবেন। তাঁরা পুরো হারাম এলাকার নিখুঁত সীমানা চিহ্নিত করার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন।

তিনি আরো বলেন, হারাম সীমানার পিলারগুলোর সঠিক দূরত্ব পরিমাপ করা এই যুগে আর কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি ঐগুলোর সঠিক দূরত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য পেশ করেছেন।

আরাফার পিলার

(১) মসজিদে হারাম থেকে আরাফার পথে, হারাম এলাকার সীমানা হচ্ছে ১৮.৪ কিলোমিটার। সেখানে মসজিদে নামেরার কাছে আরাফাহ উপত্যকার পাশ ঘেঁষে দুই পাহাড়ের ঢালু অংশের পানি প্রবাহ আরাফার যে স্থানে এসে মিলিত হয়েছে, সেখানে হারাম সীমানার পিলার রয়েছে। সেটা ৪ ও ৫ নং আরাফাগামী রাস্তার নিকটে অবস্থিত।

(২) শারায়ে' এবং জোরানার পিলার ঃ এটা এখন পর্যন্ত নজদের পিলার বলে পরিচিত। কেননা, এই রাস্তাটি সায়েল ও তায়েফ হয়ে নজদ গিয়েছে। মসজিদে হারাম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৫.২ কিলোমিটার। এটি তায়েফ যাওয়ার সময় হাতের ডানে একটি আবাদী এলাকা ১ নং শারায়ে হাউজিং এ অবস্থিত।

(৩) তানঈমের পিলার ঃ এটি মসজিদে আয়িশার কাছে এবং বর্তমানে মক্কার বিদ্যুত কোম্পানীর অফিসের অদূরে অবস্থিত। মসজিদে হারাম থেকে এটিই

সবচেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত। মসজিদে হারাম থেকে এর দূরত্ব হল মাত্র ৬.৫ কিলোমিটার।

(৪) শোমাইসীর পিলার ঃ হোদায়বিয়ার বর্তমান নাম হচ্ছে শোমাইসী। এখানকার পিলারটি হোদায়বিয়ার মসজিদের আগে এবং মসজিদে হারাম থেমে ২১ কিলোমিটার দূরে পুরাতন মক্কা-জেদ্দা সড়কে অবস্থিত।

(৫) ইয়েমেন পিলার ঃ এটি পুরাতন ইয়েমেন সড়কে অবস্থিত এবং মসজিদে হারাম থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে ১৩ কিলোমিটার। এটি লাবান পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থিত। তবে বর্তমানে সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন পিলার নেই এবং সেই রাস্তাটিও প্রায় মৃত। এখন নতুন সড়ক দিয়েই লোকেরা যাতায়াত করে।

বর্তমানে তায়েফ-হাদা রোড, মক্কা-জেদ্দা এক্সপ্রেস রোড এবং নতুন ইয়েমেন এক্সপ্রেস রোডে হারাম এলাকার সীমানার কোন চিহ্ন নেই। এগুলো নতুন রোড। অথচ এসব রাস্তা দিয়ে অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন হারাম এলাকায় প্রবেশ করছে। এগুলোতে পিলার থাকা জরুরী। সৌদী সরকার মোট ৪শ' পিলার নির্মাণ করেছে।

মসজিদে নামেরার মাঝামাঝি আরাফাতের পশ্চিম সীমান্তের পিলার

হারামে মক্কার ৩২টি ফিকাহ সম্পর্কীয় বিশেষ মাসআলা

মক্কা শহরকে 'হারাম' বা সম্মানিত এলাকা ঘোষণা করার কারণে এর সাথে ফেকাহ শাস্ত্রের অনেকগুলো নতুন মাসআলা-মাসায়েলের উদ্ভব হয়েছে। ঐ মাসায়েলগুলোর পেছনে কুরআন-হাদীসের সমর্থন রয়েছে। সেই মাসআলাগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. হারাম এলাকায় শিকার করা

মোহরেম ব্যক্তি কিংবা অমোহরেম ব্যক্তি নির্বিশেষে, সকলের জন্য হারাম এলাকার ভেতরে শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ وَلَايُنَفَّرُصَيْدُهَا এর শিকারকে তাড়ানো যাবে না। শিকারকে তাড়ানো না গেলে, সেখানে শিকার করার কোন প্রশ্নই উঠে না। সকল আলেম এই মাসআলার ব্যাপারে একমত। হারাম এলাকার সম্মানের কারণেই শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার ভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। তবে তাদের ঐ ভিন্ন কারণের পেছনে কোন প্রমাণ নেই। আল্লামা যারাকশী তাঁর اعلام المساجد বইতে লিখেছেন, নবী করীম (সা) যখন হিজরতের সময় সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন, তখন মাকড়সা গর্তের মুখে জাল বুনল। আল্লাহ এক কবুতরীকে সে জালের উপর ডিম পাড়ার নির্দেশ দিলেন। কবুতরীটি ডিম দেয়ার পর ডিমের উপর শুয়ে রইল। কাফেররা তা দেখে ফিরে গেল এবং গর্তের ভেতরে লক্ষ্য করল না। এক বর্ণনায় এসেছে যে, হারাম এলাকার কবুতরগুলো এ কবুতরীর বংশধর। বাজ্জার কর্তৃক লিখিত مسند কিতাবের বরাত দিয়ে সোহায়লী তাঁর الروض الانف নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ গর্তের জালের উপর ডিম দেয়ার জন্য দুটো বন্য কবুতরীকে নির্দেশ দেন। এর ফলে কাফেররা গর্তের ভেতর নজর না করে ফিরে আসে। মক্কার কবুতরগুলো সেই দুটো কবুতরের বংশধর। এজন্য হারাম এলাকার কবুতরগুলোর সম্মানার্থে ঐ কবুতরগুলো শিকার করা হারাম করা হয়েছে। হালাল এলাকার বাইরে থেকে শিকার করে, হারাম এলাকায় ঢুকানোর ব্যাপারে, ইবনুল মোনজের বলেছেন যে, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আয়িশা, আ'তা, তাউস, আহমদ, ইসহাক ও অন্যান্য চিন্তাবিদরা এটাকে মাকরূহ বলেছেন। তবে জাবের

বিন আবদুল্লাহ, সাঈদ বিন যোবায়ের, মুজাহিদ, মালেক, শাফেঈ ও আবু সাওর এটাকে জায়েয বলেছেন।

২. মক্কা শরীফে পড়ে থাকা জিনিসের হুকুম

মক্কা শহরের হারাম এলাকায় পড়ে থাকা কোন জিনিসের মালিকানা অর্জন করা জায়েয নেই। তবে পড়ে থাকা জিনিসের হেফাজত কিংবা সে সম্পর্কে ঘোষণা ও প্রচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে, পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে। পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা ও শহরে পড়ে থাকা জিনিসের হুকুম এর চেয়ে ভিন্ন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

انَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ لاَيُعْضَلُ شَوكُهُ وَلاَيُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلاَتُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ الاَّ مَنْ عَرَّفَهَا ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ এই শহরকে সম্মানিত করেছেন; ফলে এই শহরের কাঁটাগাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, এখানকার শিকারকে শিকারের উদ্দেশ্যে তাড়ানো যাবে না এবং প্রচার ও ঘোষণার উদ্দেশ্য ব্যতীত এই শহরের পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না। (مُسْنَد احْمَد) আবদুর রহমান বিন উসমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাজীদের পড়ে থাকা ও হারানো জিনিস কুড়াতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, হারাম এলাকার পতিত জিনিসের মালিক হওয়া যাবে না। তবে ঘোষণা কিংবা প্রচারের উদ্দেশ্যে তা উঠানো যাবে। অন্য তিন ইমামের মতে, হারাম এলাকার পড়ে থাকা জিনিসের হুকুম, অন্যান্য এলাকার পড়ে থাকা জিনিসের হুকুমেরই অনুরূপ।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুর রহমান বিন উসমান থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, “রাসূলুল্লাহ (সা) হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস উঠাতে নিষেধ করেছেন।” মক্কা যেহেতু বিশেষ সওয়াব ও এবাদতের জায়গা, সেহেতু লোকেরা হয়তো আবার এখানে ফিরে আসতে পারে। বিচিত্র নয় যে, পড়ে থাকা জিনিসের মালিকই স্বয়ং আসতে পারে কিংবা কারুর মাধ্যমে সে তার হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজ নিতে পারে। মসজিদে হারাম বিশ্ব মুসলিমের মিলনকেন্দ্র হওয়ায়

এই ব্যাপারে হারানো বা পড়ে থাকা জিনিসের হুকুম অন্য জায়গায় পড়ে থাকা জিনিসের হুকুমের চেয়ে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখাটা স্বাভাবিক।

৩. হারাম এলাকার গাছ কাটা

হারাম এলাকার গাছ কাটা নিষিদ্ধ। নবী করীম (সা) বলেছেন, وَلاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا অর্থাৎ হারাম এলাকার গাছ কাটা যাবে না। কোরাইশদের কাছে হারাম এলাকার সম্মানের বিষয়টি জানা ছিল। তারা এই হারামের সম্মান রক্ষা করে চলত। কোরাইশরা যখন নির্মাণ কাজের ইচ্ছা করল তখন তারা কুসাইকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা হারাম এলাকার গাছ দিয়ে কিভাবে নির্মাণ কাজ করবো? সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের হারাম এলাকার গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি মক্কার কুয়াইকাআন পাহাড়ে ঘর তৈরির সময় প্রতিটি কাটা গাছের বিনিময়ে একটি গরু দান করেছেন। হযরত উমর (রা) আসাদ বিন আবদুল ওজ্জার ঘরে অবস্থিত একটি গাছ কেটেছেন বলে এক বর্ণনায় এসেছে।

গাছটি কা'বা শরীফের নিকটবর্তী ছিল এবং তওয়াফকারীদের কাপড় এতে আটকে যেত। তখনও মসজিদে হারামকে সম্প্রসারিত করা হয়নি। হযরত উমর সেই গাছটি কেটে ফেলেন এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি গরু সদকা করেন।

ইমাম মালেক (র) এর মাজহাবে, দুই হারাম শরীফের গাছ কাটলে কোন ফিদইয়া দেয়া জরুরী নয়। ইমাম মালেককে তাঁর এই রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি তা জানিনা। যারা আমার সম্পর্কে এ রকম বলেছে, তারা ঠিক করেনি। তবে আমি একথা বলি যে, যারা গাছ কাটবে তারা যেন আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করে বা গুনাহ মাফ চায়। ইবনুল মোনজেরের কথা থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি কুরআন, হাদীস ও ইজমা থেকে গাছ কাটার বিনিময়ে কোন ফিদইয়া নেয়াকে ফরজ কিংবা ওয়াজিব হিসেবে দেখতে পাইনি। তবে এক্ষেত্রে, ইমাম মালেক (র) যা বলেছেন, আমিও তাই বলবো। সেটা হচ্ছে ঃ এজন্য আমরা আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাবো।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফা (র) মক্কার হারাম এলাকার গাছ কাটার বিনিময়ে ফিদইয়া দেয়াকে ফরজ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, বড় গাছ

কাটলে গরু এবং ছোট গাছ কাটলে ছাগল বা ভেড়া ফিদইয়া দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, গাছের মূল্য পরিমাণ ফিদইয়া দিতে হবে।

ইবনুল মোনজের বলেছেন, তিনি যে আলেমদের নাম জানেন, তারা সবাই হারাম সীমান্তের ভেতরের সবজি, তরি-তরকারি ও ফুল তোলাকে জায়েয বলেছেন।

সোহায়লী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র) হারাম এলাকায় বিনা চাষে উৎপাদিত গাছ এবং চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত গাছের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, বিনা চাষে উৎপাদিত গাছে ফিদইয়া লাগবে এবং চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত গাছের ফিদইয়া লাগবে না।

তবে হারাম এলাকার নিষিদ্ধ গাছগুলো থেকে যেগুলো ব্যতিক্রম এবং যেগুলো কাটার হুকুম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) ইজখের ঃ এটা মক্কার বহুল পরিচিত গাছ।

(খ) কাঁটাযুক্ত গাছ। কিন্তু একটি মশহুর হাদীসে কাঁটাযুক্ত গাছ না কাটারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে "ولايعضد شوكه" উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ঐ হাদীসে কাঁটা বলতে, উট যে সকল কাঁটাযুক্ত গাছ খায় সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। তবে কষ্টদায়ক জিনিস যেমন কাঁটাযুক্ত গাছকাটা ও ক্ষতিকর পশু-পাখি মারার হুকুম অন্য হাদীসে রয়েছে।

যারাকশী বলেছেন, বেশীর ভাগ উলামায়ে কেরাম কাঁটাকে কষ্টদায়ক জিনিসের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে বলেছেন, কাঁটাযুক্ত গাছ কাটা নিষিদ্ধ নয়। তাঁরা কষ্টদায়ক পশু হত্যার হাদীসের উপর কেয়াস করে, এটাকে এর থেকে পৃথক মনে করেন। কিন্তু ইমাম নবওয়ী 'কাঁটাযুক্ত গাছ কাটা হারাম'-এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্ণিত হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। শেখ আইনী এই কেয়াসকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং হারাম এলাকার গাছ কাটাকে নিষিদ্ধ বলেছেন।

(গ) হারাম এলাকার ভেতরের কৃষিজাত ফল-ফুল এবং সবজি ও তরকারি কাটা ও উঠানো নিষিদ্ধ নয়। ইবনুল মোনজের বলেছেন, আমি যে সকল উলামার কথা জানি, তারা সবাই এটাকে হালাল ও বৈধ বলেছেন। ইমাম খাত্তাবী তার معالم السنن বইতে লিখেছেন, সোহায়লী, ইমাম আবু হানিফা (র) এর বরাত দিয়ে

বলেছেন যে, চাষের ফলে ও বিনা চাষে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিনা চাষে উৎপাদিত ফসলের যা মূল্য আসে, তা হিসেব করে ফিদইয়া দিতে হবে এবং মানুষের উৎপাদিত ফসলাদি কাটলে, তার বিনিময়ে কিছু দিতে হবে না।

ইমাম নবওয়ীও একই মতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, আলেমরা বিনা চাষে উৎপাদিত ফল ও ফসল এবং গাছ-পালা কাটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

(ঘ) গৃহপালিত পশুর খাবারের জন্য ঘাস ও গাছ-পালা কাটা জায়েয আছে। এটাই বিশুদ্ধ মত। যারাকশী বলেছেন, মূলতঃ পশুর খাদ্যের প্রয়োজনেই হারাম এলাকার ঘাস কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি তা পশুর খাবারের জন্য কাটা হয়, তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে না। তাঁর মতে, সাহাবায়ে কেরাম হারাম সীমান্তের ভেতর উট প্রবেশ করিয়েছিলেন। সেই উটগুলো এর ঘাসে চরেছে। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যই ইজখেরের মত এটাকেও হালাল করা হয়েছে।

ইমাম খাত্তাবী معالم السنن বইতে লিখেছেন যে, ইবনুল মোনজের, ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হারাম সীমানার ভেতর পশুচারণ নিষিদ্ধ নয়।

(ঙ) হারাম এলাকার যে সকল গাছ-পালা ওষুধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বিশুদ্ধ মতে, সেগুলো কাটা হারাম নয়। কেননা, ইজখেরের প্রয়োজনের চেয়ে এগুলোর প্রয়োজন আরো বেশী। অথচ শরীয়ত ইজখেরের অনুমতি দিয়েছে। তাই ঐগুলোও জায়েয হবে। ইবনুল মোনজের উল্লেখ করেছেন, শেখ আতা তাঁর বাগান থেকে سنا নামক গাছের পাতা তোলার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এ সকল অনুমতির পাশাপাশি এর বিরোধী মতের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া দরকার। এক মতে বলা হয়েছে যে, ইজখেরের সাথে অন্য কোন কিছুকে তুলনা করা যাবে না। যদিও সে সকল জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। ঘরের ছাদে ব্যবহার করার গাছ-পালার ব্যাপারে মতভেদ অনেক তীব্র। প্রয়োজনের জন্যই ইজখের কাটার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলোও সে রকম প্রয়োজনীয়। তাই দুটো মতকেই সামনে রেখে চিন্তা করা দরকার।

গাছের ডাল কেটে মেসওয়াক বানানোর ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। ইবনুল মোনজের বলেছেন, হারামের গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক বানানোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মুজাহিদ, আতা এবং আমর বিন দীনার এটাকে জায়েয বলেছেন।

আবু সাত্তার ইমাম শাফেয়ী (র) থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনুল মোনজের বলেন, হারাম এলাকার গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক বানানোর পক্ষে সরাসরি কোন দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোন জিনিসকে হারাম করা হলে, সেই জিনিসের অল্প-বেশী সকল অংশই হারাম হয়ে যায়। ইবনে আবি শায়বা, তাঁর বইতে লাইস এর বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে, আতা মেসওয়াক বানানো এবং سَنَا নামক গাছ কাটাকে জায়েয বলেছেন এবং মুজাহিদ সেটাকে মাকরুহ বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. মক্কায় যুদ্ধ বিগ্রহ

মক্কায় যুদ্ধ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, اِنَّهَالَمْ تُحَلَّ لِىْ اِلاَّسَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ - মক্কায় আমার জন্য দিনের ১টি ঘন্টা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে হালাল করা হয়েছিল। মক্কায় হত্যা ও রক্তপাত করা যাবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার গভর্ণর আমর বিন সাঈদ, মক্কায় আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যখন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন আবু শোরাইহ বললেন, হে গভর্নর, আমি আমার দুই কানে এমন একটি হাদীস শুনেছি যা আমার পুরো স্মরণ রয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে,রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَيَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِاَنْ يَّسْفِكَ بِهَادَمًا وَلاَيَعْضُدُ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِيْهَا فَقُوْلُوْا : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَذِنَ لِرَسُوْلِهٖ وَلَمْ يَاْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقَالَ عَمْرُوبْنُ سَعِيْدٍ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ يَااَبَاشُرَيْحٍ لاَتُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ الخ -

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তায়ালাই মক্কাকে সম্মানিত করেছেন, কোন মানুষ তা

করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকারের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য এই হারাম সীমানার ভেতর রক্তপাত করা এবং এখানকার গাছ-পালা কাটা জায়েয নেই। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুদ্ধের বরাত দিয়ে এখানে যুদ্ধ ও রক্তপাত করাকে বৈধ বলে মনে করে, তাহলে তোমরা বলবে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্যই এটাকে বৈধ করেছিলেন, তোমাদের জন্য বৈধ করেননি। তাও আমার উদ্দেশ্যে দিনের ১ ঘন্টার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পুনরায় গতকালকের মতই তার মর্যাদা ও সম্মান আজ ফিরে এসেছে। তোমাদের উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত ও অনাগত লোকদের নিকট এই বাণী পৌঁছাবে।" এর জবাবে আমর বিন সাঈদ বলেন, হে আবু শোরাইহ! এ ব্যাপারে আমি তোমার চাইতে বেশী জানি। তবে মক্কা কোন অপরাধীকে কিংবা খুনী ব্যক্তিকে অথবা ভাগুড়ে দুষ্কৃতিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

যারাকশী বলেন, আবু শোরাইহ এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, মক্কায় হত্যা-লড়াই নিষিদ্ধ, যেন এর সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়। পক্ষান্তরে আমর বিন সাঈদ এই হাদীসকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমর এ প্রসঙ্গে আবু শোরাইহকে যা বলেছেন, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা, আবু শোরাইহ হারামে মক্কীতে, বহিরাগত কোন ভাগুড়ে খুনী ব্যক্তির শাস্তির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি বিরোধিতা করেছিলেন শুধুমাত্র আমরের মক্কায় অশ্বারোহী অভিযানের এবং মক্কার সম্মান ও মর্যাদাকে নষ্ট করে সেখানে তাঁর যুদ্ধের পরিকল্পনার। এক্ষেত্রে আবু শোরাইহ উত্তম প্রমাণ পেশ করেছেন এবং আমরকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন।

যদি প্রশ্ন হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর, মক্কায় মোশরেক এবং খোদাদ্রোহী শক্তির ক্ষমতা লাভ অথবা অধিকতর বাধাপ্রাপ্ত হলে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা জায়েয আছে, তাহলে মক্কার লড়াই-হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যে ফায়দা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে মক্কার সম্মানের প্রতি বিশেষ তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য স্থানের তুলনায় এর ফজীলত ও মর্যাদাকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এখানে যুদ্ধ করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এর পরও অধিকাংশ ফেকাহবিদ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে জায়েয বলেছেন।

মুহিব তাবারী القرى বইতে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণী 'আমার পরে আর কারো জন্য এই শহরকে বৈধ করা হবে না।' এর অর্থ হল যুদ্ধ ও হত্যা-লড়াইকে এখানে হারাম করা হয়েছে।

আল্লামা যারাকশী এই মাসয়ালার সমাধান দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত সকল হাদীসগুলো একত্র করে বিপরীতমুখী হাদীসগুলোর উত্তর দিয়ে মক্কার জন্য লড়াই-যুদ্ধকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়কে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

মক্কার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যদি কাফের ও বিদ্রোহীরা মক্কার বাইরে ঘাঁটি তৈরি করে অবস্থান গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের অস্ত্র ও পদ্ধতি ব্যবহার করে যুদ্ধ করা যাবে। কিন্তু যদি মক্কার ভেতর ঘাঁটি তৈরি করে অবস্থান গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সকল অস্ত্র ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর কিতাব الأم এর মধ্যেও একথা উল্লেখ করেছেন।

তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একদল আলেমের মত হচ্ছে, তা হারাম। তাঁরা বলেন, বিদ্রোহীদের উপর বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চরম চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

যারাকশী আল মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে যুদ্ধ ছাড়া যদি বিদ্রোহীদেরকে তাড়ানো না যায়, তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। কেননা, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। হারাম এলাকায় সেই অধিকারকে রক্ষা করা অধিক উত্তম।

আবু শোরাইহ সহ অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসসমূহে হারামে যুদ্ধ নিষেধের ব্যাপারে কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, হারাম এলাকায় যুদ্ধ সংঘটিত করা এবং মেনজানিকসহ আধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করাকে এ সকল হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শর্ত হল, যদি অস্ত্র প্রয়োগ করা ছাড়া অন্যভাবে সংশোধন করা সম্ভব না হয়। হাঁ, তবে কাফেররা যদি অন্য শহরে দুর্গ গড়ে তোলে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সমরাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা যাবে।

শেখ আবুল ফতেহ আল কুশাইরী এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেছেন, এটা বাহ্যিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, স্বয়ং নবী করীম (সা) এর জন্যই যেখানে এক ঘন্টা হালাল করে দেয়া হয়েছিল, অন্যদের জন্য সেখানে কি করে যুদ্ধ হালাল হয়? এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ বলতে যে কোন যুদ্ধকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সে যুদ্ধে যে ধরনের অস্ত্রই ব্যবহার করা হউক না কেন। যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কার সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা।

মূলকথা হচ্ছে এ বিষয়টিতে বিভিন্ন প্রকার দলীল প্রমাণের কারণে মতভেদ রয়েছে।

৫. মক্কায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা

হত্যার কারণে কেসাসের শাস্তি হিসাবে হত্যা, জ্বেনার কারণে পাথর নিক্ষেপ করে মারা অথবা অন্য কোন অপরাধের কারণে শরীয়তের ফয়সালা মোতাবেক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি হারামে আশ্রয় নেয়, তাহলে, সে ব্যক্তির ঐ শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে আলেমদের তিনটি মত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) হারামে অবস্থান করা পর্যন্ত সেই ব্যক্তি নিরাপদ। কেননা কুরআন মজিদে আল্লাহ বলেছেন (আলে ইমরান ৯৬) مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا 'যে ব্যক্তি হারামে ঢুকে সে নিরাপদ।' এ ছাড়াও হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য হারামে রক্ত প্রবাহিত করা জায়েয নেই।' তবে সেই ব্যক্তিকে কোনঠাসা করে রাখতে হবে, তার সাথে কথা বলা যাবে না। খাবার দেয়া যাবে না এবং কোন প্রকার লেনদেনও করা যাবে না। যেন সে হারাম থেকে বের হতে বাধ্য হয় এবং তার বিরুদ্ধে কেসাস, হদ বা অন্যান্য শাস্তি কার্যকর করা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র)ও এই একই মত পোষণ করেন বলে এক বর্ণনায় এসেছে। আমর বিন আব্বাস, সাঈদ বিন যোবায়ের, হাকাম বিন আতিয়্যা এবং জাহেরিয়াদেরও এই মত। ইমাম আহমদও এই মতের অনুসারী বলে অপর এক বর্ণনায় জানা যায়। আবু যোবায়ের আলমক্কী বলেছেন, যদি আমি হারামে আমার পিতার হত্যাকারীকেও পাই, তথাপি তার সাথে কোন কথা বলবো না।

(খ) হত্যাকারী ব্যক্তিও যদি হারামে প্রবেশ করে, বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কেসাস বা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাবে না। কিন্তু কেসাস ব্যতীত অন্য যে কোন দণ্ড প্রদান করা যাবে। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু হানীফা থেকে এ মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে।

(গ) হারামে মৃত্যুদণ্ড সহ অন্যান্য দণ্ড কার্যকর করা জায়েয। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর এই মত। তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত

وَلَاتَقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ـ (البقره : ١٩١)

অর্থ ঃ 'তোমাদের সাথে লড়াই না করলে, মসজিদে হারামে তোমরাও তাদের সাথে লড়াই করো না। এখানে লড়াই করলে তার মোকাবিলায় লড়াই বা হত্যা করা যাবে বলে বলা হয়েছে। যারাকশী ইবনুল মোনজের থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

'কাবা শরীফের গেলাফ ধরে থাকা অবস্থায় ইবনে খাতালকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন' এর উপর ভিত্তি করে ইমাম মালেকও হারামে কেসাস এবং হদ কায়েম করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

এ ছাড়াও এই মতের পক্ষে বুখারী শরীফে হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত হাদীসটিও সহায়ক।

عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاْةُ وَالْعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ৫টি প্রাণী ফাসেক বা বিদ্রোহী। হারাম এলাকায় এগুলোকে যেন হত্যা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও ক্ষতিকর কুকুর।

কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী বলেছেন যে, فسقٌ অর্থ হচ্ছে বেরিয়ে যাওয়া। হারামে নিষিদ্ধ প্রাণীগুলো থেকে এগুলোর হুকুম ব্যতিক্রম এবং এগুলোকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করা যাবে না। আল্লামা যারাকশী বলেছেন, এই পাঁচটি প্রাণী কষ্টদায়ক বলে এদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এগুলো ছোট ক্ষতিকারক প্রাণী। কিন্তু হত্যাকারী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত আরো বেশী ক্ষতিকারক। তাই বড় ক্ষতিকারক প্রাণীকে হত্যা করতে কোন বাধা নেই।

হযরত আবু শোরাইহর হাদীসে এসেছে যে, হারাম কোন হত্যাকারীকে অথবা খুনের দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। তাঁর বর্ণিত হাদীসে لاَيَسْفِكُ دَمًا কে এক্ষেত্রে এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে 'অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করা। কুরআন মজীদেও অনুরূপ অর্থে سَفْكٌ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। যেমন ঃ আল্লাহ বলেছেন,

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَاوَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (البقره : ٣٠)

অর্থ ঃ (ফেরেশতারা আল্লাহকে বলল) 'হে আল্লাহ, আপনি কি যমীনে এমন লোকদেরকে তৈরি করবেন যারা এখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করবে?' আল্লাহর এই বাণীর وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا (আলে ইমরান) 'যে

হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ' তাৎপর্য হচ্ছে ঃ আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে হারামের এই নিরাপত্তা মক্কাবাসীদের জন্য এক বিরাট নেয়ামত।

যদি কেউ মসজিদে হারাম অথবা অন্য কোন মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে তাকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে বের করতে হবে এবং হত্যা করতে হবে।

এই সকল আলোচনা দ্বারা একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি হারাম এলাকায় অপরাধ করে, তাহলে, তা এই মতভেদের আওতায় পড়ে না। বরং ইবনুল জাওযী বলেছেন, এর উপরই ইজমা হয়েছে। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি দুঃসাহস এবং আল্লাহর ঘরের বেইজ্জত ও আল্লাহর প্রতি কুফরী করা হয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ (الحج : ٢٥)

অর্থ ঃ কেউ যদি এতে জুলুমের মাধ্যমে কুফরী করে তাকে আমরা কষ্টদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো'

৬. হারামে মক্কায় দিয়াহ বা কঠোর রক্তপণ

কেউ হারাম এলাকায় কাউকে হত্যা করলে তার উপর রক্তপণ বা দিয়াহ ফরয হবে। তবে তা হবে অন্য দিয়াহ থেকে অপেক্ষাকৃত কঠোর। কেননা হারাম এলাকায় পশু শিকার করলেও কঠোর কাফফারা দিতে হয়। তাই মানুষকে হত্যা করা হলে সে ক্ষেত্রে দিয়াহ আরো কঠিন হবে এটাই স্বাভাবিক। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তির কঠোরতার ব্যাপারে হারাম শরীফের প্রভাব ক্রিয়াশীল। কেউ যদি ভুলবশতঃ হত্যা করে তারপরও দিয়াহ কঠোর হবে। চাই হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দু'জনই হারাম এলাকার অধিবাসী হউক, অথবা দু'জনের একজন হারাম এলাকার আর অন্যজন বাইরের, তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। হারাম এলাকায় হত্যা সংঘটিত হলেই তাকে কঠোরভাবে গ্রহণ করতে হবে।

কঠোরতার পরিমাণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইবনুল মোনজের বলেছেন, হযরত উমর ফারুক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম এলাকায় কিংবা হারাম মাসগুলোতে কাউকে হত্যা করে, তার উপর একটি পুরো দিয়াহ এবং আরেক দিয়াহর $\frac{১}{৩}$ ভাগ প্রদানের কঠোর হুকুম কার্যকর হবে। সাঈদ বিন আল মুসাইয়েব, আতা বিন আবি রেবাহ, সোলায়মান

বিন ইয়াসার এবং আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ উলামায়ে কেরাম এই মতই পোষণ করেন।

তবে, আরেক দল আলেমের মতে, হারাম এলাকায় সংঘটিত হত্যার জন্য কঠোরতর দিয়াহ প্রযোজ্য হবে না। হাসান বসরী, ইমাম শা'বী এবং নাখয়ী এই দলের অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল মোনজের বলেছেন, আমাদের মতও তাই। বিশ্বের সর্বত্র সকল মানুষের উপর আল্লাহর আইন একই ধরনের প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

৭. মক্কায় অস্ত্র বহন করা

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে যে নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

لاَيَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْمِلَ السِّلاَحَ بِمَكَّةَ -

অর্থ ঃ মক্কায় অস্ত্র বহন করা কারো পক্ষেই জায়েয নেই।

এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতেই হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, মক্কায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়। কেননা সেখানে হত্যা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ। তাই যে অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যাকান্ড সংঘটিত করা হয় তাও নিষিদ্ধ। কিন্তু কাজী ইয়াদ বলেছেন, বিনা প্রয়োজনে হারামে মক্কীতে অস্ত্র বহন করা জায়েয নেই। হ্যাঁ, তবে যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তা জায়েয আছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আতা (র) এই মতই পোষণ করেন। তাদের প্রমাণ হচ্ছে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বছর কাজা উমরা আদায়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) খাপবদ্ধ অস্ত্র ও তলোয়ার নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি মক্কা বিজয়ের সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সশস্ত্রভাবে মক্কায় এসেছিলেন। কোরায়েশরা প্রতিরোধ করেনি বলে যুদ্ধ হয়নি। অন্যথায় অবশ্যই যুদ্ধ সংঘটিত হত। কিন্তু ইকরামা সম্পূর্ণ পৃথক মত পোষণ করেন। তার মতে প্রয়োজন হলে অস্ত্র বহন করবে সত্য, কিন্তু তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। অন্যান্য আলেমদের বক্তব্যের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে যে, এহরাম পরিধানকারী ব্যক্তি যদি লৌহবর্ম বা শিরস্ত্রাণ পরে, তাহলে তিনি হয়তো তার জন্যই ফিদইয়া দানের কথা বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) মক্কায় অস্ত্র বহনের পক্ষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা, হজ্জ ও বিভিন্ন মওসুমে এই নগরীতে বহু লোকের ভিড় হয়। তাঁর আশংকা যে, এর দ্বারা কেউ আহত হতে পারে। বুখারী শরীফে এ মর্মে নবী করীম (সা) এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে–

مَنْ مَّشَى فِىْ مَسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لِئَلاَّ يُصِيْبَ مُسْلِمًا ۔

অর্থ ঃ তীর বহনকারী কোন ব্যক্তি যদি আমাদের মসজিদ কিংবা বাজারসমূহে চলাফেরা করে সে যেন তীরের মাথা ধরে রাখে। তা না হলে কোন মুসলমান আহত হতে পারে। এক্ষেত্রে সতর্কতা পালনের জন্যই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮. হারামে মক্কীর ঘর-বাড়ী বিক্রি করা ও ভাড়া দান

উলামায়ে কেরাম মক্কার বাড়ী-ঘর বিক্রি, ভাড়া ও বন্ধক প্রদান সম্পর্কে মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) এটাকে জায়েয বলেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র)ও এটাকে জায়েয বলেছেন বলে এক বর্ণনায় জানা যায়। হযরত উমর (রা) সহ এক দল সাহাবারও এই মত। ইমাম আবু ইউসুফও একই মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে, তা নাজায়েয। এটাই ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাজহাব।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের যুক্তি হল ঃ

১। হযরত আবদুল্লাহ বিন আবিয যিনাদ ইবনে আবি নাজিহ থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَكَّةُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أُجْرُبُيُوْتِهَا ۔

অর্থ ঃ মক্কা সম্মানিত, এর ঘর বিক্রি করা কিংবা ভাড়া দেয়া হারাম।

২। হাকেম মোসতাদরাকে, ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মোহাজের থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَكَّةُ مُبَاحٌ لاَتُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلاَتُؤْجَرُبُيُوْتُهَا ۔

অর্থ ঃ মক্কা হচ্ছে মোবাহ। এর ঘর-বাড়ী বিক্রি করা কিংবা ভাড়া দেয়া যাবে না।

৩। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সা) কে বলেছেন, হে রাসূলুল্লাহ! রোদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আপনার জন্য কি একটি ঘর নির্মাণ করবো? উত্তরে তিনি বলেন, যে আগে আসে, তার জন্যই এটা বৈধ। (তিরমিযী)

৪। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, مِنًى مُبَاحٌ لِّمَنْ سَبَقَ

যে আগে আসে, মিনা তার জন্যই বৈধ। ইমাম নওয়ী বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ হাদীস। অন্য একটি বর্ণনায় মিনার পরিবর্তে 'মক্কা' শব্দের উল্লেখ আছে। তখন এর অর্থ হবে; যে আগে আসে, মক্কা তার জন্যই বৈধ।'

তাঁরা আরো বলেছেন, মক্কা হারামেরই ভূখণ্ড। মসজিদে হারামের মতই এর ভূখন্ড বেচাকেনা কিংবা ভাড়া দেয়া জায়েয নেই।

৫। মক্কা মসজিদে হারামের মতই সম্মানিত। মসজিদে হারামের কোন অংশ যেমন বিক্রি করা যায় না ঠিক তেমনি মক্কার ঘর-বাড়ীও বেচা-কেনা করা যাবে না।

৬। হযরত উসমান বিন আবি সোলায়মান হযরত আলকামা বিন নাদলা আল-কানানী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মক্কার ঘর-বাড়ী হচ্ছে মান্নত করা ছাড়া–পশুর মত। রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবুবকর ও হযরত উসমানের যুগে সেখানকার কোন ঘরবাড়ী বেচাকেনা হত না। যার থাকার দরকার হত, সে সেখানে বাস করত এবং যে কাউকে ইচ্ছা বাস করতে দিত। (বায়হাকী)

৭। দারকুতনী ইবনে আবি নাজীহ থেকে এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন مَنْ اَكَلَ كِرَاءَ بُيُوْتِ مَكَّةَ اَكَلَ نَاراً - অর্থ ঃ যে মক্কায় অবস্থিত ঘর-বাড়ীর ভাড়া খায় সে মূলতঃ আগুন খায়।

৮। মুজাহিদ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন,

مَكَّةُ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللّٰهُ لاَيَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلاَ اِجَارَةُ رِبَاعِهَا -

অর্থ ঃ মক্কা সম্মানিত, আল্লাহ একে সম্মানিত করেছেন। এর ঘরবাড়ী বেচাকেনা করা বা ভাড়া দেয়া জায়েয নেই।

ইমাম নবওয়ী বলেছেন ঃ ইমাম শাফেয়ীসহ আরো যারা মক্কার ঘরবাড়ী বেচাকেনা ও ভাড়া দেয়া জায়েয বলেছেন, তাঁদের দলীলগুলো হচ্ছে—

১। আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ - (الحشر: ٥٩) অর্থ ঃ 'ঐ সকল গরীব মোহাজেরদের জন্য যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।' এই আয়াতে 'ঘর-বাড়ী'কে তাদের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। মালিকানা থাকলেই এই

সম্বোধন করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের ঘর-বাড়ীর মালিকানা ছিল। মালিকানা বিক্রি করতে কোন আপত্তি নেই। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কোন সময় শুধু দখলী স্বত্ব ও বসবাসের কারণেও অনুরূপ সম্বোধন করা হয়, যাতে মালিকানা থাকার দরকার হয় না। কুরআনে, এই অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ (আহযাব-৩৩)

'তোমরা তোমাদের ঘরেই থাক, (বাইরে যেয়ো না) এখানে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে তারা যেন তাদের ঘরেই থাকে। এটা জানা কথা যে, তারা স্বামীর ঘরে থাকে। তারপরও 'তাদের ঘর' এইকথা বলে তাদের বাসস্থানের দিকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নের উত্তর হল, মূলতঃ কোন কিছুর মালিকানা বুঝানোর জন্যই সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এজন্যই 'এটি যায়েদের ঘর' একথা বলে ঘরের উপর যায়েদের মালিকানা বুঝানো হয়। কিন্তু কেউ যদি বলে যে, একথা দ্বারা ঘরের উপর যায়েদের বসবাস ও দখলী স্বত্ব বুঝানো হয়েছে তাহলে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২। ইমাম নওয়ী বলেছেন, তাঁদের আরেকটি দলীল হল উসামা বিন যায়েদের বর্ণিত হাদীস। হাদীসটি হল রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় পৌছলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল। আপনি মক্কায় আপনার কোন ঘরে অবতরণ করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ী রেখেছে? আকীল এবং তালেব আবু তালেবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। মুসলমান হওয়ার কারণে জাফর এবং আলী আবু তালেবের ওয়ারিশ হননি। অপরদিকে আকীল ও তালেব ছিল কাফের। (বুখারী ও মুসলিম) এই হাদীস দ্বারা মক্কার ঘর-বাড়ীর উত্তরাধিকার এবং এতে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ ও লেন-দেন জায়েয বলে প্রমাণিত হয়।

৩। তাঁরা হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস থেকেও প্রমাণ পেশ করে থাকেন। হাদীসটিতে আছে যে, আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ থেকে কোরাইশদের সব গর্ব অহংকার শেষ এবং আজকের পরে আর কোন কোরাইশও নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন 'আবু সুফিয়ানের ঘরে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপদ এবং নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে।' (মুসলিম) এখানে আবু সুফিয়ানের ঘর ও নিজ ঘরের কথা বলা

হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্যদের ঘর-বাড়ীর মালিকানা ছিল।

৪। তাদের আরেকটি দলীল হল বায়হাকী ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত একটি আচার। সেই আচারে বলা হয়েছে যে, হযরত নাফে বিন আবদুল হারেস, সাফওয়ান বিন উমাইয়া থেকে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) এর জন্য ৪ শত, কিংবা ৪ হাজারের বিনিময়ে دارالسجن 'দারুস সিজন' খরিদ করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হারামে মক্কীর বাড়ীঘর বেচাকেনা করা জায়েয।

৫। তাঁদের আরো একটি প্রমাণ হলো, যোবায়ের বিন বাক্কার ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, হাকীম বিন হেযাম হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে মক্কার দারুন নাদওয়াকে ১ লাখের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। তখন আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের বললেন, হে আবু খালেদ, আপনি মক্কার কোরাইশদের সবচাইতে সেরা জায়গাটি খরিদ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ সকল সম্মান ও মর্যাদ বিলুপ্তি হয়ে গেছে। আজ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর সম্মান ও মর্যাদা নেই। তারপর তিনি বললেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকুন, এই অর্থ সবটুকুটই আল্লাহর রাস্তায় দান করা হল।

৬। ইমাম তাহাওয়ী ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অন্যান্য শহরের মত মক্কা শরীফের ঘরবাড়ী ভাড়া দেয়া ও বেচা কেনা করা জায়েয আছে। ইমাম তাহাওয়ী বলেছেন যে, আমাদের মতে, মসজিদে হারামের জন্যই এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য। এখানে কেউ ঘর তৈরি করতে পারবে না এবং এর কোন অংশ আটক রাখতে পারবে না। এটা ঠিক অন্যান্য ঐ সকল স্থানের মত, যেখানে সব মানুষ জমায়েত হয় সেখানে কারুর কোন মালিকানা চলে না। এতে সকল মানুষের অধিকার সমান। তোমরা কি দেখনা, আরাফাতের ময়দান, মানুষের অবস্থান বা 'ওয়াকফ' করার স্থানে কেউ যদি ঘর বানাতে চায় তাহলে সেটা জায়েয নেই? মিনার হুকুমও অনুরূপ। হযরত আয়িশা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করেন 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মিনায় রোদ থেকে বাঁচার জন্য এবং ছায়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কিছু তৈরি করবেন না? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আয়িশা, যে আগে আসে, সেই মিনায় থাকার অধিকার লাভ করবে। তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকেম বলেছেন, 'ইমাম বুখারীর শর্তের ভিত্তিতে এই হাদীসটিকে সহীহ বলা যায়।' ইমাম তাহাওয়ী আরো বলেছেন, আল্লাহ অন্যান্য

স্থানের উপর মক্কাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাতে ঘর বাড়ী নির্মাণেরও অনুমতি দিয়েছেন। 'যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সেও নিরাপদ' রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই হাদীস দ্বারা ব্যক্তি মালিকানা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। মক্কার ঘর বাড়ী ভাড়া ও বেচাকেনার বিরুদ্ধে যারা মত প্রকাশ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে জবাব হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

ক) ইমাম আবু হানিফা (র) আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস নয়। ঐটি হচ্ছে হাদীসে মাওকুফ বা কোন সাহাবীর বর্ণনা। যারাকশী বলেছেন যে, ইমাম দারু কুতনী সহ অন্যান্য হাফেজে হাদীসরা এটাকে হাদীসে মাওকুফ বলেছেন। এছাড়াও এই হাদীসের সনদের মধ্যে আবু যিয়াদ নামক রাবী হচ্ছে দুর্বল। ইমাম নওয়ী শরহুল মুহাজ্জাব গ্রন্থে এই কথা বলেছেন।

খ) হাকেম, ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মোহাজের এবং মোহাজের তাঁর বাপ থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসটি মোহাদ্দেসদের কাছে দুর্বল এবং তাঁরা সবাই এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইসমাইলকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী, ইবনে হিব্বান এবং ইয়াহইয়া বলেছেন যে সে খুব প্রকাশ্য ভুলকারী ব্যক্তি।

আবু হাতেম বলেছেন, এই হাদীস বর্জনীয়।

গ) হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসটিকে ইমাম নওয়ী সহীহ বলেছেন, সেটি দ্বারা হারামের অনাবাদী বালুকাময় পতিত এলাকা বুঝানো হয়েছে।

ঘ) ইমাম নওয়ী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'মিনায় যে আগে আসবে তার অগ্রাধিকার রয়েছে' মর্মে যে হাদীস বলেছেন সেটি দ্বারাও মিনায় অনাবাদী বালুকাময় পতিত জায়গা এবং হাজীদের অবতরণের জায়গা বুঝানো হয়েছে। মূলতঃ এটি এমন জায়গা যেটি কারুর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে না। ইমাম তীবি বলেছেন, নবী করীম (সা) মিনায় তার জন্য ঘর বানানো এই জন্য নিষেধ করেছেন যে, মিনা হচ্ছে কোরবানী, পাথর নিক্ষেপ এবং মাথার চুল কাটার স্থান। এই কাজে বহু লোক সেখানে জড়ো হবে। যদি সেখানে ঘর বানানোর অনুমতি দেয়া হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুকরণে অসংখ্য ঘরবাড়ী তৈরী হয়ে যাবে। এতে করে মিনা সংকীর্ণ হয়ে আসবে এবং হাজীদের হজ্জ সংক্রান্ত হুকুম আহকাম পালন কারা কষ্টকর হবে। যে কোন রাস্তাঘাট ও বাজারের মজলিশ

সমূহেও অনুরূপ ঘরবাড়ী তৈরী করা নিষিদ্ধ। কেননা এতেও লোকদের সমস্যা সৃষ্টি হবে। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, মিনায় নিজের ও মুহাজিরদের জন্য ঘর তৈরীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যই অনুমতি দেননি যে, তাঁরা নিজেরাই স্বয়ং এখান থেকে হিযরত করে চলে গেছেন এবং তারাই পুনরায় এখানে ফিরে এসে ঘরবাড়ী তৈরী করা পছন্দ করেননি। আল্লামা কারী বলেছেন, এই ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা) এর ব্যাখ্যার বিপরীত। কেননা মিনা থেকে তো আর তাঁরা হিযরত করেননি।

ঙ) মক্কাকে মসজিদে হারামের মতই অবিকল মনে করা ঠিক নয়। কেননা মসজিদ সর্বদাই সম্মানিত ও মুক্ত। তাই এর সাথে বাসোপযোগী ঘরবাড়ী বিক্রিকে একরকম মনে করে সেগুলোর বেচাকেনা নিষিদ্ধ করা যায়না। এজন্যই দুনিয়ার সকল দেশে ঘরবাড়ী বিক্রি হয়। মসজিদ বিক্রি হয় না।

চ) ইমাম নওয়ী বলেছেন, উসমান বিন আবু সালমান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির দুটো জবাব আছে। (১) ইমাম বায়হাকী বলেছেন যে, হাদীসটি মুনকাতি' বা মাঝখানে রাবীচ্যুত।

(২) ইমাম বায়হাকী সহ অন্যরা বলেছেন যে, এই হাদীসে আরবদের একটি অভ্যাসের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, যে সকল ঘর-বাড়ী তাদের দরকার ছিল না, নেক ও সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা সেগুলোকে ধার হিসেবে বাস করতে দিত। মক্কা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকেরা জানিয়েছেন যে, ঘরবাড়ীগুলোতে উত্তরাধিকার প্রথা চালু ছিল।

ছ) আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে ইবনে আবী নাজিহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মাঝে রাবীচ্যুত। কেননা, ইবনে নাজিহ আবদুল্লাহ বিন উমরের যুগের লোক নন। তাঁর আসল নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার।

জ) মুজাহিদের বক্তব্যটি হচ্ছে মাঝপথে সাহাবী বিচ্যুত। এটি মুরসাল। এটাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়না। এটা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (র) কর্তৃক ইবনে উমর থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসের অনুরূপ। আসলে, ঐটি হচ্ছে মাওকুফ বা সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তা বলেননি।

ইমাম শাফেয়ীর সাথে ইসহাক বিন রাহওয়াইর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম বায়হাকী ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ আল কুফীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (র)-কে লোকদের উদ্দেশ্যে মাসআলা বর্ণনা

করতে দেখলাম এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইসহাককেও উপস্থিত দেখতে পেলাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইসহাককে বললেন, হে আবু ইয়াকুব! আসুন, আমি আপনাকে এমন এক লোক দেখাবো, যার মত লোক আপনার দু'চোখের নীচে কখনও পড়েনি। ইসহাক জবাবে বললেন, কি বলেন, আমার দু'চোখ এমন লোক দেখেনি? তারপর তিনি তাকে ইমাম শাফেয়ীর কাছে নিয়ে আসলেন। ইসহাক ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে বসলেন। তখন ইমাম শাফেয়ী (র) নিজের বিশেষ শাগরেদদের নিয়ে বসা ছিলেন। ইসহাক প্রশ্ন করলেন যে, মক্কার ঘর বাড়ী ভাড়া দেয়া জায়েয আছে কি? ইমাম শাফেয়ী বললেন, আমার মতে তা জায়েয। তিনি এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর রেখেছে? তখন ইসহাক বললেন, আমি কি কথা বলতে পারি?

ইমাম শাফেয়ী তাঁকে কথা বলার অনুমতি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বলুন। তখন ইসহাক বললেন, ইয়াজিদ হিশাম থেকে এবং হিশাম হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বসরী এটাকে জায়েয মনে করেন না। অনুরূপভাবে, আবুল কাসেমসহ অন্যান্যরা সুফিয়ান থেকে, তিনি মনসুর থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম এটাকে জায়েয মনে করেন না। আতা এবং তাউসেরও এই একই মত। তখন ইমাম শাফেয়ী ইসহাককে চিনে এমন লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, লোকটি কে? তাঁরা তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, যে তিনি হলেন ইসহাক বিন রাহওয়াই। তখন ইমাম শাফেয়ী' জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সে ব্যক্তি যাকে খোরাসান বাসীরা নিজেদের ফকীহ মনে করে? ইসহাক বললেন, হ্যাঁ, তারা এরকম মনে করে। তখন শাফেয়ী' বললেন, আপনার স্থানে অন্য কেউ হলে আমি তার উটের কান ছিদ্র করে দিতে বলতাম। কেননা, আমি বললাম যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আর আপনি তাঁর মোকাবিলায় বলেন যে, আতা, তাউস, ইবরাহীম ও হাসান এটাকে না জায়েয বলেছেন। তাদের কারুর বক্তব্য বা উক্তি কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসের সমান? তিনি এই বিতর্ক পুরো বর্ণনা করে বলেন যে, তারপর ইমাম শাফেয়ী প্রশ্ন করেন ঃ আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ -

এই আয়াতে دیار 'ঘরের' সম্বোধন তার মালিকের প্রতি না অন্য কারুর প্রতি করা হয়েছে? ইসহাক উত্তরে বলেন, 'মালিকের প্রতি।' তখন ইমাম শাফেয়ী' বলেন, আল্লাহর কথাই হচ্ছে সবচাইতে বেশী সত্য। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ"। ইমাম শাফেয়ী প্রশ্ন করেন, এই হাদীসে 'আবু সুফিয়ানের ঘর' বলে সম্বোধন এর মালিকের প্রতি করা হয়েছে না কি অ-মালিকের প্রতি? ইসহাক বলেন, মালিকের প্রতি।' তখন ইমাম শাফেয়ী বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) ক্ষৌরকারদের ঘর কিনে তাতে সাহাবায়ে কেরামসহ অন্যান্যদেরকে বাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারপর ইসহাক বললেন, আমি সূরা হজ্জ এর একটি আয়াত পড়ি।
সেটি হচ্ছে এই ঃ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ (الحج : ٢٥)

অর্থ ঃ 'সেখানকার অধিবাসী ও বহিরাগত লোকদের সবার জন্য এটি সমান।' তখন ইমাম শাফেয়ী (র) বললেন, আপনি যে রকম বলছেন যদি অবস্থা তাই হয় তাহলে সেখানকার হারানো জিনিস সম্পর্কে প্রচার করা যাবে না, সেখানে কোরবানীর পশু জবেহ্ করা যাবে না এবং সেখানে মল-মূত্র ফেলাও নিষিদ্ধ হবে। আসলে সেটা শুধু সমজিদে হারাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, হারাম এলাকা সম্পর্কে নয়। তখন ইসহাক চুপ করে গেলেন এবং ইমাম শাফেয়ী'ও আর কোন কথা বললেন না।

যাই হোক, বর্ণিত আয়াতের অর্থ হল, মসজিদে হারামে মক্কা ও মক্কার বাইরের লোক সবাই সমান। মক্কার অধিবাসীগণ মসজিদে হারামের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে মসজিদে হারামে অন্যদের উপর তাদের কোন পৃথক মর্যাদা নেই। বরং এক্ষেত্রে সবাই সমান। কেননা, কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে এরকম ঃ

وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادُ - (سورة الحج :٧٥)

অর্থ ঃ 'আমরা মসজিদে হারামকে মক্কার অধিবাসী ও বহিরাগত লোকদের জন্য সমান করে দিয়েছি।' ইসহাক "ه" 'হু' সর্বনামকে মক্কা শহর বুঝেছেন। আর ইমাম শফেয়ী তাকে মসজিদে হারাম বুঝেছেন। মসজিদে হারাম হওয়াটাই এখানে বেশী যুক্তিযুক্ত। আলেমদের মধ্যে মতভেদের এটি হচ্ছে প্রথম কারণ। [দ্বিতীয় কারণ হলো, মক্কা বিজয় কি সন্ধির ভিত্তিতে হয়েছে না যুদ্ধের ভিত্তিতে? ইমাম শাফেয়ীর মতে মক্কা বিজয় সন্ধির ভিত্তিতে হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে

যুদ্ধের ভিত্তিতে হয়েছে। যারা বিজয়কে সন্ধির ভিত্তিতে হয়েছে বলে মনে করেন, তাদের যুক্তি হল, আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের সবার জন্য এবং তাদের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি সবকিছুর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে মক্কা বিজয়ের দিন নিরাপত্তা চেয়েছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ لاَالْمَلْحَمَةِ ـ

'আজ রহমত ও দয়া প্রদর্শনের দিন, আজ যুদ্ধ-বিগ্রহের দিন নয়।'

এই মতের ভিত্তিতে মক্কার ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির মালিকানা, সেগুলোর ভাড়া প্রদানসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার বহাল রয়েছে। এগুলোর মালিকেরা সেগুলোকে ভাড়া প্রদানসহ বেচা-কেনা করতে পারবে।

আর যারা বলে যে, যুদ্ধের ভিত্তিতে মক্কা বিজয় হয়েছে তাদের যুক্তি হল ঃ মক্কা বিজয়ের দিন খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে কয়েকজন কাফের সর্দারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তারা পরাজিত হয়। তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে রশি দিয়ে বেঁধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে হাজির করা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের ব্যাপারে একটি দয়াপূর্ণ ফয়সালা দান করেন। এই মতের ভিত্তিতে বলা হয় যে, মক্কা বিজয় যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিত্তিতে হয়েছে এবং এর সকল সম্পত্তি গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তাই মক্কার ঘর-বাড়ী বেচাকেনা ও ভাড়া দেয়া যাবে না।

তবে প্রথম মতটিই বেশি সহীহ এবং এর সমর্থনে ঐ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ভূমিকা সহ বহু বর্ণনা রয়েছে।

৯. হারাম এলাকার গাছ বেচা-কেনা

যারাকশী বলেছেন, হারামের গাছ বেচা-কেনা পুরো নিষিদ্ধ। কাফফাল বলেছেন, যে গাছ ঔষধের জন্য ব্যবহার হয় তার কিছু অংশ কেটে বেচাকেনা জায়েয আছে। তিনি তাঁর কেতাব 'রওদা'তে এই মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে।

১০. মোশরেকের মক্কায় প্রবেশ

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْاالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ـ (সূরা তওবা-২৮)

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে মোশরেকরা অপবিত্র। এই বছরের পর থেকে তারা যেন আর মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়।' এই আয়াতটি হিজরী ৯ সালে নাযিল হয়েছে। এখানে বর্ণিত 'মসজিদে হারাম' শব্দ দ্বারা গোটা হারাম এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা ইসরার ১ম আয়াতেও 'মসজিদে হারাম' শব্দ দ্বারা হারাম এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الخ ـ (الاسراء : ١)

অর্থ ঃ 'পবিত্রতা সেই সত্তার জন্য যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় সফর করিয়েছেন।' মাওয়ারদী এবং বাগাওয়ী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মেরাজের রাতে উম্মেহানী কিংবা হযরত খাদীজার ঘরে ছিলেন। তাঁকে সেখান থেকেই রাত্রে মসজিদে আকসায় মেরাজের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে। অথচ ঐ ঘর দু'টোর প্রত্যেকটিই মসজিদে হারামের বাইরে।

এই আয়াতের মূল কথা হল, কাফের-মোশরেকরা মক্কার মসজিদ কিংবা হারামে-মক্কীতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রা) তাঁর 'আল-উম' কিতাবে লিখেছেন, মুসলিম শাসক কোন অমুসলমানকে, চাই সে ডাক্তার কিংবা অন্য কোন পেশাদার হউকনা কেন, মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে পারেন না।

আল্লাহ কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) এর একটি দোয়া উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে–

وَاِذْقَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَابَلَدًا آمِنًا ـ (سورة البقرة : ١٢٦)

অর্থ ঃ 'যখন ইবরাহীম (আ) দোয়া করল, হে আমার রব! এই শহরকে নিরাপদ বানিয়ে দিন।' এর জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً

অর্থ ঃ 'যে কুফরী করে আমি তাকে যৎসামান্য সুখভোগের সুযোগ দেই।' এটি হচ্ছে মক্কা বিজয়ের আগের কথা।

মক্কা বিজয়ের পরও কাফেরদের মক্কায় প্রবেশ পুরোমাত্রায় নিষিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী

(রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

لَايَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ فِى الْحَرَمِ

অর্থ ঃ 'হারামে মুসলমান ও মোশরেক একত্র হতে পারে না।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এহরাম পরার যোগ্যতা ছাড়া কেউ মক্কায় প্রবেশ করে না। কাফেররা এহরাম পরেনা বলে তাদের মক্কায় প্রবেশ নিষেধ।

যারাকশী বিভিন্ন ফেকাহবিদদের বরাত দিয়ে বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞার কারণে কোন কাফের গোপনে মক্কায় প্রবেশ করে অসুস্থ হয়ে মারা গেলে, দাফন হয়ে যাওয়ার পরেও লাশ অবিকৃত থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং হারাম এলাকার বাইরে সরিয়ে নিতে হবে। তবে ফেকাহবিদরা জিম্মী এবং আহলে কিতাবের লোকদের ব্যাপারে কিছু মতভেদ পোষণ করেন।

১১. হারাম এলাকার মাটি স্থানান্তর

যারাকশী বলেছেন, মক্কার মাটি-পাথর সরিয়ে অন্যত্র নেয়া নাজায়েয। এক্ষেত্রে মসজিদে হারামের মাটি কিংবা মক্কার হারাম এলাকার মাটির একই হুকুম। ইমাম নওয়ী শরহুল মুহাজ্জিব গ্রন্থে এটাকেই বেশী সহীহ মত বলে উল্লেখ করেছেন। রাফেয়ী' এটাকে মাকরূহ বলেছেন। হানাফী মাজহাবে, পাথর ও মাটি সরানোকে জায়েয বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী' 'আল-উম' কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। এটাই হযরত উমর এবং ইবনে আব্বাসেরও মত। তবে তাঁরা এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আহমদ (রহ) বলেছেন, কেউ যদি রোগমুক্তির জন্য হারামের মাটি ব্যবহার করতে চায়, সে যেন ঐ মাটি না নেয়। বরং ঐ মাটির উপর অন্য মাটি মিলিয়ে তা ব্যবহার করে। আসলে এ ব্যাপারে মূলকথা হল, এর মাটি অন্যত্র সরানো হলে এর স্থায়ী মর্যাদা নষ্ট হয়। কেননা, আল্লাহ এর প্রতিটি বালুকণার জন্য নির্দিষ্ট মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারণ করেছেন।

১২. মক্কায় মল-মূত্র ত্যাগ করা

কিছুসংখ্যক লোক হারামে মক্কীতে মল-মূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা হারামকে মসজিদে হারামের মতই সম্মানজনক মনে করেন। যারাকশী বলেছেন, এই ব্যাখ্যা সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। স্বয়ং নবী করীম (সা), সাহাবায়ে কেরাম এবং অতীতের বুজুর্গানে দীন সবাই মক্কায়

মল-মূত্র ত্যাগ করেছেন। সম্ভবতঃ কিছু লোক নিজেদের বিশেষ রুচির ভিত্তিতে হারামে মক্কীতে পেশাব-পায়খানা না করাকে ভাল মনে করেছেন। কাজেই তাঁদের এই মতকে অনুসরণ করা জরুরী নয়। তবে এটাকে পসন্দ করতেও আপত্তি নেই। এ প্রসঙ্গে হাফেজ আবু আলী বিন সাকান তাঁর 'সুনানে সেহহা' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) এর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় থাকতেন তখন মল-মূত্র ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে মোগাম্মাসে যেতেন এবং সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করতেন।' মোগাম্মাস হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে বাদশাহ আবরাহা কাবা ধ্বংস অভিযানে হাতী থামিয়েছিলেন এবং সে হাতীগুলো সেখান থেকে আর সামনে এগুতে চায়নি। তারপর আল্লাহ ছোট পাখির ঝাঁক পাঠিয়েছে পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। তাহজীবুল আসার গ্রন্থে আবু জাফর আততাহাওয়ী বলেছেন, মোগাম্মাস মক্কা থেকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত।

তাবরানী আওসাত গ্রন্থে, নাফে' বিন আমর বিন দীনার থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ بِحَاجَتِه اِلٰى الْمُغَمَّسِ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মোগাম্মাসে মল-মূত্র ত্যাগ করতে যেতেন। নাফে' বলেছেন, ঐ স্থানটি মক্কা থেকে দু'মাইল দূরে। মোগাম্মাস, মীনা ও মোযদালাফার মাঝখানের সামান্য কিছু জায়গা। মীনার শেষ সীমানা পর্যন্তই হারাম শরীফের সীমানা। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করেছেন।

১৩. হারাম এলাকার পাথর দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করা

যারাকশী বলেছেন, মাওয়ারদী উল্লেখ করেছেন যে, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর হারাম এলাকার পাথর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা এবং পবিত্রতা অর্জন করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দুটো মত আছে। প্রথম মতটি হচ্ছে, এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হবে এবং ফরজ আদায় হবে, তবে গুনাহ হবে। আসল ব্যাপার হল, হাদীস এটাকে নিষিদ্ধ করাতো দূরে থাক, মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারেও কিছু বলেনি। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে ঃ এর পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয আছে।

যে আলেমরা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং হারামের মাটি ও পাথর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা গুনাহ বলেছেন, এটা তাদের বিশেষ রুচির ব্যাপার। কেউ এই

মত অনুসরণ করলে করতে পারে তবে তা জরুরী নয় এবং উলামায়ে কেরামের এটা কোন সর্বসম্মত মতও নয়।

ইমাম মালেক সম্পর্কে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য মদীনার হারাম শরীফের বাইরে যেতেন। তবে এই ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য তিনি কিছু বলেননি। তিনি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই হাদীস ও কুরআনের বাইরে কোন মতামত দেননি। তিনি বেদআতের ব্যাপারেও সতর্ক ছিলেন। তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, যা জায়েয মানুষ তাই করুক। এটা জায়েয এবং সাধারণ হুকুম। তবে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে হারাম শরীফের আদব রক্ষার নিয়তে হারামের বাইরে গিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করেছেন। কাজেই এটা তাঁর ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার।

১৪. নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়া জায়েয

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম (সা) কয়েক সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। সে সময়গুলো হচ্ছে ঃ সূর্যোদয়ের সময় যে পর্যন্ত না সূর্য এক তীর পরিমাণ উপরে উঠে, ঠিক দুপুরে সূর্য যখন মাথার উপর আসে এবং যে পর্যন্ত না হেলে যায়, সন্ধ্যার সময় যখন পশ্চিমাকাশে হলুদ বর্ণ দেখা দেয়, যে পর্যন্ত না সূর্য ডুবে যায়, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এই হুকুম থেকে হারামে মক্কাকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু দাউদ শরীফে হযরত যোবায়ের বিন মোতায়েম থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَّافٍ لاَتَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ ـ

অর্থ ঃ 'হে আবদে মনাফের সন্তানরা, কা'বা শরীফের তওয়াফকারী কোন ব্যক্তিকে, দিন ও রাত্রের যে কোন সময় নামায আদায় করতে চাইলে, বাধা দিওনা।' হাকেম এই হাদীসটি তাঁর মোসতাদরাকে বর্ণনা করে বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ হাদীস।

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে ঃ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ اِلاَّ بِمَكَّةَ

অর্থ ঃ 'ফজরের নামাযের পর মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও নামায পড়া জায়েয নেই।' যারাকশী বলেছেন, এখানে মক্কা বলতে পুরো হারাম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। পুরো হারামের মর্যাদার কারণেই এই হুকুম দেয়া হয়েছে।

আবুল হাসান আলী বিন আলজা'দ সুফিয়ান বিন সাঈদ থেকে, তিনি আবু জুরাইজ থেকে এবং তিনি ইবনে আবি মোলায়কা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) আসরের পরে তওয়াফ করেছেন এবং দুই রাকাত নামায পড়েছেন। ইবনে আমি শায়বা তাঁর গ্রন্থে, ইমাম আবু হানীফার মতের বিরুদ্ধে কয়েকটি আচার উল্লেখ করেছেন।

আ'তা বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) কে ফজরের পর কাবা শরীফের তওয়াফ করতে এবং সূর্যোদয়ের আগে দু'রাকাত নামায পড়তে দেখেছি।' আ'তা আরেকটি বর্ণনায় বলেছেন, 'আমি আবনে উমর এবং ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাসকে আসরের পরে তওয়াফ এবং নামায পড়তে দেখেছি।

লাইস আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা) কে মক্কায় আসতে এবং আসরের পর তাদেরকে তওয়াফ এবং নামায পড়তে দেখেছেন।

ওয়ালিদ বিন জুমাই আবুত তোফাইল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবুত তোফাইল আসরের পর তওয়াফ করেছেন এবং সূর্য হলুদ রং ধারণ করার আগ পর্যন্ত নামায পড়েছেন।

আ'তা আরো বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমর ও ইবনে যোবায়ের কে ফজরের নামাজের আগে তওয়াফ করতে এবং সূর্যোদয়ের আগে দু'রাকাত নামায পড়তে দেখেছি।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর কারণে, আলেমরা এই মাসআলায় মতভেদ পোষণ করেন। কেউ বলেছেন, এটা শুধু তওয়াফের দু'রাকাত নামাযের জন্য বিশেষ অনুমতি। এগুলোর ভিত্তিতে নিষিদ্ধ সময়েও তওয়াফ শেষে এই দুই রাকাত নামায পড়া যাবে। তবে অন্যান্য নামাযের হুকুম অভিন্ন এবং এতে মতভেদ নেই।

তাদের দলীল হচ্ছে, নিষিদ্ধ সময়ে নামায থেকে বিরত থাকার জন্য বর্ণিত হাদীসগুলো। যদিও তওয়াফের নামাযের ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি দানকারী হাদীসও

রয়েছে। তাঁরা দুটো হাদীসের জবাবও দিয়েছেন। হাদীস দু'টো হচ্ছে–

(১) لَاتَمْنَعُوا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى ـ

অর্থ ঃ 'কেউ এই ঘরের তওয়াফ করলে কিংবা এখানে নামায পড়লে তাকে নিষেধ করো না।'

(২) لَاصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ اِلَّا بِمَكَّةَ ـ

অর্থ ঃ 'ফজরের পর মক্কা ছাড়া আর কোথাও নামায পড়া জায়েয নেই।'

এই হাদীস দুটোর জবাবে তাঁরা বলেছেন, এটা হচ্ছে তওয়াফের দু'রাকাত নামাযের জন্য বিশেষ ও ব্যতিক্রমধর্মী অনুমতি। বিশেষ কোন দিক ছাড়া কোন হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। যারাকশী বলেছেন, ইমাম বায়হাকীর মতও তাই। তিনি বলেছেন, এই হাদীসগুলোর দ্বারা তওয়াফের দুই রাকাত নামায বুঝানো হয়েছে।

কেউ বলেছেন, এই অনুমতি বিশেষ করে মসজিদে হারামের জন্য, দেয়া হয়েছে। অন্য কোন শহর বা দেশে সাধারণভাবে এই অনুমতি প্রযোজ্য নয়।

কেউ বলেছেন, এই অনুমতি হচ্ছে মক্কার বাইর থেকে আগত লোকদের জন্য, মক্কায় বসবাসকারী লোকদের জন্য নয়।

আলেমরা প্রত্যেকেই ঐ সকল হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ গুলোর কারণ বের করার চেষ্টা করেছেন এবং সে অনুযায়ী মাসআলা দান করেছেন।

কেউ বলেছেন, নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়ার হুকুম হচ্ছে এই পবিত্র স্থানের মর্যাদার কারণে। ফলে তাদের কাছে এ ব্যাপারে মক্কায় বসবাসকারীও বহিরাগত লোকদের বিষয়টি সমান বিবেচনার দাবী রাখে।

কেউ বলেছেন, পবিত্র স্থানের বিভিন্ন অংশের মর্যাদার মধ্যে এ পার্থক্য আছে। এজন্য তারা মসজিদে হারাম ছাড়া মক্কা শহরের অন্য কোথাও কিংবা অন্য কোন শহরে এই বিশেষ অনুমতি প্রযোজ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ বলেছেন, মক্কাই হচ্ছে মূল কারণ। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এবাদত করার জন্য এখানে আসে। তাদেরকে নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করলে তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এজন্য বহিরাগত লোকদের জন্য নিষিদ্ধ সময় নামাজ পড়ার অনুমতি রয়েছে। তাই মক্কায় বসবাসকারী লোকেরা এই হুকুমের ব্যতিক্রম।

কেউ বলেছেন, নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়ার ব্যাপারে মক্কায় কোন বিশেষ অনুমতি থাকতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে মক্কাসহ সকল জায়গায় একই হুকুম।

১৫. মক্কায় নামাযের অতিরিক্ত সওয়াব

মক্কায় নামায পড়লে অন্য জায়গার তুলনায় ১ লাখ গুণ সওয়াব বেশী হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে এরূপ ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِيْ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার মসজিদে (নববীতে) নামায পড়া অন্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ সওয়াব বেশী, তবে মসজিদে হারাম এর চাইতে ব্যতিক্রম।' আহমদ এবং বাজ্জার তাঁদের মুসনাদে, মসজিদে নববীর চাইতে মসজিদে হারামে নামায পড়াকে অনুরূপ বেশী সওয়াবের কারণ বলেছেন।

ইবনে হিববান তাঁর হাদীস গ্রন্থে হাম্মাদ বিন যায়েদ-হাবিব আল-মোয়াল্লেম-আতা বিন আবি রেবাহ-আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِّنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِىْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ ـ

অর্থ ঃ "নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার মসজিদের নামায অন্য মসজিদের চাইতে ১ হাজার গুণ উত্তম। তবে মসজিদে হারাম এর ব্যতিক্রম। মসজিদে হারামের নামায আমার মসজিদের চাইতে ১০০ গুণ উত্তম।" এর অর্থ দাঁড়ায় মসজিদে হারামের নামায, অন্য মসজিদের চাইতে ১ লাখ গুণ এবং মসজিদে নববীর চাইতে ১০০ গুণ উত্তম।

ইবনে মাজা, ইসমাঈল বিন রাশেদ-যাকারিয়া বিন আদী-আবদুল্লাহ বিন আমর আবদুল করীম–আতা-জাবের এই সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

صَلاَةٌفِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ الاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِّائَةِ اَلْفٍ فِيْمَاسِوَاهُ ـ

অর্থ ঃ 'আমার মসজিদের নামায, মসজিদে হারাম ব্যতীত, অন্য যে কোন মসজিদের নামাযের চাইতে এক হাজার গুণ উত্তম, আর মসজিদে হারামের নামায অন্য মসজিদের চাইতে ১ লাখ গুণ বেশী উত্তম।' এর ফলে মসজিদে হারামের এক ওয়াক্ত নামায এক ব্যক্তির ৫৫ বছর ৬ মাস ২০ রাতের নামাযের সমান হয় এবং মসজিদে হারামের একদিন ও রাত্রের নামায তথা ৫ ওয়াক্ত নামায এক ব্যক্তির ২৭৭ বছর ৯ মাস ১০ রাত্রির নামাযের সমান।

বাযযার তাঁর মুসনাদে ইবরাহীম বিন হোমাইদ-মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ বিন শাদ্দাদ-সাঈ বিন সালেহ আল কাদ্দাহ-সাঈদ বিন বশির-ইসমাঈল বিন ওবায়দুল্লাহ-উম্মুদ দারদা-আবুদ দারদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন–

فَضْلُ الصَّلاَةِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلٰى غَيْرِهِ بِمَائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ ـ وَفِىْ مَسْجِدِىْ اَلْفُ صَلاَةٍ ـ وَفِى مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمَائَةِ صَلاَةٍ ـ

অর্থ ঃ 'অন্য মসজিদের নামাযের চাইতে মসজিদে হারামের নামাযের মর্যাদা হচ্ছে ১ লাখ, আমার মসজিদের নামায এক হাজার এবং বায়তুল মাকদেসের মসজিদের নামায পাঁচশতগুণ বেশী।'

ইবনে মাজা হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

صَلاَةَ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ بِصَلاَةٍ ـ وَصَلاَتُهُ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلاَةً ـ وَصَلاَتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يَجْمَعُ فِيْهِ بِخَمْسِمَائَةِ صَلاَةٍ ـ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلاَةٍ ـ وَصَلاَةٌ فِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ ـ

অর্থ ঃ 'কেউ ঘরে নামায পড়লে ১ গুণ, মহল্লার মসজিদে পড়লে ২৫ গুণ, জামে মসজিদে পড়লে ৫শ' গুণ, মসজিদে আকসা ও মদীনার মসজিদে (নববীতে)

পড়লে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে পড়লে ১ লাখ গুণ বেশী সওয়াব পাবে।'

ইবনে ওয়াদ্দাহ-হামেদ বিন ইয়াহইয়া আলবালখী-ইবনে উয়াইনা-যিয়াদ-সোলায়মান বিন আতীক-আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের হযরত উমর বিন খাত্তাবকে বলতে শুনেছেন ঃ

صَلاَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِّائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ 'মসজিদে হারামের নামায, মসজিদে নববীর নামাযের চাইতে ১ লাখ গুণ বেশী উত্তম।' ইবনে হাযম বলেছেন, এর বর্ণনাকারীদের সূত্র সূর্যের মত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। সাহাবায়ে কেরামদের এই ব্যাপারে ইজমা ছিল যে, মসজিদে নববীর নামাযের চাইতে মসজিদে হারামের নামাযের মর্যাদা ১ লাখ গুণ বেশী। কোন সাহাবী এই মতের বিরোধিতা করেননি।

যাই হোক, তিন মসজিদে অতিরিক্ত ফজীলতের যে বর্ণনা এসেছে তা শুধু ফরজ নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সকল নফল ও সুন্নাত নামায এবং অন্য সকল এবাদতের বেলায়ও প্রযোজ্য।

১৬. অতিরিক্ত সওয়াব শুধু নামাযের মধ্যেই সীমিত নয়

অতিরিক্ত সওয়াব শুধু নামাযের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং অন্যান্য সকল এবাদতের বেলায়ও প্রযোজ্য। নামাযের ফজীলত এবং কা'বা শরীফের দিকে নজর করার সওয়াবের উপর কেয়াস করে অন্যান্য সকল এবাদতেও এই অতিরিক্ত সওয়াব প্রযোজ্য বলে হুকুম দেয়া হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ মক্কার একদিনের রোযা, ১ লাখ রোযা এক দেরহাম সদকা এক লাখ দেরহাম এবং সকল নেক কাজ ১ লাখ গুণ বেশী। ইবনে মাজা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَاتَيَسَّرَ. كُتِبَ لَهُ مِائَةُ اَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهُ وَكُتِبَ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَفِيْ

كُلَّ يَوْمٍ حَمْلُ فَرَسَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِى كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةٌ ـ

অর্থ ঃ 'কেউ মক্কায় রমযান মাস পেয়ে সেখানে রোযা রাখলে এবং সাধ্যমত তারাবীহর নামায পড়লে, অন্য জায়গার তুলনায় তাকে ১ লাখ রমযান মাসের সওয়াব দেয়া হবে। তদুপরি, প্রত্যেক দিন ও রাত্রের জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব, প্রত্যেক দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে দুটো ঘোড়া দানের সওয়াব এবং প্রত্যেক রাত্রির জন্য একটি করে নেক দান করা হবে।

বাযযার তাঁর মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

رَمَضَانُ بِمَكَّةَ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ ـ

'অন্য জায়গার তুলনায় মক্কার রমযান এক হাজার গুণ উত্তম।'

হাকেম মোসতাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهَا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعُمِائَةَ حَسَنَةٍ مِّنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ ـ وَحَسَنَاتُ الْحَرَمِ ـ اَلْحَسَنَةُ بِمِائَةِ اَلْفِ حَسَنَةٍ ـ

অর্থ ঃ 'যে মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে (মীনা-মোযদালাফা ও আরাফাতে) হজ্জ করে পুনরায় মক্কা ফিরে আসে, তার প্রতি কদমে হারামের ৭ শত নেক লেখা হয়, হারামের প্রতিটি নেক হচ্ছে ১ লাখ গুণ। হাকেম বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

১৭. মক্কার গুনাহ্ অতিরিক্ত

একদল আলেম বলেছেন, মক্কায় সওয়াব যেমন অতিরিক্ত হয়, ঠিক তেমনি গুনাহও অতিরিক্ত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আহমদ বিন হাম্বল এবং মুজাহিদের এই মত।

যারাকশী বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে তাঁর মক্কার বাইরে বাস করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন–

مَالِىْ وَلِبَلَدٍ تُضَاعَفُ فِيْهِ السَّيِّئَاتُ كَمَا تُضَاعَفُ فِيْهِ الْحَسَنَاتُ ـ

অর্থ ঃ 'আমার ঐ শহর সম্পর্কে কিইবা বলার আছে যেখানে নেক কাজের মত পাপ কাজেরও অতিরিক্ত গুনাহ হয়।' (اعلام المساجد) (১২৮ পৃঃ)

মুজাহিদ বলেছেন, 'মক্কায় নেক কাজের মত পাপ কাজেরও অতিরিক্ত গুনাহ হয়।' ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, পাপ কি একাধিক গুণ হয়? তিনি জবাব দিয়েছেন, না, তবে মক্কার সম্মানের কারণে সেখানে পাপ বেশী হয়।

কিন্তু অপর একদল আলেম বলেছেন, মক্কায় পাপ বেশী হবে না, অন্য জায়গার মতই একটা পাপের একটাই গুনাহ হবে। তাঁরা বলেন, এ ক্ষেত্রে কুরআনে বর্ণিত আয়াতটিই সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য। সেটি হচ্ছে ঃ

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلُهَا ـ (الانعام : ١٦)

অর্থ ঃ 'যে গুনাহর কাজ করে তাকে সেই গুনাহর সমপরিমাণ শাস্তিই দান করা হবে।' অর্থাৎ একটা গুনাহ করলে একটি শাস্তিই দেয়া হবে, একাধিক নয়।

তাদের আরেকটি দলীল হচ্ছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَّاحِدَةٌ ـ

অর্থ ঃ 'যে একটি গুনাহর কাজ করার ইচ্ছা করে এবং পরে তা করে তার একটি গুনাহই লেখা হবে।'

মূলতঃ হারাম শরীফের মর্যাদার কারণে এখানকার গুনাহ ও কঠোরতর হওয়ার কথা। কেননা, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ (الحج : ٢٥)

অর্থ ঃ 'কেউ যদি এই হারামে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায়ভাবে কুফর করার ইচ্ছা করে আমরা তাকে কষ্টদায়ক আযাব দেব।' এই আয়াত দ্বারাও কঠোর শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারে এই ব্যাখ্যাও প্রযোজ্য যে, হারামে গুনাহর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না, তবে তা কঠোর ও ভয়াবহ গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুজাহিদ বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন উমর বিন আল আসকে আরাফাতে দেখেছি; অথচ তার থাকার জায়গা হচ্ছে হারাম এলাকার বাইরে এবং জায়নামায হচ্ছে মসজিদে হারামে। তাঁকে এ রকম করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'এখানে নেক আমল উত্তম, আর পাপ কাজ জঘন্য।

(مصنف عبد الرزاق)

আবদুর রাজ্জাক হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ 'আমি রাকবা নামক স্থানে ৭০ গুনাহ্ করাকে হারামে এক গুনাহ্ করার চাইতে উত্তম মনে করি।' রাকবা হচ্ছে তায়েফের একটি জায়গার নাম।

উম্মে হানি বিনতে আমি তালেব কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা মক্কায় অতিরিক্ত গুনাহ্র প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ أُمَّتِىْ لَمْ يَخْزُوْا مَااَقَامُوْا شَهْرَرَمَضَانَ - قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ وَمَاخِزْيُهُمْ فِىْ اِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ : اِنْتِهَاكُ الْمَحَارِمِ فِيْهِ مَنْ زَنَافِيْهِ اَوْشَرِبَ خَمْرًا لَعَنَهُ اللّٰهُ وَمَن فِى السَّمٰوٰاتِ اِلٰى مِثْلِه مِنَ الْحَوْلِ - فَاِنْ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ فَلَيْسَتْ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِىْ بِهَا النَّارَ - فَاتَّقُوْاشَهْرَ رَمَضَانَ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ فِيْهِ مَالاَتُضَاعَفُ فِيْمَاسِوَاهُ وَكَذٰلِكَ السَّيِّئَةُ -

(الصغير للطبراني وكذلك فى الاوسط)

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মত যে পর্যন্ত রমযান মাসকে কায়েম রাখবে, সে পর্যন্ত তারা অপমানিত হবে না। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! রমযান মাসকে নষ্ট করার মধ্যো কি অপমান রয়েছে? তিনি জবাবে বলেন, নিষিদ্ধ কাজের লংঘন করা হলে, যেমন, কেউ যদি এ মাসে জ্বেনা করে কিংবা মদ পান করে, তাহলে আল্লাহ্ এবং আসমানের অধিবাসীরাসহ এর চতুষ্পার্শ্বের অন্যান্যরা সবাই লা'নত বা অভিশাপ দেয়। যদি রমযান আসার আগে সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে দোজখ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র কাছে তার কোন নেক অবশিষ্ট থাকবে না। তোমরা রমযান মাসকে ভয় কর' এই মাসে, অন্য মাসের চাইতে নেক বেশী

গুণ দেয়া হয়, অনুরূপভাবে গুনাহও বেশী দেয়া হয়।'

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ সময় ও মাসে, যেমন রমযানে সওয়াব ও পাপ বেশী দেয়া হয়। তাহলে বিশেষ ও পবিত্র স্থানেও পাপ বেশী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। পাপের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

১৮. মক্কায় পাপ কাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শাস্তি হবে

একদল আলেম বলেছেন, কেউ মক্কার হারামে পাপ কাজ করার নিয়ত করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেই পাপ কাজটি না করলেও তার শাস্তি হবে। এ ব্যাপারে তাঁরা সূরা হজ্জের ২৫ নং আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۔

অর্থ ঃ 'কেউ যদি এই হারামে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায়ভাবে কুফরী ও শিরক করার ইচ্ছা করে, আমরা তাকে কষ্টদায়ক আযাব দেবো।' যারাকশী বলেছেন, আই আয়াতে, يُرِدُ 'এরাদা' শব্দের পর بِالْحَادٍ এর মধ্যে (بِ) ব্যবহৃত হয়েছে। যখন اِرَادَة শব্দ দ্বারা هَمٌّ বা কোন 'কাজ করার ইচ্ছা' বুঝানো হয় তখন (بِ) ব্যবহার করে এটাকে متعدى বানানো হয়। সাধারণতঃ اَرَدْتُ بِكَذَا এরকম বলা হয় না। কিন্তু যখন 'কোন কাজ করার ইচ্ছা' বুঝানো হয় তখন (بِ) ব্যবহার করে এরকম বলতে হয়। যেমন বলা হয় هَمَمْتُ بِكَذَا 'আমি কাজ করার ইচ্ছা করেছি।'

দাহ্হাক ও ইবনে যায়েদ এই মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা কুরতবী তাঁর তাফসীরে এবং ইবনে কাসীর ও তাঁর তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ বিন উমরেরও এই একই মত। তাঁরা বলেছেন, "(দক্ষিণ ইয়েমেনের) এডেনে বসবাসকারী কোন লোক যদি মক্কায় কোন লোককে হত্যা করার নিয়ত করে, তাহলেও আল্লাহ তাকে এ কারণে শাস্তি দেবেন।"

এর একজন বর্ণনাকারী শো'বা বলেছেন, এটি সহীহ এবং ইবনে মাসউদ একথা বলেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইয়াজিদ বিন হারুন থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর

বলেছেন, ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী এটি সহীহ, তবে এটিকে রাসূলুল্লাহর হাদীস না বলে সাহাবীদের বর্ণনা বলাই উত্তম।

আল্লামা কুরতবী, এ প্রসঙ্গে সূরা 'কালাম' এ বাগানওয়ালাদের কাহিনীতে বর্ণিত একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন।

আয়াতটি হচ্ছে ঃ

انَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَابَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ -

অর্থ ঃ "আমরা তাদেরকে সেই বাগান ওয়ালাদের মত পরীক্ষা করেছি যারা অতি ভোরে ফসল কাটার শপথ করেছিল"।

এই আয়াত দ্বারা যে কথার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, বাগানওয়ালাদের ফসল কাটার কাজটি বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। তবে তাদের অতি ভোরে ফকির মিসকীনদের বের হওয়ার পূর্বে ফসল তোলার ইচ্ছাটি ব্যক্ত হয়েছিল যেন গরীবদেরকে দান করা না লাগে। আল্লাহ তাদেরকে এই ব্যক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাস্তি দিয়েছেন এবং তারা ঘুমে থাকা অবস্থায়– তাদের ফসল ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা ভোরে গিয়ে দেখল যে, তাদের ফসল জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের ফসল তোলার আগেই তাদেরকে শাস্তি দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীসও এই মতের সমর্থন করে। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

اذَا الْتَقَى الْمُسْلمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّار قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَابَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ انَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلى قَتْلِ صَاحِبِه - (بخارى)

অর্থ ঃ 'দুই মুসলমান, যখন তাদের তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকরী ও নিহত ব্যক্তি দু'জনই জাহান্নামী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর হুকুম তো ঠিক আছে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির হুকুম এরকম কেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেননা, সে তার সাথীকে হত্যা করতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক ছিল।' এই হদীসেও নিহত ব্যক্তির হত্যার 'আগ্রহ বা ইচ্ছার' বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও এই মতের সমর্থনে পেশ করা হয়। সেটি হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَّ عِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ : لَوْأَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ـ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبَطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَيَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلاَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَلاَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللّٰهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْأَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَبِنِيَّتِهِ ـ (الترمذى)

অর্থ ঃ 'দুনিয়ায় চার ধরনের লোক আছে। এক ধরনের লোক হল, আল্লাহ যাকে সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন, সে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, আত্মীয়তার হক আদায় করে এবং একথাও জানে যে, এতে আল্লাহর অধিকার রয়েছে; সেই ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আরেক ধরনের লোক হল, আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দেননি, অথচ তার রয়েছে সঠিক নিয়ত। সে বলেঃ যদি আমার কাছে সম্পদ থাকত, তাহলে আমি উমুক কাজ করতাম এবং সে এই নিয়তের উপর স্থির আছে। এই দুই ব্যক্তির মর্যাদা সমান এবং শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মতই শ্রেষ্ঠ। অপর ধরনের লোক হল, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, জ্ঞান দেননি, সে জ্ঞান ব্যতীত শুধু সম্পদের মধ্যেই বিভ্রান্তভাবে ডুবে আছে, এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়ের হক আদায় করে না এবং এতে আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে জানে না, সেই ব্যক্তি হচ্ছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। অন্য এক ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহ যাকে সম্পদ ও জ্ঞান কোনটাই দেননি। সে বলেঃ যদি আমার সম্পদ থাকত, তাহলে আমি উমুক কাজ করতাম। সে তার নিয়তের মধ্যেই থাকবে।' এই হাদীসে সঠিক নিয়তের ভিত্তিতে সওয়াব ও মর্যাদা লাভের কথা উল্লেখ রয়েছে।

কারুর মতে, আল্লামা কুরতুবী এ ক্ষেত্রে যে সকল যুক্তিপ্রমাণ পেশ করেছেন, তা মূল বিষয় বস্তুর বাইরে। কেননা, শুধুমাত্র গুনাহর কল্পনা করলেই মানুষকে শাস্তি দেয়া হবে না। যদি প্রমাণগুলো দ্বারা এটা বুঝায়ও তবুও তাকে হারামে মক্কীর সাথে সীমিত করার কোন কারণ নেই। কেননা, এটা সাধারণভাবে সব জায়গার জন্যই প্রযোজ্য।

আসল কথা হল, কোন পাপ কাজের ইচ্ছা যদি বারবার করা হয় এবং পাপ কাজটি করার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, শেষ পর্যন্ত পাপ কাজটি না করলেও তার গুনাহ হবে। এই কথাটিই নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ১৩৫নং আয়াতে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ 'যারা অশ্লীল কাজ করে এবং নিজের উপর যুলুম করে, তারপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহ মাফ চায়; আল্লাহ ছাড়া তাদের গুনাহ কে মাফ করতে পারে? তারা জেনে শুনে, বার বার গুনাহর কাজ করে না।' এই আয়াতে لم يصروا 'বারবার না করা' এই শব্দটি এই কথার প্রকাশ্য প্রমাণ যে, মানুষকে পাপ কর্মের ব্যাপারে নেয়া 'দৃঢ় সিদ্ধান্তের' বিরুদ্ধেই পাকড়াও করা হবে। এটাই অতীতের ফেকাহবিদ', মোহাদ্দেস এবং মুসলিম মনীষীদের মত। আল্লামা কুরতবী তাঁর তাফসীরে এই মতের কথা উল্লেখ করেছেন।

পাপের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কারুর দ্বিমত নেই। চাই সেটা মক্কাতেই হউক বা মক্কার বাইরে অন্য জায়গায়ই হউক।

যদি তা বারবার চিন্তার মাধ্যমে মজবুত সিদ্ধান্তে পৌছার স্তর পর্যন্ত না পৌছে তাহলে আল্লাহ শাস্তি দেবেন না। কেননা এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিম্নোক্ত প্রকাশ্য বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً ـ (بخارى)

অর্থ ঃ 'যে অন্যায় করার ইচ্ছা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করেনি, তার গুনাহ লেখা হবে না। হাঁ, যদি গুনাহটি করেই ফেলে, তাহলে তার একটি গুনাহ লেখা হবে।'

মূলতঃ বেশী যুক্তসংগত কথা হল, যদি বারবার চিন্তা ও ইচ্ছার মাধ্যমে মক্কায় কোন পাপ কাজের মজবুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে তার শাস্তি অতিরিক্ত হবে যেমনটি ঐ পাপ কাজ সংঘটিত করলেও হওয়ার কথা। তবে যদি অনুরূপ মজবুত সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে শুধুমাত্র ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার বিরুদ্ধে কোন গুনাহ বা শাস্তি হবে না। আসলে আলেমরা পাপের মজবুত সিদ্ধান্তকে 'সংঘটিত পাপের' সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে মক্কায় পাপ করলে যেমন অতিরিক্ত গুনাহ হয়, পাপের মজবুত সিদ্ধান্ত নিলেও সে রকম অতিরিক্ত গুনাহই হবে। শুধুমাত্র কল্পনার বিরুদ্ধে আল্লাহ শাস্তি দেবেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারায় এরশাদ করেছেন–

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَامَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ـ (بقره :٢٨٦)

অর্থ ঃ 'আল্লাহ মানুষের সাধ্যের বাইরে কাউকে কোন কাজের হুকুম দেননা, মানুষ যে নেক কাজ করে তার ফল সে পাবে, আর যদি পাপ কাজ করে তাহলে এর বোঝাও তাকে বহন করতে হবে।' গুনাহ সম্পর্কিত কল্পনা থেকে বিরত থাকা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহর পাকড়াও না করারই কথা। কেননা, কল্পনার ঘোড়া বহু বিষয়ে এবং বহু সাম্রাজ্যে বিচরণ করে। কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে মানুষের দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত। এছাড়াও আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ـ (الحج : ٢٥)

'যে এই হারামে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে 'অন্যায়ভাবে' কুফরী ও শিরক করার ইচ্ছা করে, এতে بِظُلم বা 'অন্যায়ভাবে' শব্দের উল্লেখ করেও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, শুধু কল্পনার উপর তিনি কোন শাস্তি দেবেন না।

কেউ কেউ হারাম এলাকায় পাপের কল্পনা-ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাস্তি দান সম্পর্কিত বিভিন্ন ইমামদের বক্তব্যের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হারাম এলাকায় কোন অন্যায় ও পাপ না করার ব্যাপারে এটা হচ্ছে তাদের অতিমাত্রায় সতর্কীকরণের উপর গুরুত্ব

প্রদান অথবা, এখানে তারা 'কল্পনা' বা (هم) বলতে (عزم) বা 'দৃঢ় সিদ্ধান্ত' বুঝিয়েছেন।

যা হোক, হারামে মক্কীতে কল্পনা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাস্তি এবং অতিরিক্ত পাপের প্রশ্নে, অতীতের বুজুর্গদের একটি দল মক্কায় বাস করাকে অপসন্দ করেছেন। আমরা এখন এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করবো, ইনশাআল্লাহ।

১৯. মক্কায় বাস করা

অতীতের বুজুর্গদের একটি দল মক্কায় বাস করা অপসন্দ করতেন। ইমাম আবু হানীফাসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, তিন কারণে মক্কার অধিবাসী হওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

১. মক্কার সম্মানের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা, পবিত্র স্থানটি আবাসিক স্থানে পরিণত হওয়ার আশংকা এবং এর প্রতি ভালবাসা হ্রাস পাওয়ার ভয়ে এখানে বাস করে আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী হওয়াকে অপসন্দ করেছেন। এই জন্য হযরত উমর (রা) হজ্জ শেষে হাজীদেরকে স্বদেশের উদ্দেশে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন এবং কা'বা শরীফের বেশী বেশী তওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা লংঘনের আশংকা করছি। তবে যারা দূর থেকে যিয়ারত করতে আসে এবং যিয়ারত শেষে চলে যায় তাদের ব্যাপারে তিনি এই আশংকা প্রকাশ করেননি। একটি হাদীসে আছে ঃ زُرْغِبًّا تَزْدَدْحُبًّا অর্থ ঃ 'মাঝে মাঝে সাক্ষাত কর, তাহলে ভালবাসা বাড়বে।'

২. পুনরায় মক্কায় ফিরে আসার উদ্দেশ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি মক্কা ত্যাগের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ـ (بقر: ١٢٥)

অর্থ ঃ 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ এই ঘরকে মানুষের সওয়াবের জন্য তাদের বার বার ফিরে আসার জায়গা ও নিরাপত্তার স্থান হিসাবে তৈরি করেছেন।' কেউ কেউ বলেছেন, অন্য কোন শহরে বাস করে মন যদি মক্কার জন্য পাগলপারা থাকে এবং অন্তর যদি আল্লাহর ঘরের সাথে লেগে থাকে, তা মক্কায় বাস করার চাইতে উত্তম। মূলকথা হল, মক্কায় থাকলে মক্কার প্রতি ভালবাসা কমে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৩. হারামে মক্কায় পাপ ও ভুল-ত্রুটির আশংকা আছে এবং তা খুব বেশী নিন্দিত ও নিষিদ্ধ। এই পবিত্র জায়গায় পাপ করলে তা আল্লাহর অসন্তোষের বিরাট কারণ হবে। ওহাইব বিন আল-ওয়ারদী আল মক্কী বর্ণনা করেছেন যে, এক রাত আমি হাতীমে কা'বায় নামাজ পড়া অবস্থায় কা'বা শরীফ ও গেলাফে কা'বার মাঝখানে কাউকে বলতে শুনেছি ঃ "আমি আল্লাহর কাছেই আমার সকল অভিযোগ পেশ করছি, তারপর হে, জিবরাইল তোমার কাছেও পেশ করছিঃ আমার চতুষ্পার্শ্বে তওয়াফ করা অবস্থায় যারা কথা-বার্তা বলে ও অর্থহীন আলোচনা করে, তারা যদি এ সকল গর্হিত কাজ থেকে বিরত না হয়, তাহলে আমি এমনভাবে নড়ে উঠবো, যাতে আমার গায়ের সকল পাথরগুলো সে পাহাড়ে ফিরে যায়, যেখান থেকে ঐগুলোকে আনা হয়েছিল।" তাই দেখা যায়, মক্কায় বহিরাগত কিছু লোক, হারামে মক্কার সীমানার ভেতর, মলমূত্র ত্যাগ করেন নি, তাঁরা হারাম এলাকার বাইরে গিয়েছেন এবং সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। এজন্য কিছুসংখ্যক আলেম, মক্কার ঘরবাড়ি ভাড়া দেয়াকে অপসন্দ করেছেন।

ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'এহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কায় স্থায়ীভাবে বাস করা অপসন্দনীয় বলে কেউ যেন এর দ্বারা একথা না বুঝেন যে, এটা কা'বা শরীফের ফজীলত ও মর্যাদা বিরোধী। কেননা এই অপসন্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে বান্দাহদের দুর্বলতা। ইবনুস সালাহ সাঈদ বিন আল মুসাইয়াব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মদীনা থেকে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে আগত এক ব্যক্তিকে বলেছেন, 'মদীনা ফিরে যাও, কেননা আমরা শুনতে পেয়েছি যে, মক্কার অধিবাসীদের কাছে, হারামের মর্যাদা 'হাল' অর্থাৎ হারাম বহির্ভূত এলাকার সমান না হওয়া পর্যন্ত, তারা মৃত্যুবরণ করে না।'

ইমাম শাফেয়ী' ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ অন্যরা বলেছেন, মক্কায় বাস করে আল্লাহর ঘরে প্রতিবেশীর মর্যাদা লাভ করা উত্তম। তাদের যুক্তি হল, এখানে তওয়াফ, উমরাহ এবং অতিরিক্ত সওয়াবের যে সুযোগ আছে, তা অন্য কোথাও নেই। আলগায়াহ' কিতাবের লেখক আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন আল হাসানেরও একই মত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী মুসীরুল গারামে মক্কায় বসবাসকারী ৫৪ জন সাহাবী এবং বিরাট সংখ্যক তাবেয়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন

উমর এবং যাবের বিন আবদুল্লাহও মক্কায় বাস করেছেন।

ইমাম নওয়ী বলেছেন, মক্কায় বসবাস করা মুস্তাহাব। হ্যাঁ, যদি অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার আশংকা বেশী অনুভব করে, তাহলে তার জন্য মক্কায় বাস করা ঠিক নয়। বরং তার জন্য হযরত উমর বিন খাত্তাবের একটি বক্তব্য স্মরণ রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে ঃ 'মক্কায় একটি অন্যায় করার চাইতে অন্য জায়গায় ৭০টি অন্যায় করা ভাল।'

হাম্বলী মাজহাবের উপর লেখা এক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যখন মক্কা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন খলীফা মোতাওয়াককিল মক্কায় বাস করার অনুমতি চেয়েছিল। মোতাওয়াককিলকে বলা হয় "প্রচণ্ড গরম, এখানেই অবস্থান করুন।" ইমাম আহমদ বললেন "মক্কায় বাস করার মধ্যে কোন দোষ নেই, তবে হযরত উমর (রা) মক্কা থেকে হিজরতকারী লোকদের পুনরায় মক্কায় বাস করাকে অপসন্দ করতেন।"

২০. হারামে মক্কায় দাজ্জালের প্রবেশাধিকার নেই

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ نَقَبُ مِّنْ اَنْقَابِهَا اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَافِّيْنَ يَحْرِسُوْنَهَا -

অর্থ ঃ 'মক্কা এবং মদীনা শরীফ ব্যতীত আর সকল শহরেই দাজ্জালের পদচারণা হবে। ফেরেশতারা মক্কার প্রতিটি এলাকা ঘিরে পাহারা দিচ্ছে।' এই স্থানের মর্যাদার কারণেই আল্লাহ এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন।

২১. মক্কায় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

আবুল কাসেম আত্‌তাবরাণী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন মোয়াম্মাল-আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন মাহবাচান-আ'তা বিন আবি রেবাহ-আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) এই সূত্র পরম্পরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ اِلْحَادٌ অর্থ ঃ 'মক্কায় খাদ্য মওজুত করা কুফরী।' পবিত্র জায়গার সম্মানার্থেই এই বিশেষ হুকুম ঘোষণা করা হয়েছে।

২২. খুনী ও চোগলখোরের মক্কায় বাস করার অধিকার নেই

হাফেজ আবুল কাসেম ইসপাহানী তাঁর الترغيب গ্রন্থে সুফিয়ান বিন ওয়াকি- মুসা বিন ঈসা আল্‌লায়সী-যায়েদা-সুফিয়ান-মুহাম্মদ বিন আল মোকান্দার- হযরত জাবের (রা) এই সূত্রপরম্পরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَيَسْكُنْ مَكَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلاَمَشَّاءُ بِنَمِيْمٍ -

অর্থ ঃ "মক্কায় কোন খুনী কিংবা চোগলখোর বাস করতে পারে না।" তিনি আরো লিখেছেন যে, لاَيَسْكُنْ এটি হচ্ছে আদেশবাচক শব্দ। এর দ্বারা নিষেধ করা হচ্ছে যে, "মক্কায় বাস করা হারাম শরীফের সম্মান ও মর্যাদার বিরোধী।

২৩. এহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশের হুকুম

মক্কায় এহরাম ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য এই মাসয়ালায় উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। তাদের মতপার্থক্যের মূল বিষয় হল, প্রবেশকারী যদি মক্কায়, হজ্জ কিংবা উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আসে, তাহলে এহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নেই। আর যদি প্রবেশকারী উমরাহ বা হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে মক্কায় প্রবেশের জন্য তার এহরামের প্রয়োজন নেই। মক্কায় যদি কারুর কোন কাজ কিংবা প্রয়োজন থাকে, তাহলে সে কাজ সেরে নেয়ার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলে এহরাম বাঁধা জরুরী নয়।

২৪. কুরআন মজীদে মক্কার নামে আল্লাহর শপথ

কুরআন মজীদের দুই জায়গায় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র মক্কার নামে দুই দুইবার শপথ করেছেন।

(১) সূরা তীনে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (২) সূরা বালাদে আল্লাহ বলেছেন ঃ لاَاُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই দুই জায়গায় 'বালাদ' বলতে পবিত্র মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। এটা এই স্থানের বিশেষ মর্যাদার প্রতীক। স্বয়ং আল্লাহও একে সম্মান দেন এবং এর নামে শপথ করেন।

২৫. হারামে মক্কীতে দোয়া কবুল হয়

মসজিদে হারাম এবং হারামে মক্কীতে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবুদল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

যখন কোরাইশদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করেছিলেন, তখন তা কবুল হয়েছিল এবং এতে কোরাইশরা বহু কষ্ট পেয়েছে। তারা পূর্ব থেকেই জানত যে, এই শহরে দোয়া কবুল হয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, মক্কার ১৫টি স্থান ও সময়ে দোয়া কবুল হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১ মাতাফ, ২. মোলতাযাম, ৩. মীযাবের নীচে, ৪. কা'বা শরীফের ভেতর, ৫. সাফা-মারওয়া পাহাড় দ্বয়ে, ৬. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে, ৭. সা'য়ীর সময়, ৮. মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, ৯. রোকনে ইয়ামানীর কাছে, ১০. রোকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে, ১১. মসজিদে হারামে, ১২. আরাফাত, ১৩. মোযদালাফা এবং ১৪. মীনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের স্থানে। ১৫. হাজারে আসওয়াদের কাছেও দোয়া কবুল হয়। কাজী সাজদুদ্দীন সিরাজী, মিনার ফজীলতের উপর লেখা তার كتاب الوصل والمنى বইতে লিখেছেন, মক্কা ও হারাম সীমান্তের ভেতর আরো কিছু জায়গা আছে, যেখানে দোয়া কবুল হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ 'সাবীর' যা মানারাতুল ফাতহ এর পাদদেশে অবস্থিত, মসজিদে কাবস, মসজিদে খায়ফ এবং মিনার মসজিদে আন-নামর।

ইবনুন জাওযী দোয়া কবুলের আরো কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ মিনার মসজিদে বায়আ'হ, হেরাগুহা এবং হোদায়বিয়া। শেফাউল গারাম বইতে আরো কয়েক স্থানে দোয়া কবুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় এ সকল স্থানের কিছু কিছু ধ্বংস হয়েছে এবং কতগুলো এমনিতেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সবগুলো স্থান সুরক্ষিত হয়নি। হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করীম (সা) মক্কার বিভিন্ন জায়গায় দোয়া করেছেন এবং অন্যদেরকেও সে সকল জায়গায় দোয়া করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা হযরত জাবের (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে উঠেন, সেখানে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করেন, তাকবীর-তাহলীল উচ্চারণ করেন এবং এর মাঝামাঝি দোয়া করেন। মারওয়া পাহাড়েও তিনি সাফার অনুরূপ করেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলা হয় যে, "রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা পাহাড়ে আসলেন, নামাজ পড়লেন, তারপর কা'বা শরীফের দিকে নজর করলেন, এরপর দু'হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা

করলেন এবং যতক্ষণ ইচ্ছা দোয়া করলেন।"

তাবরানী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের সূত্র থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَتُرْفَعُ الْاَيْدِىْ الاَّفِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : حِيْنَ تُفْتَحُ الصَّلاَةُ وَحِيْنَ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَتَنْظُرُ اِلى الْبَيْتِ وَحِيْنَ تَقُوْمُ عَلَى الصَّفَا ، وَحِيْنَ تَقُوْمُ عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَحِيْنَ تَقُوْمُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَتَجْمَعُ الْعِشَائَيْنَ ، وَحِيْنَ تَرْمِى الْجَمْرَةَ ،

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'সাত জায়গা ব্যতীত দোয়ার উদ্দেশ্যে আর কোথাও হাত উঠাতে হয় না। সেগুলো হচ্ছে ঃ তাকবীরে তাহরীমা, যখন তুমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং কা'বা শরীফকে দেখতে পাবে, যখন সাফা পাহাড়ে উঠবে, যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠবে, আরাফাতের দিনে অপরাহ্নে যখন অন্যান্য হাজীদের সাথে সেখানে অবস্থান করবে ও এশার সময়ে মাগরিব-এশাকে এক সাথে মিলিয়ে পড়বে এবং যখন মিনায় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে।' এই সাত সময় দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত উঠাতে হয়। مجمع الزوائد গ্রন্থে আল্-হায়সমী লিখেছেন যে, এই হাদীসের সনদের মধ্যে, মুহাম্মাদ বিন আবিলায়লা নামক রাবী দুর্বল স্মরণ শক্তির অধিকারী এবং তার হাদীসকে 'হাসান' বলে বিবেচনা করা হয়।

আল্লামা আযরাকী তাঁর 'তারিখে মক্কা' বইতে লিখেছেন যে, আবুল ওলীদ-মাহাম্মাদ বিন সোলাইম, যানজি মোসলেম বিন কালেদ-ইবনে জোরাইজ-এই সূত্র পরম্পরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আ'তা বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মীযাবে কা'বার নীচে দাঁড়িয়ে দোয়া করে তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং সে মায়ের পেট থেকে সদ্য প্রসূত নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।'

আবুল ওলীদ বলেছেন, আমার দাদা সাঈদ বিন সালেম-উসমান বিন সেরাজ-জা'ফর বিন মাহাম্মাদ এই সূত্র পরম্পরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'তওয়াফের সময় নবী করীম (সা) যখন মীযাবে কা'বার নীচে আসতেন তখন তিনি এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَالْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ ـ

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে মৃত্যুর সময় আরাম চাই এবং হাশরের দিন হিসাব-নিকাশের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

এছাড়াও আরো যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছেন এবং সেগুলোর মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

২৬. দম বা কোরবানীর পশু মক্কায় জবেহ করা জরুরী

হজ্জের দম বা কোরবানী শুধুমাত্র মক্কায় হারাম সীমানার ভেতরই জবেহ করতে হবে এবং ঐ সকল গোশত হারাম এলাকার ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিলি করতে হবে। যদি হারাম এলাকায় ফকির মিসকিন না থাকে, তাহলে তা বাইরেও বন্টন করা যাবে। যদি ঐ সকল কোরবানীর পশু হারাম এলাকার বাইরে জবেহ করা হয়, তাহলে সকল মাজহাব অনুযায়ী তা না জায়েয। হজ্জে তামাত্তু ও কেরানসহ অন্যান্য যেসব কারণে হাদী বা দম ওয়াজেব হয়, সে সকল হাদী বা দম, সবগুলোই হারাম সীমানার ভেতর জবেহ করা শর্ত।

২৭. মক্কায় কুরআন খতম করা উত্তম

আমাদের পূর্বসূরী বুজুর্গানে দীন, মক্কায় আগত লোকদের জন্য, কুরআন খতম করাকে উত্তম বলেছেন। বিশেষ করে তওয়াফের মধ্যে যদি তা করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটাই সর্বোত্তম। হাদীস শরীফে, যে তিন মসজিদের প্রতি সফর করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে সে সকল মসজিদগুলোর প্রত্যেকটাতেই কুরআন খতম করাকে, তাঁরা উত্তম বলেছেন। সে মসজিদ ৩টি হচ্ছে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা। সাঈদ বিন মনসুর বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, লোকেরা মক্কা শরীফে এসে, পুরো কুরআন খতম করার আগে, নিজ দেশের উদ্দেশ্যে ফিরে যেতেন না দেখে, তাঁরা আশ্চর্য হতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মক্কায় কুরআন খতম করে দেশে ফেরাকে বুজুর্গানে দীন উত্তম মনে করতেন। তাই তারা কুরআন খতম না করে দেশে ফিরতেন না।

২৮. বিদায়ী তওয়াফ

মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে, বিদায়ী তওয়াফ করা জরুরী। হজ্জ ও উমরায় আগত বাইরের লোকদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ জরুরী। কিন্তু এছাড়াও, হজ্জ

উমরাহ্ ব্যতীত মক্কার অধিবাসী কিংবা বাইরের কোন লোক-যদি মক্কা থেকে এমন পরিমাণ দুরত্ব অতিক্রম করে সেখানে নামায কসর করতে হয়-তাহলে তাদের জন্যও হারাম শরীফের সম্মানার্থে বিদায়ী তওয়াফ করাকে, দুই মতের মধ্যে, বিশুদ্ধ মত বলা হয়েছে। অপর মতে, তাদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

মুসলিম শরীফে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হচ্ছে– 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ যেন বিদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা না করে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ঘরের সাথে তার সর্বশেষ সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হয়।' অর্থাৎ মক্কা থেকে বের হওয়ার আগে সর্বশেষ কাজ হল আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা এবং এরপর বিদায় যাত্রা শুরু করা। বিদায়ী তওয়াফের মাঝে আর কোন কাজ নেই।

২৯. মক্কার প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণবোধ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মক্কার প্রতি মানুষের অন্তরে, ভালবাসা ও বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন যা আর কোন শহরের প্রতি করেননি। মক্কার কথা শুনলেই মোমেনের মন নেচে উঠে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠে। এটা মানুষের মনকে চুম্বকের চাইতেও বেশী আকর্ষণ করে। এজন্যই আল্লাহ্ এই শহরকে কুরআনে 'বছর পরিক্রমা শেষে মানুষের প্রত্যাবর্তনের স্থান' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ এই শহরের প্রতি মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেছিলেন, তারই বরকতে মানুষ মক্কাকে ভালবাসে এবং মক্কার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। কোন কোন সময় সে আকর্ষণ উন্মাদের উন্মত্ততাকেও ছাড়িয়ে যায় এবং এই ঘরের দেওয়ানা ও আল্লাহর প্রেমে সিক্ত ব্যক্তি, এখানে পৌছার আগে এবং তা দেখা ব্যতীত, অন্তরের জ্বালা নিবারণ করতে পারে না। ভুক্তভোগী ব্যক্তিরাই তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারেন। কতলোক, এই ঘর দেখার জন্য আফসোস করতে করতে কবরে চলে গেছেন! কিন্তু সামর্থের অভাবে এখান পর্যন্ত পৌছতে পারেননি।

এক হাদীসে এসেছে যে, 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক শা'বান মাসের মাঝামাঝি তারিখের রাত্রে, কা'বা শরীফের প্রতি (বিশেষ) দৃষ্টি দেন।' তখনই এই ঘরের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

৩০. মক্কায় মৃত্যুর ফজীলত

হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَّاتَ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَاجٍّ اَوْمُعْتَمِرٍ لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ وَقِيْلَ لَهُ : اُدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন হাজী ও উমরাহ আদায়কারী যদি এখানে মারা যায়, তাহলে, তার কোন প্রশ্ন ও হিসাব হবে না। তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর।'

আল্লামা ইবনুল জাওযী, এটাকে 'মিথ্যা হাদীসের' অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, ইমাম বায়হাকীসহ আবু নাঈম তাঁর **حلية** গ্রন্থে এই হাদীসটির উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা এটাকে মিথ্যা হাদীস বলে অভিহিত করেননি। অবশ্য হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে,

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْمُعْتَمِراً اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِه كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ اِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি হজ্জ, কিংবা উমরাহ অথবা জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং পথে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত যোদ্ধা, হাজী ও উমরাহকারীর সওয়াব দান করবেন।"

হযরত যাবের (রা) বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ لَمْ يَعْرِضْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মক্কার পথে মারা যাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কোন প্রশ্ন করবেন না এবং তাঁর কাছে হিসাব চাইবেন না।'

আল্লামা ইবনুল জাওযী এই হাদীসটিকেও মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু আল্লামা সুয়ূতী অন্য আরেকটি সনদে সামান্য শব্দের পার্থক্যসহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসের মূল বিষয়বস্তু ঠিক আছে।

সালমান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ بِاَحَدِ الْحَرَمَيْنِ اُسْتُوْجِبَ شَفَاعَتِيْ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْاٰمِنِيْنَ ، اخرجه ابن عدى ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ যদি দুই হারামের কোন এক হারাম শরীফে মারা যায়, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে এবং কিয়ামতের দিন সে নিরাপদ ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হবে।

আবু যোবায়ের নবী করীম (সা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ فِيْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ اَوِ الْمَدِيْنَةَ بُعِثَ اٰمِنًا ـ اخرجه ابن عدى ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার দুই হারামের কোন এক হারামে মারা যায় সে কিয়ামতের দিন নিরাপদভাবে উঠবে।' ইবনুল জাওযী বর্ণিত হাদীস দুটোকে 'মিথ্যা হাদীসের' অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ুতী বলেছেন, ইবনুল জাওযী হাদীস দুটোকে মিথ্যা বলে বাড়াবাড়ি করেছেন। কেননা, ইমাম বায়হাকী তাঁর شعب الايمان গ্রন্থে এই হাদীস দুটো উল্লেখ করে বলেছেন যে, এগুলোর সনদ দুর্বল।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا بَعَثَهُ اللّٰهُ بِلَاحِسَابٍ عَلَيْهِ وَلَاعَذَابٍ ـ (الحاكم)

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি দুই হারামে, হজ্জ কিংবা উমরাহ আদায় করা অবস্থায় মারা যাবে আল্লাহ তার কোন হিসাব নেবেন না এবং তাকে কোন আযাব দেবেন না।'

আল্লামা ইবনুল জাওযী এই হাদীসটিকে মিথ্যা বলেছেন।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ هٰذِهِ ـ

অর্থ ঃ 'এই কবরস্থানটি কতইনা উত্তম।' ইবনে জোরাইজ বলেছেন, এই কবরস্থান বলতে, মক্কার কবরস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন উমর, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

مَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ فَانَّمَا مَاتَ فِىْ سَمَاءِ الدُّنْيَا ـ

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি মক্কায় মারা যায়, সে যেন প্রথম আসমানে মারা গেল।' আল্লামা ফাসী বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল। তিনি বলেছেন যে, হাসান বসরীর প্রসিদ্ধ 'রেসালা' বইতেও এ হাদীসটির উল্লেখ আছে।

৩১. হারামের অধিবাসীদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

মাওয়ারদী তাঁর الاحكام السلطانية। 'গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না যদি তারা হক ও ইনসাফপন্থীদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত নয়।' কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয নেই; তবে তাদেরকে এমনভাবে কোনঠাসা করা যাবে, যেন তারা আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং হক ও ইনসাফের গণ্ডীতে প্রবেশ করে।' বেশীর ভাগ ফেকাহবিদরা বলেছেন, তাদের বিদ্রোহ দমনে যদি লড়াই ছাড়া বিকল্প উপায় না থাকে, তাহলে, অবশ্যই লড়াই করতে হবে। কেননা, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর অধিকার। তাই এই অধিকারকে নষ্ট করা যাবে না। হারাম এলাকায় এই অধিকার নষ্ট হওয়ার চাইতে হেফাজত করা বেশী জরুরী। মতভেদের কারণ হল রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস। সেটি হচ্ছে ঃ

فَلاَيَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِاَنْ يَّسْفِكَ بِهَادَمًا ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য হারাম এলাকায় খুন-খারাবী জায়েয নেই।' এই হাদীস দ্বারা যুদ্ধের সকল কারণকে নিষেধ করা হয়েছে এবং মাত্র এক ঘন্টার জন্য, রাসূলুল্লহর উদ্দেশ্যে এখানে যুদ্ধকে হালাল করার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরেকটি হাদীসও এক্ষেত্রে মতভেদের কারণ। সেটি হচ্ছে–

فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلُوْا :

اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهٖ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ـ

'কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুদ্ধের উদাহরণ দিয়ে এখানে যুদ্ধকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে বল, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদেরকে অনুমতি দেননি।'

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য মক্কায় যুদ্ধকে বৈধ এবং অন্যদের জন্য অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর সমর্থনে মুসনাদে বাজ্জারে, হযরত জাবের নবী করীম (সা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি হচ্ছে ঃ

اِنَّ قَوْمَ صَالِحٍ لَمَّا عَقَرُوْا النَّاقَةَ اَهْلَكَ اللّٰهُ مَنْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مِنْهُمْ اِلاَّ رَجُلاً كَانَ فِى حَرَمِ اللّٰهِ فَمَنَعَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُوَ؟ قَالَ اَبُوْرَغَالٍ ـ

অর্থ ঃ 'কাওমে সালেহ যখন উটকে হত্যা করেছিল, তখন যমীনে তাদের যত লোক ছিল আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন এবং আল্লাহর হারামে অবস্থিত তাদের এক ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে রেহাই দিলেন। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, হে রাসূলুল্লাহ, সে ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, সে ছিল আবু রেগাল।'

মক্কার অধিবাসীদের আরেকটি বৈশিষ্ট হল, তাদের থেকে বর্ণিত হাদীস অন্যদের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা বেশী অগ্রগণ্য। যারাকশী, আবুল ফতহ বিন বোরহান অসুলীর কিতাব 'আল-আওসাত' থেকে উল্লেখ করেছেন ঃ 'হারামের অধিবাসীদের রেওয়ায়েত অন্যদের রেওয়ায়েত থেকে বেশী গ্রহণযোগ্য। কেননা, তারা অন্যদের চাইতে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর অবস্থা বেশী জানতেন। এ জন্যই কোন কোন মোহাদ্দেসীন বলেছেন, 'হারাম এলাকা অতিক্রম করে গেলে সে রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়।'

হারামের অধিবাসীদের পক্ষে অনুরূপ বক্তব্য বেশী বাড়াবাড়ি। অথচ, অন্যান্য শহরের লোকদের দ্বারা বর্ণিত অনেকগুলো সহীহ হাদীস রয়েছে যার উপর আমল করা হচ্ছে। মক্কার বাসিন্দাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এখানে যারা বাস করে, তারা যেন জেহাদের কোন ঘাঁটিতে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করছেন। এক হাদীসে মক্কার অপর নাম হচ্ছে رباط বা ঘাঁটি"। আল্লামা ফাসী, আল্লামা ফাকেহী

থেকে একটি মরফু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নামকরণ করেছেন رباط, বা 'ঘাঁটি'। ঘাঁটি থেকে, জেহাদের ময়দানে, শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য মুজাহিদদেরকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হয়। একজন মোমেন, যখন মক্কায় বাস করেন, তিনিও সওয়াবের নিয়তেই এখানে ঘাঁটিতে পাহারারত মুজাহিদের মত এবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি কঠোর শ্রম ও সাধনা করেন এবং নামাযকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং তাঁর কাছে মর্যাদাবান হন। মূলতঃ সময়ের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম মর্যাদা ও সম্মান লাভ করাই হচ্ছে জিহাদেরও উদ্দেশ্য।

আহলে মক্কার আরেকটি বৈশিষ্ট হল, হজ্জের এহরাম বাঁধার জন্য তাদেরকে মিকাতে যেতে হয় না। মক্কাই হচ্ছে তাদের মিকাত। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে, মসজিদে হারামের নিকটবর্তী কোন মসজিদ থেকে এহরাম বাঁধা। হাদীসে এসেছে, وَاَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا অর্থ ঃ 'আহলে মক্কা মক্কা থেকেই এহরাম বাঁধবে।' তাদের মিকাতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মিকাত। এখানে প্রবেশ করার জন্যই বাইরে মিকাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং বহিরাগত লোকেরা সেখান থেকেই এহরাম বাঁধবে।

আহলে মক্কার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, কেরান ও তামাত্তু হজ্জের কারণে, তাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব হয় না। ইমাম মালেক ও শাফেয়ীসহ অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। মসজিদে হারামে উপস্থিত হওয়ার কারণেই তাদের এই বিশেষ সুবিধা। অন্যদের জন্য কেরাণ ও তামাত্তু হজ্জে কোরবানী ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (بقره : ١٩٦)

অর্থ ঃ 'এই হুকুম তাদের জন্য, যারা মসজিদে হারামের উপস্থিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়।' অর্থাৎ যারা মক্কার অধিবাসী নয়, তাদের উপরই কেরান ও তামাত্তু হজ্জে কোরবানী ওয়াজিব।

ইমাম মালেক আহলে মক্কার জন্য কেরান হজ্জকে মাকরূহ মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে, মক্কার অধিবাসীদের জন্য কেরান হজ্জ জায়েয নেই।

নবী করীম (সা) এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী বলেছেন, মক্কার অধিবাসীরা হচ্ছে 'আহলুল্লাহ' বা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। দুনিয়ার আর কোন শহরের অধিবাসীদের ব্যাপারে এরকম সম্মান ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়নি।

ওহাব বিন মোনাব্বেহ বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি হারামের অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তা দেয়, তার জন্য আমার নিরাপত্তা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং যে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে, সে আমায় দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে। প্রত্যেক বাদশাহর চতুষ্পার্শ্বে নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে; মক্কা আমার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি। মক্কাবাসীরা তারই অধিবাসী এবং আমার প্রতিবেশী; তারা আমার ঘর ও এই ঘরের আবাদকারীদেরও প্রতিবেশী। এই শহরের যিয়ারতকারীরা আমার প্রতিনিধি ও মেহমান। তারা আমারই নিরাপত্তায় থাকে এবং তারা আমারই প্রতিবেশী।' (আযরাকী)

মক্কাবাসীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, আনুগত্য ও এবাদতে মশগুল লোকদের উপর যে ধরনের রহমত নাজিল হয়, আল্লাহ তাদের উপর সে ধরনের রহমত বর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

انَّ اللّٰهَ يُنَزِّلُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَّيَوْمٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ - يَنْزِلُ عَلٰى هٰذَا الْبَيْتِ سِتُّوْنَ لِلطَّائِفِيْنَ - وَاَرْبَعُوْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ ، وَعِشْرُوْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ وفى رواية - عَلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ مَكَّةَ - وفى رواية تَنْزِلُ عَلٰى اَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ -

অর্থ ঃ '(মসজিদে হারামে) আল্লাহ প্রত্যেক রাত ও দিনে ১২০টি রহমত বর্ষণ করেন। এই ঘরের তওয়াফকারীদের উপর ৬০টি, মুসল্লীদের উপর ৪০টি এবং কা'বা শরীফের প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের প্রতি ২০টি রহমত বর্ষণ করেন।' এক রেওয়ায়েতে এসেছে ঃ 'মক্কার এই মসজিদের উপর রহমত নাজিল হয়।' অন্য আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, 'মক্কীবাসীদের উপর রহমত নাজিল হয়।'

মক্কাবাসীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, কা'বা শরীফের নিকটে বাস করার কারণে, তাঁরা কা'বা শরীফকে ঘন ঘন দেখতে পায়। কা'বা শরীফকে দেখাও একটি সম্মানিত এবাদত।

মক্কাবাসীদের অন্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা যমযমের পবিত্র পানির নিকটবর্তী। তাঁরা বেশী বেশী করে এই পানি পান করতে পারে এবং তৃপ্তি সহকারে, ইচ্ছামত পানি পান করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

মক্কাবাসীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা হাজারে আসওয়াদের নিকটবর্তী। ফলে তাদের পক্ষে সহজে এই পাথরকে স্পর্শ করা এবং চুমু দেয়া সম্ভব। এই কাজটিকে আল্লাহর সাথে শপথ অনুষ্ঠান বলা হয়। এর ফলে গুনাহ্ মাফ হয়।

মক্কাবাসীদের অপর মর্যাদা হল, তারা ঘন ঘন উমরাহ করতে পারে। উমরাহ্র জন্য তাদের নির্ধারিত মিকাত তানয়ীমে অবস্থিত মসজিদে আয়িশা এবং জো'রানা খুবই নিকটবর্তী। ফলে, বেশী বেশী উমরাহ্র মাধ্যমে তারা নেক ও কল্যাণ বৃদ্ধির এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করছে।

ইমাম মালেক বলেছেন, 'হে মক্কাবাসীরা, তোমাদের উপর উমরাহ্ ওয়াজিব নয়, তোমাদের উমরাহ্ হচ্ছে তওয়াফ।' কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এর দ্বারা ইমাম মালেক মক্কাবাসীদের উমরাহ্‌কে মাকরূহ বলেছেন, আসলে তা ঠিক নয়। তিনি শুধু একথা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের উপর উমরাহ্ ওয়াজিব নয়। তবে তা অবশ্যই জায়েয।

আহমদ বলেছেন, মক্কাবাসীদের জন্য উমরাহ্ জায়েয নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ অন্যদের মতে, বেশী বেশী উমরাহ্ করা মোস্তাহাব। ইবনে হাজম, হযরত আলী, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আনাস, আয়িশা এবং তাবেয়ীদের মধ্য থেকে একরামা ও আ'তার সূত্রে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, সেগুলোতে অধিক উমরাহ্ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সে সকল হাদীসে, মক্কাবাসীদেরকে উমরাহ্ করা থেকে বাদ দেয়া হয়নি কিংবা তাদেরকে নিরুৎসাহিতও করা হয়নি। তাই তাদের উমরাহ্ না করার কোন কারণ নেই। মক্কাবাসীদের জন্যেও বেশী বেশী উমরাহ্ করা উত্তম। এমনটি হতে পারে না যে, আল্লাহ্ এই শহরের লোকদেরকে এমন একটি রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে সেই শহরে আগত লোকদের উপর তা বন্টন করবেন। বরং হাদীসে এসেছে যে,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَوَ الْهَوْنَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ـ

অর্থ ঃ তোমরা একসাথে হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় কর, এ দুটো দারিদ্র ও অবহেলাকে এমনভাবে দূর করে যেমন আগুন সোনা-রূপা ও লোহা থেকে মরিচা দূর করে।'

হযরত আলী (রা) প্রতি মাসে একবার উমরাহ্ করতেন এবং আয়িশা (রা) এক বছরে তিনবার উমরাহ আদায় করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস বছরে একাধিকবার উমরাহ্ করেছেন।

হযরত আনাস (রা) মক্কায় বাস করা অবস্থায় যখনই মাথার চুল বড় হত, তখনই একবার উমরাহ্ করে চুল কাটতেন। উমরাহ্ কম হলে তাওয়াফের পরিমাণও কমে যাবে। তাই যারা বলেন, মক্কাবাসীদের জন্য অধিক সংখ্যক উমরাহ্ জায়েয নেই, তা ঠিক নয়। অবশ্য, এ ব্যাপারে আলেমদের মত পার্থক্য রয়েছে। একাধিকবার উমরাহ্ করা সুন্নাত যা স্বয়ং নবী করীম (সা) নিজেই করেছেন। তবে বারবার তওয়াফ করা আরো বেশী উত্তম।

৩২. মক্কার কবরস্থানের ফজীলত বা মর্যাদা

মক্কার কবরস্থানের মর্যাদার ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ هٰذِهِ অর্থ ঃ 'এটি কতইনা উত্তম কবরস্থান।' (আলবাজ্জার) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সানিয়ায়, সানিয়া গোরস্থানের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তখন এতে কোন কবর ছিলনা। তারপর তিনি বললেন ঃ

يَبْعَثُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ اَوْ مِنْ هٰذَا الْحَرَامِ كُلِّه سَبْعِيْنَ اَلْفًا ـ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَشْفَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا ـ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ـ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ : مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ هُمُ الْغُرَبَاءُ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ এই যমীন থেকে কিংবা হারাম থেকে ৭০ হাজার লোককে হাশরের ময়দানে উঠাবেন, যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে; তাঁরা প্রত্যেকেই ৭০ হাজার লোকের জন্য সুফারিশ করবেন, তাঁদের চেহারা পূর্ণিমার রাত্রের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে, আল্লাহ্র রাসূল, তাঁরা কারা?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাঁরা হচ্ছে 'অপরিচিত' আশ্চর্যজনক লোক।

মক্কার কবরস্থানের আরেকটি বিশেষ মর্যাদা হল, এতে অনেক সাহাবী, তাবেয়ী, উলামায়ে কেরাম এবং বুজুর্গানে দীন শায়িত আছেন। যে সকল সাহাবায়ে কেরামকে মক্কায় দাফন করা হয়েছে তাঁরা হলেন ঃ

১। আল্ হারেস বিন লাহুফ, তিনি ইবনে আওফ নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেছেন তিনি হচ্ছেন, আল্হারস বিন মালেক বিন আসাদ।

২। হাব্বা। কেউ বলেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে আ'মর। তবে প্রথম নামটিই বেশী সহীহ্। কেউ বলেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে হান্না। আবার কেউ বলেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে লবীদ বিন আবদে রাব্বিহ।

৩। হামনান বিন আওফ, যিনি আবদুর রহমান এবং আবদুল্লাহ বিন আওফের ভাই।

৪। খালেদ বিন উসাইদ বিন আবুল আস বিন উমাইয়া।

৫। খোবাইব বিন আদী। কেউ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, খোবাইব বিন মালেক বিন আদী বিন আমের আল্-আওসী এবং তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬। খোনাইস বিন খালেদ আল-আশয়া'রী বিন রবিয়াহ বিন আহরাম বিন খোনাইস বিন হাবশিয়া বিন কা'ব বিন উমর। তাঁর উপাধি ছিল, আবু সখর।

৭। খোয়াইলাদ বিন খালেদ আবু জুয়াইব আল্-হাজলী আশশায়ের। তাঁর উপাধি ছিল কোতাইল।

৮। যায়েদ বিন আদ্দাসিনাহ বিন মুয়াবিয়া বিন ওবায়েদ আলবায়াদী। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

৯। সা'দ বিন খোলি বিন আমের।

১০। সাঈদ বিন ইয়ারবু বিন আনকাসা বিন আমের বিন মাখযুম আলমাখযুমী।

১১। আস্সাকরান বিন আমর বিন আবদে শামস বিন আবদুদ। তিনি সোলাইত ও সোহাইলের ভাই।

১২। সালমা বিন আল মিলা আলজোহানী।

১৩। সামুরা বিন মূয়ীর বিন লুজান আল্জুমাহী।

১৪। শায়বা বিন উসমান বিন তালহা।

১৫। সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ।

১৬। আমের বিন ওয়াসেলা বিন আবদুল্লাহ বিন আ'মীর।

১৭। আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উসমান।

১৮। আবদুর রহমান বিন উসমান বিন ওবায়দুল্লাহ আততাইমী।

১৯। আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের বিন আওয়াম।

২০। আবদুল্লাহ বিন আস্‌সায়েব বিন আবিস সায়েব।

২১। আবদুল্লাহ বিন শিহাব বিন আবদুল হারস বিন যাহরা।

২২। আবদুল্লাহ বিন আমের বিন কোরাইজ।

২৩। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস বিন ওয়ায়েল।

২৪। আবদুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব।

২৫। আবদুল্লাহ বিন কায়েস বিন সোলাইম বিন হেসার।

২৬। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি তাইয়্যেব ও তাহের নামেও পরিচিত ছিলেন।

২৭। আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার আল-আনসী। তিনি আম্মার বিন ইয়াসারের ভাই।

২৮। উতাব বিন উসাইদ আলী যানা আমীর বিন আল ইস।

২৯। উসমান বিন তালহা বিন আবি তালহা।

৩০। উসমান বিন আমের বিন আমর আবু কোহাফা।

মোয়াল্লাহ কবরস্থানে হযরত খাদীজার (রা) কবর

৩১। আল-আরস বিন কয়েস বিন সাঈদ বিন আল-আরকাম।

৩২। আইয়াস বিন আবি রবীয়াহ আল্ মাখযুমী।

৩৩। কাসেম বিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

৩৪। কালদাহ বিন হাম্বল বিন মোলাইল।

৩৫। মুহাম্মাদ বিন হাতেব বিন আল-হারেস।

৩৬। আল্-মেসওয়ার বিন মাখরামা বিন নওফাল।

৩৭। মোগাফ্ফাল বিন গনম। কেউ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, আবদ নহম বিন আফীফ বিন আসহম।

৩৮। ইয়াসের বিন আম্মার বিন মালেক বিন কানানাহ।

৩৯। আবু সুবরাহ বিন আবি রহম বিন আবদুল ওজ্জা আল-আমেরী।

এই হচ্ছে পুরুষ সাহাবায়ে কেরামের নাম।

মক্কার কবরস্থানে দাফনকৃত মহিলা সাহাবীদের নাম হচ্ছে ঃ

১। আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রা)। তাঁর মায়ের নাম হচ্ছে কোতলা; কাতিলাও বলা হয়। তিনি যোবায়ের বিন আওয়ামকে বিয়ে করেছিলেন।

২। খাদ্দামা বিনতে খোলাইলাদ বিন আসাদ। তিনি উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদীজার বোন ছিলেন।

৩। খাদীজা বিনতে খুয়াইলাদ বিন আসাদ বিন আবদুল ওজ্জা বিন কুসাই বিন কিলাব। তাঁর মায়ের নাম হচ্ছে যায়েদা বিন আসেম বিন আমের বিন লুই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রী ছিলেন।

৪। যয়নব বিনতে মাজউ'ন বিন হাবীব বিন ওহাব। তিনি উসমান বিন মাজউ'নের বোন এবং হযরত উমর (রা) এর স্ত্রী ছিলেন।

৫। যয়নব আল-আসাদীয়া আল-মক্কীয়াহ।

৬। সুমাইয়াহ্ বিনতে খাব্বাত। তিনি আম্মার বিন ইয়াসেরের মা ছিলেন।

হাফেজ ফিরোজাবাদী মক্কার হুজুন কবরস্থানে দাফনকৃত সাহাবাদের নামের তালিকার উপর একটি বই লিখেছেন। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী মালেকীরও একটি বই আছে। তাতে তিনি মক্কা বিজয়ের দিন সাহাবাদের মধ্যে কারা মক্কায় মারা গেছেন এবং অন্যান্য সময় মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইন্তিকাল করেছেন তাদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

৮. মক্কার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

ঐতিহাসিক স্থানগুলো সম্পর্কে জানা ও তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। ঐ সকল স্থানে গিয়ে ভক্তির আতিশয্যে যেন কোন বেদআত বা কুসংস্কার প্রসূত কাজ না করা হয়। অনেকেই সেসব স্থানে গিয়ে চুমু খায়, সাজদা করে এবং মাটি ও পাথর নিয়ে আসে। এসব কাজ বেদআত। এগুলো নিষিদ্ধ কাজ। সে সকল স্থান থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য করণীয় নেই। ঐ সকল পবিত্র স্থানে দো'আ কবুল হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মস্থান ও জন্ম বৃত্তান্ত

মক্কার সোকুল লাইলের (নৈশ বাজার) উপরিভাগে এক ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। আবরাহা বাদশাহর ধ্বংসের বছরকে عام الفيل বা 'হস্তিবাহিনীর বছর' বলা হয়। সেই বছর রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ২য়, ৩য়, ৯ম ও ১২ই রবিউল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। ১২ই রবিউল আউয়াল বেশী প্রচলিত। তবে ৯ই রবিউল আউয়াল বেশী সঠিক। কেননা দিবসের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোমবারকে ঠিক রাখার জন্য বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন, ৯ই রবিউল আউয়াল ছিল সোমবার। পক্ষান্তরে, ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল বৃহস্পতিবার। এই হিসেবে ৯ তারিখ বেশী যুক্তিসংগত।

তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুওয়ত লাভ করেন, মক্কা থেকে সোমবারে মদীনায় হিজরত করেন, মদীনায় এসে সোমবারে পৌঁছেন, সোমবারে হাজারে আসওয়াদকে তার যথাস্থানে উঠান এবং সোমবারে ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে, তিনি খতনা করা এবং নাভীর আঁত কাটা অবস্থায়, দুই হাত যমীনে বিছিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঁচু অবস্থায় ভূমিষ্ট হন। তাঁর শরীরে প্রসবকালীন কোন ময়লা আবর্জনা ছিল না।

নবী করীম (সা) এর প্রসব কাজে নিয়োজিত দাই আবদুর রহমান বিন আওফের মা শেফা বলেন, নবী (সা) যখন আমার হাতে এসে পড়লেন এবং কেঁদে উঠলেন তখন আমি একজন লোকের এই শব্দ শুনতে পাই, رَحِمَكَ اللّٰهُ 'আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।' তারপর আমার সামনে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সব আলোকিত হয়ে গেল। এমনকি তখন আমি রোমের ইমারত ও রাজ প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মের রাতে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, বহুসংখ্যক মূর্তি স্থানচ্যুত হল এবং তাদের মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল। অন্যটি হচ্ছে, তাঁর জন্মের সাথে সাথে এমন আলো উদ্ভাসিত হল যে, সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত দেখা গেল। আরেকটি ঘটনা হল, পারস্য সম্রাট কেসরার রাজ দরবার কেঁপে উঠল, ছায়াদার নির্মিত ছাতাগুলো ভেঙ্গে পড়ল, একহাজার বছর যাবত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড নিভে গেল এবং তা একটি পুকুরে পরিণত হয়ে গেল।

জন্মস্থানের ইতিহাস

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর আকীল বিন আবি তালেব ঐ ঘরটির মালিক হন। দীর্ঘদিন যাবত ঘরটি তাঁর ও তাঁর সন্তানদের মালিকানায় থাকে। অবশেষে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে একজন ঐ ঘরটি মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস-সাকাফীর কাছে বিক্রি করেন। পরে উম্মুল খলীফাতাইন খাইযুরান হজ্জ করতে এসে ঐ ঘরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।

কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্তমানে তাঁর জন্মস্থান বলে পরিচিত জায়গায় জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের রায় হচ্ছে, তিনি এই জন্মস্থানেই জন্মলাভ করেছেন। ইবনে জোহাইরাও এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মস্থান সোকুল লাইলের (নৈশ বাজার) পার্শ্বে অবস্থিত এবং এ ব্যাপারে মক্কাবাসীদের কোন মতভেদ নেই। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটিই তাঁর জন্মস্থান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

জন্মঘরের বর্ণনা

আল্লামা ফাসী শেফাউল গারাম বইতে লিখেছেন, এটি খুঁটির উপর একটি বর্গাকৃতির ঘর। এর উপর দুটো ছোট মিনারা আছে। এর পশ্চিম কোণ বড় এবং
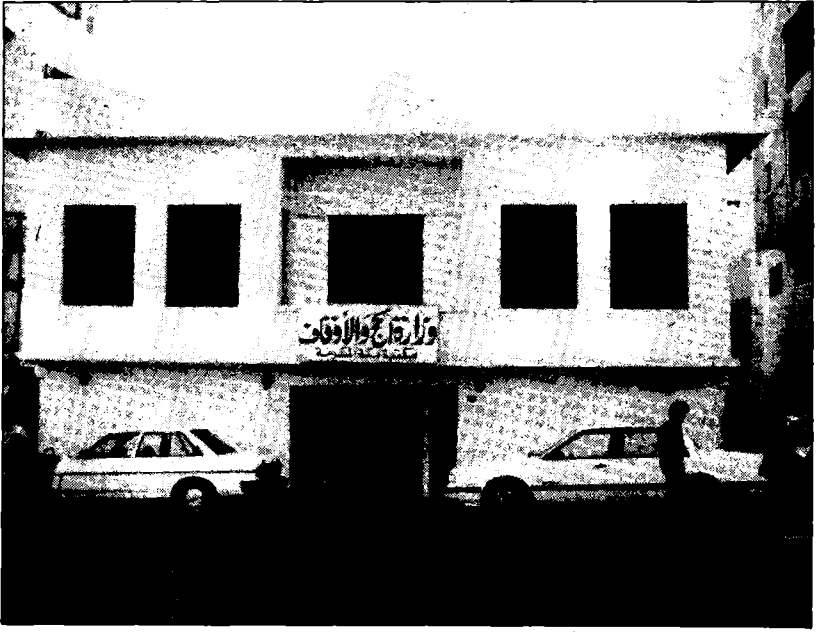
রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মস্থান

এতে ১০টি জানালা আছে এবং একটি মেহরাব আছে। মেহরাবের কাছে একটি গর্তে কাঠের একটি খুঁটি আছে। এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, ঘরের এই স্থানেই রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন। ৫৭৬ হিজরীতে নাসের আব্বাসী এবং ৬৬৬ হিজরীতে বাদশাহ মুজাফফর এই ঘরটি পুনঃনির্মাণ করেন। ইবনে যোবায়ের তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই ঘরের যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তা পূর্বের বর্ণনার বিপরীত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ঘরটি সবসময় একই অবস্থায় ছিল না। বিভিন্ন সময় এর পূনঃনির্মাণ হয়েছে।

বাদশাহ আবদুল আযীযের আমলে, এই ঘরের পুরাতন কাঠামো ভেঙ্গে তা নতুন করে নির্মাণ করা হয় এবং এতে বড় এক পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। লাইব্রেরীর নাম হচ্ছে 'মক্কা লাইব্রেরী'। এতে বহু ইসলামী বই-পুস্তকের সমাহার ঘটানো হয়েছে। লোকদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে এই লাইব্রেরী খোলা থাকে।

হযরত খাদীজা (রা) এর ঘর

জন্ম ও বংশ ঃ খাদীজা বিনতে খোয়াইলাদ বিন আসাদ বিন আবদুল ওয্যা বিন কুসাই আল-আসাদীয়ার বংশ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পূর্ব পুরুষ কুসাই এর সাথে গিয়ে মিশেছে। হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) র জন্মের ১৫ বছর আগে, 'বাইতে খাদীজা' নামক মশহুর ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন।

খাদীজার বৈশিষ্ট্য

হযরত খাদীজার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

১। তিনিই রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রথম স্ত্রী। হযরত খাদীজার সাথেই তিনি ২৪ বছর ঘর সংসার করেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কোন বিয়ে করেননি। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁকে মক্কায় দাফন করা হয় এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কবরে নামেন। তাঁকে মোয়াল্লাহ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

২। তিনিই প্রথম মোমেন। নারী-পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই রাসূলুল্লাহ (সা) এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, সাহায্য করেন এবং তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাঁর উছিলায় আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াত ও প্রচার কাজের সকল দুঃখ কষ্ট লাঘব করেন।

৩। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসে এসেছে ঃ

سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ ثُمَّ خَدِيْجَةُ ثُمَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ـ

অর্থ ঃ 'মহিলাদের সর্দার (সেরা) হচ্ছে মরিয়ম, তারপর ফাতিমা, তারপর খাদীজা এবং পরে হচ্ছে ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া।'

হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلَدَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ ـ احمد والترمذى ـ

অর্থ ঃ 'জগতের মহিলাদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে

খুয়াইলাদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ এবং আসিয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট।' (আহমদ-তিরমিযী)

৪। হযরত খাদীজা (রা) থেকেই রাসূলুল্লাহ্‌র সকল সন্তান জন্মলাভ করেছে। একমাত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়েছে মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে।

৫। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَقَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا فَاَنَا اُحِبُّ مَنْ يُّحِبُّهَا ـ

অর্থ ঃ 'আমি তাঁকে (খাদীজাকে) ভালবাসার সুযোগ পেয়েছি। তাঁকে যারা ভালবাসবে, আমি তাদেরকে ভালবাসবো।'

৬। হযরত আয়েশা (রা) খাদীজা (রা) এর ব্যাপারে যখন কথা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শানে বলেন, আল্লাহ খাদীজার চাইতে উত্তম কোন স্ত্রী আমাকে দেননি; যখন লোকেরা কুফরী করেছে তখন সে আমার রিসালতের উপর ঈমান এনেছে, যখন অন্যরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে, যখন লোকেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে; যখন তারা আমাকে বঞ্চিত করেছে তখন সে আমাকে সমবেদনা জানিয়েছে এবং অন্য স্ত্রীদের সন্তান থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাঁর থেকে আমার সন্তান হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, হযরত খাদীজার প্রতি স্বয়ং আল্লাহ এবং জিবরাইল (আ) সালাম পাঠিয়েছেন। জিবরাইল (আ) বললেন, হে মুহাম্মাদ! খাদীজা আপনার জন্য একটি পাত্রে তরকারি ও খাবার নিয়ে এসেছিল। পুনরায় আসলে তাঁকে তাঁর রব এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম দেবেন। হযরত খাদীজাকে ঐ সালাম পৌছানোর পর তিনি সালামের জবাবে বলেন ঃ

اَللّٰهُ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ (بخارى ومسلم)

অর্থ ঃ 'আল্লাহ নিজেই শান্তি এবং জিবরাইলের উপর তার শান্তি বর্ষিত হোক।'

৮। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হযরত জিবরাইল খাদীজা (রা) কে বেহেশতের এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে কোন চিৎকার নেই এবং নেই কোন কষ্ট ক্লেশ। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি হিজরতের আগে ১১ই রমযান ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে, তিনি অন্য তারিখে মারা যান।

ঘরের বর্ণনা ঃ হযরত খাদীজার ঘরেই, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিয়ে হয় এবং একই ঘরে হযরত ফাতিমাসহ তাঁর অন্যান্য সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার আগ পর্যন্ত ঐ ঘরেই বাস করতেন। তারপর, আকীল বিন আবু তালেব ঘরটি নিয়ে নেন। পরবর্তীতে, হযরত মুয়াওবিয়াহ (রা) তাঁর থেকে ঘরটি কিনে এটিকে মসজিদ বানান এবং লোকেরা এতে নামায পড়া শুরু করে।

ইবনে জোহাইরাহ বলেন, লোকেরা প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত্রে এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এই মসজিদে আল্লাহর জেকর ও এবাদত করত। কয়েকটি কারণে এই ঘরটি মসজিদে হারামের পর, মক্কার অন্যান্য সকল স্থান থেকে উত্তম বলে বিবেচিত। কারণগুলো হচ্ছে, এতে রাসূলুল্লাহ (সা) বাস করেছেন, অনেক ওহী এই ঘরেই নাযিল হয়েছে এবং হযরত ফাতিমা এই ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছেন। ঘরটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৫ হাতের কিছু কম।

ঘরের ভেতর কূপের মত প্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট গোলাকৃতির একটি জায়গা আছে। এর দৈর্ঘ্য এক হাত এবং প্রস্থও এক হাত। এর মধ্যভাগে একটি কালপাথর আছে। এই পাথরটির উপর হযরত ফাতিমার মাথা প্রসবিত হয়েছিল বলে বলা হয়। তবে, একথা ঠিক যে, এই ঘরেই হযরত ফাতিমা (রা) জন্মগ্রহণ করেছেন। পাথরটির উপর প্রসবকালীন সময়ে হযরত ফাতিমার মাথা এসে পড়েছিল কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। এর সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাদশাহ আশরাফের আমলে, নাসের আব্বাসী ঐ ঘরটি নির্মাণ করেন। এই ঘরের সাথে قُبَّةُ الْوَحِيْ বা 'ওহী গম্বুজ' নামক একটি জায়গা অবস্থিত ছিল। সাথে আরো একটি জায়গা সংযুক্ত ছিল। সেটির নাম ছিল اَلْمُخْتَبِى বা 'লুকানোর জায়গা'। মক্কার মোশরেকদের ইট পাথর বর্ষণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এই জায়গায় আত্মগোপন করে থাকতেন। ইয়েমেনের বাদশাহ মুজাফফর 'কুব্বাতুল ওহী' নির্মাণ করেন।

অবশেষে, বাদশাহ আবদুল আযীযের আমলে মক্কা পৌরসভার মেয়র শেখ আব্বাস কাত্তান ঘরটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং এতে হাফেজী মাদ্রাসা চালু করেন।

মসজিদে হারামের পবিত্রতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এতে হাফেজী মাদ্রাসা চালু করা হয়। এই ঘরটি গায্যা বাজারের স্বর্ণের মার্কেটের ভেতর অবস্থিত। কিন্তু, বর্তমানে তাও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

দারুল আরকাম বিন আবুল আরকাম

এই ঘরটিকে ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। হযরত আরকাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী। এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ১ম ১০ জন সাহাবীর পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৫২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

মক্কার সাফা পাহাড়ের ডানপাশে তাঁর একটি ঘর ছিল। মুসলমান হওয়ার পর তিনি ইসলামের জন্য ঐ ঘরটি ওয়াকফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোরাইশদের ভয়ে সেই ঘরে বসে গোপনে লোকদের কাছে ইসলাম প্রচার করতেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এ ঘরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সর্বশেষ হযরত উমরসহ মোট ৪০ জন সাহাবায়ে কেরামের ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) সেই ঘরে বসেই ইসলামের দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করেন। তারপর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতী তৎপরতা শুরু হয়।

হযরত আরকামের নাতি আবু জাফর মনসুরের কাছে ঐ ঘরটি বিক্রি করে ফেলেন। এক সময় ঐ ঘরকে 'দারুল খাইযুরান' বলা হত। খলীফা মাহদীর দাসী খাইযুরান সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং লোকেরা তা দেখতে যেত। তাঁর দিকে সম্বোধন করেই হয়তো এটিকে ঐ নতুন নামে অভিহিত করা হত।

মসজিদে হারামের সৌদী সম্প্রসারণের সময় ঐ ঘরটি পুনঃনির্মাণ করা হয় এবং আমর বিন মারুফ ও নেহী আনিল মোনকার বিভাগের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অংশে কুরআন ও হাফেজী শিক্ষা চালু করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাও ভেঙ্গে দেয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্তও তার চিহ্ন রয়েছে।

হযরত আলী (রা) এর জন্মস্থান

হযরত আলী (রা) যেই ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ঘরটি নবী করীম (সা) এর জন্মস্থানের নিকটবর্তী জায়গায় শে'বে আলীতে অবস্থিত। এই ঘরের সামনে লেখা ছিল ঃ هٰذَا مَوْلِدُ اَمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, এটি আমীরুল মোমেনীন এর

জন্মস্থান। এই ঘরেই হযরত মুহাম্মাদ (সা) এরও প্রতিপালন হয়। উল্লেখ আছে যে, এই ঘরের দেয়ালে একটি পাথর আছে। ঐ পাথরটি নাকি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে কথাবার্তা বলত।

৬০৮ হিজরীতে, আহমদ নাসের লি-দীনিল্লাহ ঐ ঘরটি পুনর্নির্মাণ করেন। সেখানে নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে 'মাদরাসাতুন নাজাহ' নামক একটি নৈশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছে এবং নতুন করে ঘরটি তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ ঘরটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কেননা, শে'বে আলী থেকে জাবালে আবু কোবায়েসের নীচ দিয়ে মিনা অভিমুখী দু'টো সুড়ঙ্গ তৈরি করায় শে'বে আলীর সকল বাড়ী ঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। হযরত আলী বিন আবি তালেব প্রথম ৪ জন মুসলমানের একজন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচাতো ভাই, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদের স্বামী এবং হযরত হাসান ও হোসাইনের বাপ ছিলেন। তিনি ইসলামের ৪র্থ খলীফা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধের সময় তার সম্পর্কে বলেছিলেন, اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلاَّ اَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِىٍّ -

অর্থ ঃ 'আমার কাছে তোমার মর্যাদা হচ্ছে মূসা (আ) এর কাছে হারুন (আ) এর মত। তবে পার্থক্য হচ্ছে এইটুকু যে, তুমি নবী নও।' তিনি ৪০ হিজরীর ১৭ই রমযান শহীদ হন। তাঁর খেলাফত সাড়ে তিন মাস কম ৫ বছর স্থায়ী ছিল।

আবু সুফিয়ানের (রা) ঘর ঃ খাদীজার ঘরের কাছেই ছিল আবু সুফিয়ানের ঘর। সেখানে বর্তমানে আল-কাব্বান হাসপাতাল অবস্থিত। এর বিপরীতেই মসজিদে হারামের বাবুন্নবী।

হামযার (রা) ঘর ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হামযার ঘর ছিল মসজিদে হারামের দক্ষিণে আধা কিলোমিটার দূরে মেসফালায়। সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

আবু জাহলের বাড়ী ঃ এ বাড়ীটিতে বর্তমানে টয়লেট ও ওজুখানা নির্মাণ করা হয়েছে। সেটি মসজিদে হারামের উত্তর-পূর্বদিকে এবং আবু সুফিয়ানের বাড়ীর কাছে ছিল।

মোয়াল্লাহ কবরস্থান

মক্কার কবরস্থানের ফজীলত ও মর্যাদার ব্যাপারে আমরা 'হারাম এলাকা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মক্কার কবরস্থানের ফজীলত ও মর্যাদা অনেক বেশী। এই কবরস্থানে ৪৫ জন মহিলা ও পুরুষ সাহাবায়ে কেরামসহ আরো

অনেক বুজুর্গের কবর রয়েছে।

মক্কার সবচেয়ে বড় কবরস্থান হচ্ছে হুজুনের কাছে মোয়াল্লাহ কবরস্থান। মোয়াআল্লাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে উঁচু। এই কবরস্থানটি মক্কার উঁচুদিকে অবস্থিত বলে একে মোয়াল্লাহ বলা হয়। বেশীর ভাগ মত অনুযায়ী, হযরত খাদীজা (রা) এর কবর এখানে অবস্থিত। কারো কারো মতে, তখনকার যুগে মক্কার কবরস্থান অন্যত্র ছিল এবং সেই কবরস্থানের বিশেষ কোন চিহ্ন বর্তমানে অবশিষ্ট নেই।

মোয়াল্লাহ কবরস্থানে দাফনকৃত লোকদের সৌভাগ্য বেশী। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজী ও উমরাহ আদায়কারী লোকেরা এখানে কবর যিয়ারত করে এবং মুর্দাদের জন্য দোয়া করে। দোয়াকারীদের মধ্যে কত না নেককার লোক রয়েছেন, যাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন! এছাড়াও মোয়াল্লাহ কবরস্থানের বেশীর ভাগ মুর্দার নামাযে জানাযা মসজিদে হারামে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিক থেকেও এখানকার কবরবাসীরা ধন্য।

মোয়াল্লাহ কবরস্থানের উপর দিয়ে বর্তমানে হুজুন ওভার ব্রীজ তৈরি করাতে বাহ্যতঃ কবরস্থানটি দুইভাগে বিভক্ত দেখা যায়। অবশ্য ওভারব্রীজের নীচ দিয়ে দুই দিকে পারাপারের ব্যবস্থা আছে।
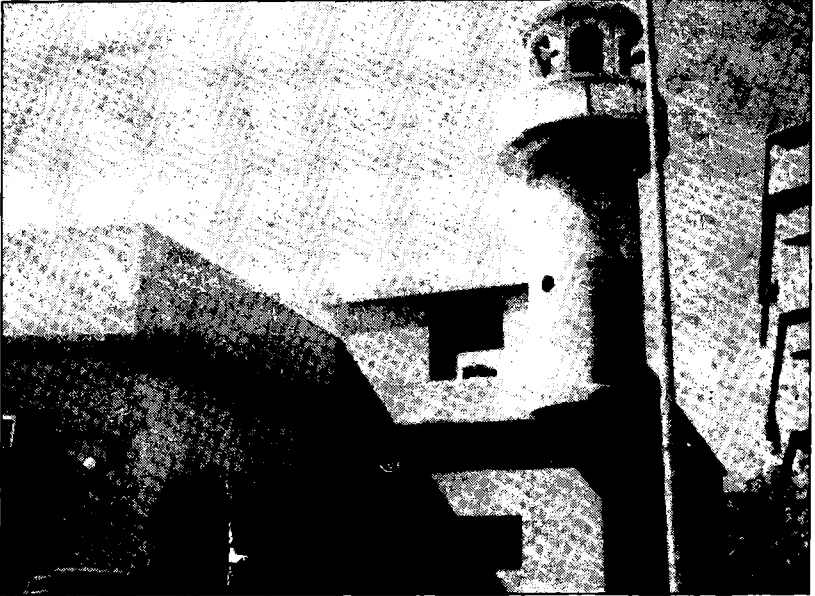
মসজিদে জু-তওয়া

জু-তওয়া (ذُوْطوى) রাসূলুল্লাহ (সা) এর মক্কা প্রবেশের বিশ্রামস্থল

জু-তওয়া মক্কার প্রসিদ্ধ কূপসমূহের অন্যতম। এটি জারওয়ালের বর্তমান ম্যাটারনিটি ও চিলড্রেন হসপিটালের সামনে অবস্থিত। হাদীসে এ কূপের আলোচনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে অবতরণ করে গোসল করেছেন এবং রাত্রি যাপন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে মক্কায় আসার সময় প্রথমে জু-তওয়ায় অবতরণ করেন এবং সেখানে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত রাত কাটান। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নামাযের স্থান হচ্ছে বর্তমান মসজিদের আরো পরে এবং নীচে। হযরত ইবনে উমরের বর্ণনায় আরো এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জু-তওয়ায় রাত্রিযাপন, ফজরের নামায পড়া এবং সেখানে থেকে গোসল করা ব্যতীত দিনে ছাড়া কখনো মক্কায় প্রবেশ করতেন না। (আবু দাউদ ও নাসাঈ) আবুজর আরো একটু অতিরিক্ত যোগ করে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে মক্কায় প্রবেশ করা অপছন্দ করতেন।

উরওয়া থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) জু-তওয়ায় রাত্রি যাপন করেন ও ফজরের নামায পড়েন। তারপর গোসল করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করেন। (মোআত্তা মালেক)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশের আগে, মক্কার নিজ বাড়ীতে গোসল করতেন। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মক্কায় প্রবেশের আগে, জু-তওয়ায় গোসল করতেন। (اخرجه الشافعى)

ইমাম মালেক উল্লেখ করেছেন, ইবনে উমর হজ্জ ও উমরাহ করার উদ্দেশ্যে বের হলে নিজে গোসল করা এবং সাথীদেরকে গোসলের আদেশ ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করতেন না। হযরত ইবনে উমর থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশের আগে ফাখ নামক জায়গায় গোসল করেছেন। (দারে কুতনী)

হাফেজ মুহিববুদ্দিন তাবারী বলেছেন, উলামায়ে কেরামের মতে, মক্কায় প্রবেশের আগে গোসল করা মোস্তাহাব।

জু-তওয়া হচ্ছে, উত্তর দিক থেকে আগত যাত্রীদের মক্কায় প্রবেশের সাবেক প্রবেশ পথ। এটি মসজিদে হারাম থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে মক্কা শহর সম্প্রসারিত হয়ে অনেক বড় হয়েছে এবং জু-তওয়া শহরের মাঝখানে অবস্থান করছে। অথচ আগে মক্কা শহর ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

অপরদিকে, ফাখ হচ্ছে বর্তমানে যাহের, শোহাদা ও উম্মুল জুদ নামে পরিচিত এলাকার নাম। ফাখ হচ্ছে, মক্কার ২য় বৃহত্তম উপত্যকা। এটি মূলতঃ সানিয়াতুল বায়দা পাহাড়ের ঢালু থেকে শুরু হয়েছে। এটি জেদ্দাগামী লোকদের জন্য জু-তওয়ার বামে থাকে।* রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় যখন মক্কায় আসেন তখন জু-তওয়ায় অবতরণ করে গোসল করেন। তবে বিদায় হজ্জ ছাড়া অন্য কোন সফরে তিনি ফাখ এলাকায় অবতরণ করেন এবং গোসল করেন। বর্তমানে এর কাছে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

সারেফ উপত্যকা ঃ হযরত মায়মুনার বিয়ে ও কবর

মসজিদে হারাম থেকে সারেফ উপত্যকার (ওয়াদী সারেফ) দূরত্ব হচ্ছে ৬ মাইল। কারো কারো মতে, ৭ মাইল, ৯ মাইল এবং ১২ মাইল। এই উপত্যকাটি ওয়াদী ফাতেমা এবং মক্কার মাঝে অবস্থিত অর্থাৎ এটি জমুম (ওয়াদী ফাতেমা) ও তানঈমের মাঝে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম হচ্ছে حَيُّ النَّوَارِيَة বা নাওয়ারিয়া এলাকা। এলাকাটি উত্তর মক্কার প্রবেশদ্বারে হিজরাহ সড়কের উপর এবং সড়কটি বর্তমানে এক্সপ্রেস রোড হিসাবে পরিচিত।

এই উপত্যকায় হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস হেলালীর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিয়ে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ৬ষ্ঠ হিজরীতে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর উমরাহ না করে ফিরে যান এবং পরের বছর ৭ই হিজরীর জিলকদ মাসে মক্কায় কাজা উমরাহ আদায়ের সময় সারেফ উপত্যকায় হযরত মায়মুনার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর নাম ছিল বোররাহ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম রাখেন মায়মুনা। হযরত মায়মুনা (রা) নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য ওয়াকফ করেন। কাতাদাহ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর শানেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ -

অর্থ ঃ 'একজন মোমেন মহিলা যখন নিজেকে নবীর জন্য দান করল।'

উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ৫শ' দেরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে বিয়ে করেন। ইবনে সাইয়েদুন নাস তাঁর সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন, মায়মুনা (রা) সওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ফলে, মায়মুনা সওয়ারী থেকে নেমে নিজেকে রাসূলুল্লাহ এর খেদমতে পেশ করে বলেন, উট এবং উটের পিঠের সওয়ারীকে

---

* আখবারে মক্কা, আযরাকী

রাসূলুল্লাহর জন্য ওয়াকফ করলাম।

ইবনে সা'দ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَلْاَخَوَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ مَيْمُوْنَةُ وَاُمُّ الْفَضْلِ وَاَسْمَاءُ ـ

অর্থ ঃ মায়মুনা, উম্মে ফজল এবং আসমা হচ্ছে মোমেন বোন। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন, মায়মুনা আমাদের মধ্যে বেশী খোদাভীরু ও আত্মীয়তার হক আদায়কারিণী। তাঁর বক্তব্যটি হচ্ছে এই যে,

اَمَا اَنَّهَا كَانَتْ اَتْقَانَا لِلّٰهِ وَاَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ ـ

রাসূলুল্লাহ (সা) কাজা উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে আসার সময় সারেফ উপত্যকায় হযরত মায়মুনার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। উমরাহ শেষে মদীনা ফেরার পথে তিনি সারেফ উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং হযরত মায়মুনা (রা) এর সাথে বাসর যাপন করেন। পরে, হযরত মায়মুনা (রা) একই জায়গায় ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সেই জায়গাটি রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত।

সারেফ উপত্যকায় তাঁর কবরের উপর একটি গম্বুজ এবং পার্শ্বে একটি মসজিদ ছিল। পরবর্তীতে গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মসজিদ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু ১৩৭২ হিজরীতে সেই মসজিদটিও ভেঙ্গে দেয়া হয়।

হেরা গুহা

হেরা গুহা যে পাহাড়ে অবস্থিত সে পাহাড়টির নাম হচ্ছে হেরা পাহাড় কিংবা নূর পাহাড়। এটি মক্কার উত্তর দিকে অবস্থিত। নগর অভিধান প্রণেতা ইয়াকুব হামাওয়ী লিখেছেন, মসজিদে হারাম থেকে এর দূরত্ব ৩ মাইল। বর্তমানে আবাদী হেরা পাহাড়কেও ছাড়িয়ে গেছে। মসজিদে হারাম থেকে নূর পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। এটি একটি খাড়া পাহাড়। এর উচ্চতা হচ্ছে ২০০ মিটার এবং এর চূড়ায় পৌছতে প্রায় আধ ঘন্টা সময় লাগে।

গুহাটি পাহাড়ের চূড়া থেকে ৫০ মিটার দূরে। মানুষ গুহায় পৌছার জন্য চূড়া থেকে নীচের দিকে যায়। পাহাড়ে উঠা ও গুহায় নামার জন্য কোন সুষ্ঠু সিঁড়ি নেই। পাহাড়ের গায়ে চড়ে উঠানামা করতে হয়। বর্তমানে, পথ হারানো থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে পথের দুই পার্শ্বে সাদা পিলার বসানো হয়েছে। গর্তটির প্রবেশ

জাবালে নূর বা হেরা পাহাড়

পথ উত্তরমুখী। এর উচ্চতা হচ্ছে মধ্যম আকৃতির মানুষের উচ্চতার সমান। এতে একসাথে ৫ জন লোক বসতে পারে।

এই গুহার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ এতে নবী করীম (সা) এর উপর ওহী নাযিল করেছেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই গর্তে বসে সাধনা করেছেন এবং একাধারে অনেকদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। বুখারী শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী সেখানেই, হযরত জিবরাইল (আ) সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে হাজির হন।

সেই গুহাটি থেকে আগে কা'বা শরীফ পরিষ্কার দেখা যেত। কিন্তু মক্কা শহরে আজকাল সুউচ্চ ইমারত নির্মাণের কারণে, সেখান থেকে কা'বা দৃষ্টিগোচর হয় না। হেরা পাহাড় মক্কার সর্বোচ্চ পাহাড়। মক্কা শহরের চতুর্দিক থেকে হেরা পাহাড়ের উঁচু শৃঙ্গটি দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত জিবরাইল (আ) তাঁর কাছে এসে প্রথমে বলেন, পড়। তিনি বলেন, আমি নিরক্ষর, পড়তে পারি না। জিবরাইল তাঁকে জোরে জড়িয়ে ধরে দ্বিতীয়বারও সেই একই কথা বললে নবী করীম (সা) একই উত্তর দেন। জিবরাইল পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। ৩য় বার জিবরাইল সূরা আ'লাকের প্রথম ৫টি আয়াত পড়ে শুনান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ও ঐ

আয়াতগুলো সাথে সাথে পড়েন। সেই আয়াতগুলো হচ্ছে ঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

অর্থ ঃ 'পড় (হে নবী)! তোমার রবের নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্তের এক পিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার রব অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা মানুষ জানত না।'

হেরা পাহাড় মানুষের হেদায়াতের প্রথম আলো বিতরণকারী পাহাড় হিসেবে মুসলমানদের অন্তরে সম্মানের আসন গেঁড়ে আছে। তাই এর অপর নাম হচ্ছে 'নূর পাহাড়' বা আলোর পাহাড়।

সাওর গুহা

এই গুহাটি সাওর পাহাড়ে মসজিদে হারামের ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এটি হেরা পাহাড় থেকে বড় পাহাড় এবং মসজিদে হারাম থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে। সাওর বিন মানাতের নামানুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছে। এই পাহাড়ে উঠতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগে। ৩টি সংযুক্ত পাহাড়ের সমষ্টিকে সাওর পাহাড় বলা হয় এবং দুই পাহাড় অতিক্রম করার পর ৩য় পাহাড়ে ঐ গুহাটি অবস্থিত। পাহাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫৪টি উঁচু নীচু মোড় আছে। পাহাড়ে আরোহণকারী ব্যক্তি ঐ সকল মোড় দিয়ে একবার উপরে উঠে, আবার নীচে নামে। এইভাবে তাকে চূড়ায় অবস্থিত গুহায় পৌঁছতে হয়। পাহাড়ের চূড়ায় গর্তটি একটি ছোট নৌকার মত দেখায় এবং এর পিঠ হচ্ছে উপরের দিকে। এর সামনে ও পেছনে দুটো ছিদ্র আছে। গুহাটি মাটি থেকে ৫শ' মিটার উপরে।

গুহার দৈর্ঘ্য ১৮ বিঘত এবং সংকীর্ণ মুখের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৫ বিঘত। যমীন থেকে এর মুখের উচ্চতা ১ বিঘত এবং অন্য দুই দিক থেকে উচ্চতা হচ্ছে এক বিঘতের দুই তৃতীয়াংশ। এর প্রবেশমুখের ২য় দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে ১৫ বিঘত।

এই গুহার মধ্যেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ - (التوبه : ٤٠)

অর্থ ঃ 'তারা দু'জন যখন সেই গর্তে ছিল, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল।'

ঐ গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর প্রিয় সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) আশ্রয় নিয়েছিলেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকরকে নিয়ে ৩ দিন ঐ পাহাড়ের গর্তটিতে আত্মগোপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের ব্যাপারে কোরাইশ কাফেরদের তল্লাশী থেমে যাবে। তাঁদের খাবার ছিল খেজুর। হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা (রা) মক্কা থেকে তাঁদের জন্য রাত্রে খাবার নিয়ে আসতেন। কোরাইশরা তাঁদের দু'জনকে তালাশ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সাওর গুহায় গিয়ে পৌঁছে এবং গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে ফিরে আসে। কেননা, কেউ ভেতরে ঢুকলে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতে পারে না। আল্লাহর কত অসীম কুদরত যে সামান্য মাকড়সার জাল দিয়ে তিনি তাঁর নবী, দীন ও শরীয়তের হেফাজত করেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ দুটো বন্য কবুতরকে আদেশ করেছেন তারা যেন গর্তের প্রতিরক্ষার কাজ করে। সে অনুযায়ী কবুতর দুটো মাকড়সার জাল ও গাছের মাঝখানে বসে থেকে গুহার হেফাজত করে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি কতই না তাৎপর্যপূর্ণ!

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ (আল ফাতহ-৪)

অর্থ ঃ 'আল্লাহর জন্যই আসমান এবং যমীনের সৈন্য-সামন্ত নিয়োজিত।'

কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পেছনে পেছনে গুহা পর্যন্ত গেল। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল। এইভাবে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদ্বয়কে হেফাজত করেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۔ (التوبه : ٤٠)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাঁর (নবীর) উপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং অদৃশ্য সেনা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন।' হযরত আবু বকর বলেন, তারা পা উঠালেই আমাদেরকে দেখতে পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ পেরেশান হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

মিনা

মিনা হজ্জ এবং মক্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হাজীদের ৮ই জিলহজ্জ জোহর থেকে ৯ই জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা সুন্নত এবং সেখানে ৮ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ৯ তারিখের ফজর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করাও সকল মাজহাবের দৃষ্টিতে সুন্নত। মিনায় ৮ তারিখে অবস্থান করাকে يَوْمُ التَّرْوِيَةَ বলে। আগে পানির স্বল্পতার কারণে এই দিবসে হাজীরা মিনা থেকে পানি সংগ্রহ করতেন এবং আরাফাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন। تروية মানে পানির প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ৮ তারিখ সকালে মক্কা থেকে রওনা দিয়ে জোহরের সময় মিনায় পৌছেন। তিনি মিনায় 'গারে মোরসালাত' নামক গুহায় রাত্রিযাপন করেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (সা) থেকে বর্ণিত। ঐ গুহায় সূরা 'আল-মোরসালাত' নাযিল হয়। ৯ তারিখ সকালে হাজীরা আরাফাতের ময়দানে চলে যায় এবং সেখানে দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান এবং মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করার পর ১০ই জিলহজ্জ পুনরায় মিনায় ফিরে আসে ও জামরায় পাথর মারে এবং পশু কুরবানী করে। কুরবানীর দিনসহ আইয়ামে তাশরীক তথা ১২ কিংবা ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় থাকার পর হাজীরা মক্কায় ফিরে আসে। তাসরীক অর্থ গোশত শুকানো। ঐ দিনগুলোতে কোরবানীর গোশত শুকানো হত বলে তাকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

মক্কার দিক থেকে মিনার সীমানা হচ্ছে জামরাতুল আকাবা এবং মোযদালেফার দিক থেকে হচ্ছে মোহাস্‌সার উপত্যকা। মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৬ কিলোমিটার। মিনার দৈর্ঘ্য তিন কিলোমিটার। মিনাতেই সূরা কাওসার নাযিল হয় এবং হজ্জের দিনগুলোর মধ্যেই তিনি উক্ত সূরার নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কুরবানীর আদেশ দেন।

অভিধানে বলা হয়েছে (মিনা) مَنَى শব্দটি আরবী اِلَى (ইলা) শব্দের আঙ্গিকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রবাহিত করা। মিনায় অধিক সংখ্যক কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় একে মিনা বলে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জিবরাইল (আ) হযরত আদম (আ) থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় বলেছিলেন, হে আদম! আপনি আশা করুন। তখন আদম (আ) বলেন, আমি

বেহেশতের প্রত্যাশা পোষণ করি। হযরত আদম (আ) এর প্রত্যাশা أُمْنِيَّةٌ থেকে মিনা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

রাত্রি যাপন

মিনায় হাজীদের ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ কিংবা ১৩ই জিলহজ্জের রাত্রি যাপন করা হানাফী মাজহাবে সুন্নত এবং অন্যান্য মাজহাবে ওয়াজিব। আবদুর রহমান বিন ফররুখ বলেন, আমি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা বেচা-কেনা করি আমরা কি কেউ মিনায় রাত্রি যাপন না করে মক্কায় আমাদের মালের কাছে রাত্রি যাপন করতে পারি? তখন ইবনে উমর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তো মিনাতেই রাত্রি যাপন করেন। (আবু দাউদ ও বায়হাকী)।

মিনায় রাত্রি যাপনের অর্থ হল, রাতের বেশীর ভাগ অংশ মিনায় কাটানো। ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে প্রতি রাতের রাত্রি যাপন ত্যাগ করার মোকাবিলায় একটি করে দম দিতে হবে। সে অনুযায়ী তিন রাত যাপন না করলে তিনটি দম দিতে হবে। শাফেঈ এবং হাম্বলী মাজহাবের মশহুর মতামত হচ্ছে, এক রাত যাপন না করলে এক মুদ খাবার, ২ রাত যাপন না করলে দুই মুদ খাবার কাফফারা দিতে হবে। তৃতীয় রাত যাপন না করলে দম দিতে হবে।

ফেকাহবিদদের মধ্যে ওজরের কারণে মিনায় রাত্রি যাপন না করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যেমন, হাজীদের পানি পান করানো এবং পশুর রাখালের ওজর গ্রহণযোগ্য। তারা রাত্রি যাপন না করলে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্বাস (রা) তাশরীকের দিনসমূহে মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে অনুমতি চান যেন তিনি হাজীদের পানি পান করাতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি দেন। (বুখারী ও মুসলিম) হযরত আ'সেম বিন আ'দী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাখালদেরকে মিনায় রাত্রি যাপন থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, আবু দাউদ এবং ইবনে হিব্বান)। ৮ তারিখ, গারে মোরসালাতের রাত্রিযাপন ব্যতীত বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামসহ মসজিদে খায়েফের বর্তমান স্থানেই আইয়ামে তাশরীকে অবস্থান করেন ও রাত্রি যাপন করেন।

মিনায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর খোতবা

রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় দু'টো খোতবা দিয়েছেন। কুরবানীর দিন এবং পরের দিন ১১ই জিলহজ্জ এই খোতবা দু'টো দেন। কারো কারো মতে, তিনি ১০ এবং ১২ই জিলহজ্জ খোতবা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর মিনায় ২য় খোতবার ব্যাপারে সারা বিনতে নাবহান থেকে বর্ণিত আছে, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি জান আজ কোন দিন? শ্রোতারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। তিনি বলেন, আজ হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝের দিন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান এটি কোন শহর? শ্রোতারা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, এটি মাশআরুল হারাম বা সম্মানিত নিদর্শনের স্থান। তিনি আরো বলেন, জানিনা, এই বছরের পর তোমাদের সাথে আর আমার এখানে সাক্ষাত হবে কিনা। তবে জেনে রাখ, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জত আজকের এই পবিত্র দিন এবং স্থানের মতই সম্মানিত, যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রতিপালক রবের সাথে গিয়ে সাক্ষাত কর এবং তিনি তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেন। জেনে রাখ, তোমাদের নিকটবর্তীরা যেন দূরবর্তীদের কাছে এই বাণীসমূহ পৌঁছায়। আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছি?

মদীনায় ফিরে আসার কয়েকদিন পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই খোতবা আইয়ামে তাশরীকের ১ম দিকে নয়, মাঝামাঝি সময়ে দান করা হয়েছিল। এই জন্যই ইমাম শাফেঈ এবং আহমদ বলেছেন, ১২ই জিলহজ্জ তারিখে ঐ খোতবা দেয়া হয়েছে।

আহমদ, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ৮ই জিলহজ্জ তারওইয়া (تروية) দিবসে জোহরের নামায থেকে ৯ই জিলহজ্জ আরাফাহ দিবসের ফজরের নামায অর্থাৎ ৫ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়েন।

জামরাহ*

মিনায় তিন জামরায় কংকর মারতে হয়। মসজিদে খায়েফের দিক থেকে মক্কার দিকে আসার সময় প্রথমে জামরাহ সোগরা বা ছোট জামরাহ পড়ে। ছোট জামরাহ এবং জামরাহ আকাবার মাঝে জামরাহ ওস্তা অবস্থিত। এরপরই হচ্ছে জামরাহ আকাবা। জামরাহ আকাবা অন্য দুটো জামরাহর তুলনায় মক্কার বেশী নিকটবর্তী। প্রথম জামরাহ থেকে মেঝো জামরাহর দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ১৫৬ মিটার এবং মেঝো জামরাহ থেকে জামরাহ আকাবার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ১১৭ মিটার। মিনায় অবস্থানের সময় ঐ সকল জামরার প্রত্যেকটিতে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়।

ছোট ও মেঝো জামরার চারদিকে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে এবং বৃত্তের মাঝখানে উঁচু স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে। এটিই কংকর নিক্ষেপের স্থান। বড় জামরাহ বৃত্তাকার। সেখানেও একটি স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রায় ৩ মিটার উঁচু।

তিনটা স্তম্ভের উপর চার তলা ছাদ তৈরি করা হয়েছে এবং স্তম্ভগুলোর মাথা চার তলা পর্যন্ত উঁচু করা হয়েছে যাতে করে চার তলায় উঠেও পাথর নিক্ষেপ করা যায়।

নীচতলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর উপর তলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থও সমান করা হয়েছে। একই সময়, হাজীরা নীচ ও উপরতলা থেকে কংকর মারার সুবিধে লাভ করায়, কংকর নিক্ষেপের সময় ভিড়ের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য উপরতলাকে একটি চওড়া ওভার ব্রীজের মত মনে হয় এবং এর উপরে কোন ছাদ না থাকায় গরমের সময় হাজীরা রোদে কষ্ট পায়। নীচতলা সবটুকুই চার তলার ছাদের ছায়া-ঘেরা।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জামরায় কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে, বান্দাহ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর আনুগত্য করলে শয়তান ব্যথিত হয়। এজন্য জামরায় জুতা বা তীর নিক্ষেপের কোন প্রয়োজন নেই। অনেকেই এই সুন্নত বিরোধী কাজকে সওয়াবের কাজ মনে করে ভুল করে বসে। রাসূলুল্লাহ (সা) মিনা, মোযদালেফা এবং আরাফাতকে ডানে ও মক্কাকে বাঁয়ে রেখে জামরাহ আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রত্যেকবার আল্লাহু আকবার বলেছেন।

---

* জামরা অর্থ বিশেষ স্তম্ভ।

জামরায় কংকর নিক্ষেপের তাৎপর্য

মুসীরুল গারামে ইবনে জাওযী থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা শরীফ নির্মাণ শেষ করেন তখন জিবরাইল (আ) এসে তাঁকে তওয়াফের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। তারপর তাঁকে জামরাতুল আকাবায় নিয়ে আসেন। তখন শয়তান হাজির হয়। জিবরাইল (আ) ৭টি পাথরের টুকরা হাতে নেন এবং ইবরাহীম (আ)-কে দেন। জিবরাইল (আ) ইবরাহীম (আ)-কে তাকবীরসহ কংকর নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁরা দু'জনেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত কংকর মারেন এবং তাকবীর বলেন। তারপর তাঁরা মেঝো জামরাহর কাছে আসেন। সেখানেও শয়তান হাজির হয়। তাঁরা দু'জনে জামরাহ আকাবার অনুরূপ করেন। তারপর ছোট জামরাহর কাছে এলে সেখানেও শয়তান হাজির হয়। ফলে তাঁরা দু'জনেই শয়তানের প্রতি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করেন এবং তাকবীর বলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) এর অনুসরণে শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহর এবাদত করাই হচ্ছে কংকর নিক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। সালেম বিন আবু জা'দ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন
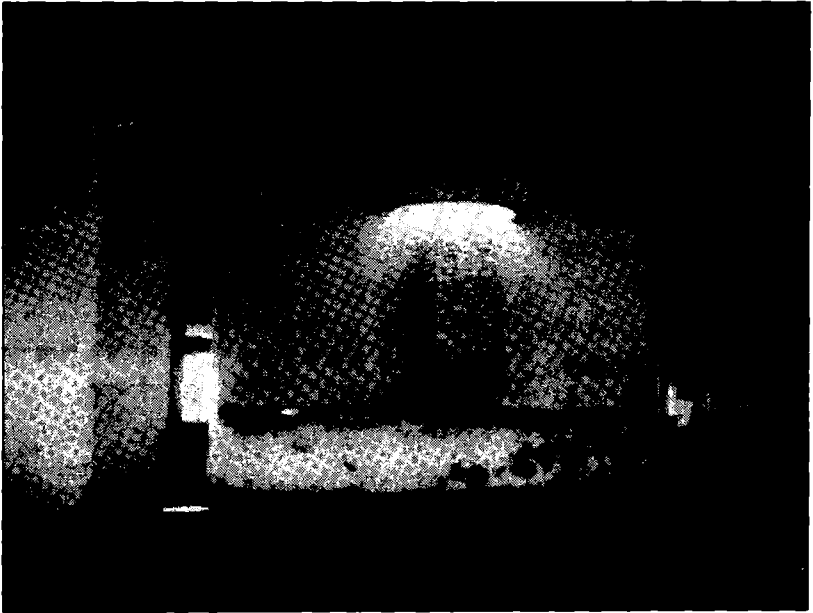
জামরাতুল আকাবা : নীচতলার দৃশ্য
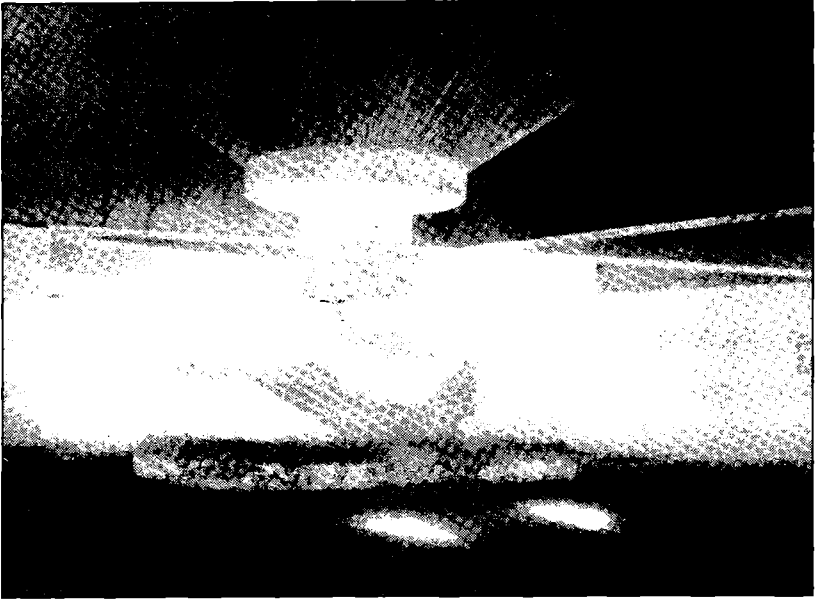
ছোট জামরাহ : নীচতলার দৃশ্য
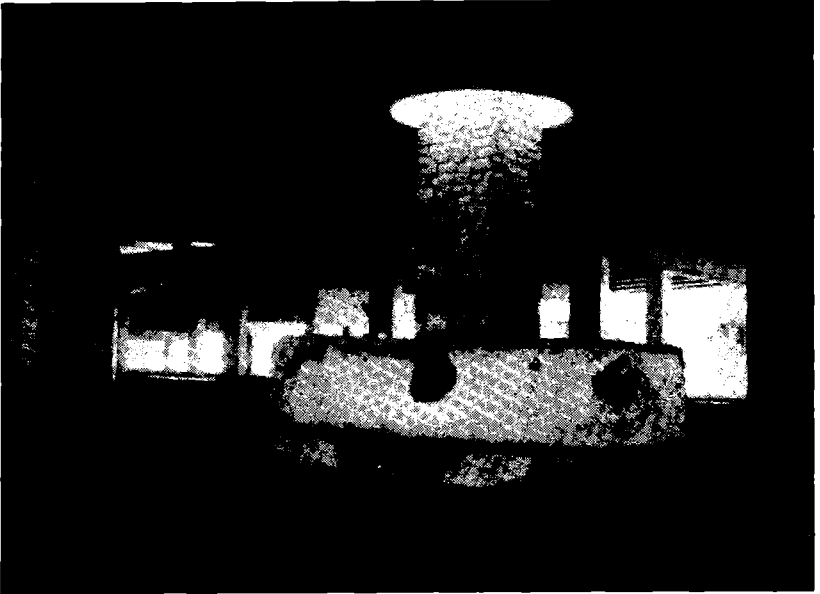
মধ্যম জামরাহ : নীচতলার দৃশ্য

ইবরাহীম (আ) হজ্জের হুকুম পালন করার জন্য আসেন তখন জামরাহ আ'কাবার কাছে শয়তান এসে হাজির হয়। তিনি তার প্রতি ৭টি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করায় সে মাটিতে কুপোকাত হয়ে পড়ে। তারপর মেঝো জামরায় শয়তান হাজির হলে সেখানেও তাকে কংকর মেরে চিতপটাং করে দেন। অনুরূপভাবে, ছোট জামরায় পুনরায় শয়তান আবির্ভূত হলে সেখানেও শয়তানকে কংকর মেরে কাবু এবং ধরাশায়ী করে ফেলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শয়তানকে কংকর মেরে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর। (বায়হাকী)

কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহর গোলামীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা হয় এবং ধোঁকাবাজ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ যে সকল গুনাহ ও অন্যায় কাজ করে তার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে শয়তানকে নিরাশ করে দিয়ে বুঝানো হয় যে, আমরা অতীতে তোর আনুগত্য করলেও ভবিষ্যতে আর তা না করার অঙ্গীকার করছি।

কসাইখানা

মিনা مَنْحَرْ বা কুরবানীর স্থান। যে কোন জায়গায় কুরবানী করলেই কুরবানী হয়ে যাবে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেন যে তিনি তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করছেন। তখন তিনি ইসমাঈলকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলায় ইসমাঈল রাজী হলেন এবং জবেহর জন্য মিনায় আসেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আল্লাহ ইসমাঈল (আ) কে জবেহ না করার হুকুম দেন এবং তার পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানীর নির্দেশ দেন। তখন থেকেই হজ্জের পরের দিন, ১০ই জিলহজ্জ কুরবানীর দিবসে পশু কুরবানীর পদ্ধতি প্রবর্তন হয়।

বর্তমানে মিনায় পশু কুরবানীর স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যাতে করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা না দেয়। ক্রমবর্ধমান হাজীর কারণেও কসাইখানা সুনির্দিষ্ট স্থানে করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে, মোযদালেফার মিনা সীমান্তে দুটো কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে একটিতে ছাগল, দুম্বা ও ভেড়ার বাজার বসে এবং অন্যটিতে গরু, উট ও অন্যান্য বড় বড় প্রাণীর বাজার বসে। আধুনিক পদ্ধতিতে সেখানকার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়।

মিনায় হাদী (কেরান ও তামাত্তু হজ্জের কোরবানী), দম, সদকা ও কোরবানী উপলক্ষে অসংখ্য হাজীর লাখ লাখ জবেহকৃত পশুর গোশত পূর্বে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেয়া ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৪০৩ হিজরীতে, উক্ত গোশতের সদ্ব্যবহারের জন্য, সৌদী সরকার মিনার পূর্ব সীমান্তের পার্শ্বে মোআইসামে একটি আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করে। মুসলিম বিশ্বের উদ্যোগে গঠিত ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক নিজ খরচে তা পরিচালনা করে এবং গরীব মুসলিম দেশসমূহে উক্ত গোশত পাঠায়। হাজীরা ব্যাংক ও বিক্রয় কেন্দ্রসমূহে টিকেট ক্রয়ের মাধ্যমে অগ্রিম পশু কিনে। তাদের নিজেদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সেখানে পশু কোরবানী হয়। প্রতিনিধি না থাকলেও পশু কোরবানী হয়ে যায়। সাধারণতঃ প্রতিনিধিরা সেখানে কমই গিয়ে থাকে। কসাইখানায় একই সাথে হাজার হাজার ছোট পশু অর্থাৎ ভেড়া, বকরী ও দুম্বা রাখার একটি খোঁয়াড় আছে। কসাইখানাটিতে একসাথে অনেক পশু জবেহ করা যায়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোল্ড স্টোরেজের মাধ্যমে এগুলো সাময়িক সংরক্ষণ কর হয়।

সৌদী সরকার ১৪১০ হিজরীতে, মোআইসামে আরেকটি আদর্শ কসাইখানা তৈরি করেছে। এটা আগেরটার চাইতেও বৃহত্তর। এতে ৫ লাখ ছোট পশু অর্থাৎ ভেড়া বকরী ও দুম্বা জবেহর ব্যবস্থা আছে। এ সকল গোশতও গরীব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এছাড়াও ওয়াদী আন্নারে ২০ হাজার বর্গমিটারের উপর প্রাসঙ্গিক সকল সুযোগ-সুবিধাসহ গরু ও উট জবেহর জন্য সৌদী সরকার আরো কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। এটা নির্মিত হলে, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক মোট ৫টি কসাইখানা থেকে প্রতি বছর ১৫ লাখ পশুর গোশত বিশ্বের গরীব মুসলমানদের জন্য পাঠাতে সক্ষম হবে। তখন মিনায় আর কোন পশুর গোশত নষ্ট হবে না।

মিনায় হাজীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে সংকুলান সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায়, আরাফার দিকে যেতে মিনার ডানদিকের পাহাড়ের উপরিভাগ কেটে সমতল করা হয় এবং এতে হাজীদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫ লাখ ঘনমিটার পাহাড়ী এলাকার পাথর কেটে পাহাড়ের উপরের ২০ লাখ বর্গমিটার এলাকা সমতল করা হয়। এতে রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, টয়লেট ও বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়। পাহাড়ের উপরিভাগের দুই সীমান্তে দেয়াল তৈরি করা হয়। পাহাড়ের উপরে আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে হাজীদের জন্য

দুটো আবাসিক এলাকা তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মিনার ভেতর ৯টি সড়ক তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়াও মিনার তাঁবুতে অগ্নি নির্বাপণের জন্য দমকল বাহিনী সদা প্রস্তুত থাকে। বর্তমানে মিনায় স্থায়ীভাবে আগুন প্রতিরোধক বিকল্প তাঁবু প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট জায়গায় হেলিপোর্ট বানানো হয়েছে যেন হেলিকপ্টার সার্ভিসের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ মিনায় সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষ ও অজস্র গাড়ী-ঘোড়া চলাচল ও আবাসিক স্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে, হাজীদের মিনায় অবস্থান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য 'মিনা উন্নয়ন প্রকল্প' সংস্থা মিনায় সুষ্ঠু যোগাযোগ এবং মক্কার সাথে পরিকল্পিত অবাধ যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মিনায় এক বলিষ্ঠ রোড নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই নেটওয়ার্ক মক্কা শহরের ৪টি রিংরোডের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় একদিকে মোযদালেফা এবং আরাফাহ, অন্যদিকে মোআইসাম, আযিযিয়াসহ মক্কার সকল এলাকার মধ্য দিয়ে মসজিদে হারামের সাথে মিনার সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়াও মিনার সাথে জেদ্দা, তায়েফ ও মদীনার সংযোগও স্থাপিত হয়েছে। মিনার রাস্তাগুলো আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে।

হাজীদের তাঁবু নির্মাণের জন্য নির্ধারিত এলাকার আয়তন হচ্ছে, ২৮ লাখ ৪৫ হাজার বর্গমিটার। মিনায় প্রায় ১ লাখ তাঁবু নির্মাণ করা হয়।

মিনা রোড নেটওয়ার্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র স্থানসমূহে মোট ১শ' কিলোমিটারেরও বেশী রাস্তা পাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ মিনায় গাড়ী চলাচলের জন্য নির্মিত রাস্তার মোট আয়তন হচ্ছে, ২৩ লাখ ২৪ হাজার বর্গমিটার। মিনার ভেতর গাড়ীর রাস্তার মোট আয়তন হচ্ছে ৭ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার। ওভারব্রীজসমূহের মোট আয়তন হচ্ছে, ৩ লাখ ৪৫ হাজার বর্গমিটার। পায়ে চলার পথের আয়তন হচ্ছে, ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার। রাস্তা তৈরির উদ্দেশ্যে মোট ২৮টি সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মোট ১৭ কিলোমিটার এবং আয়তন হচ্ছে, ২ লাখ ২৮ হাজার ৩১৮ বর্গমিটার

মিনা রোড নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে ১. প্রধান সড়ক ২. সংযোগ সড়ক–মিনার এপার ওপার ভেদকারী। ৩. পায়ে চলার পথ।

এখন আমরা মিনার প্রধান সড়কগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো ঃ

১. বাদশাহ্ ফাহাদ সড়ক ঃ এটি মিনার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত ও পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এটি মিনার ১নং প্রধান সড়ক হিসেবে বিবেচিত। এটি মোযদালেফার মাশআরুল হারাম- এবাদতের সম্মানিত স্থানের উত্তর পাশ হয়ে মিনার উত্তর পাশ দিয়ে মসজিদে হারামের নিকট শে'বে আমের ও শে'বে আলী পর্যন্ত পৌছেছে। এর দৈর্ঘ্য ৮.৫ কিলোমিটার ও প্রস্থ ৩১.২০ মিটার। প্রতিদিকে ৩টি করে দুই দিকে গাড়ী চলার জন্য মোট ৬টি ট্র্যাক আছে। এর মাঝে ২মিটার চওড়া আইল্যাণ্ড আছে। এটি মক্কার ৪টি রিং রোডের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এটি মিনায় 'তরীক বাদশাহ্ আবদুল আযীয' প্রধান সংযোগ সড়কের ওভারব্রীজের নীচে গিয়ে মিশেছে। পরে সেখান থেকে ২য় সংযোগ সড়ক বাদশাহ্ খালেদ ওভারব্রীজের নীচ দিয়ে এবং হাজারুল কাবস এলাকার উপর দিয়ে ৮০০ মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ হয়ে ময়দানে আদলের ওভারব্রীজের সাথে গিয়ে মিশেছে। অপর দিকে এটা ২য় নেটওয়ার্ক দ্বারা শোয়াইবিন এলাকার সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে গোটা মিনা ও মক্কার সকল এলাকার সাথে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। ময়দানে আ'দল থেকে আযিযিয়া ক্রসিং দিয়ে ফয়সলিয়া হয়ে একটা ওভারব্রীজ দ্বারা ৯৫০ মিটার লম্বা দ্বিমুখী সুড়ঙ্গের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ঐ সুড়ঙ্গ পথটি শে'বে আমের পর্যন্ত গিয়ে মক্কার অভ্যন্তরীণ ২য় রিং রোডের সাথে মিশেছে। সেখান থেকে তা হারামের চারপাশে নির্মিত ১ম রিং রোডের সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

২. বাদশাহ্ আবদুল আযীয সড়ক ঃ এটি মিনার দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ২য় বৃহত্তম সড়ক। এটি মক্কার বাইরের ৪র্থ রিংরোডের সাথে সংযুক্ত। এটি মিনার ১ম সংযোগ সড়ক তরীক মালেক আবদুল আযীয ও ২য় সংযোগ সড়ক বাদশাহ্ খালেদ ওভারব্রীজের নীচ দিয়ে এসে মসজিদে হারামের পার্শ্ববর্তী ২য় ও ১ম রিংরোডের সাথে মিলিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৯.৫ কিলোমিটার এবং প্রশস্ততা হচ্ছে ৩১.২০ মিটার। দুই দিকের প্রতি সড়কে ৩টি করে মোট ৬টি গাড়ীর ট্র্যাক আছে। এই রোডে মোট ৫টি ওভারব্রীজ ও ২টি সুড়ঙ্গ আছে। প্রতিটি সুড়ঙ্গ ১৪ মিটার চওড়া।

এবার আমরা সংযোগ সড়ক সম্পর্কে আলোচনা করবো ঃ

১. তরীক মালেক আবদুল আযীয ঃ এটি মিনার প্রথম ও প্রধান সংযোগ সড়ক হিসেবে বিবেচিত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে এপার ওপার ভেদকারী। এটি

মোযদালেফা ও মিনা থেকে মোআইসাম পর্যন্ত গিয়েছে এবং মক্কা শহরের বাইরের রিং রোড তথা মক্কা ৪র্থ রিং রোডের সাথে গিয়ে মিশেছে। মিনায় এটিকে বাদশাহ আবদুল আযীয অভারব্রীজও বলা হয়। এর দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার ও প্রস্থ ৩১.২০ মিটার। এর প্রতি দিকে ৩টি করে দুই দিকের রাস্তায় মোট ৬টি গাড়ীর ট্র্যাক আছে। এতে ৬টা ওভারব্রীজ আছে। এগুলোর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১ হাজার ৬৭৫ মিটার। এতে মোট ২টি সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গগুলো দ্বিমুখী। সুড়ঙ্গের প্রতিদিকের দৈর্ঘ্য ৩৫০ মিটার ও প্রস্থ ১৪ মিটার।

২. বাদশাহ খালেদ ওভারব্রীজ রোড ঃ এটি মিনার ২য় বৃহত্তম সংযোগ সড়ক। এটিও উত্তর-দক্ষিণমুখী এবং মিনার এপার ওপার ভেদকারী। এই রাস্তা তৈরির লক্ষ্য হল, জামরাহ এলাকা থেকে গাড়ীর গতি পরিবর্তন করে তাকে আযিযিয়া এবং মোআইসামের দিকে বের করে দেয়া। এটি দক্ষিণের সাওর পর্বত থেকে উত্তরে মোআইসাম কসাইখানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এটিও মক্কার বাইরের ৪র্থ রিং রোডের সাথে গিয়ে মিশেছে। এর দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার। প্রতিদিকে ৩টি করে দুইদিকে মোট ৬টি গাড়ীর ট্র্যাক আছে। এতে দুটো ওভারব্রীজ আছে। একটি মিনার ভেতর এবং অন্যটি আযিযিয়ায়। এছাড়াও এতে ৮টি সুড়ঙ্গ আছে।

১নং পায়ে চলার পথ ঃ এবার আমরা পায়ে চলার পথ সম্পর্কে আলোচনা করবো। মিনায় পায়ে চলার পথ ২টা। এই পথ দুটি মোযদালেফা এবং আরাফাতের সাথে গিয়ে মিশেছে। প্রত্যেকটার প্রশস্ততা হচ্ছে, ৩০ মিটার। ১নং ও প্রধান রাস্তাটি আরাফাত থেকে মোযদালেফা এসে এক রাস্তায় পরিণত হয়েছে। একসাথ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তা ৩০ মিটার চওড়া এবং মিলিত হওয়ার পর মিনার প্রবেশ মুখে রাস্তাটির প্রশস্ততা দাঁড়িয়েছে ৬০ মিটারে। কিন্তু পড়ে তা সরু হয়ে মিনা উপত্যকার মাঝে ৩০ মিটার প্রশস্ততা নিয়ে জামরাহ পর্যন্ত এসেছে। সেখান থেকে মসজিদে হারামে পৌঁছেছে। মিনা-মোযদালেফা সীমান্ত থেকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ হচ্ছে, ৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩ কিলোমিটার মিনার ভেতর এবং অবশিষ্ট ৪ কিলোমিটার জামরাহ থেকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত। মিনা থেকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত এটিই হচ্ছে সবচাইতে সংক্ষিপ্ত রাস্তা। এতে গাড়ী চলাচল করেনা। এর ফলে মিনা থেকে মসজিদে হারামের দূরত্ব অর্ধেক কমে গেছে। এই রাস্তা তৈরির আগে মিনা থেকে মসজিদে হারামের দূরত্ব ছিল ৮ কিলোমিটার। কিন্তু এই রাস্তা তৈরির জন্য শে'বে আলী-জিয়াদ সুড়ঙ্গ এবং জিয়াদ-মাহবাসুল জ্বিন

সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়। তারপর জামরাহ-আযিযিয়া পাহাড় ঘেষে রাস্তা তৈরির ফলে, দূরত্ব অর্ধেক কমে আসে। সুড়ঙ্গের মধ্যকার পথ ছায়াদার। তাই সুড়ঙ্গের বাইরের রাস্তাকে প্রথম পর্যায়ে মাহবাসুল জ্বিন থেকে মিনার শেষ সীমা পর্যন্ত এয়ারকণ্ডিশন শেড দ্বারা ছায়াদার বানানো হয় এবং ২য় পর্যায়ে, মোযদালেফা থেকে আরাফাত পর্যন্ত একে এয়ারকণ্ডিশন শেড দ্বারা ছায়াদার বানানো হয়। এর ফলে, হাজীরা সূর্যতাপে আক্রান্ত হওয়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পায়। এই রাস্তাটি মিনার দুটো এবং মোযদালেফার একটি ওভারব্রীজের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছে এবং ৪টা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করেছে।

২নং পায়ে চলার পথ ঃ এটি মিনা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল, উত্তরাঞ্চলের শুয়াইবিন এবং মোআইসামের আধুনিক কসাইখানা এলাকার লোকদের জামরায় আসার সুবিধে সৃষ্টি করেছে। এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৪ শ' মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার। এতে সুড়ঙ্গ সংখ্যা হচ্ছে ৩টি। সুড়ঙ্গগুলোর দৈর্ঘ্য ১ হাজার ২৬ মিটার ও প্রস্থ ১২.৫ মিটার।

পানি সেবা

পানিহীন মিনা উপত্যকায় হজ্জের সময় লক্ষ লক্ষ হাজী ও অন্যান্য মানুষের ভীড় হয়। ১৪০৯ হিজরীতে, সৌদী আরবের বাহির থেকে আগত হাজীর সংখ্যা ৭ লাখ ৭৫ হাজার এবং ভেতর থেকেও প্রায় অনুরূপ পরিমাণ লোক হজ্জে অংশগ্রহণ করে। হাজীদের সেবার জন্য বিরাট সংখ্যক লোকের উপস্থিতিসহ মিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। এত বিপুল সংখ্যক হাজীদের জন্য প্রায় সপ্তাহ খানেক যাবত পানির ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য হলেও তা অত্যন্ত জরুরী। তাই মিনা, মোযদালেফা ও আরাফাতে ৩০টি পানির রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে এবং এগুলোতে হজ্জের সময় পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা হয়।

এখন আমরা মিনার পানি সরবাহের উদ্দেশ্যে নির্মিত কিছু সংখ্যক পানির রিজার্ভার সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. মোআইসাম রিজার্ভার ঃ এতে ১০ লাখ ঘনমিটার পানি ধরে। তাই একে 'মিলিয়ন রিজার্ভার'ও বলে। এটা সায়েলের রাস্তা থেকে মিনায় যাওয়ার সময় ডানদিকে মুআইস নামক স্থানে সাগরের স্তর থেকে ৪৪৯ মিটার উপরে অবস্থিত। এর ভিত্তি ও ছাদ কংক্রিটের তৈরী এবং তা তিনদিকে পাহাড় বেষ্টিত। এই

রিজার্ভারটি আধুনিক প্রকৌশলের একটি উন্নত উপহার। এর ছাদ তৈরীতে সর্বাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ছাদটিকে বাহির থেকে তারের মাধ্যমে ঝুলন্ত পুলের মত মনে হয়। এটাকে ওভারব্রীজ তৈরীর পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়েছে। এর সাথে মক্কায় প্রাকৃতিক পানির উৎস হিসাবে সাওলা ও মাদীক থেকে পানি আনার সংযোগ লাইন দেয়া হয়েছে। মিনার শোয়াইবিয়া পানি প্রকল্পের পাম্প স্টেশন থেকেও এতে পানি আনা হয়। এখান থেকে মক্কা শহরেও পানি সরবরাহ করা হয়।

২. জো'রানা রিজার্ভার ঃ এতে ৬ লাখ ঘনমিটার পানি ধরে। এটি সাগরের স্তর থেকে ৪৪৮ মিটার উপরে তায়েফ-সায়েল রোড থেকে জোরানাগামী রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত এবং তিনদিক থেকে পাহাড় বেষ্টিত । এর ছাদ পাকা স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং তার দিয়ে ছাদকে ১৬টি পিরামিডের আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে। রিজার্ভারটির দৈর্ঘ্য ৭৫০ মিটার প্রস্থ ৩৫০ মিটার ও গভীরতা ২৬ মিটার। পাইপ দিয়ে সাওলা, মাদীক ও বনি ওমাইর মাওর উপত্যকা থেকে সরবরাহ লাইন আনা হয়েছে এবং তায়েফ নোমান রাস্তায় অবস্থিত শোয়াইবিয়া লবণমুক্ত মিষ্টিপানি প্রকল্পের লাইনের সাথে এর সংযোগ দেয়া হয়েছে। এই রিজার্ভার থেকে পাইপের মাধ্যমে মিনার আলবাইয়া রিজার্ভার বাদশাহ ফাহাদ সড়কের রিজার্ভারসমূহ এবং সেখান থেকে শোয়াইবিন রিজার্ভারসমূহে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্য আরেক লাইনের মাধ্যমে সেখান থেকে মক্কার মুলকিয়া রিজার্ভারেও ১০ হাজার ঘনমিটার পানি সরবরাহ করা হয়। এই সকল রিজার্ভারের পানি বিশুদ্ধ করার জন্য বিশুদ্ধকরণ ইউনিট কায়েম করা হয়েছে।

৩. দুই নম্বর মোআইসাম রিজার্ভার ঃ এই রিজার্ভারে ৯০ ঘনমিটার পানি ধরে। এটি মিনা যাওয়ার সময় হাতের ডানে মোআইস পাহাড়ের শীর্ষে সাগরের স্তর থেকে ৪৭৫ মিটার উপরে অবস্থিত। ১৪০০ হিজরী থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। পাইপের মাধ্যমে সাওলা ও মাদীক থেকে এতে পানি সরবরাহ করা হয়। এতে দৈনিক ৬ হাজার ঘন মিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এতে শোয়াইবিয়া মিষ্টি পানি প্রকল্পের পানি 'রাবওয়া-মিনা' রিজার্ভার থেকে পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এই রিজার্ভারের পানিসহ মিনা-মোযদালেফা এবং আরাফাতের পবিত্র স্থানসমূহের বড় বড় রিজার্ভারের পানি বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. রাজপ্রাসাদ রিজার্ভার ঃ মিনার রাজপ্রসাদে পানি সরবরাহের জন্য এবং তা মসজিদে খায়েফের পশ্চিমে সাগরের স্তর থেকে ৪৪৩ মিটার উপরে অবস্থিত। এতে ২০ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। ১৪০৫ হিজরীতে তা চালু হয়। এইটা থেকে রাজপ্রাসাদ ও মসজিদের খায়ফে পানি সরবরাহ করা হয়।

৫. শোয়াইবিন রিজার্ভার ঃ এটি সাগরের স্তর থেকে ৩৭৬ মিটার উপরে মিনার আশ শোয়াইর আল কবীর এলাকার পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এতে ২০ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। এটির উচ্চতা ৬ মিটার, দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং তা কংক্রিটের তৈরী ও চতুর্ভুজ। পাইপের মাধ্যমে মাদীক থেকে এতে পানি সরবরাহ করা হয়। এর পানিও বিশুদ্ধ করা হয়।

৬. মালকান রিজার্ভার ঃ এটি মোযদালেফা থেকে মিনায় প্রবেশের সময় মিনার পশ্চিম দিকের পাহাড়ের চূড়ায় সাগরের স্তর থেকে ৩৮৬ মিটার উপরে অবস্থিত। ১৪০৭ হিজরীতে ৪০ হাজার ঘনমিটার পানি ধারণ সম্পন্ন এই রিজার্ভারটি চালু করা হয়। এর দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার উচ্চতা ৬ মিটার। আগে মালকান উপত্যকা থেকে এতে পানি সরবরাহ করা হত বলে একে মালকান রিজার্ভার বলা হয়। চওড়া পাইপ দ্বারা শোয়াইবিয়া পানি প্রকল্পের পানি এতে সরবরাহ করা হয়। এর পানি বিশুদ্ধ করা হয়।

৭. বাদশাহ ফাহাদ রাবওয়া মিল রিজার্ভার ঃ এতে ৪০ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। এই কসাইখনা দক্ষিণের পাহড়ের চূড়ায় সাগরে স্তর থেকে ৩৮৮ মিটার উপরে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার এং উচ্চতা ৬ মিটার। বর্গাকৃতির এই রিজার্ভারটি ১৩৯২ হিজরীতে চালু করা হয়। শোয়াইবিয়া মিষ্টি পানি প্রকল্পের লাইন থেকে এতে পানি আনা হয়। জমুম, নোমান উপত্যকা ও রাহজান উপত্যকা থেকে অপর একটি পাইপ দ্বারা এই রিজার্ভারে পানি আনা হয় আবার এই রিজার্ভার থেকে তিনটি পানি সরবরাহকারী প্রধান লাইনের মাধ্যমে পানি বন্টন করা হয়। ৭০০ মিলিমিটার পাইপের মাধ্যমে আযিযিয়া এলাকায়, ২য় একটি লাইন দ্বারা কওয়াশেক রিজার্ভার এবং ৩য় আরেকটি লাইন দ্বারা মিনার আরেকটি রিজার্ভারে পানি সরবরাহ করা হয়। এতে পানি বিশুদ্ধ করার জন্য একটি বিশেষ ইউনিট আছে।

৮. বাইআহ রিজার্ভার ঃ এখানে দুটো রিজার্ভার আছে। এই দুটো মিনার শেষ সীমান্তে জামরার কাছে অবস্থিত। প্রতিটিতে ১০ হাজার ঘনমিটার করে দুটোতে

মোট ২০ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। নীচু রিজার্ভারটি সাগরের স্তর থেকে ৩৮০ মিটার উপরে এবং উঁচু রিজার্ভারটি ৪১৬ মিটার উপরে অবস্থান করছে। এগুলো বর্গাকৃতির এবং কংক্রিটের তৈরি। প্রতিটার দৈর্ঘ্য ৩৫ মিটার ও উচ্চতা ৬ মিটার। ১৩৯২ হিজরীতে এগুলো চালু করা হয়। সাওলা থেকে জাওয়াফা রিজার্ভারে আগত লাইন থেকে এতে পানি আনা হয়। বর্তমানে রাবওয়া-মিনা রিজার্ভার থেকেও এতে পানি আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯. মসজিদে খায়ফ রিজার্ভার ঃ এতে দু'টো রিজার্ভার আছে। ভূগর্ভস্থ রিজার্ভারটিতে ৬ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে এবং বাইরের রিজার্ভারটিতেও আরো ৬ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে।

১০. ২ নং শোয়াইবিন রিজার্ভার ঃ এতে দু'টো রিজার্ভার আছে। প্রতিটিতে তিন হাজার ঘনমিটার করে মোট ৬ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। মিনায় সর্বমোট ১৮টি রিজার্ভার আছে।

মিনায় আগে যখন এ সকল ব্যবস্থা ছিলনা, তখন পানি সমস্যা কত মারাত্মক ছিল তা ভালভাবে বুঝা যায়। বর্তমানে সেখানে পানির কোন সংকট নেই।

গরমের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি সরবরাহের জন্য বহু পানির কুলার বসানো হয়েছে। সেগুলো থেকে হাজীরা ঠাণ্ডা পানি পান করে। এ ছাড়াও বাদশাহ ফাহাদ পানি প্রকল্প থেকে হাজীদের উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা পানি বন্টন করা হয়।

১৪০৩ হিজরীতে, মিনায় পানির নেটওয়ার্ক কাজের সমাপ্তি হয় এবং ঐ নেটওয়ার্ক মিনা উপত্যকা, শোআইবিন উপত্যকা, মিনার পাহাড়, জামরাহ এলাকা, মসজিদে খায়ফের পার্শ্ববর্তী পাহাড়, কাবশ ওভারব্রীজসহ বিরাট এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়াও মোআইসামের আধুনিক কসাইখানা এলাকা পর্যন্ত শারায়ে'তে অবস্থিত পানির সংরক্ষণাগার থেকে পাইপ লাইন বসানো হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। পানি নেটওয়ার্কের মধ্যে পানি সরবরাহ লাইন, ময়লা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বৃষ্টি ও বন্যার পানি নিষ্কাশন পয়ঃনালা, সুয়েরেজ লাইন, পরিচ্ছন্নতা কেন্দ্র, পান করার পানি বিশুদ্ধকরণ এবং হিমায়িতকরণের জন্য ৪টি কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে অন্যতম।

১৪০৩ হিঃ, ১ম দফায় বাদশাহ খালেদ এবং বাদশাহ আবদুল আযীয ওভারব্রীজের মধ্যবর্তী এলাকায় ৫ হাজার টয়লেট এবং ১৪০৪ হিঃ, শোআইবিন এলাকায় আরও

কয়েক হাজার টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও পাহাড়ের উপর অতিরিক্ত ১৮০০ টয়লেট তৈরি করা হয়েছে। মোট টয়লেটের সংখ্যা হচ্ছে ১৬ হাজার। অজুর জন্য চুম্বক কল নির্মাণ করায় হাত বাড়ানোর সাথে সাথে পানি পড়া শুরু হয়। হাতে কল ঘুরানোর দরকার হয় না।

হজ্জের সময় মিনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বাজার এং হোটেল বসে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও খাদ্য এবং পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে থাকে।

তাঁবুতে অগ্নিকান্ড না ঘটার লক্ষ্যে বর্তমানে হাজীদেরকে পৃথক পৃথক রান্না করতে দেয়া হয় না। মোতাওয়েফরা রান্না করে খাওয়ায় এবং হাজীদের থেকে খাবারের মূল্য গ্রহণ করে।

মিনা উন্নয়ন প্রকল্প

১৩৯৫ হিজরীতে, সৌদী সরকার মক্কার পবিত্র স্থানসমূহের উন্নয়নের জন্য মিনা উন্নয়ন প্রকল্প নামক সংস্থাটি কায়েম করে। এই সংস্থা মিনা মোযদালেফাহ, আরাফাহ এবং মিনার সাথে সংশ্লিষ্ট মক্কার অন্যান্য স্থানের উন্নয়নের জন্য এযাবত বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে সুড়ঙ্গ, ওভারব্রীজ, আদর্শ কসাইখানা, পানির বিরাট রিজার্ভার নির্মাণ, আবাসিক এলাকা তৈরির উদ্দেশ্যে মিনার পাহাড়ের উপরিভাগ সমতলকরণ এবং জামারাহর ওভারব্রীজ সম্প্রসারণ অন্যতম। ভবিষ্যতেও সংস্থা আরো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনা নিচ্ছে।

মিনায় প্রায় বছর তাঁবুতে আগুন লাগে। তাই সৌদী সরকার মিনায় তাঁবুর পরিবর্তে হাজীদের আবাসিক বিল্ডিং তৈরির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক কিছু বিল্ডিং তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। এই পরিকল্পনা সফল প্রমাণিত হলে গোটা মিনায় বহুতল বিশিষ্ট বিল্ডিং নির্মাণ করার সম্ভাবনা আছে।

সৌদী সরকার মিনা, মোযদালেফা ও আরাফাতের উন্নয়নের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে। ঐ পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ২০০5 সাল পর্যন্ত ৩০ লাখ হাজীদের সুযোগ সুবিধে নিশ্চিত করা। পরিকল্পনায় তিনটি পবিত্র স্থানকে ১০টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। সংযোগ সড়কের মাধ্যমে প্রতি জোনের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় ৪০% হাজীকে পদব্রজ বিবেচনা ধরে তাদের চলাচলের সুবিধে নিশ্চিত করা হবে। মসজিদে হারাম থেকে মিনা,

মোযদালেফা এবং আরাফাত পর্যন্ত আরেকটি প্রধান পায়ে হাঁটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে এরকম রাস্তার সংখ্যা হচ্ছে ১টি। অবশিষ্ট হাজীদেরকে গাড়ীর যাত্রী হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমানে ১তলা বাসের পরিবর্তে দোতলা বাস চালু করা হবে। এর ফলে যানজট হ্রাস পাবে।

মিনায় ৩টি প্রধান হাঁটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মিনায় আরও ৩০ হাজার টয়লেট, ৩০ হাজার পানিকেন্দ্র, ৩৩টি ক্লিনিক, ২০টি হাজী 'হারানো প্রাপ্তি' কেন্দ্র, ২৮টি পুলিশ ও ট্রাফিক ফাঁড়ি, ৫৬টি বেসামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, ২৫ হাজার টেলিফোন লাইন এবং ৬ হাজার খাবার দোকান প্রতিষ্ঠা করা হবে।

জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময় ভীড়ে প্রায়ই হাজী মারা যায়। সেই কারণে জামরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মওজুদ ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে জামরা এলাকা সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মিনায় পানি ও বিদ্যুত সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হবে।

মোযদালেফা

মিনার উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে মোযদালেফার উন্নয়ন করা হবে। মোযদালেফায় হাজীদের বিশ্রামের জায়গা ও পায়ে হেঁটে চলা হাজীদের রাস্তা তৈরি করা হবে। এছাড়া গাড়ী পার্কিং এর অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধে নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও পানি, টয়লেট, ক্লিনিক, হাজী হারানো-প্রাপ্তি কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সুযোগ বৃদ্ধি হবে।

আরাফাত

মিনা ও মোযদালেফার আঙ্গিকে আরাফাতকে ১০টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। ৮টি জোন গাড়ীতে আগমনকারী হাজী, একটি পায়ে হেঁটে আসা হাজী এবং অন্যটি সরকারী বিভাগের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট আছে। ২০০৫ খৃঃ, আরাফাতে ২৪,৬০০ টয়লেট, ১৮,৫০০ পানি কেন্দ্র, ৬৫টি ক্লিনিক, ৪টি হাসপাতাল, ২০টি হারানো-প্রাপ্তি হাজী কেন্দ্র, ১০টি প্রধান ট্রাফিক ও নিরাপত্তা পুলিশ কেন্দ্র, ২টি পুলিশ ফাঁড়ি, একটি বেসামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, ৩৭০০ খাবার দোকান এবং ২৫০০ টেলিফোন লাইন বসানো হয়েছে।

পানি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য মওজুদ পানি লাইনের সাথে সংযোগ লাইনসহ অতিরিক্ত রিজার্ভার নির্মাণ করা হবে।

আরাফাহ

আরাফাহ এবং আরাফাত এই দুটো শব্দই আরবীতে প্রচলিত আছে। আরাফাহ বা আরাফাত হচ্ছে, দুই মাইল দৈর্ঘ্য এবং দুই মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি বিরাট সমতল ময়দানের নাম। এটি ৩ দিকেই পাহাড় বেষ্টিত ধনুকাকৃতির এবং এর দক্ষিণ পাশ নতুন মক্কা-হাদা-তায়েফ রিং রোডে অবস্থিত। এই রোডের দক্ষিণ পাশেই আবেদীয়া উপত্যকায় নতুন উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয় নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরাফাতের উত্তর সীমান্তে রয়েছে সাদ পাহাড়। সেখান থেকে আরাফাত সীমান্ত পশ্চিমে আরও এক হাজার মিটার। সেখান থেকে দক্ষিণে নামেরার সাথে গিয়ে আরাফাত সীমান্ত শেষ হয়েছে।

এই ময়দানেই ৯ই জিলহজ্জ হাজীরা অকুফে আরাফাহ করে। অকুফে আরাফাহ হজ্জের অন্যতম ফরজ এবং রোকন।

মক্কার মোয়াল্লা থেকে আরাফাতের মক্কা সংলগ্ন পশ্চিম সীমান্তের দূরত্ব সাড়ে ২১ কিলোমিটার। ঠিক এই পশ্চিম সীমান্তেই, আরাফাতের সীমানা শুরুর স্থানে দু'টো পিলার নির্মাণ করা হয়েছে, অবশিষ্ট তিনদিকের সীমান্তেও পিলার নির্মাণ করা হয়েছে। আরাফাহ সাগরের স্তর থেকে ৭৫০ ফুট উপরে অবস্থিত। আরাফার

আরাফাতের ময়দান

সকল অংশই حَلٌّ অর্থাৎ হারাম এলাকার (حُدُوْدُ حَرَمْ) বাইরে।

হারাম সীমানা যেখানে শেষ, সেখানেই আরাফাতের সীমানা শুরু হয়েছে। আরাফার পশ্চিমে এবং পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত উপত্যকাটির নাম হচ্ছে ওরানা। এই ওরানা হারাম এলাকার ভেতর অন্তর্ভুক্ত। ওরানার পশ্চিম সীমান্ত হচ্ছে মোযদালেফা। ওরানা বিরাট এক উপত্যকার নাম। পূর্বে মসজিদে নামেরা ওরানার মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের মসজিদে নামেরার পশ্চিমের অর্ধেক ওরানায় এবং পূর্বের অর্ধেক আরাফাতে অবস্থিত। মসজিদের পশ্চিম দিকে বের হওয়ার কোন দরজা নেই। মসজিদের পূর্বের অর্ধাংশে অবস্থান করলে অকুফে আরাফাহ হয়ে যাবে। আরাফাহর সাথে হারাম সীমান্তের দুটো পিলার আছে।

পিলারের পূর্বে আরাফাত এবং পশ্চিমে হারাম এলাকা।

রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নামেরায় খোতবা দেয়ার পর জোহর এবং আসরের নামাজ একসাথে পড়েন এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি আরাফাতে অকুফ (অবস্থান) করেন।

আরাফাহ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ - (بقره : ١٩٨)

অর্থ ঃ 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসবে।'

মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং ইমাম আহমদ জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি এখানে জবেহ করেছি। মিনার সর্বত্রই জবেহ করা যায়। তোমরাও কুরবানী কর। আমি এখানে অকুফ করেছি। আরাফাহর সর্বত্র অকুফের স্থান। মোযদালেফার সর্বত্রই অকুফের স্থান।

আরাফাহর যে কোন জায়গায় ৯ই জিলহজ্জ দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে এবং জেনে বা না জেনে অবস্থান করলেই অকুফ হয়ে যাবে। হযরত আবদুর রহমান বিন ইয়ামার আদদাইলী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে নাজদ থেকে আগত কিছু লোক প্রশ্ন করল যে, হজ্জ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন হজ্জ হচ্ছে অকুফে আরাফাহ! যে ব্যক্তি মোযদালেফার রাত্রে সোবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত আরাফাতে আসবে তার অকুফ হয়ে যাবে এবং হজ্জ শুদ্ধ হবে। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, হাকেম, বায়হাকী)।

অকুফের সময় হচ্ছে, ৯ই জিলহজ্জ তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে মোযদালেফার রাত্রির সোবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ ফজরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত। এটাই হানাফী, শাফেঈ, মালেকী মাজহাব এবং অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদার সবাই দুপুরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর অকুফ শুরু করেন। ইমাম আহমদের মতে, অকুফে আরাফার সময় হচ্ছে, ৯ই জিলহজ্জের ফজর থেকে মুযদালেফার রাত কুরবানীর দিনের ফজর শুরুর আগ পর্যন্ত। দিন এবং রাত্রের যেকোন সময় আরাফায় অকুফ করলে হজ্জ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং বায়হাকী মোদাররিস আত-তাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে মোযদালেফায় ফজরের নামায পড়েছে, আমরা মিনায় রওনা দেয়ার আগ পর্যন্ত অকুফ করেছে এবং ইতিপূর্বে আরাফায় রাত বা দিনে অকুফ করেছে, তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়েছে। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম আহমদ ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাজকে তাঁর বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, তিনি নিজে সূর্য হেলার পর আরাফাতে অকুফ করেছেন। তাই এটিই অকুফের প্রথম সময়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জ সংক্রান্ত মাসআলা গ্রহণ কর। অকুফের সর্বশেষ ওয়াক্তের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ হচ্ছে, অকুফের ওয়াক্ত শুরুর ব্যাপারে। অকুফে আরাফার পেছনে যে হেকমত কাজ করে তা হচ্ছে, হাজীরা আরাফাতে আল্লাহর ভয় এবং আশা ভরসা নিয়ে হাজির হয়। আল্লাহর কাছে তাদের কবুল কিংবা বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই মহান দিবসে তারা হাশরের বিচার দিনকে স্মরণ করবে। কেননা, এটি হাশরের ময়দানের একটি ছোট নমুনা। হাশরের দিন বহুলোক সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে মুসলমানরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নমুনা তুলে ধরে এবং তাদের ইমাম বা নেতা তাদের সামনে পারলৌকিক সৌভাগ্য এবং চিরন্তন হেদায়েতের ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করেন। এই সবের আলোকে তারা ইচ্ছা করলে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের ব্যাপারে আরো অনেক বেশী উপকৃত হতে পারে।

আরাফাতের ফজীলত

আরাফাতে অবস্থান করা আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন–

'আরাফাতের দিন ছাড়া আর অন্য কোন দিন, এত বেশী বান্দাহকে আল্লাহ দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেন না। সেদিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন, ফেরেশতাদের কাছে গর্ব-অহংকার করেন এবং বলেন, আমার এই বান্দাহগণ কী চায়?

মোয়াত্তা ও হাকেম হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আরাফাতের দিন আল্লাহর রহমত নাজিল এবং বান্দাহর বড় বড় গুনাহসমূহ মাফ হতে দেখে শয়তানকে অন্য কোনদিন এত বেশী ছোট, নাজেহাল, অপমানিত, ঘৃণিত ও রাগান্বিত হতে দেখা যায়নি, তবে অনুরূপ শুধু বদর যুদ্ধের দিন দেখা গিয়েছিল।' প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! বদর যুদ্ধের দিন শয়তান কী দেখে ঐরকম হয়েছিল? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, 'শয়তান দেখেছিল যে জিবরীল (আ) ফেরেশতাদেরকে পরিচালনা করছেন।'

আরাফাতের ফজীলত সম্পর্কে হযরত জাবের (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

'জিলহাজ্জ মাসের ১ম ১০ দিনের চাইতে আর কোন উত্তম দিন নেই।' তখন একজন লোক জিজ্ঞেস করল ঃ হে রাসূলুল্লাহ! এই দিনগুলো উত্তম, নাকি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে সমপরিমাণ দিন উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের সমপরিমাণ দিনের চাইতে এগুলোই উত্তম। আল্লাহর নিকট আরাফাতের দিবসের চাইতে উত্তম কোন দিন নেই।

এই দিন আল্লাহ ১ম আসমানে নেমে আসেন এবং আকাশের ফেরেশতাদের কাছে যমিনের অধিবাসীদের সম্পর্কে গর্ব করেন। তিনি বলেন ঃ 'তোমরা আমার বান্দাহদের প্রতি তাকাও, তারা ধূলা-মলিন ও রৌদ্রদগ্ধাবস্থায় দুনিয়ার সকল প্রান্ত থেকে আমার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছে, তারা আমার কাছে রহমত প্রত্যাশা করে, অথচ তারা আমার আযাব দেখেনি।' আরাফাত দিবস অপেক্ষা অন্য কোনদিন এত বেশী সংখ্যক লোককে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি দিতে দেখা যায় না। (বায়যার, আবু ইয়ালা, ইবনে খোযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

তবে ইবনে খোযায়মা আরো একটু বাড়িয়ে বলেছেন, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি ঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।' ফেরেশতারা বলবে ঃ তাদের মধ্যে অমুক অমুক ব্যক্তি পাপী রয়েছে। তখন আল্লাহ জবাবে বলবেন, 'আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।'

ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী আবদুল্লাহ বিন কের্নানাহ বিন আব্বাস বিন মেরদাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহর পিতা তাঁর দাদা আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আরাফাত দিবসের বিকেলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ উম্মতের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দোয়া কবুল হল, কিন্তু আল্লাহ বলেন, আমি জালেমকে ক্ষমা করলাম না বরং তার কাছ থেকে মজলুমের অধিকার আদায় করে ছাড়বো। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় ফরিয়াদ করলেন, হে রব! আপনি চাইলে মজলুমকে বেহেশত দিতে পারেন এবং জালেমকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু আরাফাতের বিকেলে ঐ দোয়া কবুল হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে মোযদালেফায় পৌঁছে পুনরায় ঐ দোয়া করলেন। এবার তাঁর দোয়া কবুল হল। রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসলেন। তখন হযরত আবু বকর এবং উমর (রা) বলেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনার জন্য আমাদের মাতা-পিতা কোরবান হউক; এই সময়েতো আপনার হাসার কথা নয়। কেন আপনি হাসলেন, আল্লাহই আপনাকে হাসিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ আল্লাহর দুশমন ইবলিশ যখন জানতে পারল যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মতের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, তখন সে নিজ মাথায় মাটি নিক্ষেপ শুরু করল এবং তার ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য আহ্বান জানাল। আমি তার এই কষ্ট ও পেরেশানী দেখে হেসেছি। বায়হাকী বলেছেন এই হাদীসের সমার্থক আরো অনেক হাদীস আছে। সেগুলো তিনি كِتَابُ الْبَعْث-এ উল্লেখ করেছেন।

ইবনে মোবারক উত্তম সনদ সহকারে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতে সূর্যাস্তকালীন সময়ে হযরত বেলাল (রা) কে ডেকে বলেন ঃ হে বেলাল! লোকদেরকে আমার কথা শোনার জন্য চুপ করতে বল। বেলাল লোকদেরকে চুপ করতে বলেন এবং লোকেরা চুপ করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে লোকেরা! এই মাত্র আমার কাছে জিবরীল এসে আল্লাহর সালাম পৌঁছে দিয়ে গেল এবং বলল, আল্লাহ আরাফাতবাসী এবং মোযদালেফার মাশআরুল

হারামের অবস্থানকারীদের গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমা করার পর তাদের জুলুম উঠিয়ে নিয়েছেন। হযরতন উমর (রা) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ক্ষমা কি শুধু আমাদের জন্য সীমিত? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলে, এই ক্ষমা তোমাদের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের সবার জন্য। তখন হযরত উমর (রা) মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহর কল্যাণ অনেক বেশী এবং এটা সুখপ্রদ।

বাজ্জার, তাবারানী এবং ইবনে হিব্বান হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই হাদীসের অংশবিশেষ হল ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আরাফাতের বিকেলে সেখানে তোমাদের অবস্থানের সময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন ঃ 'আমার বান্দাহগণ আমার কাছে দুনিয়ার সকল প্রান্ত থেকে এখানে ছুটে এসেছে, তারা ধূলা-মলিন। তোমাদের গুনাহ যদি বলুকারাশি, অগণিত বৃষ্টির ফোঁটা কিংবা সাগরের অসংখ্য ফেনারাশির মতও হয়, আমি তা মাফ করে দিলাম। তোমরা নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যাও এবং যাদের জন্য তোমরা দোআ' করেছ তাদের গুনাহও মাফ করে দিলাম।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন ঃ

اَعْظَمُ النَّاسِ ذَنْبًا مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةً فَظَنَّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ ـ

অর্থ ঃ সে ব্যক্তি সবচাইতে বড় গুনাহগার যে হজ্জের দিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করেও ধারণ করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি।*

এই হচ্ছে, আরাফাতের ক্ষমা দয়া, রহমত ও পুরস্কারের ঘোষণা। এ আরাফাতে গুনাহ্ মাফ না হলে, আর কোথায় গুনাহ মাফের এত উত্তম জায়গা পাওয়া যাবে? তাই আরাফাতের অবস্থানকে অর্থবহ করে সত্যিকার অর্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। আরাফাতের মূল শিক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের খোতবার মধ্যে নিহিত।

আরাফাতের দিনে হাজীদের গোসল করা এবং জাবালে রহমতের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো সুন্নত। তবে পাহাড়ে উঠা সুন্নত নয়। পাহাড়ের পেছনে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা, তাকবীর, তাহলীল এবং আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। বেশী বেশী

---

* এহইয়াউ উলুমুদ্দিন, ইমাম গাজালী।

তালবিয়া পড়া উত্তম। এই দিনে বেশী বেশী তওবা ও এস্তেগফার করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সা) জাবালে রহমতকে ডানে রেখে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।

আরাফাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিদায় ভাষণ

রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের দিশেহারা মানবতার কল্যাণের জন্য মুক্তিসনদ। মুসলিম, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজায় হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে।আরাফাতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ আজকের এই পবিত্র দিন, মাস এবং শহরের মতই পবিত্র ও নিষিদ্ধ। জেনে রেখ, জাহেলিয়াতের সকল জিনিস আমার পায়ের নীচে এবং এগুলো সবই বাতিল। জাহেলিয়াতের রক্তপণ বাতিল। আমাদের পক্ষ থেকে আমি সর্বপ্রথম ইবনে রবিআ বিন হারেস বিন আবদুল মোত্তালিবের রক্তপণ প্রথা বাতিল ঘোষণা করছি। সে বনি সাদ গোত্রে দুধ পানকারী পোষ্য শিশু ছিল। হোজাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলিয়াতের সুদকে আমি বাতিল ঘোষণা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি প্রথম আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সকল প্রাপ্য সুদকে বাতিল করছি। এগুলো সবই বাতিল। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তোমাদের বিছানায় কোন লোককে স্থান না দেয়া। যা তোমরা কখনও পছন্দ করবে না। যদি তারা অনুরূপ করে তাহলে তাদেরকে জখম না করে মেরে শাস্তি দাও। কিন্তু স্মরণ রেখ, তোমাদের উপর তাদের ইনসাফপূর্ণ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এই দুটো জিনিসের অনুসরণ করবে সে পর্যন্ত গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটো জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত। আমার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে কি বলবে? সবাই উত্তর দেয় আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

আরাফাতের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতের বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রধান ৫টা বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার না থাকলে আরাফাতে এসে আকাঙ্ক্ষিত ফায়দা লাভ করা যাবে না।

তিনি প্রথমতঃ জানমালের নিরাপত্তার কথা বলেছেন। আমরা কি একে অপরের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে পারছি? কথায় কথায়, মানুষ হত্যা করা, গুলী করা এবং মানুষের ইজ্জত সম্মান ছিনিয়ে নেয়া কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই ভাষণ বিরোধী নয়? আমাদের সমাজে বাক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানী, নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই হচ্ছে মুসলিম দেশের অবস্থা। অমুসলমান দেশগুলোতেও জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে। এ ছাড়াও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে এই মানবিক নীতিকে আরো বেশী পদদলিত করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহেলিয়াতের সকল বিষয় ও রীতি-নীতি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আরাফাত থেকে আমাদের সমাজের দিকে তাকালে আমরা কি সেখানে জাহেলিয়াতের সকল রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও পরিবেশ বহাল দেখতে পাইনা? জাহেলিয়াতের মতই আমাদের সমাজে উলঙ্গপনা-বেহায়াপনা, অশ্লীল নাচ-গান, উপন্যাস, মারামারি, হানাহানি, অজ্ঞতা, মূর্খতা, বর্বরতা ইত্যাদি বিরাজ করছে না? বরং আগের জাহেলিয়াত থেকে বর্তমান জাহেলিয়াত আরো বেশী জঘন্য। অশ্লীল ছায়াছবি, পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনের অরুচিকর কর্মসূচী ইত্যাদি আগের জাহেলিয়াতকেও হার মানায়।

তৃতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অনৈসলামী অর্থনীতির প্রধান বাহন সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ইসলামী রাজনীতি তথা কোরআন ও হাদীসের আইন ছাড়া কোন সমাজে ইসলামী অর্থনীতি কায়েমের স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। আমরা কি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র, ব্যাংক বীমা-ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী ও বেসরকারী খাত থেকে অভিশপ্ত সুদকে দূর করেছি? যদি না করে থাকি তাহলে, আরাফাতে হাজিরা দিয়ে লাভ কি? আরাফাতে হাজিরা দিয়ে আরাফাতের এই শিক্ষা গ্রহণ না করে খালি হাতে আরাফাত থেকে বিদায় নেয়ার সার্থকতা কোথায়?

চতুর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নারী-অধিকারের কথা বলেছেন। আমাদের সমাজে নারীরা

তাদের উপযুক্ত মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইসলাম তাদের যে সকল অধিকার দিয়েছে, আমরা সেগুলো থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখছি। আমরা তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। ওয়ারিশ হিসেবে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওনা সম্পত্তি দেইনা এবং আমরা মহিলা আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেই না। তাদের দেন-মোহর আদায়ের ব্যাপারেও আমরা সচেষ্ট নই। এগুলো গুরুতর অন্যায় এবং হারাম কাজ। তাদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ দিয়েছেন।

পঞ্চমতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে কোরআন ও হাদীস আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এ দুটো অনুসরণ করলে তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না।

আর এ দু'টোকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে যাবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র এবং নাগরিকেরা আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসের পরিবর্তে মানব রচিত মতাদর্শ ও মতবাদ অনুসরণ করছে। এগুলো সবই ভুল ও ভ্রান্ত এবং এগুলোর একমাত্র পরিণতি হচ্ছে দুনিয়ায় বিভিন্ন রকম আজাব-গযব এবং পরকালে দোজখের কঠিন শাস্তি। কোরআনে এসেছে (العمران - ١٩) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ 'আল্লাহ ইসলামকেই একমাত্র দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা এবং আইন-কানুন হিসেবে মনোনীত করেছেন।'

ইসলাম ছাড়া আর যত মানব রচিত মতবাদ আছে, ইসলামের দৃষ্টিতে সেগুলো হচ্ছে জাহেলিয়াত। আরাফাতে হাজিরাদানকারী একজন হাজীর জীবনে আরাফাতের শিক্ষা হচ্ছে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা এবং মানব রচিত মতবাদ সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে অস্বীকার করা। ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ থেকে অন্যান্য জাহেলী মতবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসরণে জেহাদের ডাক দিয়ে সবাইকে সংগঠিত করে বাতিলের উৎখাতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া আরাফাতের অন্যতম শিক্ষা।

বিদায় হজ্জের দিন সর্বশেষ এই আরাফাতের ময়দানেই কোরআন নাযিল হয়। এরপর আর কোরআন নাযিল হয়নি।

আরাফাতের নাযিল হওয়া সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (المائدة - ٩)

অর্থ ঃ 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।' এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর অর্থ হল, এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান রয়েছে। তাই একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী সকল মত ও পথ ত্যাগ করতে হবে এবং মানব রচিত মতাদর্শ গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য মানবাধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। ইসলামের বিশ্বব্যাপী এই আদর্শিক আন্দোলনে, একজন হাজী হচ্ছে আল্লাহর একজন বিরাট সৈনিক। উপরোক্ত আয়াতটি যেহেতু আরাফাতে নাযিল হয়েছে, তাই আরাফাতে অবস্থানকারী ও হাজিরাদানকারী হাজীদের এটি ভাল করে বুঝা ও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব অন্যদের চাইতে বেশী।

আরাফাত থেকে বিদায় নেয়ার পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম কেউ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এবং দ্বীনের দাওয়াত ও জেহাদ থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলেন না বরং আরো দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তারা দ্বীনী আন্দোলনের কাজ করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের সঠিক অনুসরণের জন্য তাঁদের মতই আমাদের হজ্জ পরবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করা জরুরী। হজ্জ করে তারা একথা মনে করেননি যে, আমাদের গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, এখন আমরা বিশ্রাম করি এবং এখন আর আমাদের আগের মত দ্বীনের দাওয়াত ও জেহাদ করার দরকার নেই। বিপরীত পক্ষে, তাঁরা মনে করেছেন, আরাফাতে যাওয়ার পর আমাদের উপর আরো কিছু বাড়তি দায়িত্ব এসেছে এবং সেই দায়িত্ব পালনে তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। তাই অন্যান্য বিষয়গুলোর মত এক্ষেত্রেও আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ

এবং সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের মহান হজ্জ ও প্রাসঙ্গিক এবাদতসমূহ সফল করার চেষ্টা করতে হবে।

আরাফাহ দিবসের দোয়া

মালেক ও বায়হাকী তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন কোরাইশ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

(১) اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاَفْضَلُ مَاقُلْتُ اَنَاوَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِىْ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ـ

অর্থ ঃ আরাফাহ দিবসের দোয়াই উত্তম দোয়া এবং আমি সহ আমার আগের অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম যে উত্তম দোয়াটি পড়েছেন তা হচ্ছে ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শারীক নেই। ইমাম তিরমিযী দোয়াটি আরো একটু বেশী যোগ করে বর্ণনা করেছেন।

(২) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ ঃ রাজত্ব তাঁর প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিবান।

হযরত আমর বিন শোয়াইব তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, যে আরাফাতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) উপরোক্ত দোয়াটি বেশী করে পড়তেন। হযরত যোবাইর বিন আওয়াম (সা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে আরাফাতের দিন নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে শুনেছি–

(৩) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَوَالْمَلاَئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। ফেরেশতা এবং জ্ঞানীরাও ইনসাফের সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানী, শক্তিশালী এবং বিজ্ঞ।

তিনি দোয়াটি পড়ে বলতেন, হে রব, আমিও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি ।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীরা যে উত্তম দোয়াটি পড়েছেন তা হলো, উপরোক্ত দোয়াটির মত। তবে এর শেষে আরো একটু যোগ করেছেন

(৪) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ مَايَلِجُ فِىْ اللَّيْلِ وَشَرِّمَايَلِجُ فِىْ النَّهَارِ وَشَرِّمَاتَهِبُّ بِهِ الرِّيَاحُ وَشَرِّبَوَائِقَ الدَّهْرِ ـ (بيهقى)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর (আলো) দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর দাও এবং আমার অন্তরে নূর দাও। হে আল্লাহ! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার অন্তরের ওয়াসওয়াসা, কাজের বিশৃংখলা, কবর আজাব, রাত ও দিনে অনুপ্রবেশকারী মন্দ, অনিষ্টকর বাতাস প্রবাহের ক্ষতি এবং যুগের ধ্বংসাত্মক ক্ষতিসমূহ থেকে পানাহ চাই।

হযরত আলী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতের ময়দানে নিম্নোক্ত দোয়াটিও বেশী বেশী পড়তেন ঃ

(৫) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَابِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَهِبُّ بِهِ الرِّيْحُ ـ (الترمذى)

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা যে রকম পারি সে রকম কিংবা তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য। হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আমার নামায, কোরবানী, জীবন ও মৃত্যু নিবেদিত; তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং তোমার জন্যই আমার উত্তরাধিকার। হে আল্লাহ! আমি কবর আজাব, মনের

ওয়াসওয়াসা এবং কাজের বিশৃংখলা থেকে পানাহ চাই! হে আল্লাহ! আমি বাতাসের প্রবাহের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই।'

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرُعَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَاأُعْطِي السَّائِلِيْنَ ـ (٦)

(اخرجه ابوذر)

অর্থ ঃ 'আমার জেকরের কারণে যে ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চাইতে পারেনি আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চাইতেও উত্তম দান করবো।'

হযরত আলী (রা) বলেন, আরাফাতের যে সুযোগ পেয়েছি তা হাতছাড়া করবো না। কেননা, এই দিনেই যমীনে আল্লাহর বহু বান্দাহ মুক্তি পাবে। আরাফাতের দিনের চাইতে অন্য কোন দিন এত বেশী লোককে আল্লাহ দোজখের আগুন থেকে মুক্ত দেন না। এই জন্য নিম্নের দোয়াটি বেশী বেশী পড়া দরকার।

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَاَوْسِعْ لِيْ مِنْ الرِّزْقِ الْحَلاَلِ (٩)
وَاصْرِفْ عَنِّيْ فَسَقَةَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! দোজখের আগুন থেকে আমার গর্দানকে মুক্ত কর। আমার জন্য হালাল রিজক প্রশস্ত কর এবং জ্বিন ও মানুষ শয়তানকে আমার থেকে দূরে রাখ। তিনি বলেন, আজকে এটাই হবে আমার স্বাভাবিক দোয়া। (মুসীরুল গারাম)

হযরত ইবনে উমর তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর একবার বলতেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ (٨)

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একও অদ্বিতীয়, রাজত্ব ও প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য

তারপর তিনবার বলতেন

اَللّٰهُم اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى وَاعْصِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى فِيْ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ـ (٩)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাকে সত্য পথ দেখাও এবং তাকওয়া দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতকে হেফাজত কর।

তারপর সূরা ফাতেহা পড়ার পরিমাণ সময় চুপ করে থাকতেন। এরপর আগের মত ঐ দোয়াগুলো পড়তেন। সবশেষে পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ۔ (১০)

হে আল্লাহ হজ্জ কবুল কর এবং গুনাহ মাফ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতের ময়দানে যে সকল দোয়া পড়েছেন তার মধ্যে একটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلاَمِىْ وَتَرَى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلاَنِيَتِىْ (১১) وَلاَيَخْفَى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِّنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ اَلْمُسْتَغِيْثُ مُسْتَجِيْرُ اَلْوَجِلُ الْمُشْفِقُ اَلْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِه اَسْاَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ خَدُّهُ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ بِىْ رَؤُفًا رَّحِيْمًا يَاخَيْرَالْمَسْؤُلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ ۔ (اخرجه ابوذر)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনতে পাও; তুমি আমার অবস্থান দেখতে পাও প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু জান। আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নেই। আমি বিপদগ্রস্ত, দরিদ্র, সাহায্য প্রার্থনাকারী, আশ্রয় প্রার্থী, ভীত-সন্ত্রস্ত, নিজ গুনাহ স্বীকারকারী; তোমার কাছে মিসকীনের ফরিয়াদ জানাই এবং লাঞ্ছিত পাপীর করুণ অনুশোচনা নিবেদন করি, তোমার কাছে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকের দোয়া চাই; যার গর্দান তোমার অনুগত, তোমার জন্য যার চোখের পানি ঝরে, যার গণ্ডদেশ বিনীত এবং যার নাক তোমার জন্য ধূলা-মলিন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে দোয়া কবুলের ব্যাপারে আমাকে হতভাগ্য করোনা এবং আমার প্রতি তুমি সদয় ও মোহেরবান হও। হে উত্তম প্রার্থনার কেন্দ্র ও সর্বোত্তম দাতা!

হযরত আলী এবং আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে নিম্নোক্ত দোয়ার চাইতে আর কোন উত্তম কথা ও কাজ নেই। আল্লাহ আরাফাতে সেই ব্যক্তির দিকেই প্রথম লক্ষ্য করবেন যে ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে দোয়ার জন্য দু'হাত তুলে তিনবার তিনবার করে তালবিয়া ও তাকবীর বলবে এবং এই দোয়াটি ১০০ বার পড়বে ঃ

(১২) لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। তাঁর হাতে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

তারপর এই দোয়াটি ১০০ বার পড়বে ঃ

(১৩) لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِّى الْعَظِيْمِ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নেই। তিনি বড় ও মহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ সকল কিছুর উপর শক্তিমান এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।

তারপর তিনবার পড়বে ঃ

(১৪) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ـ

অর্থ ঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে পানাহ চাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা ও জ্ঞানী। তারপর বিসমিল্লাহ পড়ে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং শেষে বলবে 'আমীন'। তারপর বিসমিল্লাসহ সূরা এখলাস (قُلْ هو الله احد) একশ'বার পড়তে হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর একশ'বার নিম্নোক্ত দরূদ পাঠ করতে হবে।

(১৫) صَلَّى اللّٰهُ وَمَلاَئِكَتُهُ عَلَى النَّبِىْ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নিরক্ষর নবী ও তাঁর বংশধরের উপর দরুদ ও সালাম পাঠায়। নবীর উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত কামনা করি।

তারপর নিজের জন্য দোয়া করবে, নিজের মা-বাপ-আত্মীয় স্বজন এবং সকল মোমেন নর-নারীর জন্য দোয়া করবে। দোয়া থেকে অবসর হওয়ার পর হাদীসের প্রথম অংশে বর্ণিত বাণীটা তিনবার উচ্চারণ করবে (এই জায়গায় নিম্নোক্ত দোয়া ছাড়া কোন উত্তম কথা ও কাজ নেই) তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, হে ফেরেশতারা, দেখ, আমার এই বান্দাহ কিবলামুখী হয়ে আমার তাকবীর, তালবিয়া, তাসবীহ, তাহলীল ও হামদ প্রকাশ করেছে। আমার অতিপ্রিয় সূরাগুলো পাঠ করেছে, এবং আমার নবীর উপর দরূদ পাঠ করেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তার আমল কবুল করেছি, আমার উপর এর বিনিময় ওয়াজিব করেছি, তার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি, তাকে সুফারিশপ্রাপ্ত লোকদের শ্রেণীভুক্ত করেছি এবং যদি তাকে আরাফাতে অবস্থানকারী সুফারিশপ্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে তাও হতে পারে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন বান্দাহ বা উম্মত যদি আরাফার রাত্রে ১ হাজার বার নিম্নোক্ত ১০টি কলেমা পাঠ করে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ তাকে যা চাবে তাই দেবেন। শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অথবা বিশেষ পাপী ব্যক্তি ব্যতীত। সেই কালেমাগুলো হচ্ছে–

(১) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِىْ السَّمَاءِ عَرْشُهُ (٢) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى (১৬) الْاَرْضِ مَوْطِئُهُ (٣) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِىْ الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ (٤) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِىْ النَّارِ سُلْطَانُهُ (٥) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِىْ الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ (٦) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِىْ الْقَبْرِ قَضَاؤُهُ (٧) سُبْحَانَ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاءَ (٨) سُبْحَانَ الَّذِىْ وَضَعَ الْاَرْضَ (٩) سُبْحَانَ الَّذِىْ لاَ مَنْجَى وَلاَ مَلْجَاَ مِنْهُ اِلاَّ اِلَيْهِ (١٠) سُبْحَانَ الَّذِىْ فِىْ الْقُرْاٰنِ وَحْيُهُ ـ

অর্থ ঃ সেই আল্লাহর জন্য পবিত্রতা ১. যাঁর আসন আসমানে, ২. যাঁর পায়ের স্থান যমীনে, ৩. যাঁর পথ সাগরে, ৪. যাঁর কর্তৃত্ব দোযখে, ৫. যাঁর রহমত বেহেশতে, ৬. যাঁর ফয়সালা কবরে, ৭. যিনি আসমানকে উপরে সৃষ্টি করেছেন, ৮. যিনি

যমীনকে নীচে সৃষ্টি করেছেন, ৯. যিনি ছাড়া আর কোন মুক্তি ও আশ্রয়কেন্দ্র নেই, ১০. এবং কোরআনে যাঁর আদেশ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আরাফাতের দোয়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দোয়া। এজন্য সেখানে কান্নাকাটা করে বেশী বেশী দোয়া ও এস্তেগফার করা দরকার। সেখানে দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহর উত্তম বান্দাহদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যাদের বন্ধু আল্লাহর কোন প্রিয়ভাজন ব্যক্তি নয়, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। তবে মোবাহ্ কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে গুনাহ্ হবে না। উচিত হল নেক ও সওয়াবের কাজ করা।

যোগাযোগ

বর্তমানে মোযদালেফা-মিনার সাথে আরাফাতের যানবাহন যোগাযোগ এবং পায়ে হেঁটে চলার জন্য ৯টি পাকা রাস্তার সংযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আরাফাতের ভেতরেও বহু সড়ক তৈরি করা হয়েছে। তাতে যানবাহন চলাচলের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

আরাফাত থেকে মোযদালেফা-মিনাগামী রাস্তাগুলোর মধ্যে ২ টাকে হাজীদের পায়ে চলার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এগুলোকে গাড়ীর রাস্তা থেকে পৃথক করা হয়েছে। আরাফাতের চারদিকে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রিং রোড তৈরি করা হয়েছে। এতে ৪টা ওভারব্রীজ আছে। দু'টো ওভারব্রীজ পায়ে চলার রাস্তায় আর দুটো গাড়ীর রাস্তায় পড়ে। আরাফাতে বর্তমানে ৪টি সংযোগ সড়ক আছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, আরাফাতে ভবিষ্যতে ৩০ লাখ হাজীর প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রধান সড়ক, সংযোগ সড়ক, পায়ে চলার পথ, গাড়ীর রাস্তা, হাজীদের জন্য আঙ্গিনা, সুয়েরেজ এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছে।

আরাফাতের উত্তর পার্শ্বে আগমনকারী গাড়ীর জন্য ২ লাখ ৪০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের উপর গাড়ীর পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়াও আরাফাত থেকে মোযদালিফা-মিনা হয়ে মসজিদে হারামে পৌঁছার জন্য মাহবাসূল জিনের সুড়ঙ্গমুখ পর্যন্ত এয়ারকণ্ডিশনযুক্ত শেড নির্মাণ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে হাজীদের পায়ে চলার রাস্তাকে ছায়াদার বানানো হয়েছে।

গরমকালে, ছায়াদানের জন্য আরাফাতের বহু গাছ লাগানো হয়েছে।

পানি সেবা

১৪০৯ হিজরীতে, আরাফাত ময়দানে ১৪ লাখ ৭৭ হাজার হাজী ১ লাখ ২৫ হাজার ঘনমিটার পানি ব্যবহার করে। এত বিপুল সংখ্যক লোকের পানির চাহিদা পূরণ করার জন্য সৌদী সরকার আরাফাতে মোট ৪টি পানির রিজার্ভার নির্মাণ করেছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১নং রিজার্ভার ঃ আরাফাতের উত্তরে রিং রোডের উপর আরাফাতের এই প্রধান রিজার্ভারটি ৫০ হাজার ঘনমিটার পানি ধারণ ক্ষমতার অধিকারী। এটি সাগরের স্তর থেকে ৪০৬ মিটার উপরে এবং এর উচ্চতা হচ্ছে ৮ মিটার। ১৩৯২ হিজরীতে এটি চালু হয়। শোয়াইবিয়া পানি প্রকল্প সরবরাহ লাইন থেকে চওড়া পাইপের মাধ্যমে এতে পানি আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও এতে জমুম হয়ে নোমান উপতক্যার পানি আনার ব্যবস্থাও রয়েছে। এর পানি বিশুদ্ধ করা হয় এবং মক্কা পানি নেটওয়ার্কে তা সরবরাহ করা হয়।

২নং রিজার্ভার ঃ ২০ হাজার ঘনমিটার পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই রিজার্ভারটি দক্ষিণ আরাফাতের রিং রোডে, সাগরের স্তর থেকে ৩৬৫ মিটার উপরে নির্মিত। এর উচ্চতা হচ্ছে ৬ মিটার। ১৪০৮ হিজরীতে তা চালু হয়। জমুম পানি নেটওয়ার্ক এবং শোয়াইবিয়া পানি প্রকল্প নেটওয়ার্ক থেকে এতে পানি এনে তা বিশুদ্ধ করার পর সরবরাহ করা হয়।

৩নং রিজার্ভার ঃ ১ হাজার ঘনমিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই রিজার্ভারটির নাম হচ্ছে শাইর রিজার্ভার। এটি আরাফাতের পূর্ব দিকের পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত।

৪নং রিজার্ভার ঃ মসজিদে নামেরার ভূগর্ভস্থ ৬টি রিজার্ভারে ১২ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। তা ছাড়াও মাটির উপরে নির্মিত দুটো রিজার্ভারে ২ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে।

আরাফাত থেকে মিনা পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে মোট ৭৪০টি স্থানে ঠাণ্ডা পানি পান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি স্থানে টেপ লাগানো আছে। শোয়াইবিয়া পানি প্রকল্পের সরবরাহ লাইনের পানি এতে সরবরাহ করা হয়। আরাফাত ময়দানেও অনুরূপ ৪ হাজার পানিপান কেন্দ্র আছে।

সৌদি সরকার আরাফাতে হাজীদের সুবিধার্থে হাজার হাজার টয়লেট নির্মাণ করেছে।

মোযদালেফা

মোযদালেফা হচ্ছে মিনা এবং আরাফাতের মধ্যে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। হাজীরা আরাফাহ থেকে ৯ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার পর, এখানেই রাত্রি যাপন করেন। মূলত ঃ মোযদালেফা হচ্ছে আরাফাগামী মাজেমাইন নামক দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ মাদীক এবং মোহাস্‌সার উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত ৪ হাজার ৩শত ৭০ মিটার দীর্ঘ একটি স্থানের নাম।

মোযদালেফার নাককরণের ব্যাপারে অনেকগুলো মতভেদ আছে। সেগুলো হচ্ছে (১) এযদেলাফ থেকে মোযদালেফা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এযদেলাফ অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী হওয়া। মোযদালেফায় সকল হাজী একত্রিত হয় বলে একে অপরের নিকটবর্তী হয়। তাই একে মোযদালেফা বলা হয়। (২) মোযদালেফায় অবস্থানের মাধ্যমে হাজীরা আল্লাহর নিকটবর্তী হয় বলে একে মোযদালেফা বলা হয়। (৩) এযদেলাফ অর্থ হচ্ছে মিলিত বা জমা হওয়া। লোকেরা সেখানে মিলিত ও জমা হয়। তাই একে মোযদালেফা বলা হয়। (৪) আল্লাহর কুদরতে এখানে হযরত

মোযদালেফার মসজিদ

আদম (আ) এবং হাওয়া মিলিত হয়েছেন বলে একে মোযদালেফা বলা হয়। (৫) এখানে হাজীরা মাগরিব এবং এশার নামায এক সাথে মিলিয়ে পড়ে বলে একে মোযদালেফা বলা হয়।

মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। হযরত ইবনে উমরের মতে গোটা মোযদালেফাই মাশআরুল হারাম। তাই এর যে কোন জায়গায় রাত্রি যাপন করা যাবে। অন্যান্য আলেমদের মতেও মোযদালেফার সর্বত্র রাত্রি যাপন করা যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মোযদালেফার সর্বত্র অকুফের স্থান।' তবে তাঁরা মাশাআরুল হারাম বলতে মোযদালেফার মধ্যবর্তী স্থান 'কোযাহ' পাহাড়কে বুঝান। তাঁরা এই জায়গায় হাজীদের অবস্থান ও রাত্রি যাপন, আল্লাহর জেকর ও শোকর এবং এবাদত করাকে মোস্তাহাব বলেছেন। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে এখানেই অবস্থান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুকরণে এই জায়গায় অবস্থান উত্তম। মোযদালেফার বর্তমান মসজিদের স্থানে ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সা) দোআ ও জিকরে ব্যস্ত ছিলেন এবং সুর্যোদয়ের আগে আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। অনেকের মতে, গোটা মোযদালেফাই মাশআরুল হারাম।

আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন–

فَاذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ ـ (بقره : ١٩٨)

অর্থ ঃ 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আস তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন সেভাবে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর।' মাশআরুল হারাম অর্থ এবাদতের সম্মানিত নির্দশনের স্থান।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মোযদালেফায় এসে এশার সময় মাগরেবের এবং এশার নামাযকে একই আযান ও দু' একামত সহকারে আদায় করেছেন।

এমনকি দুই নামাযের মাঝখানে কোন সুন্নাত পড়েননি এবং কোন নফল এবাদতও করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মোযদালেফায় সুন্নাতও নফল ত্যাগ করাই হচ্ছে
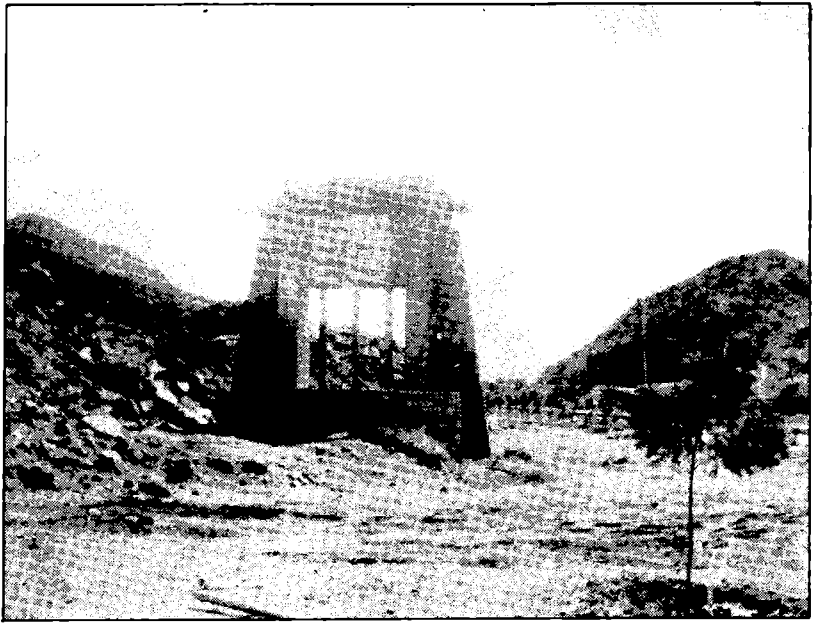
মোযদালেফার পূর্ব সীমানার পিলার

সুন্নাত। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো আদায় করেননি। তবে বিতরের নামায আদায় করতে হবে। যাই হোক, এরপর তিনি রাত্রের খানা খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মোযদালেফায় ঘুমানো সুন্নাহ। এর মাধ্যমে শরীরের দাবী পূরণ করে তিনি উম্মাহর জন্য বিশেষ শিক্ষা রেখে গেছেন। তিনি সোবহে সাদেকের আগে উঠেছেন এবং সোবহে সাদেকের অন্ধকার দূর হওয়ার আগেই আজান ও একামত সহকারে ফজরের নামায পড়েছেন। একেবারে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার উদ্দেশ্য হল, পরে যেন দোয়া ও তাসবীহ-তাহলীলের সময় বেশী পাওয়া যায়। তারপর তিনি কোসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে মাশআরে হারামে আসেন এবং কেবলামুখী হয়ে তাকবীর তাহলীল পাঠ করেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করেন। তিনি ফদল বিন আব্বাস (রা)-কে মোযদালেফা থেকে কংকর সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য বলেন। সে অনুযায়ী ফদল (রা) ১ম দিন জামরাহ আকাবায় নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য কংকর এনে দেন।

সূর্য উঠার একটু আগে আকাশ যখন বেশ ফর্সা হয়ে উঠল তখন তিনি মোযদালেফা থেকে রওনা দেন এবং মোহাস্‌সার উপত্যকায় এসে একটু জোরে চলেন। তিনি

মোযদালেফা থেকে যে রাস্তায় মিনায় আসেন তার বর্তমান নাম হচ্ছে 'সোকুল আরব'। এর আগে তিনি মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় দব নামক রাস্তা দিয়ে যান, রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা। এরপর তিনি বড় জামরাহমুখী রাস্তা দিয়ে বড় জামরাহর কাছে অবস্থিত গাছের নিকট অবতরণ করেন এবং সূর্যোদয়ের কিছু পর বড় জামরায় ৭টি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করেন। প্রত্যেক বার কংকর নিক্ষেপের সাথে তিনি তাকবীর বলেন এবং পরে জবেহখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনিসহ সাহাবায়ে কেরামের জন্য আনীত ১শ' উটের মধ্যে তিনি নিজ হাতে ৬৩টি জবেহ করেন এবং বাকীগুলো হযরত আলী (রা) কে জবেহ করার নির্দেশ দেন। পরে তিনি কোরবানীর গোশত খান।

জাহেলিয়াতের সময় লোকেরা সূর্যোদয়ের পর মোযদালেফা থেকে রওনা হত এবং বলত সাবির পাহাড়ে আলো এসেছে, আমরা যেন রওনা হই। রাসূলুল্লাহ (সা) জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির বিরোধিতা করে সূর্যোদয়ের সামান্য আগে, মোযদালেফা থেকে মিনা রওনা হন।

জাহেলিয়াতের সময় আরাফাত থেকে মোযদালেফায় আগমনকারী লোকদের উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানো হত যেন তারা ঠিকমত পৌঁছতে পারে এবং পথ না হারায়। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মোযদালেফায় আসার সময় সেখানে আগুন জ্বলছিল। তিনি সেই আগুনের পার্শ্বে অবতরণ করেন। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা) এর সময়ও মোযদালেফায় আগুন জ্বালানো হত।

'অকুফে মোযদালেফা'র ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত উমরের মতে–

৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সময়ই হচ্ছে অকুফে মোযদালেফার সময়। আমর বিন মায়মুন থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) মোযদালেফায় আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন, তারপর অকুফ করেছেন এবং বলেছেন, মোশরেকগণ সূর্যোদয়ের আগে মোযদালেফা ত্যাগ করত না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এই কাজের বিরোধিতা করেন এবং সূর্যোদয়ের আগেই মোযদালেফা থেকে রওনা দেন। (আহমদ ও আবু দাউদ)

ইমাম আবু হানীফাসহ অন্যান্য আলেমদের মতে, সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সময়ই হচ্ছে অকুফে মোযদালেফার সময়। কেউ যদি বিনা ওজরে ঐ সময়ে অকুফ না করে, তাহলে তাকে দম দিতে হবে। যে কেউ ঐ সময় মোযদালেফায় থাকলে তার অকুফ হয়ে যাবে। চাই সে মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করুক বা নাই করুক। ঐ সময়ের অকুফে মোযদালেফা ওয়াজিব। মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।

ইমাম শাফেঈ এবং আহমদের মতে, অর্ধরাত্রির পর যে কোন সময়ে অকুফ করলে তা আদায় হবে এবং মাঝরাতের আগে কেউ মোযদালেফা ত্যাগ করলে তাকে দম দিতে হবে। তবে ইমাম মালেকের মতে, কেউ মোজদালেফায় মাগরেব ও এশার নামায আদায় করার পর রাত্রির খাওয়া শেষে মোযদালেফা ত্যাগ করলে তা জায়েয হবে। মালেকী মাজহাবে, পানি পান করানোকারী ব্যক্তি এবং রাখাল ছাড়া অন্যদের জন্য মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) এই দুই শ্রেণীর লোকদের অনুমতি দিয়েছিলেন।

মোযদালেফার পশ্চিম সীমানার পিলার

ইমাম আহমদ ও শাফেঈর মতে মাঝরাতের পর থেকে অকুফে মোযদালেফা ওয়াজিব। কেউ মাঝ রাতের পর কিছু সময় অকুফ করলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অপরদিকে হানাফী মাযহাবে মোযদালেফায় রাত্রি যাপন সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ এবং সোবহে সাদেকের পর সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত অকুফ ওয়াজিব।

যাদের ওজর রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মোযদালেফায় রাত্রি যাপন কিংবা সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অকুফ করার জন্য নির্দেশ দেননি। তাঁর কাছে রাখাল ও হাজীদেরকে পানি পান করানোকারী ব্যক্তিরা এসে অনুমতি চাওয়ায় তিনি তাদেরকে মোযদালেফা থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, শিশু ও নারীদেরকেও মোযদালেফা ত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা), আমাদের আবদুল মোত্তালিব বংশের কিছু সংখ্যক ছোট বালককে রাত্রে মোযদালেফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের গায়ে স্নেহ করে হালকা থাপড় দিয়ে বললেন, হে আমার সন্তানরা! সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করোনা।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মোযদালেফায় পৌছার পর সাওদা বিনতে যামআ' লোকদের ভীড়ের আগে মিনায় পৌছার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি ধীর গতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি লোকের ভীড়ের আগেই রওনা দেন। আমরা সকাল পর্যন্ত মোযদালেফায় থাকার পর, পরে রওনা দেই। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে সালমাকে মোযদালেফার রাতে সোবহে সাদেকের আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে রাত্রি যাপনের পালা ছিল। উম্মুল মোমেনীন উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মোযদালেফার রাত্রে রাত অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। যোবায়েরের স্ত্রী আসমা বিনতে আবী বকর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে এরূপই করতাম। তালহা বিন যোবায়ের এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) দুর্বল লোক এবং নারী ও শিশুদেরকে রাত্রেই মোযদালেফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দিতেন।

মূলকথা, ওজরগ্রস্ত এবং অসুস্থ ও দুর্বল লোকদেরকেও কিছুক্ষণ অকুফ করার পর রাত্রেই মোযদালেফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেয়া জায়েয আছে।

অকুফে মোযদালেফার জন্য ৬টি সুন্নাহ আছে। সেগুলো হচ্ছে– (১) অর্ধরাত্রির পর গোসল করা ও পানি না পেলে তায়াম্মুম করা। (২) ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া যেন পরে অকুফের সময় বেশী পাওয়া যায়। (৩) মাশআরুল হারামে এসে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা। (৪) হানাফী, শাফেঈ এবং হাম্বলী মাযহাবসহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম আমর বিন মায়মুনের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্যোদয়ের সামান্য আগে মোযদালেফা ত্যাগ করাকে সুন্নাহ বলেছেন। ইমাম মালেকের মতে, ভোরে আকাশ ফর্সা হওয়ার আগে মোযদালেফা ত্যাগ করা যায়। (৫) ধীরে সুস্থে মোযদালেফা থেকে মিনায় পৌঁছা। শুধুমাত্র মোহাস্‌সার উপত্যকায় দ্রুত চলতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মোযদালেফায় এসে ফজল বিন আব্বাসকে নিজের সওয়ারীর পিছনে বসান এবং বলেন, হে লোকেরা, উট ও ঘোড়া দৌড়ানোর মধ্যে কোন নেক নেই। তোমরা ধীর স্থিরভাবে চল। রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় পৌঁছা পর্যন্ত ধীর-স্থির ছিলেন। (আবু দাউদ, বায়হাকী) (৬) মোহাস্‌সার উপত্যকায় দ্রুত চলা। চাই পায়ে হেঁটে হউক কিংবা সওয়ারী ও গাড়ীর উপরই হউক না কেন সর্বাবস্থায় তা দ্রুত পার হতে হবে। নাসাঈ শরীফে হযরত জাবের থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মোহাস্‌সার উপত্যকা দ্রুত পার হয়েছেন।

মাশআরুল হারামে নির্মিত মসজিদে আগে শুধু একটি মিনারা ছিল। সৌদী আমলে সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। তাতে ২টি মিনারা আছে। মসজিদটির আয়তন হচ্ছে ৫ হাজার ৪শ' বর্গমিটার এবং এতে একসাথে দুই লক্ষ মুসল্লি নামায পড়তে পারে। মোযদালেফায় অকুফের রাত্রির জন্য পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিকটবর্তী পাহাড়ে ৫০ হাজার ঘনমিটার পানি ধারণকারী একটি ধাতব রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও মসজিদের রিজার্ভারে ২ হাজার ঘনমিটার পানি ধরে। সেখানে বেশ কিছু টয়লেটও তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও মোযদালেফায় গাড়ী ও পায়ে চলার জন্য সকল রাস্তা পাকা করা হয়েছে এবং আরাফাতের দিকে মোযদালেফার উপর দিয়ে ৮টি সড়ক তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও মোযদালেফায় মাঝামাঝি বাদশাহ ফয়সল ওভারব্রীজ তৈরি করা হয়েছে। সম্প্রতি হাজীদের সুবিধার্থে এতে, প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ, রিজার্ভার নির্মাণ এবং সুয়েরেজের ব্যবস্থাসহ মোট ২ হাজার টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

মোহাস্‌সার উপত্যকা ঃ আবরাহা বাহিনীর ধ্বংসস্থল

মোহাস্‌সার উপত্যকা হচ্ছে মিনা এবং মোযদালেফার মাঝে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ৫৪৫ হাত দীর্ঘ একটি স্থানের নাম। এই জায়গায় আবরাহা বাহিনীর উপর আল্লাহর গযব নেমে আসে এবং তারা পুরো ধ্বংস হয়।

মোহাস্‌সার শব্দের অর্থ হচ্ছে অচল ও অক্ষম হওয়া। হস্তিবাহিনীর হাতীগুলো সামনে চলতে অক্ষম হওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে মোহস্‌সার।

খৃস্টানরা এই জায়গায় অকুফ করত বা অবস্থান করত। তাই হাজীদের সেই জায়গা দ্রুত পার হওয়া এবং খৃস্টানদের বিরোধিতা করা জরুরী। মুসলিম এবং আবু দাউদ শরীফে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা) যখন মোযদালেফা হতে মিনার দিকে রওনা হন তখন মোহাস্‌সার উপত্যকায় চলার গতি দ্রুত করে দেন।

ইমাম নওয়ী বলেছেন, আবরাহার হস্তীবাহিনীর ধ্বংসলীলা এই স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল। যে সকল জায়গায় আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে, সে সকল জায়গা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিয়ম ছিল।

অনেকে মুহাস্‌সার এবং মোহাচ্ছাব এই দু'টো উপত্যকাকে এক মনে করেন।
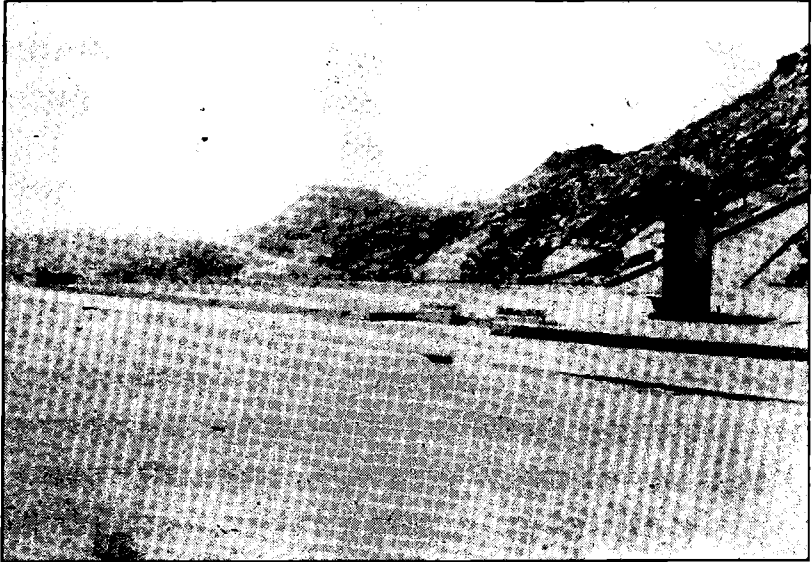
ওয়াদী মোহাস্‌সার
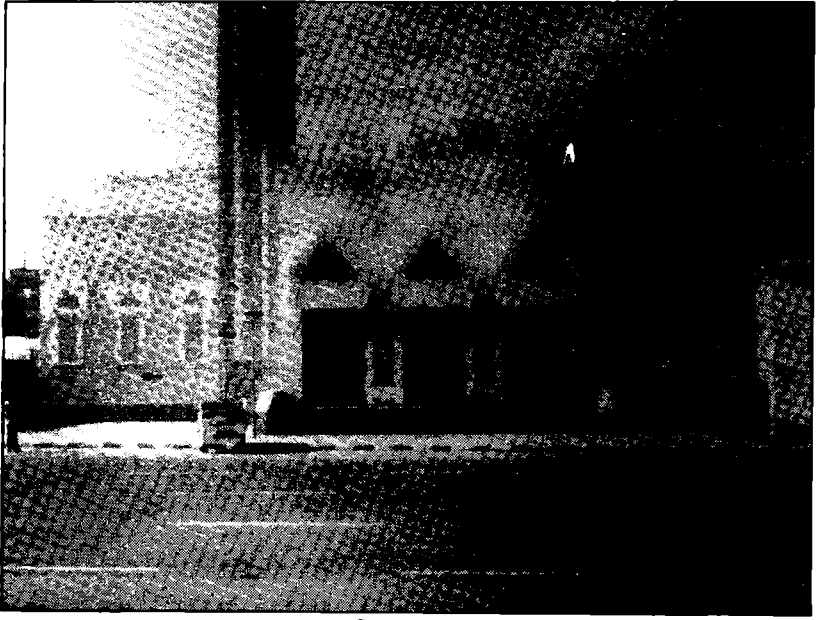
মসজিদুল এজাবাহ

আসলে এদু'টো এক নয়, ভিন্ন দু'টো উপত্যকা। মোহাচ্ছাব উপত্যকা হচ্ছে সাবেক বাতহা এবং বর্তমান মায়াবদা এলাকা। এখানে মসজিদে এজাবাহ্ অবস্থিত।

মোহাচ্ছাব

মোহাচ্ছাব শব্দের অর্থ হচ্ছে, জমাকৃত পাথরের টুকরার স্থান। বন্যার পানিতে উপরোল্লিখিত স্থানে পাথরের টুকরা জমা হওয়ায় একে মোহাচ্ছাব বলা হয়। মোহাচ্ছাব হচ্ছে সেই স্থান, মিনা থেকে মক্কা ফেরার সময় যেখানে অবতরণ করা মোস্তাহাব। এই স্থানটি আবতাহ নামক জায়গায় দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম হচ্ছে মাআ'বদাহ।' মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) এই জায়গায় অবতরণ করেন। মসজিদে হারামের বাবুস সালাম থেকে মোহাচ্ছাবের দূরত্ব হচ্ছে ৩ কিলোমিটার। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে মাগরিবের নামায পড়েছেন। বর্তমানে সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদটির নাম হচ্ছে মসজিদে এজাবাহ্। এতে ১ টি সুন্দর মিনারা আছে।

হোদায়বিয়া

হোদায়বিয়ার বর্তমান নাম হচ্ছে শোমাইসী। খাত্তাবী বলেছেন, হোদায়বিয়াকে হোদায়বিয়া বলার কারণ হচ্ছে সেখানে হাদবা নামক গাছ ছিল। হোদায়বিয়া থেকে সামান্য আগে মক্কার দিকে হুদুদে হারামের পিলার বসানো আছে। ঐ পিলার থেকে মসজিদে হারামের দূরত্ব হচ্ছে ২১ কিলোমিটার। হোদায়বিয়া হারাম এলাকার ভেতর না বাইরে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে সহীহ্ মত অনুযায়ী এর অর্ধেক হারাম এলাকার ভেতর আর বাকী অর্ধেক হারাম এলাকার বাইরে।

হোদায়বিয়ায় একটি পুরাতন মসজিদ ছিল। কথিত আছে যে, মসজিদটি হোদায়বিয়ার বাইআত যে গাছের নীচে হয়েছিল সেখানেই নির্মিত হয়েছিল অথবা, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) শিবির স্থাপন করেছিলেন সেখানে নির্মিত হয়েছিল। তারপর সেখানকার মসজিদটি ভেঙ্গে নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাও ভেঙ্গে ফেলা হয়।

হোদায়বিয়া হচ্ছে সেই স্থান যেখানে ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে মক্কায় উমরার উদ্দেশ্যে আসার পথে অবতরণ করেন। কেননা, মক্কার কাফেররা তাঁকে উমরাহ আদায় করতে বাধা দেয়। সেখানে গাছের নীচে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতে যে বাইআত গ্রহণ করেন তাকে বাইআতে রিদওয়ান বলে। আল্লাহ কুরআনে ঐ বাইআত ও গাছের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ মোমেনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছটির নীচে আপনার (নবীর) কাছে বাইআত গ্রহণ করছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর জানেন। তারপর তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাদেরকে দ্রুত বিজয় দান করেন।' (আল-ফাতহ-২৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এবং তাঁর সাথীরা নিরাপদে মাথার চুল খাট করে এবং মুণ্ডন করে বাইতুল্লায় ঢুকেছেন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে উমরাহ করা। তিনি মদীনা থেকে উমরার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে এহ্‌রাম পরে বের হন এবং সাথে দমের পশু নিয়ে রওনা হন। যুদ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উসফান পৌঁছেন তখন, মুসলমানদের গুপ্তচর বিসার বিন সুফিয়ান কাবী রাসূলুল্লাহ (সা) কে খবর দেন যে, মক্কার কোরাইশরা জু-তওয়ায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে এবং খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কোরাউল গামীমে অশ্বারোহী বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা যে কোন মূল্যে আপনাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দেবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ খবর পেয়ে মক্কার রাস্তা পরিবর্তন করে হোদায়বিয়ায় উপস্থিত হন। সানিয়াতুল মেরারে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর উট বসে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাকে মক্কায় আবরাহার হস্তীবাহিনীকে আটককারী শক্তিই আটক করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) পরে হোদায়বিয়ায় অবতরণের নির্দেশ দেন। সেখানে কোন পানি ছিল না। পুরাতন একটি কূপে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি তীর নিক্ষেপ করেন। ফলে, এতে পানি নির্গত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সকল সাথী-সঙ্গী এবং উটের পানির চাহিদা পূর্ণ হয়।

কোরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দূত বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে হযরত উসমানকে মধ্যস্থতার জন্য মক্কায় পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে তার ফিরতে দেরী
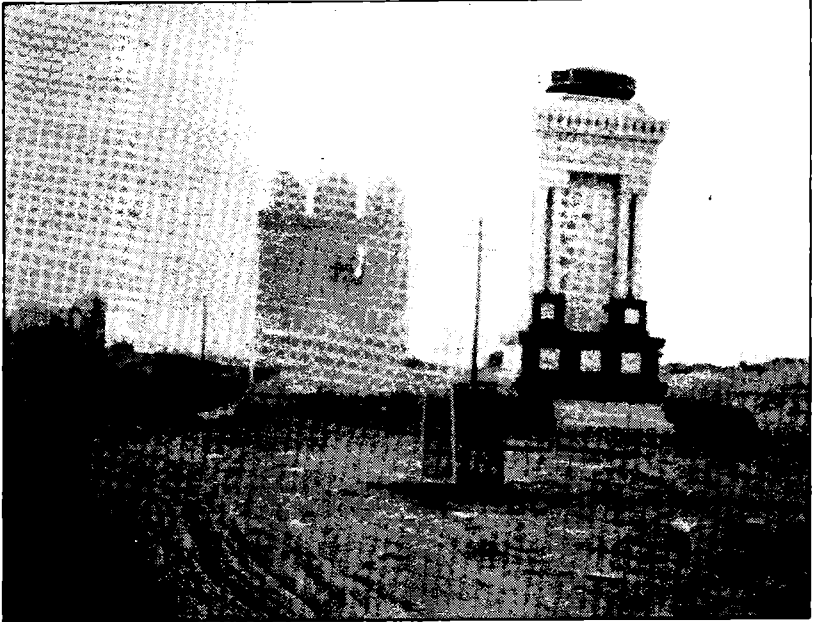
হোদায়বিয়ার পিলার
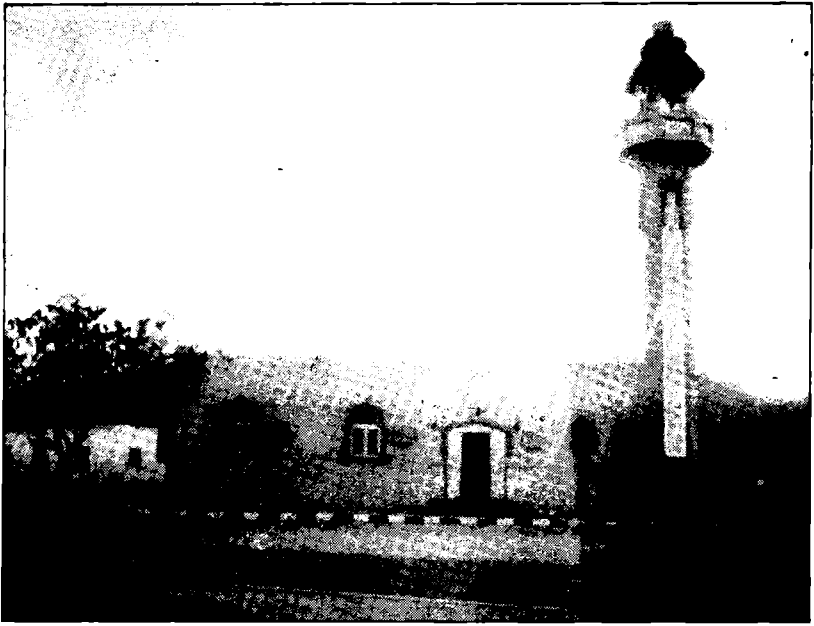
হোদায়বিয়ার নিকটবর্তী মসজিদ

হওয়ায় গুজব রটে যে, মক্কার কাফেরগণ তাঁকে হত্যা করেছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহর হাতে উসমান হত্যার প্রতিশোধের জন্যে মৃত্যুর আইআত গ্রহণ করেন। পরে হযরত উসমান নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন।

সবশেষে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ১০ বছরের একটি সন্ধি চুক্তি হয়। চুক্তির বাহ্যিক শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ছিল। কিন্তু এর অভ্যন্তরে প্রকাশ্য বিজয় লুকিয়ে ছিল। এই সন্ধিই পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সহ সবাই হোদায়বিয়ায় চুল খাট করে কিংবা মুণ্ডন করে এহরামমুক্ত হন এবং মদীনা ফেরত যান। চুক্তি অনুযায়ী পরের বছর তিনি ও তাঁর সাথীরা কাজা ওমরাহ আদায় করেন। হোদায়বিয়ার পশ্চিমে শেষপ্রান্তে বর্তমানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তাতে সুন্দর মিনারাও রয়েছে।

ওয়াদী ফাতেমা

এটি মক্কা বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর অবতরণ স্থল। খোজাআ গোত্রের ফাতেমা নামক মহিলার নামানুসারে এ উপত্যকার নামকরণ করা হয় ওয়াদী ফাতেমা বা ফাতেমা উপত্যকা। তিনি খুব সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনি উপত্যকার

অধিবাসীদের জানমাল লুটপাট থেকে রক্ষার জন্য বীরত্বের পরিচয় দেন। ওয়াদী ফাতেমা মক্কার উত্তরে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর সাবেক নাম হচ্ছে মাররুজ জাহরান (مَرُّالظَّهران)। এই উপত্যকায় বহু ঝর্ণা ও খেজুর বাগান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এতে অসংখ্য কূপ খনন করে পানি উঠানোর কারণে ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে গেছে। ঐ উপত্যকা থেকে পাইপের মাধ্যমে জেদ্দা সহ অন্যান্য জায়গায় পানি সরবরাহ করেন। এখন এই উপত্যকাবাসীদেরই অন্য স্থান থেকে পানি আনতে হয়। এই উপত্যকা আজকে পুরো আবাদ এবং এখানে আধুনিক জীবন যাত্রার সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। এই উপত্যকায় বর্তমানে অনেকগুলো গ্রাম আছে। তার মধ্যে জমুম হচ্ছে বেশী প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও এতে, আবু উরওয়া, আবু শোয়াইব, খায়ক আইনে শামস, সাম্‌ত এবং বারাবার গ্রাম উল্লেখযোগ্য।

এই উপত্যকায় মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা থেকে আগত মুসলিম বাহিনী অবতরণ করে রাত্রি যাপন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) সহ সবাই এখানে নামায পড়েন এবং এখানেই আবু সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহ (সা) এখানেই আবু সুফিয়ানের সম্মানে ঘোষণা করেন যে, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই উপত্যকা দিয়েই মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। এই উপত্যকার উপরিভাগে, হাদা বা হাদআ নামক একটি জায়গা আছে। এখানেই রাসূলুল্লাহ (সা) এর ৬ জন সাহাবীর সাথে লেহইয়ান এবং হোজাইল গোত্রের লোকেরা লড়াই করে। এই যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে اصحاب الرجيع বা রাজীই যুদ্ধ বলা হয়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের পর আ'দল এবং কারা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে অনুরোধ করে যে, তাদের মধ্যে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা বলে, আমাদের সাথে আপনার সাহাবাদের একটি দলকে পাঠান যেন তারা আমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেন, কুরআন পড়ান এবং ইসলামের আইন-কানুন বাতান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের আহবানে (১) মোরশেদ বিন মোরশেদ গানওয়ী, (২) খালেদ বিন বোকাইর লীচি (৩) আসেম বিন সাবেত বিন আবুল আকলাহ (৪) খোবাইব বিন আ'দী, (৫) যায়েদ বিন দাসেনা এবং (৬) আবদুল্লাহ বিন তারেক (রা) কে তাদের সাথে পাঠান এবং

মোরশেদ বিন মোরশেদকে তাদের আমীর করেন।

তারা উল্লেখিত কওমের প্রতিনিধিদলের সাথে হাদার শুরুতেই রাজী-ই নামক স্থানে পৌঁছেন। এটি হোজাইল গোত্রের নিবাস। তখন কওমের প্রতিনিধি দলটি বিশ্বাসঘাতকতা করে হোজাইল গোত্রের সাহায্য প্রার্থনা করে। সাথে সাথে হোজাইল গোত্রের লোকেরা তলোয়ার নিয়ে বের হয়। তারা ৬ জন সাহাবীকে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানিয়ে বলে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু মোরশেদ, খালেদ এবং আসেম বলেন, মোশরেকদের প্রতিশ্রুতির কোন অর্থ নেই। তাই তাঁরা লড়াই করে শহীদ হন। পরে মোশরেকরা আসেমের মাথা নিতে আসলে মৌমাছি এসে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। রাত্রে এক অভাবিত বন্যা এসে আসেমের লাশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিনি জীবদ্দশায় আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, কোন মোশরেক যেন তাঁর শরীর স্পর্শ করতে না পারে। হযরত উমর বলেন, আসেম মান্নত করেছিলেন যেন তাকে কোন মোশরেক স্পর্শ না করে। আল্লাহ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শরীরকে মোশরেকদের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেন।

পক্ষান্তরে, যায়েদ বিন দাসেনা, খোবাইব বিন আদী এবং আবদুল্লাহ বিন তারেক মোশরেকদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু ওয়াদী ফাতিমায় এসে আবদুল্লাহ বিন তারেক নিজের হাতের রশি খুলে তলোয়ার হাতে নেন এবং মোশারেকদের সাথে লড়াই শুরু করেন। পরে গাদ্দার কওম তাঁকে পাথর মেরে শহীদ করে দেয়। তাঁকে ওয়াদী ফাতিমায় দাফন করা হয়।

এ দিকে হযরত খোবাইব (রা) কে হোজাইর বিন আবি আহাব তামীমী এবং যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করে। সবশেষে, হযরত যায়েদ এবং খোবাইবকে মক্কার তানইমে হত্যা ও শূলবিদ্ধ করে শহীদ করা হয়।

হোনাইন

নগর অভিধানের লেখক ইয়াকুত হামাওয়ী লিখেছেন, হোনাইন শব্দ 'হানান' শব্দ থেকে এসেছে। এর নামকরণ করা হয়েছে হোনাইন বিন কানিয়া বিন মাহলাইল এর নামানুসারে। তাঁর মতে সম্ভবতঃ হোনাইন আমালিকা সম্প্রদায়ের লোক ছিল। পবিত্র কুরআন মজীদে এই 'হোনাইন' এর উল্লেখ এসেছে।

এই স্থানটি মক্কা থেকে কাছে। কেউ বলেছেন, এটি তয়েফের দিকে একটি

উপত্যকার নাম। আবার কেউ বলেছেন, এটি জুল-মাজায উপত্যকার পাশে অবস্থিত। ওয়াকেদী বলেছেন, মক্কা থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে তিন রাত্রির পথ। কারো কারো মতে এটি মক্কা থেকে ১০-১৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

সহীহ্ আল-আখবারের লেখক বলেছেন, হোনাইনের সঠিক অবস্থান জানার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করতে করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। বর্তমান যুগের বই পুস্তক থেকে জানা যায়, কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি বর্তমানে শারায়ে' উপত্যকা নামে পরিচিত এবং মক্কা থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত।

এটিই বেশী ঠিক বলে মনে হয়। এটা যদি হুবহু হোনাইন নাও হয়ে থাকে তবে, হোনাইন যে এর দক্ষিণে নিকটবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত তা অনেকটা নিঃসন্দেহ। কারণ, তাহলে সেটি জুলমাজায উপত্যকার নিকটবর্তী হয়। ঐ ময়দানেই হোনাইন যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং মুসলমানরা সেখান থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে। হোনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের পর জানতে পারলেন যে, হাওয়াযেন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং গোত্র প্রধান মালেক বিন আওফ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। নসর, জসম এবং সাকীফ গোত্র তাদের সাথে যোগ দেয় ও সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাহিনীর দিকে এগুতে থাকে এবং ময়দানে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ এবং নারী-শিশুদেরকে সাথে নিয়ে আসে যাতে করে কেউ ভেগে না যায়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং মদীনা থেকে আগত ১০ হাজার সাহাবায়ে কেরামের সাথে মক্কার আরো ২ হাজার নওমুসলিম যোগ দেয়। মুসলমানরা অতীতের যে কোন যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা থেকে এই সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব বোধ করে। ৮ই হিজরীর ১০ শাওয়ালের ভোরে মুসলমানরা ময়দানে হোনাইনে উপস্থিত হয়।

হাওয়াযেন গোত্র ছিল দক্ষ তীরন্দাজ। তারা মুসলমানদের আগেই হোনাইন উপত্যকার পাহাড় ও গিরিপথসমূহে অবস্থান নেয় এবং মুসলমানদের উপর একযোগে আক্রমণ শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং উহুদ যুদ্ধের মত পর্যুদস্ত অবস্থার শিকার হয়। ঐ কঠিন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পার্শ্বে অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন

এবং হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর খচ্চরের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্ভিক চিত্তে দাঁড়িয়ে নিম্নের কাব্যাংশ আবৃত্তি করেন।

أَنَا النَّبِيُّ لاَكَذِبْ أَنَابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ـ

অর্থ ঃ 'আমি মিথ্যা কোন নবী নই এবং আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

আল্লাহ মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের অহংকারের কারণে তাদেরকে প্রয়োজনমত শাস্তি দান শেষ করে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে মুসলমানদের পক্ষে এনে দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর প্রশান্তি নাযিল করেন। মুসলমানরা যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আব্বাস, মুসলমানদেরকে একত্রিত হওয়ার আহবান জানান। হযরত আব্বাসের আওয়ায বুলন্দ ছিল। তাঁর আওয়ায শুনে মুসলমানরা রাসূলুল্লাহর (সা) পার্শ্বে জড় হল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী মোশরেকদের একটি দলের উপর রাসূলুল্লাহ (সা) বালু নিক্ষেপ করায় তারা রাসূলুল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মুসলমানরা যখন পুনরায় পূর্ণ উদ্যোগে লড়াই শুরু করল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু পাথরের টুকরা কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করার পর থেকে তারা পরাজিত হতে থাকল। অবশেষে হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা বন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসতে লাগল। আল্লাহ ঐ যুদ্ধে ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করেন।

এই যুদ্ধের ফলে, গোটা আরবে ইসলাম বিরোধী শক্তির মূলোৎপাটন হয়। হোনাইন যুদ্ধের কয়েদী এবং মালে গনীমত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) জো'রানায় অবস্থান করেন। হোনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে অনেক যুদ্ধবন্দী, ৬ হাজার উট, ২৪ হাজার দুম্বা, ৪০ হাজারের বেশী ভেড়া-বকরী এবং ৪ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মালে গনীমত হস্তগত হয়। এটা ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় মালে গনীমত। রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের ময়দানে কোন সহকারী নারী, শিশু, এবং দাস-দাসী হত্যার জন্য নিষেধ করেন। হোনাইনের নিহত একজন মহিলার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْاَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْكَثُرَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ

وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ـ (سورة توبه : ٢٥ـ٢٦)

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে হোনাইনসহ আরো বহু স্থানে সাহায্য করেছেন। যখন তোমরা সংখ্যাধিক্যের গর্ব-অহংকার বোধ করছিলে, তখন সংখ্যা বেশী থাকার কারণেও কোন লাভ হয়নি। বরং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বে তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবং তোমরা পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মোমেনদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং এমন সৈন্য পাঠান যা তোমরা দেখতে পাওনি। তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দেন। আর এটাই হচ্ছে কাফেরদের প্রতিদান।

জো'রানা

মক্কা বিজয়ের পর হোনাইন যুদ্ধ শেষে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই স্থান থেকে উমরাহর এহরাম বাঁধেন। এটি পুরাতন তায়েফ রোডের পার্শ্বে, ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। মক্কাবাসীদের রমযানে অনেকে এই জায়গা থেকেই উমরাহর এহরাম বাঁধে। সেখানে বর্তমানে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। এটাকে 'মসজিদে রাসূল' বলা হয়। হোনাইন যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এই জায়গায় হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রের মালে গনীমত বন্টন করেন এবং ১৫ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে নামায-দোয়া-তাসবীহ আদায় করেন। মসজিদের একটি সুন্দর মিনারা আছে।

জোরানা হচ্ছে, কোরাইশ বংশের রাতা বিনতে কাব নামক মহিলার উপাধি। তার সম্পর্কেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَاتَكُوْنُوا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ـ(سوره نحل : ٩٢)

'তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতো টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) ৮ হিজরীর ১৭ই জিলকদ সেখান থেকে এহরাম পরেন। মক্কার পার্শ্ববর্তী যে সকল এলাকা থেকে লোকেরা উমরাহর এহরাম পরে, জোরানা হচ্ছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মীকাত। কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে এহরাম পরেছেন। এটা হচ্ছে ইমাম শাফেঈ, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের মত।

জো'রানার মসজিদ

জোরানায় একটি পুরাতন মিষ্টি পানির কূপ ছিল। কথিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ কূপের পানি পান করেছেন। ঐ পানি খনিজ পানির মত উপকারী। ঐ পানি কিডনী এবং প্রস্রাব যন্ত্রণার জন্য পরীক্ষিত ওষুধ স্বরূপ। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, আব্বাসী খলীফারা এই পানি বাগদাদে নিয়ে ব্যবহার করেছেন।

নাখলা

মক্কা ও তায়েফের মাঝে নাখলা উপত্যকা অবস্থিত। মক্কা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে, পুরাতন তায়েফ রোডে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই উপত্যকায় মানুষের বসতি তেমন একটা নেই। বর্তমানে সেখানে অল্প সংখ্যক লোক বাস করে। তবে এতে বর্তমানে কৃষিকাজ হয়। নাখলা অর্থ খেজুর গাছ। বর্তমানের কৃষিকাজ দ্বারা প্রামাণ হয় যে, অতীতে সম্ভবতঃ এখানে খেজুর বাগান ছিল। এই জন্যই হয়তো এর নামকরণ করা হয়েছে নাখলা। এই জায়গাটি মিষ্টি পানির কূপের জন্য প্রসিদ্ধ।

নাখলা একটি ঐতিহাসিক স্থান। আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি জিনদের কুরআন শুনার ঘটনা এখানে সংঘটিত হয়েছিল।

সূরা জিনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন যে, একদল জিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে

কুরআন মজীদ শুনেছে। নবী করীম (সা)এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে, উচ্চতর জগতের খবরাখবর জানার জন্য জিনেরা আকাশ লোক হতে কিছু একটা জানাশুনার কোন না কোন একটি সুযোগ পেয়ে যেত। কিন্তু পরে তারা সহসা দেখতে পেল যে, চারদিকে ফেরেশতাদের অত্যন্ত কড়া প্রহরা দাঁড়িয়ে গেছে। আর একই সাথে তাদের উপর অগ্নিপিন্ড বর্ষিত হচ্ছে। কোথাও দাঁড়িয়ে কান লাগিয়ে কিছু একটা শুনে নেয়ার স্থান তারা পাচ্ছে না। পৃথিবীতে এমন কি ঘটে গেল যে, এরকম কঠিন ব্যবস্থাপনা গৃহীত হল! এই প্রশ্নের উত্তর জানার উদ্দেশ্যে জিনদের বিভিন্ন দল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে উকাজ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামায পড়ান। তখন তথ্যানুসন্ধানী জিনদের একটি দল নাখলা এলাকা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় কুরআন পাকের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল এবং মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনল। সম্ভবতঃ এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে সংঘটিত হয়েছিল। সূরায়ে জিনে বহু সংখ্যক কাফের ও মোশরেক জিনের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুরআন শুনার পর তারা মুসলমান হল। নবীর আগমনের কারণে আকাশের খবর চুরি বন্ধ হওয়ার ঘটনা দ্বারা মনে হয় যে, এই ঘটনা রাসূলুল্লাহর (সা) এর নবুওয়াতের প্রাথমিক সময়ের ঘটনা। সূরা জিনের প্রথমে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরায়ে আহকাফের মধ্যেও জিনদের কুরআন শোনার আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের তিন বছর পূর্বে, ১০ম হিজরীতে, রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ যান এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সেখান থেকে ব্যর্থ ও নির্যাতিত হয়ে মক্কা ফিরে আসার পথে নাখলায় জিনেরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সফরসঙ্গী ছিলেন যায়েদ বিন হারেসা (রা)।ঐ জিনেরা হযরত মুসা (আ) এর অনুসারী ছিল বলে সূরা আহকাফের ২৯-৩২ আয়াতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। এই দুটো ঘটনা কি পৃথক পৃথক ঘটনা না একই ঘটনা, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, দুটো পৃথক পৃথক ঘটনা।

জিনদের কুরআন শুনা এবং মুসলমান হওয়ায় ঘটনা দুটো ঐতিহাসিক নাখলায় সংঘটিত হয়। বর্তমানে ঐ এলাকার কবীলা প্রধানের নাখলায় এক বিরাট সুন্দর বাড়ী রয়েছে।

নাখলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে ৮ জন সাহাবীকে সুনির্দিষ্ট যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে ক্ষুধা ও পিপাসায় অধিকতর ধৈর্যধারণকারী আবদুল্লাহ বিন জাহাসকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করলাম। আবদুল্লাহ বিন জাহাস রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। পরে যায়েদ বিন হারেসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহাশকে রাসূলুল্লাহ (সা) বিয়ে করায় আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্যালকে পরিণত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহর হাতে একটি বদ্ধমুখ চিঠি দিয়ে বলেন, দুই দিন সফরের আগে যেন চিঠিটা খোলা না হয়। সাহাবীদের এর কাফেলা আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী রওনা হন এবং দুইদিনের রাস্তা অতিক্রম করার পর চিঠি খুলে জানতে পারেন যে, তাঁদেরকে নাখলা যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নাখলায় পৌঁছে কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করা ছিল তাদের দায়িত্ব।

তারা হঠাৎ করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোরাইশ কাফেলার সাক্ষাত পান। ফলে, তাঁরা কোরাইশ কাফেলার উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মাসে আক্রমণ করে বসেন এবং তাদের একজনকে হত্যা করেন, দুইজনকে আটক করেন এবং একজন ভেগে যেতে সক্ষম হয়। পরে সাহাবাদের ঐ কাফেলা দুইজন বন্দীও গনিমতের মাল নিয়ে মদীনায় হাজির হন এবং নিজেদের তৎপরতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)কে অবগত করেন। তিনি তাঁদের এই কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আমি তোমাদেরকে পাঠিয়েছি কোরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য, আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাইনি। এতে করে সাহাবাদের ঐ কাফেলা মনে করল যে, তাঁরা ঐ কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদেশের খেলাপ করায় অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও তাদেরকে নিন্দা করেন। ফলে, তাঁরা আরো বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে যান।

তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে, কোরাইশরা এই ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে তখন তাঁদের পেরেশানী আরোও বেড়ে যায়। তখন কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ـ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ـ (سورة بقره : ٢١٧)

অর্থ ঃ "হে, রাসূল, আপনাকে তারা পবিত্র মাসে লড়াই করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, লড়াই করা বড় গুনাহ। তবে, আল্লাহর রাস্তা থেকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারাম থেকে বিরত থাকা এবং সেখানকার লোকদেরকে বিতাড়িত করা আল্লাহর কাছে অপেক্ষাকৃত আরো বড় গুনাহ। হত্যা থেকে ফেতনা আরো বেশী জঘন্য।

নাখলার এ যুদ্ধই ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, সেখানকার বিজয়ই প্রথম বিজয়, সেই মালে-গনিমতই ইসলামের প্রথম মালে-গনিমত এবং আবদুল্লাহ্ বিন জাহাসই ইসলামের প্রথম মুসলিম সেনাপতি। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মুসলিম বাহিনীর ঐ কাজকে সমর্থন করেন।

ওসফান

এ শব্দটি 'ওসমান' শব্দের আঙ্গিকে গঠিত। বিদায় হজ্জে এটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বশেষ অবতরণ স্থল। সেখান থেকে তিনি সরাসরি মক্কায় চলে আসেন। ওসফানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন্ উপত্যকা! রাসূলুল্লাহ (সা) জানতেন যে, এটি কোন্ উপত্যকা। তারপরও তিনি এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য প্রশ্ন করেন। আবু বকর (রা) জবাবে বলেন, এটি ওসফান উপত্যকা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُوْدٌ وَّصَالِحٌ عَلٰى بَكْرَيْنِ اَحْمَرَيْنِ خِطَامُهُمَا اللِّيْفُ يُلَبُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ وَفِى رِوَايَةٍ لَقَدْ مَرَّبِهِ نُوْحٌ وَّهُوْدٌ وَّاِبْرَاهِيْمُ -

অর্থ ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহর নবী হযরত হুদ এবং সালেহ (আ) ও দু'টো যুবক লাল উটের পিঠে আরোহণ করে এ উপত্যকা অতিক্রম করেন। তাদের উটের লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরি। তাঁরা তালবিয়া পড়া অবস্থায় হজ্জের উদ্দেশ্যে এ উপত্যকা পাড়ি দিয়ে মক্কা পৌঁছেন। আরেক বর্ণনায় এসেছে, এ উপত্যকা দিয়ে নূহ, হুদ এবং ইবরাহীম (আ) অতিক্রম করেন। রাসূলুল্লাহ সহ মোট ৫জন নবী এ উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করায় উপত্যকাটি একটি বরকতপূর্ণ ঐতিহাসিক উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মক্কা ও জিদ্দা থেকে ওসফান পর্যন্ত বিরাট রাস্তা নির্মিত হয়েছে।

৯. মক্কার ঐতিহাসিক মসজিদ ও পাহাড়সমূহ

মক্কা শহরে বর্তমানে ১৪শ’ মসজিদ রয়েছে। ক্রমান্বয়ে মসজিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মক্কার ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ

১. মসজিদে আবু বকর ঃ এটি মেসফালায় অবস্থিত। কথিত আছে যে, এখানে হযরত আবু বকরের বাড়ি ছিল এবং এখান থেকে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। বর্তমানে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

২. মসজিদে খালিদ বিন ওয়ালিদ ঃ এই মসজিদটি শোবেকা গলিতে অবস্থিত। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের ঝাণ্ডা এখানেই দাঁড় করানো হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাহিনী মক্কার নিম্নভূমির দিক থেকে আগমন করে এখানে অবস্থান করে। বর্তমানে এখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে যা আধুনিক স্থাপত্য ও নির্মাণ কৌশলের স্বাক্ষরবহন করে। মসজিদে একটি মিনারা আছে।

মসজিদে খালিদ বিন ওয়ালিদ

মসজিদ আর-রায়াহ

৩. মসজিদ আর-রায়াহ ঃ মোয়াল্লাহ থেকে মোদ্দাআর দিকে যেতে এই মসজিদটি জোদারিয়ায় অবস্থিত। মসজিদের আগে একটি সরু গলি এসে প্রধান সড়কের সাথে মিশেছে। এই গলিতে যোবাইর বিন মোতয়েমের কূপটি বর্তমানে অব্যবহৃত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঝাণ্ডা এখানে দাঁড় করানো হয়েছিল। এতে একটি মিনারা আছে। এর অদূরেই মসজিদে জিন অবস্থিত। এটি জিন মসজিদ থেকে দক্ষিণে অবস্থিত। মসজিদের কাছেই রয়েছে মোআল্লা কবরস্থানের প্রবেশপথ।

১৩৬১হিজরীতে, এই মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। মসজিদের ভিত্তিমূল খননের সময় দু'টো পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এটি আসলেই মসজিদ আর-রায়াহ। একটি পাথরে ৮৯৮ হিজরী এবং অন্যটিতে ১ হাজার হিজরী লেখা আছে। শেখ তাহের কুর্দী বলেন, মসজিদ পুনঃনির্মণের সময় পাথর দু'টোকে আমরা দেয়ালে দেখেছি।

আযরাকী লিখেছেন, কুসাই বিন কিলাব প্রথমে কূপটি খনন করেন। পরে মাটিচাপা পড়ে গেলে যোবাইর বিন মোতয়েম কূপটি পুনঃখনন করেন।
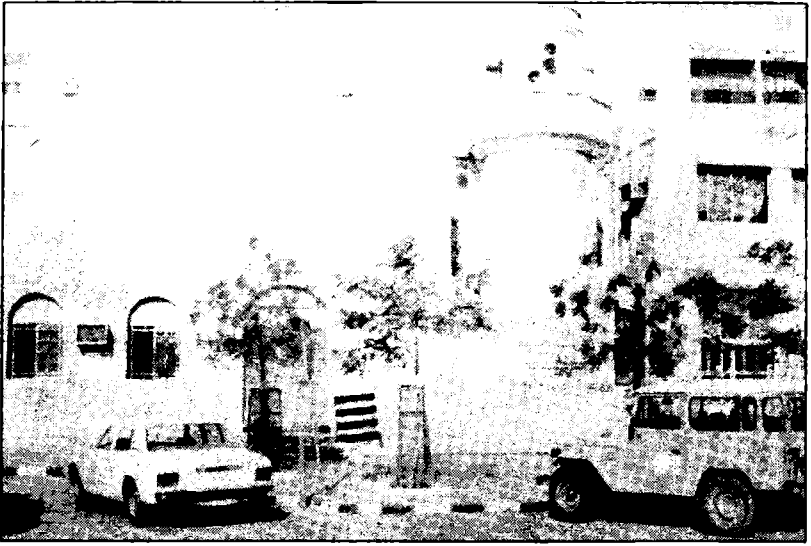
মসজিদে জিন

৪. মসজিদে জিন ঃ মসজিদে জিন মোয়াল্লাহ কবরস্থানের পার্শ্বে অবস্থিত। বর্তমানে খুব সুন্দর ও মজবুত করে সেখানে মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। জিনদের কুরআন শুনার রাত্রে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে জায়গায় দাগ এঁকেছিলেন, বর্তমান মসজিদটি সেখানে অবস্থিত। এতে সুন্দর একটি মিনারা রয়েছে।

মক্কায় জিনেরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে অন্ততঃ ৬ বার এসেছে বলে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ রাতে জিনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার সঙ্গে কে যাবে। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। মক্কার উচ্চভূমিতে এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ (সা) রেখা টেনে আমাকে বললেন, এই রেখা অতিক্রম করে সামনে যাবে না। তারপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কুরআন পড়া শুরু করলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়েই সেখানে বহুসংখ্যক লোককে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা) কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাঝে তারা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইবনে মাসউদ আরেক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে জিনের সাক্ষাতের জন্য গেলেন। হুজুনে রাসূলুল্লাহ (সা) জিনের একটি মামলার বিচার করে দিলেন। জিনেরা মূলতঃ ইসলাম শেখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করতে আসত।

৫. মসজিদে বাইআহ ঃ আ'কাবা হচ্ছে, মক্কার দিকে মিনার পশ্চিম সীমান্তের নাম। মক্কার দিক থেকে মিনার শুরু এই আকাবা থেকেই। মসজিদে বাইআহ, আকাবা থেকে আধা কিলোমিটার দূরে মক্কার দিকে অবস্থিত। এই মসজিদটি দুই পাহাড়ের মাঝখানে ঢালু এলাকায় বিদ্যমান। বর্তমান মসজিদের স্থানেই মদীনাবাসী আনসাররা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে পরপর দু'বার বাইআত গ্রহণ করেন। এটাকে ইসলামের পরিভাষায় আকাবার ১ম ও ২য় শপথ বলা হয়। মসজিদে একটি মিনারা রয়েছে।

হযরত উমর ফারুক (রা) আ'কাবার পরে রাত্রি যাপন না করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা মিনায় রাত্রি যাপন কর। (ইবনে আবি শায়বা, বায়হাকী)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাবা হচ্ছে মিনার সর্বশেষ সীমা। বড় জামরাহও আকাবায় অবস্থিত। এজন্য এটাকে জামারাতুল আকাবা বলে।
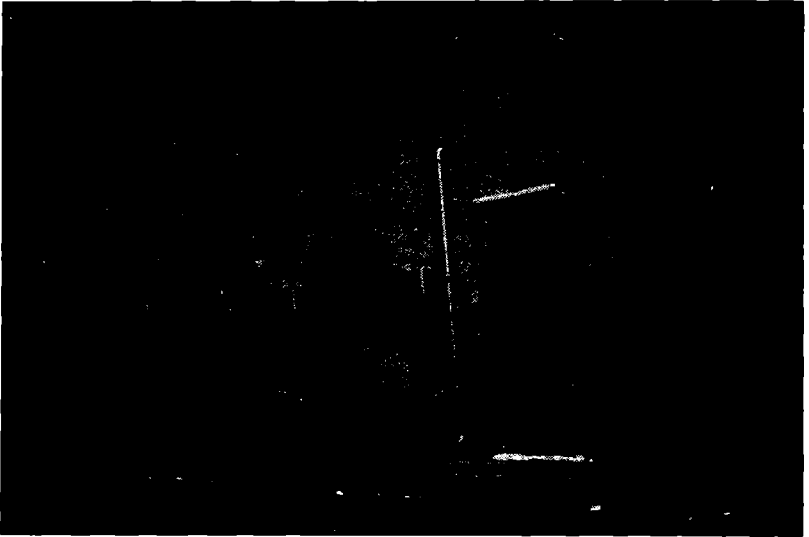
মসজিদে বাইয়াহ

রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ মওসূমে মিনার দিকে মক্কার বাইরে থেকে আগত লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। আকাবায় পৌঁছার পর তিনি মদীনার খাযরাজ বংশের একটি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত পান। তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআন পাঠ করে শুনান। তারা মদীনায় ইহুদীদের প্রতিবেশী ছিল। তারা ইহুদীদের মুখে একজন নতুন নবীর আগমনের অপেক্ষার কথা শুনতে পেয়েছিল এবং একথাও শুনেছিল যে, সেই শেষ নবী আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াত কবুল করে বলল, আমরা আমাদের গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের কাছেও আপনার এই দাওয়াত পেশ করবো। তাঁরা মদীনায় গিয়ে নতুন নবীর দাওয়াত পেশ করল এবং তা গোটা মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল।

পরের বছর হজ্জ মওসূমে ১২জন মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আকাবায় সাক্ষাত করে তাঁর কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁরা তাওহীদ-বিশ্বাস, চুরি, জেনা এবং সন্তান হত্যা না করা ও নেক কাজে আনুগত্যের শপথ করল। মদীনা ফিরে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে হযরত মোসআব বিন উমায়েরকে পাঠান এবং তাদেরকে কুরআন, ইসলাম ও দ্বীন শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন। তিনি মদীনায় কারী বলে পরিচিতি লাভ করেন এবং আসআ'দ বিন যোরারার ঘরে অবস্থান করেন। তিনি তাদের নামাযের ইমামতিও করতেন।

মদীনায় আউস-খাযরাজ গোত্রে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আউস গোত্রের বনি আবদুল আশহাল শাখাদ্বয়ের সর্দার হযরত সাদ বিন মোয়া'জ এবং উসাউদ বিন হোদাইরও ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে বনি আবদুল আশহাল গোত্রের আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করা থেকে দূরে রইল না।

আকাবার প্রথম শপথের কারণে, মদীনায় মুসলমানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে লাগল। পরের বছর হযরত মোস'আব বিন উমায়ের, হজ্জ মওসূমে মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর সাথে মদীনার মোশরেকদের সঙ্গে অনেক মুসলমানও হজ্জে আসেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আকাবার নিকট সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেন। হজ্জ সেরে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহত হওয়ার পর তাঁরা পূর্বনির্ধারিত স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করেন। মোট ৭৫ জনের মধ্যে দুইজন ছিলেন স্ত্রীলোক। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আপন চাচা আব্বাস (তখন
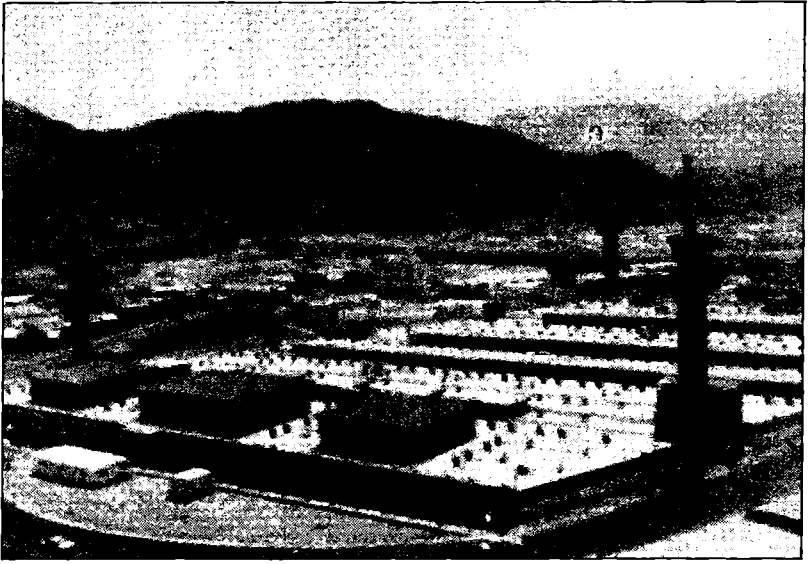
মসজিদে খায়ফ

তিনি অমুসলমান)-কে সাথে নিয়ে আকাবায় উপস্থিত হন। তিনি তাদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহ দেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে এই বাইআত নিলেন যে, তাঁরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যেসব বিপদ-মুসীবত থেকে রক্ষা করেন অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সা) কেও হেফাজত করবেন। তাঁরা একথার উপর মজবুত বাইআত গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের মধ্যে ১২ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ৯ জন খাযরাজ এবং তিনজন আউস গোত্র থেকে।

৬. মসজিদে মিনা ঃ ছোট ও মধ্যম জামরাহর মাঝখানে, আরাফাতের দিকে যাওয়ার সময় হাতের ডানে মসজিদে মিনা অবস্থিত। এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা) এশরাকের নামায পড়েছেন বলে জানা যায়। এই মসজিদটির অপর নাম হচ্ছে মসজিদে মানহার। মসজিদটি বর্তমানে নেই।

৭. মসজিদে খায়ফ ঃ মসজিদে খায়ফ মিনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং আরাফাতে যাওয়ার সময় হাতের ডানে পড়ে। এই মসজিদটি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় অবস্থানের জায়গায় নির্মিত হয়েছে। তিনি এই জায়গায়

মিনায় অবস্থানকালীন নামাযগুলো পড়েছেন। বর্তমানে সেখানে বিরাট এয়ারকণ্ডিশন-যুক্ত মসজিদ এবং পার্শ্বে অজুর স্থান ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে চারটি সুন্দর মিনারও তৈরী হয়েছে।

এই মসজিদের ফজীলত সম্পর্কে তাবরানীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে তোমরা সফর করোনা, সেই তিন মসজিদ হচ্ছে, মসজিদে খায়ফ, মসজিদের হারাম এবং আমার মসজিদ। এই হাদীসটি তাবরানী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি। অন্যান্য হাদীসে মসজিদে খায়ফের কথা উল্লেখ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, এই মসজিদে ৭০ জন নবী নামায পড়েছেন। এর মধ্যে হযরত মুসা (সা) ও রয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তাঁর দিকে দেখছি এবং তাঁর শরীরে দু'টো আবা এবং উটের উপর দুটো গদি রয়েছে। বর্তমান মসজিদের আয়তন হচ্ছে ২৪ হাজার বর্গমিটার। এতে একসাথে ১ লাখ ৪৫ হাজার মুসল্লীর নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের পার্শ্বেই রয়েছে বাদশাহ আঃ আযীয কল্যাণ সংস্থার বিল্ডিং। হজ্জের সময় এই সংস্থা গরীব হাজীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করে।

৮. মসজিদে কাউসার ঃ এই মসজিদটি মিনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এখানে সুরা কাউসার নাযিল হয় এবং সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর নির্দেশ দেন। কেননা, তাতে কুরবানী করার নির্দেশ রয়েছে। মসজিদের কাছে একটি কূপও ছিল। কিন্তু মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে এর কোন চিহ্ন নেই।

৯. মসজিদে কাবস ঃ এই মসজিদটি জামরাহ আকাবার উত্তর দিকে ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত। মক্কা থেকে আরাফাত যাওয়ার সময় বাম দিকে যে সাবীর পাহাড়, তার ঢালুতে এটি অবস্থিত।

কেউ কেউ বলেন, এই মসজিদের স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর জন্য ইসমাঈলকে জবেহ করার পরিবর্তে একটি দুম্বা নাযিল হয়েছিল। আসলে এসব কথার কোন প্রমাণ নেই। বর্তমানে মসজিদটি নেই।

মসজিদের পার্শ্বেই বিরাট একটি পাথর আছে। কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর দুম্বাটি জবেহ করেন। এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে বলা হয় যে,

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও ইবরাহীম (আ) এর জবেহর স্থানে জবেহ করেছেন। অর্থাৎ সেই পাথরটির উপর জবেহ করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে পশু জবেহ করেননি, বরং তিনি দুই জামরাহর মাঝখানে জবেহ করেছেন।

১০. মসজিদে নামেরাহ ঃ এটিকে মসজিদে ইবরাহীমও বলা হয়। এটি আরাফাহ এবং উরানাহ উপত্যকার মাঝে অবস্থিত। এর পূর্ব অংশ আরাফাহ এবং পশ্চিম অংশ উরানা উপত্যকা। এটিকে মসজিদে উরানা বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাহ দিবসে সূর্য হেলার আগে নামেরা উপত্যকায় অবস্থান করেন। সূর্য হেলার পর তিনি আরাফাহর ভেতর যান এবং জোহর ও আসর একসাথে পড়েন এবং নামাযের আগে খোতবা দেন। বর্তমানে এটিকে বিরাট মসজিদ হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এতে এয়ারকণ্ডিশন রয়েছে। এতে ৬০ মিটার উঁচু সুন্দর ৬টি মিনারা ও ১৪ মিটার উঁচু ৩টি গোলাকার গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রায় তিন লাখ ৫০ হাজার লোক এক সাথে নামায পড়তে পারে।

হজ্জ মন্ত্রণালয়, মসজিদটিকে পূর্বের তুলনায় ৫গুণ বড় করে সম্প্রসারণ করেছে। এতে বিশেষ নকশা ও কারুকার্য করা হয়। এর বর্তমান আয়তন হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার। মসজিদে ১ হাজার টয়লেট ও বিরাট অজুর জায়গা রয়েছে।

মসজিদে নামেরাহ

মসজিদের বাইরে পূর্বদিকে ১০ হাজার মিটার জায়গার উপর শেড নির্মাণ করা হয়েছে। শেডে ও অনেক মুসল্লীর নামায পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের সাথেই রয়েছে বাদশাহ আবদুল আযীয কল্যাণ সংস্থার ভবন। আরাফাতের দিন এই ভবনের হল রুমে, গরীব হাজীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। মসজিদের ভেতর সর্বাধুনিক দু'টো পূর্ণাঙ্গ বেতার নেটওয়ার্ক আছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এগুলোর মাধ্যমে হজ্জের দিন মসজিদের নামায ও খোতবা রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ১৪০৯ হিজরীতে, আরব ও মুসলিম বিশ্বের রেডিও টেলিভিশন কর্মীরা আরাফাতসহ পবিত্র স্থানসমূহ থেকে হজ্জের জীবন্ত বর্ণনা পেশ করে।

বাংলাদেশসহ দূর-দূরান্তের মুসলিম দেশগুলোতে আরাফাতের ময়দান থেকে হজ্জের দৃশ্য দেখানো হয়।

১১. তানঈম ঃ মসজিদে আয়েশা ঃ তানঈম হচ্ছে হারাম এলাকার শেষ সীমানা এবং এর চাইতে নিকটবর্তী সীমানা অন্য কোনটি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় আবদুর রহমান বিন আবু বকরকে এখান থেকেই হযরত আয়িশা (রা) কে উমরাহ করানোর নির্দেশ দেন।

এখানে একটি মসজিদ আছে। একে মসজিদে আয়িশা বলে। বহুবার ঐ মসজিদটিকে ভেঙ্গে গড়া হয়। সম্প্রতি এটাকে অতিসুন্দর বৃহদাকার এক মসজিদ হিসেবে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এটি একটি সর্বাধুনিক সুন্দর ডিজাইনের মসজিদ। উমরাহর এহরাম বাঁধার লোকজনের অজু-গোসল-এস্তেনজার জন্য পানি এবং টয়লেটের সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর বর্তমান আয়তন হচ্ছে ৬ হাজার বর্গমিটার। তাতে এক সাথে ১২ হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারে। এতে ৫৫০টি টয়লেট এবং অজুর জন্য ৭শত স্বয়ংক্রিয় কল লাগানো হয়েছে। মসজিদটিতে দু'টো সর্বাধুনিক ডিজাইনের মিনার তৈরী করা হয়েছে এবং মহিলাদের নামায ও টয়লেটের পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। এহরামের জন্য জো'রানার পর মসজিদে আয়েশাই হচ্ছে উত্তম, জো'রানা হচ্ছে সর্বোত্তম।

আযরাকী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে যোবায়ের (রা) কা'বা শরীফ নির্মাণ শেষে এই মসজিদটির সংস্কার করেন এবং এতে কাবাতী কাপড়ের গেলাফ লাগান। তারপর তিনি আহবান করেন যে, আমার প্রতি খলিফা হিসাবে যাদের আনুগত্য
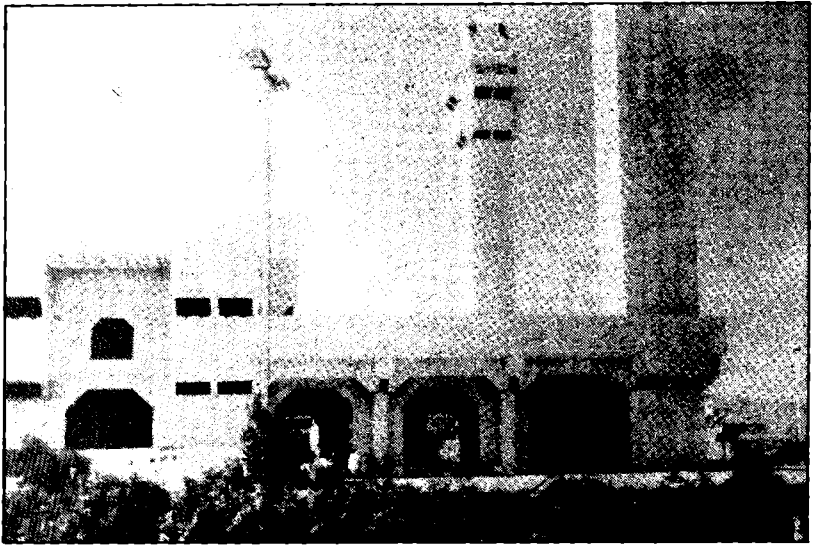
মসজিদে আয়েশা

রয়েছে তারা যেন তানঈমে আমার সাথে উমরাহর এহরাম করার জন্য যায় এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন উট কুরবানী করে। যাদের এই সামর্থ্য নেই, তারা যেন ভেড়া জবেহ করে। যাদের এতটুকু সামর্থ্যও নেই তারা নিজেদের সাধ্যমত দান- সদাকাহ করবে। তাঁর আহবানে সবাই পায়ে হেঁটে তানঈমে যান এবং সেখান থেকে উমরাহর এহরাম বাঁধেন। তাঁরা আল্লাহর শোকরিয়া স্বরূপ এই উমরাহ করেন। ঐ দিনের চাইতে বেশী দাস মুক্তি, উট ও ভেড়া-বকরী জবেহ এবং সদকা অন্য কোন দিন হতে দেখা যায়নি। সে দিন ইবনে যোবায়ের (রা) একশ'টি উট জবেহ করেছেন।

আযরাকী ইবনে খায়সাম থেকে আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আতা বিন আবি রেবাহ, মুজাহিদ এবং আবদুল্লাহ বিন কাসীরুদ্দায়ী ২৯ শে রমযানের রাত্রিতে তানঈমে গিয়ে এহরাম বেঁধে আসতেন।

ইমাম শাফেঈ (রা) বলেন, জোরানা থেকে এহরাম বাঁধা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই সেখান থেকে এহরাম বেঁধেছেন। তারপর উত্তম হচ্ছে, তানঈম থেকে এহরাম বাঁধা। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশাকে সেখান থেকে এহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর হচ্ছে হোদায়বিয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) সেখান দিয়ে হারামে ঢুকতে চেয়েছেন এবং পরে সেখানেই হালাল হয়ে যান।

তানঈমে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দু'জন বড় সাহাবী শহীদ হন। তাঁরা হচ্ছেন, যায়েদ বিন দাসেনা এবং খোবাইব বিন আদী। ঐ দু'জন সাহাবী "আসহাবুর রাজীই" এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের ৬ জনের ৪ জনকেই শহীদ করা হয়েছে। হোজাইল গোত্র তাদের দু'জনকে মক্কার কোরাইশদের কাছে তাদের গোত্রের আটক লোকদের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, যায়েদ বিন দাসেনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া, তার পিতা উমাইয়া বিন খালাফের হত্যার প্রতিশোধের জন্য কিনে নেয়।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া নিজ গোলাম নিসতাসকে নির্দেশ দিল যায়েদ বিন দাসেনাকে হত্যার জন্য হারাম এলাকার বাইরে তানঈমে নিয়ে যেতে। সেখানে মক্কার কোরাইশদের একটি দল একত্রিত হল। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারবও ছিল। যায়েদকে হত্যার আগে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, হে যায়েদ, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমার স্থানে যদি এখন আমাদের হাতে মুহাম্মাদ থাকত তাহলে তুমি নিজ পরিবারে বাস করা অবস্থায় তাকে হত্যা করা কি পছন্দ করতে? যায়েদ উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহর কসম! হযরত মুহাম্মাদ (সা) বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় আমি আমার নিজ পরিবারে বাস করার সময়ে তাঁর গায়ে একটা কাঁটা লাগুক সেটাও পছন্দ করবো না। তারপর আবু সুফিয়ান বলল, আমি কাউকে মুহাম্মদকে তার সাহাবীরা যেরূপ ভালবাসে তার চাইতে বেশী ভালবাসতে দেখিনি। তারপর নিসতাস তাঁকে সেখানে হত্যা করে।

ইবনে ইসহাক বলেন, খোবাইবকে হোজাইর বিন আবি আহাব তামীমী ক্রয় করে এবং তানঈমে শুলবিদ্ধ করে হত্যার জন্য নিয়ে আসে। তাঁকে সেখানে শহীদ করা হয়।

মক্কার ঐতিহাসিক পাহাড়সমূহ

১। হেরা বা নূর পাহাড় ঃ এখানকার প্রসিদ্ধ গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা) ধ্যান করতেন এবং সেখানেই তাঁর উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়।

২। সাওর পাহাড় ঃ এখানেও একটি বিরাট গুহা আছে। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এতে আত্মগোপান করেছিলেন।

৩। আবু কোবায়েস পাহাড় ঃ এটি মসজিদে হারামের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনা মতে, হাজারে আসওয়াদকে এই পাহাড়ে আমানত রাখা হয়েছিল। অপর দিকে, পাহাড়টির মেসফালার মুখের অংশে রাসূলুল্লাহ (সা) চাঁদকে দুই টুকরো করার পর চাঁদ এখানে এসে পড়েছে বলে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তার কোন সনদ নেই। বর্তমানে পাহাড়টির উপরে বাদশাহর তিনটি রাজ প্রাসাদ, নিরাপত্তা ভবন এবং রাজকীয় অতিথি ভবন তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ের উপরে মসজিদে ইবরাহীম আল-কিঈসীর নির্মিত একটি মসজিদ আছে। অনেকে ভুল করে সেটাকে মসজিদে ইবরাহীম খলীল কিংবা মসজিদে বিলাল বলে, কিন্তু আসলে তা সঠিক নয়।

৪। খন্দমা পাহাড় ঃ এটি আবু কোবায়েস পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত এবং দুই পাহাড়ের মধ্যে বর্তমানে একটি রাস্তা আছে। কথিত আছে যে, এই পাহাড়ে ৭০ জন নবীর কবর আছে। তবে, এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই।

৫। সাবীর পাহাড় ঃ এটি মিনায় অবস্থিত এবং আরাফাতে যাওয়ার সময় হাতের ডানে পড়ে। এই পাহাড়ে হযরত ইবরাহীম (আ) এর জন্য ইসমাঈলের কুরবানীর পরিবর্তে একটি দুম্বা এসে পড়ে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের আগে এবং ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার সময় এতে এবাদত করেছেন।

৬। গার আল-মোরসালাত ঃ এটি সাবীর পাহাড়ের বিপরীত দিকের পাহাড়ে অবস্থিত একটি গুহার নাম। এটি মসজিদে খায়েফের দিকে এবং এর কাছে অবস্থিত। বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মিনার একটি গুহায় অবস্থান
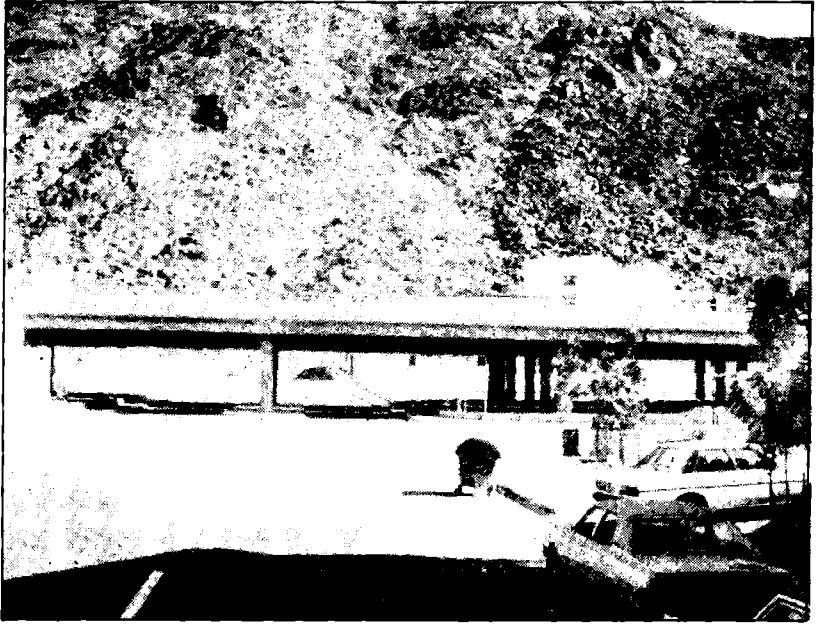
জাবালে সাবীর

জাবালে রহমত

করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর সূরা والمرسلات নাযিল হয়।

৭। জাবালে রহমত ঃ এই পাহাড়টি আরাফাত ময়দানের মাঝে অবস্থিত। এটিকে 'আরাফাত পাহাড়' এবং 'দোয়ার পাহাড়'ও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন এই পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে বড় পাথরগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করেছেন, পাহাড়ের উপর ওঠেননি। তাই হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহর অনুকরণে জাবালে রহমতের পার্শ্বে দাঁড়ানো সুন্নাত। তবে পাহাড়ের উপর উঠার কোন বিশষ ফজীলত নেই। আরাফাতের সর্বত্রই অকুফের স্থান।

জাবালে রহমত ছাড়াও আরাফাতের ভেতর আরও ছোট পাহাড় আছে। এই নিয়ে আরাফাতের ভেতর মোট ছোট পাহাড়ের সংখ্যা হচ্ছে- দুটো।

১০. হজ্জ

হজ্জের তাৎপর্য

আরবীতে 'হজ্জ' শব্দের অর্থ হচ্ছে যিয়ারতের ইচ্ছা করা। কা'বা শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মুসলমানরা এই কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে বলে তাদের এই যিয়ারতকে হজ্জ বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে, হজ্জের মাসে পবিত্র মক্কায় সুনির্দিষ্ট হুকুম আহকাম পালন করার নাম হচ্ছে হজ্জ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَفَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ - (ال عمران :٩٧)

অর্থ ঃ সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর আল্লাহর ঘরের হজ্জ ফরজ। যে ব্যক্তি তা অমান্য করে, আল্লাহ্ গোটা বিশ্বের সকল কিছু থেকে প্রয়োজনমুক্ত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে–

بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ .... وَحَجُّ بَيْتَ اللّٰهِ الْحَرَامِ -

অর্থ ঃ ইসলামের ৫টি মৌলিক স্তম্ভ আছে।

৫মটি হচ্ছে আল্লাহর সম্মানিত ঘরের হজ্জ করা।

সুনানে সাঈদ বিন মানসুরে বর্ণিত। হযরত উমর (রা) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয়, কিছু সংখ্যক লোককে বিভিন্ন শহরে পাঠাই, তারা খুঁজে দেখবে যে, যে সকল লোকের উপর হজ্জ ফরজ কিন্তু তারা হজ্জ আদায় করছে না, তাদের উপর জিযিয়া কর চাপিয়ে দিক। কেননা, তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়। হযরত আলী (রা) বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ করেনা, সে ইহুদী কিংবা খৃস্টান হয়ে মরুক তাতে কিছু যায় আসে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

تَعَجَّلُوْا اِلَى الْحَجِّ يَعْنِى الْفَرِيْضَةَ فَاِنَّ اَحَدَ كُمْ لاَيَدْرِىْ مَايُعْرَضُ لَهُ -

অর্থ ঃ তোমরা ফরজ হজ্জ তাড়াতাড়ি আদায় কর। কেননা, তোমাদের কেউ নিজ ভাগ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু জানেনা। (আহমদ)

হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করেন, হে রাসূলুল্লাহ! মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরজ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَقِتَالَ فِيْهِ ـ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ـ

অর্থ ঃ মহিলাদের উপর এমন জিহাদ ফরজ করা হয়েছে যাতে কোন লড়াই নেই, আর তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা করা। (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

উপরোল্লেখিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ ফরজ এবং দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে সামর্থ্যবান প্রতিটি লোকের উপর তা অবশ্য করণীয়।

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন, 'স্মরণ কর, আমরা যখন ইবরাহীমের জন্য এই ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম– এই কথা বলে যে, এখানে কোন প্রকার শিরক করোনা এবং আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পবিত্র রাখ। আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যে আহবান জানাও তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে কিংবা দূর দূরান্ত হতে কৃশ উটের পিঠে চড়ে। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য কল্যাণের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া পশুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে। তা হতে নিজেরাও খাবে এবং অভাবী লোকদেরকেও খেতে দেবে।' (সূরায়ে হজ্জ-২৬)

হজ্জ হচ্ছে ইসলামের ৫ম রোকন বা স্তম্ভ। হজ্জের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং ঈমান ও ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের জন্য আল্লাহর ঘরে এসে হাজিরা দেয়া এবং লাব্বাইকা বলে নিজের সার্বিক প্রস্তুতি ও আনুগত্যের ঘোষণা দেয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ও একামতে দ্বীনের যে চেষ্টা চলছে তার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মক্কা। আর দুনিয়ার যারাই ইসলামী আদর্শের অনুসারী এবং এর বাস্তবায়নে আগ্রহী, তারা যে জাতি বা যে দেশেরই নাগরিক হউক না কেন, সকলকে প্রতিবছর এই কেন্দ্রে সমবেত করার জন্যই হজ্জের বিধান চালু করা হয়েছে। মুসলমান এখানে এসে ঘোষণা দেবে– লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা। হে আল্লাহ, হাজির, হে আল্লাহ তোমার দরবারে হাজির। এতে করেই হজ্জের মূল উদ্দেশ্যে পৌছা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

হজ্জ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন। এতে সকল বর্ণ, বংশ ও সব দেশের লোকেরা হাজির হয়ে প্রমাণ করে যে, সকল মানুষই সমান। কারো উপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সবাই সেলাইবিহীন এহরামের কাপড় পরে মুর্দার কাফনের মিছিলে শরীক হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং সেটাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

হজ্জে আল্লাহর জিকর ও স্মরণকে বৈধ করা হয়েছে এবং অন্যায় ও বেহুদা কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَاذْكُرُوْهُ كَمَاهَدَاكُمْ (بقرة : ١٩٧)

অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে বলে দিয়েছেন সেভাবে তাঁর স্মরণ বা জিকর কর। আল্লাহ আরো বলেন ঃ

فَلاَرَفَثَ وَلاَفُسُوْقَ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ (البقرة : ١٩٧)

যৌন আচরণ, ফাসেকী ও ঝগড়া-বিবাদ এবং যুদ্ধ করা যাবে না।

فَاذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْاَشَدَّذِكْرًا ـ (اَلبقرة : ١٩٩)

অর্থ ঃ হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো যখন শেষ হবে তখান তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেভাবে তোমরা স্মরণ কর ঠিক অনুরূপ কিংবা এর চাইতে বেশী করে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর।

শ্রেষ্ঠ এবাদত ঃ

হজ্জের মধ্যে অন্যান্য সকল এবাদতের সমারোহ ঘটেছে। হজ্জ হচ্ছে, অন্যান্য এবাদতসমূহের মিলনকেন্দ্র। হজ্জের মধ্যে ঈমান পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তাওহীদ বিশ্বাস ঈমানের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। হজ্জের মূলকেন্দ্র কা'বা শরীফ সেই তাওহীদের উজ্জ্বল প্রতীক। শেরক ভিত্তিক ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে এই কা'বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে আছে। জেকর' এর দিক থেকে হজ্জের সাথে নামাযের মিল রয়েছে। কেননা, নামাযের মত হজ্জও জেকরে পরিপূর্ণ। হজ্জে অর্থ ব্যয় এবং কোরবানী যাকাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রোযার মধ্যে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ। হজ্জ এবং উমরার এহরামকালীন সময়ে যৌন আচরণসহ যে কোন সাজ-সজ্জা নিষিদ্ধ। মিনার জামরায় পাথর নিক্ষেপ করার সাথে ইসলামের শ্রেষ্ঠ এবাদত-জেহাদের মিল রয়েছে। এর মাধ্যমে হাজী সৈনিকের

মত সঠিক লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার উদ্দেশ্যে চাঁদমারীর প্রশিক্ষণ নেয়। হাজী পরবর্তীতে গাজী বা আল্লাহর সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে শয়তানের সকল ব্যবস্থা ও মতের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

এহরামের পোশাক পরে হাজী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান-মালের সার্বিক ত্যাগ ও কোরবানীর প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে। লাব্বাইকা, প্রভু হে আমি হাজির॥ একথা তারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে অনুভব করে যে সে যেন আল্লাহর হাতে সার্বিক ত্যাগ ও আনুগত্যের বায়আত বা শপথ নিয়েছে। কা'বার চারপাশে তওয়াফ করে সে আল্লাহর প্রেমের আগুনে শ্যামা পোকার মত ঘুরে ঘুরে আত্ম নিবেদনের কথা ঘোষণা করছে। তওয়াফ একত্ববাদী মোমেনের বিশ্বব্যাপী একতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা দূরত্বের সকল বন্ধন ডিঙিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে এই মিলনকেন্দ্রে একাকার করে দেয়। কাবা হচ্ছে ঐক্যের পুঁতিমালা আর মুসলমানরা হচ্ছে মালার রশিতে গাঁথা পুঁতি। হজ্জের কোরবানী হচ্ছে এসকল শিক্ষার সর্বশেষ আপোষহীন স্তর। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কোরবানী দিয়ে হাজী যেন নিজেকে কুরবান করার বাস্তব নমুনা পেশ করল। এই আলোকে হজ্জ কতই না মহান এবাদত!

হজ্জের ফজীলত

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ (بخارى ومسلم)

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস ও গুনাহ হতে দূরে থেকে হজ্জ পালন করে সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কে উত্তম আমল কোনটি এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। তারপর কোনটি উত্তম আমল এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবারও প্রশ্ন করা হল এরপর কোনটি উত্তম আমল? তিনি বলেন, কবুল হজ্জ।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ ـ

অর্থ ঃ এক উমরাহ আরেক উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহর কাফফারা এবং কবুল হজ্জের বিনিময় বেহেশত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হযরত আমর বিন আস (রা) মৃত্যুর মুহূর্তে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেঁদে বলেন, আল্লাহ যখন আমার অন্তরকে ইসলাম কবুলের জন্য প্রস্তুত করলেন, তখন আমি নবী করীম (সা) এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ডান হাত বিছিয়ে দিন, আমি বাইআ'ত নেবো। রাসূলুল্লাহ (সা) হাত বিছালেন। কিন্তু আমি নিজ হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করেন, হে আমর, তোমার কি হল? তখন আমি জবাব দিলাম, বাইআ'তের পূর্বে আমি কিছু শর্ত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আমার গুনাহ মাফ হতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম গ্রহণের পর আগের সব গুনাহ শেষ হয়ে যায়, হিজরতের পর হিজরতের আগের গুনাহ এবং হজ্জের পর হজ্জের আগের গুনাহ মাফ হয়ে যায়? (ইবনে খোযায়মা, সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দুটো আমল অতি উত্তম এবং যারা অনুরূপ অন্য কোন আমল করে তারা ছাড়া আর কেউ এত উত্তম আমল করে না। সে দুটো আমল হচ্ছে কবুল হজ্জ এবং উমরাহ। (আহমদ)

হযরত মায়েজ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল উত্তম? তিনি জবাবে বলেন, এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং কবুল হজ্জ। এই আমল দুটো সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের স্থানের মাঝখানে অন্য যে কোন আমলের চাইতে উত্তম। (আহমদ)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা হজ্জ এবং উমরাহ আদায় কর। এই দু'টো অভাব এবং গুনাহকে এমনভাবে পরিষ্কার করে যেমন ফাঁপর লোহা, সোনা এবং রূপার মরিচা পরিষ্কার করে। কবুল হজ্জের জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব নেই।

তাবরানী হযরত আবদুল্লাহ বিন জারাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

حُجُّوْا فَاِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلِ الذُّنُوْبَ كَمَايَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ ـ

অর্থঃ তোমরা হজ্জ আদায় কর। কেননা, পানি যেমন ময়লা পরিষ্কার করে, হজ্জও তেমনি গুনাহ পরিষ্কার করে। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত হাদীসে حج مبرور বা কবুল হজ্জ কি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হয়। অর্থাৎ, بر কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, খানা খাওয়ানো এবং ভাল কথা বলা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, খানা খাওয়ানো এবং বেশী বেশী সালাম দেয়া। অভাবী মানুষকে খানা খাওয়ানো, সর্বদা ভাল কথাবলা এবং মানুষকে সালাম দেয়া আদর্শ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা কবুল হজ্জের লক্ষণ।

নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খোযায়মা এবং ইবনে হিববান হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হাজী এবং উমরাহ আদায়কারী লোকেরা আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা দোয়া করলে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন।

হাদীসটি হচ্ছে–

اَلْحَجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ ـ

তাবারানী হযরত আবুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার মাবুদ! যে বান্দাহরা তোমার ঘর যিয়ারত করে তাদের জন্য তোমার কাছে কি রয়েছে? আল্লাহ উত্তরে বলেন, যার যিয়ারত করা হল তার উপর প্রত্যেক যিয়ারতকারীর অধিকার রয়েছে। হে দাউদ, আমার উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, আমি তাদেরকে দুনিয়ায় করুণা দান করবো এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের দিন ক্ষমা করে দেবো।

হাদীসটি হচ্ছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : اِلٰهِيْ مَا لِعِبَادِكَ عَلَيْكَ اِذَاهُمْ زَارُوْكَ فِيْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى اَلْمَزُوْرِ حَقًّا يَادَاوُدُ لَهُمْ عَلَيَّ اَنْ اُعَافِيْهِمْ فِي

الدُّنْيَا وَاغْفِرْ لَهُمْ اِذَا لَقِيْتُهُمْ -

তাবারানী সাহল বিন সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاحَ مُسْلِمُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مُجَاهِدًا اَوْ حَاجًّا مُهِلاً اَوْ مُلَبِيًا اِلاَّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوْبِهِ وَخَرَجَ مِنْهَا -

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলমান যদি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কিংবা তাকবীর ও তালবিয়াসহ হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বের হয়, তাহলে, সূর্য ডুবার সাথে সাথে তাদের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং তারা নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হাকেম আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! হাজীর গুনাহ মাফ কর এবং হাজী যাদের জন্য ক্ষমা চায় তাদের গুনাহ্ও মাফ কর।'

উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা হজ্জ এবং এবং উমরাহর ফজীলত কত বেশী তা বুঝা গেল। হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল উত্তম? তিনি জবাবে বলেন, 'তালবিয়া পাঠ করে হজ্জ করা এবং কুরবানী করা।' (তিরমিযী) হজ্জ উপলক্ষে এই দু'টো কাজই করা লাগে। এছাড়াও হজ্জ সম্পর্কে ফাকেহী হাসান বসরী থেকে একটি চমৎকার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আরশের নীচের ধনভাণ্ডারসমূহের মধ্যে তিনটি বিষয় হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) কোন ব্যক্তির কাছে যদি ১ লাখ পরিমাণ মুদ্রা থাকে তবুও সে হজ্জ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আরশের নীচের একজন আহবানকারী এই আহবান করে যে, এই বছর অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ হজ্জ করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

(২) কারো নিকট যদি ১ লাখ পরিমাণ মুদ্রা থাকে, তথাপি সে উমরাহ্ করার তৌফিক লাভ করবে না যে পর্যন্ত না আরশের নীচের একজন আহবানকারী এই বলে আহবান করবে যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে উমরাহ্ করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

(৩) মোশরেকেরা ১ লাখ তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে চাইলেও সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবে না যে পর্যন্ত না আরশের নীচের একজন আহবানকারী এই মর্মে আহবান করবে যে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বয়ং আসমান থেকে আল্লাহর একজন প্রতিনিধি হজ্জ এবং উমরাহর ঘোষণা দিয়ে থাকেন। আসমান থেকে যে জিনিসের ঘোষণা দেয়া হয় সে বিষয়টি কত মহান এবং কতইনা তাৎপর্যপূর্ণ।

হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য হালাল অর্থ জরুরী

হালাল ও বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ ছাড়া হজ্জ করলে সে হজ্জ হয় না।

এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْـه وَسَلَّمَ اذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًا بِنَفْقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِىْ الْغَرْزِ فَنَادٰى : لَبَّيْكَ ، نَادَاهُ مُنَاد مِّنَ السَّمَاءِ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، زَادُكَ حلاَلٌ وَرَاحلَتُكَ حَلاَلٌ وَحَجُّكَ مَبْرُوْرٌ غَيْرُ مَأْزُوْرٌ ، وَاذَا خَرَجَ بِالنَّفْقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ فَنَادى : لَبَّيْكَ اللّٰهمَّ لَبَّيْكَ ، نَادَاهُ مُنَاد مِّنَ السَّمَاءِ لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ ، زَادُكَ حَرَامٌ وَ نَفْقَتُكَ حَرَامٌ وَ حَجَّةٌ مَّأْزُوْرٌ غَيْرُ مَبْرُوْرٍ -

অর্থ ঃ 'আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন। যখন কোন ব্যক্তি হালাল অর্থ দ্বারা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে সওয়ারীর আসনে পা রাখে এবং প্রভু হে, আমি হাজির এ কথা বলে, তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকরী তার উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিয়ে বলে ঃ আমিও হাজির, তোমার কল্যাণ হোক। তোমার পথের সম্বল হালাল, সওয়ারী হালাল, তোমার হজ্জ কবুল এবং তোমার আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট নেই। আর যদি হাজী হারাম অর্থ দ্বারা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে এবং প্রভু হে আমি হাজির– একথা বলে, অর্থাৎ লাব্বাইকা বলে, তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী এর জবাবে বলে, তোমার জন্য আমি

হাজির নেই, তোমার কোন কল্যাণ নেই, তোমার পথের খরচ হারাম, সম্বল হারাম, তোমার হজ্জ কবুল নয় এবং তা গুনাহমুক্ত নয়।' (তাবারানী)

অন্য এক হাদীসে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحتِ وكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهِ ـ (احمد والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

অর্থ ঃ জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন ঃ হারাম অর্থ দ্বারা যে শরীরের রক্ত-মাংস গঠিত হয়েছে সে শরীর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম অর্থ দ্বারা গঠিত রক্ত-মাংসের শরীরের জন্য দোজখই উত্তম।

আরেক হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ : لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادُهُ اِلَى النَّارِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْحُوْ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُوْ السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُوْ الْخَبِيْثَ ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে তা দান করলে তা কবুল হয় না। সে মাল খরচ করলে তাতে বরকত হয় না এবং মৃত্যুর পর তা রেখে গেলে তা তার জন্য দোযখের সম্বল হবে। আল্লাহ খারাপ জিনিসের বিনিময়ে খারাপ জিনিস দূর করেন না। কিন্তু ভালর বিনিময়ে মন্দ দূর করেন। নিকৃষ্ট ও মন্দ জিনিস অন্য মন্দ ও নিকৃষ্ট জিনিসকে দূর করতে পারে না। (মুসনাদ আহমদ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক লম্বা হাদীসের শেষাংশে এসেছে,

فَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثُمَّ ذَكَرَالرَّجُلَ الَّذِىْ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ (مسلم)

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন...। তারপর তিনি দীর্ঘপথ সফরকারী এলোমেলো চুল ও ধূলা-মলিন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেন, (সাধারণতঃ মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়) সেই ব্যক্তি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া করে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এং হারাম দ্বারা তার শরীর গঠিত হয়েছে। কি করে তার দোয়া কবুল হবে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হারাম অর্থসম্পদ বলতে কি বুঝায়? বহু উপায়ে হারাম অর্থ উপার্জন করা যায়। মিথ্যা বলে আয় করা কিংবা ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত অর্থও হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ فِى النَّارِ অর্থ ঃ ঘুষখোর ও ঘুষদাতা দোযখে যাবে। সুদ হারাম। সুদের গুনাহ ৭০ ভাগে বিভক্ত। এর সর্ববৃহৎ গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর ছোট গুনাহ হচ্ছে, নিজ মায়ের সাথে যেনা করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ الرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ (ابن ماجة، بيهقى شعب الا يمان)

অর্থ ঃ সুদের গুনাহের ৭০ ভাগের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে নিজ মায়ের সাথে যেনা করা। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

অর্থ ঃ যদি তোমরা সুদ থেকে বিরত না হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর।(সূরা বাকারা-২৭৯)

কাউকে ঠকানোর মাধ্যমে, ধোঁকা ও ফাঁকিবাজীর মাধ্যমে কিংবা জোর জবরদস্তি ও জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে অবৈধভাবে মাল কামাই করা যায়। অন্যের অধিকার হরণ করা, মাপে কম দেয়া, ভেজাল মিশানো, মওজুদ্দারী করা, সম্পদের যাকাত

আদায় না করা, চুরি, ডাকাতি করা, কারো জমীনের উপর নিজের জমীনের আল ঠেলে নেয়া ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত অর্থ হারাম ও অবৈধ। হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ ভোগ করে হজ্জ কেন, অন্য কোন এবাদতও কবুল হবে না বলে রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন। তাই হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করা খুবই জরুরী।

হালাল রোজগারের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলাম সম্মত না হলে, বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা প্রায় অসম্ভব। ইসলামী অর্থনীতির অবর্তমানে, হালাল রোজগারের সুযোগ থাকে সীমিত, ইসলামের প্রতিটি হুকুম একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটাকে ছাড়া আরেকটা চলতে পারে না। ইসলামকে একটা গাছের সাথে তুলনা করলে, হজ্জ এবং অন্যান্য সকল হুকুম তার শাখা-প্রশাখা মাত্র। তাই শুধুমাত্র একটি শাখাকে পৃথকভাবে পরিশুদ্ধ করে পারা যাবে না। সেজন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম করার জন্য ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জেহাদ ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। তাহলে হজ্জ, নামায, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য সকল এবাদত সুষ্ঠুভাবে আদায় হবে ও আল্লাহর কাছে কবুল হবে। হজ্জ ও অন্যান্য এবাদত কবুল হওয়ার এটাই হচ্ছে সরস রাস্তা।

হজ্জের হুকুম ও নিয়মাবলী

সেই ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ যার বাড়ী থেকে কাবা শরীফ পর্যন্ত আসা যাওয়ার ব্যয়ভার এবং ঐ সময়ের পরিবারের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা রয়েছে। সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই বালেগ, আকেল, মুসলমান হতে হবে। মহিলার জন্য মোহরেম পুরুষ সাথে আসা এবং তার ব্যয়ভার বহন করা শর্ত। এক কথায় আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ব্যক্তির উপরই হজ্জ ফরজ। হজ্জের কারণে যদি অভাব দেখা দেয় কিংবা ঋণ করে চলতে হয়, সে ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরজ নয়। ভিক্ষা করে হজ্জ করা কিংবা হজ্জে এসে ভিক্ষা করা জায়েয নেই। তবে হজ্জের সফরে ব্যবসা করা জায়েয আছে।

জিলহজ্জের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রধানতঃ হজ্জের চূড়ান্ত ও প্রধান প্রধান হুকুমগুলো পালন করতে হয়।

হজ্জ তিন প্রকার। ১. এফরাদ ২. তামাত্তু এবং ৩. কেরান। এফরাদ হচ্ছে শুধু হজ্জের এহরাম বাঁধা এবং উমরাহর নিয়ত না করা। তামাত্তু হচ্ছে, হজ্জের মাসে উমরাহ করা। হজ্জের মাস হচ্ছে শাওয়াল, জুলকাদাহ ও জুলহিজ্জার প্রথম ১০দিন।

অর্থাৎ হজ্জের আগে উমরাহর কাজ সেরে হালাল হয়ে যাওয়া এবং হজ্জের পূর্বে পুনরায় হজ্জের এহরাম বাঁধা। কেরান হচ্ছে, হজ্জ এবং উমরাহর নিয়ত একই সাথে করা। তবে উমরাহর কাজ শেষ করা সত্ত্বেও এহরাম না খোলা এবং একই এহরামে হজ্জ করা। তামাত্তু এবং কেরান হজ্জে কুরবানী জরুরী। তবে এফরাদ হজ্জে কুরবানী নেই। হজ্জের কোন ওয়াজিব ভঙ্গ হলে কাফফারা দিতে হয়। তামাত্তু এবং কেরান হজ্জের কুরবানী দ্বারা ঈদুল আজহা উপলক্ষে সাধারণ যে কুরবানী ওয়াজিব তা আদায় হয়ে যায়। পৃথকভাবে সেজন্য কুরবানী দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই

মীকাতের বর্ণনা

মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী হাজী এবং উমরাহ আদায়কারীকে মীকাতে প্রবেশের আগেই হজ্জ বা উমরাহর এহরাম বাঁধতে হবে। এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয হবে না।

মীকাত ৫টি। মদীনাবাসী এবং সেই পথে আগমনকারীদের মীকাত হচ্ছে 'জুল হোলায়ফাহ'। এর বর্তমান নাম হচ্ছে 'আবইয়ারে আলী'। এটি মদিনা থেকে ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মক্কা থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সিরিয়াবাসী এবং ঐ রাস্তা দিয়ে আগমনকারীদের জন্য মীকাত হচ্ছে জোহফা। এর বর্তমান নাম হচ্ছে 'রাবেগ'। মক্কা থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে, ১৪৮ কিলোমিটার। মূলতঃ জোহফা রাবেগের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম। নাজদবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত হল কারনুল মানাযেল। এর বর্তমান নাম হচ্ছে 'আস সায়লুল কবীর'। এটি মক্কা থেকে ৯৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইয়েমেনবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত হচ্ছে 'ইয়ালামলাম' পাহাড়। সামুদ্রিক পথে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ান দেশগুলোর হাজীদের এটাই হচ্ছে মীকাত। এর বর্তমান নাম হচ্ছে সা'দীয়াহ। এটি মক্কা থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তবে স্থল ও বিমানপথে আগমনকারী বাংলাদেশী এবং এশিয়ান দেশগুলোর হাজীদের মীকাত হচ্ছে 'আস-সায়লুল কবীর'। কেননা, এই স্থান বরাবরই তাদের বিমান ও যানবাহন আগমন করে। 'জাতে এরক' হচ্ছে ইরাকবাসীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ৯৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম হচ্ছে, দারীবাহ্।

মীকাতের ভেতর অবস্থানকারী লোকেরা নিজেদের অবস্থান থেকেই এহরাম

বাঁধবে। তাদের মীকাতের বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হুদুদে হারামের ভেতর অবস্থানকারী লোকদের উমরাহর জন্য হুদুদের বাইরে যেতে হবে কিন্তু হজ্জের জন্য তার প্রয়োজন নেই। বরং সবাই হুদুদের ভেতর নিজ অবস্থান স্থল থেকেই হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধবে। মীকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন—

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -

অর্থ ঃ ঐ মীকাতগুলো ঐ এলাকাবাসী এবং যারা ঐ পথ দিয়ে হজ্জ কিংবা উমরাহ করতে আসবে তাদের জন্য নির্ধারিত। (বোখারী-মুসলিম)

হজ্জের ফরজ ও ওয়াজিব

হজ্জের তিনটি ফরজ আছে। (১) এহরাম পরা। (২) অকুফে আরাফাহ এবং (৩) তওয়াফে এফাদাহ বা ফেরত তওয়াফ অর্থাৎ আরাফাহ, মোযদালেফা এবং মিনা থেকে বিভিন্ন হুকুমগুলো পালন করার পর মসজিদে হারামে ফিরে এসে কা'বা শরীফের তওয়াফ করা। এটাকে তওয়াফে যেয়ারতও বলে। এই তিনটির কোনটি বাদ গেলে হজ্জ হবে না এবং পরবর্তীতে পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

হজ্জের ৬টি ওয়াজিব আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) অকুফে মোযদালেফা (২) জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা। (৩) তামাত্তু এবং কেরান হজ্জকারীদের কুরবানী করা। (৪) মাথার চুল কাটা। চুল ছোট করা কিংবা মাথা মুণ্ডন করা। মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। (৫) সাফা মারওয়ায় সাঈ করা। (৬) বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হানাফী মাজহাবে তা সুন্নাত এবং হাম্বলী মাজহাবে ওয়াজিব।

জামরায় পাথর নিক্ষেপের নিয়ম হচ্ছে, অকুফে মোযদালেফার পর মিনায় এসে প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ সূর্য হেলার পূর্ব পর্যন্ত জামরাতুল আকাবায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। পরের ২ দিন অর্থাৎ ১১ এবং ১২ই জিলহজ্জ সূর্য হেলে যাওয়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত ৩টি জামরাতেই ৭টি করে দৈনিক ২১টি কংকর মারতে হয়। ১ম, ২য় এবং ৩য় জামরায় ধারাবাহিকভাবে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় থেকে মক্কায় চলে আসা যায়। তবে মিনায় ১৩ তারিখ পর্যন্তই থাকার নিয়ম। যারা ১৩ই জিলহজ্জে মিনায় থাকবে তাদেরকে সেই দিন তিন জামরায় উল্লিখিত নিয়মে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

হজ্জের সুন্নত

হজ্জের সুন্নতগুলো নিম্নরূপ (১) মীকাতের বাইরে থেকে আগত লোকদের তওয়াফে কুদুম করা। (২) হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করা। (৩) তওয়াফ কুদুম, উমরাহ এবং হজ্জের তওয়াফে রমল করা অর্থাৎ প্রথম তিন চক্করে জোরে হাঁটা। (৪) সাফা-মারওয়ার দুই সবুজ চিহ্নের (বাতির) মাঝে জোরে হাঁটা (৫) আরাফাত এবং মিনায় খোতবা দান (৬) ৮ই জিলহজ্জ জোহর থেকে ৯ই জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া। (৭) অকুফে আরাফার জন্য গোসল করা (৮) সূর্যোদয়ের একটু আগে মোযদালেফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করা। (৯) মিনায় রাত্রি যাপন করা। অবশ্য হাম্বলী মাজহাবে মিনায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব।

হজ্জের নিষিদ্ধ কাজসমূহ

এহরাম বাঁধার পর নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যায়। (১) সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করা। (২) সেলাই করা জুতা ও কাপড় পরা। তবে স্ত্রী লোকদের জন্য সেলাই করা কাপড়-চোপড় পরা নিষিদ্ধ নয়। (৩) পুরুষের মাথা ঢাকা, তবে মহিলারা অ-মোহরেম পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখবে। (৪) শরীরের চুলকাটা (৫) নখকাটা (৬) যৌন আচরণ (৭) অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও ঝগড়া বিবাদ করা (৮) শিকার করা (৯) পোকা মাকড়, কীট-পতঙ্গ, মশা মাছি ও উকুন মারা। (১০) ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া।

বদলী হজ্জ

হজ্জ ফরজ হওয়ার পর হজ্জ না করে কেউ যদি মারা যায়, কিংবা স্বাস্থ্যগত কারণে যদি হজ্জ আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্যের দ্বারা হজ্জ করানো যেতে পারে। বদলী হজ্জের জন্য যার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে, তাকে সকল খরচ বহন করতে হবে। বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি একজন সাধারণ হাজীর ন্যায় হজ্জের সকল হুকুম আহকাম পালন করবেন। ফরজ হজ্জ অনাদায়কারী ব্যক্তিকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো নিষিদ্ধ। সামর্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল হজ্জ আদায় করা জায়েয কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। তা নাজায়েয হওয়াটাই বেশী যুক্তিসঙ্গত। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, এবাদতে কোন প্রতিনিধিত্ব চলে না।

উমরাহ

উমরাহর সওয়াব অনেক বেশী। হানাফী মাযহাব ব্যতীত কোন কোন মাযহাবে জীবনে একবার উমরাহ্ করা ওয়াজিব। হানাফী মাযহাবে তা সুন্নত। উমরাহর জন্য প্রথমে এহরাম পরতে হয় এবং উমরাহর নিয়ত করতে হয়। তারপর তওয়াফ এবং সাঈ করতে হয়। এরপর মাথার চুল ছাঁটা কিংবা মুণ্ডন করতে হয়। এহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে নেয়া উত্তম এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ভাল। তারপর হুদুদে হারামের বাইরে থেকে কিংবা মীকাত থেকে এহরাম বাঁধতে হবে। এহরামের জন্য সেলাইবিহীন দু'টো কাপড় দরকার। একটি লুঙ্গি এবং অপরটি চাদর হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এহরামের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম। এহরামের পর নিম্নোক্ত তালবিয়াহ্ পড়তে হবে। তালবিয়া হচ্ছে–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لاَشَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরবারে হাজির। তোমার কোন অংশীদার নেই। তোমার দরবাবে আমি উপস্থিত। সকল প্রশংসা ও নেয়ামতের মালিক তুমিই। শাসন ও রাজত্ব একমাত্র তোমারই। তোমার কোন অংশীদার নেই।

তারপর তওয়াফ এবং সাঈ করে মাথার চুল কাটতে হবে। তওয়াফের পর দু'রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বা কাছে পড়তে হবে। মাথার চুল কাটার পর একজন ব্যক্তি উমরাহ থেকে হালাল হয়ে যায়।

হজ্জ এবং উমরাহকে সুষ্ঠুভাবে আদায় করার মাধ্যমেই মক্কার ফজীলত, তাৎপর্য এবং বৈশিষ্ট্য অনুধাবন সম্ভব হবে। মূলতঃ এই হজ্জ এবং উমরাহর জন্যই এই কা'বা এবং মসজিদে হারামের অস্তিত্ব। তাই উমরাহ এবং হজ্জের মত এত মহান এবাদতগুলোকে সুন্দর করে আদায় করে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য সর্বাধিক এখলাস এবং আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করা দরকার। এবাদত যত বড় এবং মহানই হউক না কেন, এখলাস, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ব্যতীত তার কোন মূল্য নেই। তাই হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ـ অর্থাৎ 'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'

একটি স্বপ্ন ঃ

আলী বিন মোয়াফফাক বলেন ঃ আমি এক বছর হজ্জে গিয়ে ৮ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে মিনার মসজিদে খায়ফে অবস্থান করলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করলেন। তাদের একজন আরেকজনকে আবদুল্লাহ্ বলে ডাক দিলেন। অপরজন লাব্বাইক 'আমি হাজির' বলে জওয়াব দিলেন। প্রথম ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন; তুমি জান, এ বছর কত লোক আমাদের প্রতিপালকের হজ্জ্ব করেছে? দ্বিতীয়জন বলেন; আমি জানিনা। প্রথমজন বলেন; এবার ৬লাখ লোক হজ্জ্ব করেছে। এখন তুমি বলতে পার, তাদের মধ্যে কতজনের হজ্জ্ব কবুল হয়েছে? ২য়জন বলেন; আমার জানা নেই। প্রথমজন বলেন; তাদের মধ্যে মাত্র ৬ জনের হজ্জ্ব কবুল হয়েছে। একথা বলার পর উভয় ফেরেশতা উপরে উঠে আমার দৃষ্টির আগোচরে চলে গেলেন। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হলাম। এক কঠিন দুঃখ আমাকে চেপে বসল। আমি নিজের কথা চিন্তা করে মনে মনে বললাম; যখন ৬ জনেরই হজ্জ্ব কবুল হয়েছে, তখন আমি তাদের মধ্যে কোথায়?

যখন আমি আরাফাত থেকে ফিরে এসে মোযদালেফায় মাশআ'রে হারামের কাছে রাত যাপন করলাম, তখন এ চিন্তায় বিভোর ছিলাম যে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মাত্র এই কয়জনেরই হজ্জ্ব কবুল হল; চিন্তার মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, সে দু'জন ফেরেশতা পূর্বের আকৃতিতে পুনরায় অবতরণ করলেন এবং একে অপরের সাথে পূর্বের মত কথাবার্তা বললেন। ১ম ফেরেশতা বলেন; তুমি জান আজকের রাত আমার রব কি আদেশ দিয়েছেন? ২য় ফেরেশতা বলেন, না, আমি জানিনা। প্রথম ফেরেশতা বলেন; আল্লাহ্ ছয়জনের প্রত্যেককে ১লাখ করে দিয়েছেন অর্থাৎ ৬ জনের দোয়ায় কিংবা সুপারিশে ৬ লাখ লোকের হজ্জ্ব কবুল করবেন। ইবনে মোয়াফফাক বলেন, এরপর যখন আমার চোখ খুলল তখন, যেন আমার আনন্দের সীমা রইলনা।[১]

হজ্জ্বে আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। তা যেন কবুল হয় সে জন্য প্রত্যেককে আন্তরিক হতে হবে।

---

১. এহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজ্জালী।

হজ্জের কিছু জরুরী মাসআলাহ

১ম প্রশ্ন ঃ তওয়াফ ও সাঈ'তে কি দোআ' পড়া দরকার?

উত্তর ঃ সাঈ'র শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা) পড়েছেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِاللهِ ـ

রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণে আমাদেরও তাই পড়া সুন্নাত। এছাড়া তওয়াফ এবং সাঈ'তে বেশী বেশী করে আল্লাহর জিকর বা স্মরণ করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَرَمْىُ الْجِمَارَ لِاقَامَةِ ذِكْرِاللهِ ـ

"তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ায় সাঈ'এবং পাথর নিক্ষেপের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে আল্লাহর জিকর প্রতিষ্ঠার জন্য।" (আহমদ, আবু দাউদ)

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী, তাওয়াফ, সাঈ' এবং মিনায় পাথর নিক্ষেপের সময় বেশী বেশী করে দোআ' তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), গুনাহ মাফ চাওয়া, কোরআন তেলাওয়াত করা, তাওবাহ করা দরকার। কেননা, এগুলো সবই জিকরের অন্তর্ভুক্ত।

২য় প্রশ্ন ঃ নফল হজ্জ, ওমরাহ, তওয়াফ ও নামাযসহ দান-সদকার সওয়াব কি কোন মুর্দার রুহের জন্য উপহার দেয়া যায়?

উত্তর ঃ এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে তওয়াফসহ যে কোন নফল এবাদতের সওয়াব অন্য যে কোন জীবিত কিংবা মৃত মুসলমানের জন্য উপহার দেয়া জায়েয। এতে সেই মুসলমানের কল্যাণ হবে। শারীরিক এবাদত যেমন, নামায, তওয়াফ; আর্থিক এবাদত যেমন, দান-সদকাহ অথবা শারীরিক ও আর্থিক এবাদত যেমন কোরবানী ইত্যাদি অন্য যে কোন নফল এবাদতের সওয়াব কোন মুসলমানের জন্য উপহার হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

অন্য এক দল আলেমের মতে, দান-সদকা ও কোরবানী ছাড়া নফল নামায, রোজা, হজ্জ, তাওয়াফ, ওমরাহ ইত্যাদির সওয়াব অন্যের জন্য উপহার দেয়ার সমর্থনে হাদীসে উল্লেখ নেই। শুধু দোআ করার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ঐ সকল

এবাদত নিজের জন্য করে অপরের জন্য শুধু দোআ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

اِذَامَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّمِنْ ثَلاَثٍ : صَدْقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْ عُوْلَهُ ـ

'মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাত্র তিনটি জিনিসের সওয়াব অব্যাহত থাকে, ১. সদকাহ্ জারিয়াহ ২. উপকারী জ্ঞান এবং ৩. নেক সন্তান, যে মাতা-পিতার জন্য দোআ করে।' (মুসলিম)

এই হাদীসে সদকাহ্ জরিয়াহ্ এবং উপকারী জ্ঞানের পর শুধু নেক সন্তানের দোআর সুযোগ রাখা হয়েছে। যদি অন্য কিছুর সুযোগ থাকত তাহলে, তা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা হত।

৩য় প্রশ্ন ঃ বিদায়ী তওয়াফের হুকুম কি? মীকাতের ভেতরে লোকদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ লাগবে কি?

উত্তর ঃ বিদায়ী তওয়াফ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ بِالطَّوَافِ ـ

'যে আল্লাহর ঘর কা'বায় হজ্জ আদায় করে তার সর্বশেষ কাজ হচ্ছে বিদায়ী তওয়াফ করা।'

এই কারণে একদল আলেম বিদায়ী তওয়াফকে ওয়াজিব বলেন। আবার অন্য একদল আলেম বিদায়ী তওয়াফকে সুন্নাত বলেন। তাদের দৃষ্টিতে, হাদীসের এই আদেশ ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত।

মীকাতের ভেতর বসবাসকারীদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ লাগবে কিনা এ নিয়েও মতভেদ আছে। হানাফী মাজহাবের মতে, মীকাতের ভেতর যেমন, জিদ্দা, জমুম, বাহরা, হাদ্দা ইত্যাদি এলাকার লোকদের জন্য বিদায়ী তওয়াফের জরুরত নেই। তারা মক্কাবাসীদের মত। মক্কাবাসীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ নেই।

মালেকী মাজহাবের মতে, মীকাতের ভেতরের লোকদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ জরুরী নয়। তাদের মতে, বিদায়ী তওয়াফ সুন্নাত, ওয়াজিব নয় তাই বিদায়ী তওয়াফ না করলে দম দিতে হবে না।

অপরদিকে, শাফেঈ ও হাম্বলী মাজহাবে হারাম সীমানার বাইরের লোক এবং মীকাতের ভেতরের অধিবাসীদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ মক্কা এবং মীকাতের ভেতরে, লোকেরা তামাত্তু হজ্জ করতে পারবে কিনা? হজ্জের মাসে ওমরাহ্ করলে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক হবে কি?

উত্তর ঃ হজ্জের মাসে অর্থাৎ ১লা শাওয়াল থেকে ৯ই জিলহজ্জ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ওমরাহ করে হালাল হয়ে গেলে এবং পরে হজ্জ করলে সেই হজ্জ হচ্ছে তামাত্তু হজ্জ। এটা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল আলেম বলেন তারা তামাত্তু হজ্জ করতে পারবেনা। তাদের দলীল হচ্ছে কোরআনের এই আয়াত ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

'যারা মসজিদে হারাম তথা হারাম সীমানার অধিবাসী নয়'। হারাম সীমানার অধিবাসী হলে তামাত্তু হজ্জ করতে পারবেনা, বাইরের অধিবাসী হলে পারবে।

কিন্তু হাম্বলী মাজহাবসহ অন্যান্য মাজহাবের মতে মক্কা এবং মীকাতের ভেতরের বাসিন্দাদের জন্য তামাত্তু হজ্জ জায়েয। কেননা, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অধিকাংশ লোক ওমরাহ করেছেন এবং তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন।

হজ্জের মাসে ওমরাহ্ করলে হজ্জ বাধ্যতামূলক হবে না। ইচ্ছা করলে হজ্জ করতে পারবে, আর ইচ্ছা না করলে হজ্জ করা জরুরী হবে না, ওমরাহ্ পৃথক এবাদত হিসেবে গণ্য হবে। তবে হজ্জ করলে তা তামাত্তু হবে।

৫ম প্রশ্ন ঃ মিনায় ২য় দিন থেকে জামরায় কংকর মারার সময়সীমা হচ্ছে, দুপুরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে কিংবা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অন্য লোকদের জন্য কি রাত্রে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। জামরার গায়েই কংকর নিক্ষেপ জরুরী নয়। বরং জামরার গোড়ায় কূপের মত যে হাউজ তৈরি করা আছে সেখানে কংকর পড়লেও চলবে। কংকর নিক্ষেপ না করলে দম দেয়া ওয়াজিব। ১ম দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয। সাধারণতঃ ২য় দিন থেকে দুপুরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন–

اِنِّىْ رَمَيْتُ بَعْدَ مَاأَمْسَيْتُ فَقَالَ لَهُ اِرْمِ وَلَاحَرَجَ ـ

'আমি সন্ধ্যার পর কংকর নিক্ষেপ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেন, কংকর

নিক্ষেপ কর, তাতে কোন অসুবিধে নেই।'[১] এই হাদীসে কংকর নিক্ষেপের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, করো তাতে কোন অসুবিধে নেই। সন্ধায় কংকর মারায় অসুবিধে না হলে অন্য সময়ে নিক্ষেপ করার মধ্যেও কোন অসুবিধে না হওয়ারই কথা। এমনকি আরবীতে সন্ধ্যা বলতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বুঝায়। তাই দুপুর রাত পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা যাবে।

হযরত আয়েশার হাদীসে–

كُنَّا نَتَحَيَّنُ وَقْتَ الظُّهْرِ لِرَمْيِ الْجَمْرَاتِ ـ

'আমরা দুপুরেই কংকর নিক্ষেপের সময় ঠিক করেছি।' কংকর নিক্ষেপের শুরুর উত্তম সময় দুপুর থেকে বলা হয়েছে। শেষ সময়ের কথা বলা হয়নি। এই সময় উত্তম, কিন্তু ওয়াজিব নয়। তাই আতা বিন আবী রেবাহ ও তাউস মধ্যরাত পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করাকে জায়েয বলেছেন। ক্রমবর্ধমান হাজীর সংখ্যার কারণে মধ্যরাত পর্যন্ত কংকর মারার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। হযরত আয়েশার হাদীস অনুযায়ী দুপুরকে উত্তম সময় বিবেচনা করলে ভীড়সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে আইয়ামে তাশরীকে যে কোন সময় কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয।[২]

এমনকি ওজরের কারণে ১ম দিনের কংকর ২য় দিন, ২য় দিনের কংকর ৩য় দিন সকল দিনের কংকরগুলি আইয়ামে তাশারিকের সর্বশেষ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা যায়। তবে শর্ত হলো, শেষ দিন ধারাবাহিকভাবে সেগুলো নিক্ষেপ করতে হবে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ ১০ই জিলহজ্জ ১ জন হাজী যদি ওয়াজিব কাজগুলো ক্রমধারা রক্ষা করে আদায় না করে তাহলে কি দম দিতে হবে?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ১০ই জিলহজ্জ ক্রমানুসারে ৫টি কাজ করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে ১. জামরা আকবায় কংকর নিক্ষেপ করা ২. কোরবানী করা ৩. মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা ৪. কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা এবং ৫. সাফা-মারওয়ায় সাঈ' করা।

হানাফী মাজহাবে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব, আর হাম্বলী মাজহাবসহ অন্যান্য মাজহাবে সুন্নাত। তাদের দলীল হচ্ছে, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যা কিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি জবাব দিয়েছিলেন– اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ 'কর এবং কোন অসুবিধে নেই'। এর দ্বারা বুঝা যায়, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উত্তম এবং সুন্নাত। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়।

---

১. সাপ্তাহিক আল মুসলিমুন ৫/৬ ১৯৯২, জেদ্দা, সৌদী আরব ২. ঐ

৭ম প্রশ্ন ঃ তওয়াফে যেয়ারতের আগে কি হজ্জের সাঈ' করা যায়?

উত্তর ঃ হজ্জে এফরাদ ও কেরানে তওয়াফে যেয়ারতের আগে হজ্জের সাঈ' করা জায়েয আছে। ভীড়ের আশংকা কিংবা অন্য কোন কারণেই সাধারণতঃ তা অগ্রিম করার চিন্তা করা হয়। নচেত, তওয়াফে যেয়ারতের পরেই তা করা উত্তম। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে কেরান হজ্জ আদায়কারীরা তওয়াফে কুদুমের পর অগ্রিম ঐ সাঈ' করেছিলেন।

অপরদিকে, তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য রয়েছে ২টি সাঈ'। একটি ওমরাহ্ এবং অপরটি হজ্জের জন্য। তওয়াফে যেয়ারতের পরই হজ্জের সাঈ' করা উত্তম। কেননা, সাঈ' তওয়াফের অধীন। কিন্তু কেউ যদি উপরোল্লিখিত কারণে হজ্জের সাঈ' অগ্রিম করে তাহলে তা জায়েয। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ . قَالَ لاَ حَرَجَ -

'আমি তওয়াফের (যেয়ারত) আগে সাঈ' করেছি।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তাতে কোন অসুবিধে নেই।'

৮ম প্রশ্ন ঃ মীকাতের বাইরের লোকেরা যেমন– বাংলাদেশের লোকেরা কি জিদ্দায় পৌছার পর জিদ্দা থেকে ওমরাহ্ কিংবা হজ্জের এহরাম পরতে পারবে?

উত্তর ঃ জিদ্দা মীকাতের ভেতর। তাই মীকাতের বাইরের কোন লোক জিদ্দায় পৌছে এহরাম করলে জায়েয হবে না। শুধু জিদ্দাবাসীরাই জিদ্দা থেকে এহরাম করবেন। আর কেউ যদি হজ্জ ও ওমরাহর নিয়ত ছাড়া, চাকুরী, ব্যবসা কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে জিদ্দা আসে, তাহলে তারা ওমরাহ্ কিংবা হজ্জ করতে চাইলে জিদ্দা থেকে এহরাম করতে পারবে। হজ্জ এবং ওমরার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে আগত কোন লোক জিদ্দা থেকে এহরাম করলে তা জায়েয হবে না। তাকে পুনরায় মূল মীকাতে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে এহরাম পরে আসতে হবে। সেটা না করতে পারলে মক্কায় একটি দম দিতে হবে এবং গরীব লোকদের মধ্যে ঐ দম বা কোরবানীর গোশ্ত বিলি করতে হবে।

অনেকে জিদ্দায় নেমে মদীনায় যান এবং সেখানকার মীকাত থেকে এহরাম বেঁধে মক্কায় আসেন। সেটাও ঠিক নয়। কেননা তিনি তার মূল মীকাত এহরাম ছাড়া আগেই লংঘন করে জিদ্দায় প্রবেশ করেছেন। তাই তাকে তার মূল মীকাতেই ফিরে যেতে হবে।

৯ম প্রশ্ন ঃ মিনায় কি পুরো রাত্র যাপন করা জরুরী?

উত্তর ঃ মিনায় পুরো রাত যাপন করা উত্তম। তবে রাত্রের অধিকাংশ সময় মিনায় কাটালে এবং পরে মিনা ত্যাগ করে মক্কা চলে আসলে তাতে মিনায় রাত্রি যাপনের হুকুম আদায় হয়ে যায়। অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রির চাইতে কিছু বেশী কাটালেই রাত্রি যাপন সম্পন্ন হয়ে যাবে।

১০ম প্রশ্ন ঃ স্ত্রীলোকের হায়েজ অবস্থায় কি তওয়াফ ও সাঈ' করা যায়?

উত্তর ঃ হায়েজ অবস্থায় তওয়াফ করা জায়েয নেই। হায়েজ থেকে পাক হলে তওয়াফ আদায় করতে হবে। সেটা ওমরার তওয়াফ কিংবা হজ্জের তওয়াফ যাই হোকনা কেন। পক্ষান্তরে, মাসিক অবস্থায় সাফা-মারওয়ায় সাঈ' করা জায়েয আছে। মসজিদে হারামে প্রবেশ ও অবস্থান করা জায়েয নেই। তবে সাফা-মারওয়ায় প্রবেশ ও অবস্থান উভয়টাই জায়েয। কেননা, সাফা-মারওয়া মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১১শ প্রশ্ন ঃ কবুল হজ্জের লক্ষণ কি?

উত্তর ঃ কবুল হজ্জের শর্ত হচ্ছে, হজ্জের জন্য ব্যয়িত অর্থ হালাল হতে হবে, হজ্জের ফরজ, ওয়াজিবগুলো ঠিকমত পালন করতে হবে, হজ্জে যৌন তৎপরতা বন্ধ, গুনাহর কাজ না করা এবং কারুর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা যাবেনা। পুরো সময় আল্লাহর স্মরণ ও জিকরের মধ্যে কাটাতে হবে। এই সকল শর্ত পূরণের পর হজ্জ শেষে যদি হাজীর মধ্যে ফরজ-ওয়াজিব পালনের আগ্রহ জাগে, সাবেক ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, হারাম ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকে, তাকওয়া-পরহেজগারী বাড়ে, নফল ও সুন্নাতের প্রতি আগ্রহী হয় তাহলে, বুঝা যাবে তার খালেস তাওবাহ কবুল হয়েছে এবং হজ্জ আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে। কবুল হজ্জের বিনিময় হচ্ছে বেহেশত।

হজ্জের যে সকল ভুল থেকে সতর্ক থাকা দরকার

হজ্জের পূর্বের ভুল

১. হারাম অর্থ সম্পদ দিয়ে হজ্জ করা : আল্লাহ নিজে পাক-পবিত্র। তিনি পবিত্রতা ছাড়া এবাদত কবুল করেন না। তাই বান্দার সর্বাধিক পবিত্র সম্পদ ব্যয় করে হজ্জে আসা দরকার।

২. বুড়া হওয়া পর্যন্ত হজ্জ না করা ঃ শারিরীক ও আর্থিক সচ্ছলতা আসা মাত্রই হজ্জ করা প্রয়োজন। বৃদ্ধ হয়ে গেলে প্রচণ্ড ভীড় কিংবা গরম ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হজ্জের বহু হুকুম পালন করা সম্ভব হয় না। হজ্জের জন্য শক্তি প্রয়োজন। তাই শক্তি থাকা অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হজ্জ করা উচিত।

৩. লোক দেখানোর মনোভাব ঃ কোন কোন ধনী ব্যক্তি মনে করেন যে, হজ্জ না করলে মানুষ খারাপ বলবে। তাই তিনি হজ্জ করেন। অথচ হজ্জ করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

৪. মোহরম ব্যক্তি ছাড়া মহিলাদের হজ্জ করা ঃ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা মোহরম আত্মীয়। এরপর যে কোন একজনের সাথে মহিলাদের হজ্জে আসতে হবে। অন্য কারো সাথে নয়।

এহরাম সম্পর্কিত ভুল

১. হাজীরা মীকাত থেকে এহরাম বেঁধে হজ্জ ও ওমরাহর নিয়ত করবেন। এটাই উত্তম পদ্ধতি। মীকাতের আগে, এমনকি দেশ থেকে বের হওয়ার সময়ও এহরাম পরা যায় ও নিয়ত করা যায়। তবে জেদ্দা এসে এহরাম পরে নিয়ত করা চলবে না। কেউ এরকম করলে তার জন্য প্রথম হুকুম হল, আবার মীকাতে ফিরে যাওয়া এবং এহরাম পরে নিয়ত করা। ২য় হুকুম হল, মীকাতে ফিরে না গেলে একটা দম দেয়া। কেননা জিদ্দা মীকাতের ভিতরে। এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা যাবে না।

২. এহরামের কাপড় ময়লা বা নাপাক হলে তা বদল করা যায় ও ধোয়া যায়। তখন আরেক সেট এহরামের কাপড় পরতে হবে। সেলাইযুক্ত কাপড় পরা যাবে না।

৩. এহরামের সময় প্রথমেই ডান বগলের নীচ দিয়ে এহরামের কাপড় রেখে ডান কাঁধ খোলা রাখা এবং বাম কাঁধের উপর এহরামের কাপড়ের দু'মাথা রাখা ভুল। এটা শুধু তওয়াফে কুদুমে করতে হয়, তওয়াফের আগে নয়।

৪. এহরাম বাঁধার জন্য বিশেষ কোন নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। অনেকেই দু'রাকাত নামায পড়ে এহরামের কাপড় পরে ও হজ্জ-ওমরার নিয়ত করে। এক্ষেত্রে আবুল আব্বাস শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া অগ্রাধিকারযোগ্য কথা বলেছেন। তিনি বলেন ঃ এহরামের জন্য বিশেষ কোন নামায পড়ার বিধান নেই। নবী (সা) থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। গোসল করে এহরামের কাপড় পরাই যথেষ্ট। তবে, তখন যদি কোন ফরজ নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে, ফরয নামায শেষ করে এহরামের নিয়ত করা উত্তম।

৫. ৮ তারিখ তারওইয়া দিবসে অনেকে ঘর থেকে এহরাম না পরে মসজিদে হারামে এসে এহরাম পরে মক্কা থেকে মিনা রওনা করে। এটা ভুল; ঘর থেকেই এহরাম পরে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করতে হবে। এটাই সুন্নত তরীকা। বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে যে সকল সাহাবী তামাত্তু হজ্জ করেছিলেন, অর্থাৎ ওমরাহ করে এহরাম খুলে ফেলেছিলেন, তাঁরা নিজের স্থান থেকেই ৮ তারিখে পুনরায় হজ্জের এহরাম পরেছেন। তাঁরা এহরাম পরার জন্য মসজিদে হারামে যাননি।

যদি কেউ মনে করে যে, ওমরাহর এহরাম ধোয়া ছাড়া তা দিয়ে হজ্জের এহরাম পরা যাবে না– তাহলে সেটা হবে ভুল। এহরামের কাপড় নতুন হতে হবে কিংবা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে– এটা জরুরী নয়। তবে পরিষ্কার হলে উত্তম হবে।

৬. এহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো ঃ এটা নিষিদ্ধ। এরূপ করলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৭. মহিলাদের জন্য এহরামের কাপড় নির্দিষ্ট করা ঃ এটা ঠিক নয়। তারা যেকোন কাপড় পরতে পারে।

৮. এহরাম অবস্থায় বেহুদা ও অশ্লীল কথা-বার্তা বলা ঃ এ সময় কেবল তালবিয়া, যিকির, তাসবীহ-তাহলীল করতে হবে।

তালবিয়া সংক্রান্ত ভুল

১. এহরাম বাঁধার সময় শব্দ করে তালবিয়া পাঠ না করা। নবী করীম (সা) বলেন : "আমার কাছে জিবরীল এসেছিল। তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন আমার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেই।[১] তালবিয়া হচ্ছে : 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।'

---

১. আবু দাউদ, হজ্জ অধ্যায়; তিরমিযী, হাদীস নং-৮২৯।

হাজীরা দলে দলে অতিক্রম করে, অথচ তাদের মুখে জোরে তালবিয়া শব্দ উচ্চারিত হয় না। ফলে হজ্জের মধ্যে আল্লাহর যিক্‌র-আযকারের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরুষদের ব্যক্তিগতভাবে সশব্দে তালবিয়া পাঠ সুন্নাত। মহিলাদের শব্দ করে তালবিয়া পাঠ করার দরকার নেই।

২. সামষ্টিক সুরে অনেকের একসাথে মিলে তালবিয়া পাঠ ঠিক নয়। রাসুলুল্লাহ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনুরূপ আমলের বর্ণনা নেই। বরং হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত : 'আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ তাকবীর, কেউ তাহলীল অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং কেউ তালবিয়া পাঠ করতেন।[১] এটাই বিশুদ্ধ পদ্ধতি। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই শব্দ করে উপরোক্ত পদ্ধতিতে আল্লাহর যিক্‌র-আযকার করবে।

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ভুল

১. মসজিদে হারামে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোন দরজার আলাদা কোন গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। সব দরজাই সমান। যারা মনে করেন, ওমরাহর জন্য বাবে ওমরাহ কিংবা বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম– এটা তাদের ভুল ধারণা। মসজিদে হারামে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করে মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়তে হবে।

اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

২. কা'বা শরীফ দেখলে পড়ার জন্য বিশেষ কোন দু'আ নেই। নবী (সা) থেকে এরূপ বিশেষ কোন দু'আর বর্ণনা নেই।

৩. একজন ফেকাহবিদের কথার কারণে কেউ কেউ বলেন যে, মসজিদে হারামে ঢুকলে প্রথমে তওয়াফ করতে হবে, এটা সুন্নত। এ কথার মধ্যে মতভেদ আছে। এক মত অনুযায়ী, মসজিদে হারামে প্রবেশ করলে অন্যান্য মসজিদের মতই ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ -

'তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকলে সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ার আগে না বসে।' (বোখারী)

---

১. ফিকহুল এবাদাত; মোহাম্মদ বিন সালেহ ওসাইমিন, দারুল ওয়াতন প্রকাশনী, রিয়াদ; প্রথম প্রকাশ ১৪১৬ হিঃ (১৯৯৬ সন)।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ মসজিদে হারামসহ সকল মসজিদের জন্য সমান।

উল্লিখিত ফেকাহবিদ যা বলেছেন, তাঁর কথার অর্থ হল : কেউ যদি মসজিদে হারামে ওমরাহ, হজ্জ কিংবা নফল তওয়াফের জন্য প্রবেশ করে তওয়াফ করে, তাহলে তার দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায না পড়লেও চলবে। কিন্তু কেউ যদি তওয়াফ ছাড়া নামাযের জামাতের জন্য অপেক্ষা, ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতা শোনা কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে দু'রাকাত নামায পড়তে হবে। অন্য মত অনুযায়ী, আগে তওয়াফই করতে হবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) মক্কায় পৌছে প্রথমে ওজু করেন, তারপর তওয়াফ করেন। (বোখারী)

তওয়াফের ভুল

১. তওয়াফ সহ যে কোন এবাদতের জন্য নিয়ত করতে হয়। নিয়তের স্থান হল অন্তর, মুখ নয়। তাই মুখে নিয়তের উচ্চারণ অর্থহীন কাজ। মনে মনে এরাদা করলেই নিয়তের কাজ শেষ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম কেউ মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেননি এবং হাদীসে কোথাও মুখে নিয়ত উচ্চারণের কথা উল্লেখ হয়নি। নিয়ত বা মনের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সাথে। তাই মুখে এর উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই। তওয়াফের সময় মুখে একথা বলার দরকার নেই যে,

نَوَيْتُ اَنْ اَطُوْفَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلْعُمْرَةِ اَوْ لِلْحَجِّ ـ

'আমি ওমরাহ কিংবা হজ্জের জন্য সাত চক্কর তওয়াফের নিয়ত করলাম।'

২. হাজারে আসওয়াদে চুম দেয়া কিংবা স্পর্শ করা এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় কঠোর ভীড় করা ও ঠেলাঠেলি কিংবা ধাক্কাধাক্কি করা ঠিক নয়। স্বাভাবিকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্পর্শ বা চুমু দিতে পারলে দেবে, নচেত নয়। কোন সময় কোন মহিলার সাথেও ভীড় হতে পারে। মহিলার সাথে শরীর লাগার পর মনে কামভাব সৃষ্টি হলে পবিত্র বাইতুল্লাহয় তার কতবড় গুনাহ তা কি চিন্তা করার বিষয় নয়? ভীড় করে হাজারে আসওয়াদ কিংবা রোকেন ইয়ামানী স্পর্শ করা নাযায়েয। ঠেলা-ধাক্কার পর অন্য কারো বকাবকি শুনতে হলে তখন রাগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু তওয়াফকারীর উচিত প্রশান্ত মনে এবাদত করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "বায়তুল্লাহর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ এবং জামরায়

---

১. বোখারী, কিতাবুল হজ্জ।

কংকর নিক্ষেপকে আল্লাহর স্মরণ তথা যিক্‌রের জন্য বিধান করা হয়েছে।"[১] ঠেলা-ধাক্কা-কামভাব কিংবা রাগ সৃষ্টির মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

৩. রোকনে ইয়ামানী হাতে স্পর্শ করার নিয়ম আছে। কিন্তু হাজরে আসওয়াদের মত এর প্রতি ইশারা করার নিয়ম নেই। রোকনে ইয়ামানীতে হাতে ইশারা করার ব্যাপারে বর্ণিত ফাকেহীর হাদীসটির সনদ দুর্বল। হাতে স্পর্শ করার সুযোগ না পেলে এমনিতেই চলে যেতে হবে। ইশারা করার দরকার নেই।

৪. কেউ কেউ মনে করেন, হাজারে আসওয়াদকে চুমু না দিলে কিংবা হাতে স্পর্শ না করলে তওয়াফ শুদ্ধ হবে না। এটা ভুল ধারণা। হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেয়া কিংবা হাতে স্পর্শ করা সুন্নত। ওয়াজিব নয়। এ দুটোর কোনটা করতে না পারলে হাতে ইশারা করলেই চলবে। ভীড়ের মধ্যে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে চুমুর চাইতে হাতে ইশারা করা উত্তম। ভীড়ের সময় মহানবী (সা)ও এভাবেই কাজ করেছেন। ভীড় করে অন্য ভাইকে কষ্ট দেয়া গুনাহ। মহানবীর আদর্শই উত্তম আদর্শ।

৫. রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেয়া ভুল। নবী (সা) রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেননি। তিনি তাকে হাতে স্পর্শ করেছেন মাত্র। রোকনে ইয়ামানীতে চুমুদানের বিষয়ে ঐ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল।

ডান হাতে স্পর্শ করতে হবে, বাম হাতে নয়। অনেকে বাম হাতে স্পর্শ করে। বাম হাতকে এস্তেঞ্জা ও নাকের ময়লা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ডান হাতকে সম্মান ও মর্যাদার কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই ডান হাত থাকতে বাম হাত দিয়ে রোকনে ইয়ামানী কিংবা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা ঠিক নয়।

৬. অনেকে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়াকে কিংবা একে এবং রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করাকে বরকতের কাজ মনে করেন, এবাদত মনে করেন না। অথচ, এটা মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী। হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেয়া কিংবা একে ও রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটানো। মহানবী (সা) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় তাকবীর বলে সে উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাই আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেন : আল্লাহর কসম, আমি জানি তুমি একটা পাথর, যার উপকার-অপকার করার শক্তি নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে, আমি তোমাকে কখনও চুমু দিতাম না।[১]

---

১. বোখারী, হজ্জ অধ্যায়; মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

এ বক্তব্য দ্বারা এ ব্যাপারে ইসলামের আকীদা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এগুলোকে স্পর্শ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ এবং মহানবী (সা) এর অনুসরণই উদ্দেশ্য।

একই ধরনের ভুল মদীনায় নবী করীম (সা)-এর কবর মোবারকের জালি ও বেষ্টনী ধরেও করতে দেখা যায়। লোকেরা এগুলোকে বরকতের কাজ মনে করে। অথচ, এগুলো নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। এসব কাজ থেকে দূরে থাকা দরকার।

৭. তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে মক্কায় প্রথম আগমনকারী ব্যক্তি ওমরাহ্ কিংবা তওয়াফে কুদুমে রমল করবেন অর্থাৎ দ্রুত হাঁটবেন। অন্য চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন। কিন্তু অনেকে ৭ চক্করেই রমল করেন। এটা ভুল। নারীদের জন্য রমল নেই।

৮. প্রত্যেক চক্করে বিশেষ কিছু দু'আ নির্দিষ্ট করা ভুল। নবী করীম (সা) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনুরূপ কোন বর্ণনা নেই। তিনি সাধারণতঃ হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অনেক তওয়াফকারী নির্দিষ্ট দু'আ সম্বলিত বই খুলে দু'আ পড়ে। অনেকে আরবী না জানার কারণে আরবী দু'আয় কি বলা হচ্ছে, তা বুঝতে পারে না। তাই যে যে ভাষা বুঝে সে ভাষায় দু'আ করা সঙ্গত। কেননা, দু'আর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণ।

৯. অনেক তওয়াফকারী হাতীমে কাবা থেকে তওয়াফ শুরু করে। ভীড়ের সময় ভীড় এড়ানোর উদ্দেশ্যে তা করা হয়। এর দ্বারা আল্লাহর ঘরের পূর্ণ তওয়াফ হয় না। কেননা হাতীমের অংশবিশেষ অসম্পূর্ণ কাবা। আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন : 'তারা যেন আল্লাহর প্রাচীন ঘরের তওয়াফ করে।' (সূরা হজ্জ-২৯)। হাতীমের ভেতর দিয়ে তওয়াফ করলে আল্লাহর পূর্ণ ঘরের তওয়াফ হয় না, বরং ঘরের অংশবিশেষের তওয়াফ হয়।

১০. তওয়াফের সময় কা'বা শরীফকে বাঁয়ে রাখতে হবে। কেউ স্ত্রীলোকদেরকে সাথে নিয়ে তওয়াফ করে। তখন অন্য সাথীর হাতে হাত ধরে মহিলাদেরকে হেফাজত করে। সে কারণে কা'বাকে পেছনে রেখে ঘুরতে থাকে। অন্য সাথী কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে তওয়াফ করে। ওলামায়ে কেরামের মতে, তওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল কা'বাকে বাঁয়ে রাখা। কা'বাকে ডানে, সামনে কিংবা

পেছনে রেখে তওয়াফ করলে তওয়াফ বিশুদ্ধ হবে না। ভীড় বেশী হলে কেউ কেউ ভীড়ের সাথে খাপ খাইয়ে কাবাকে বামে না রেখে অন্য দিকে রাখে। এটা ভুল।

১১. তওয়াফে জোরে জোরে দু'আ পড়া ভুল। কোন সময় মোআল্লেম জোরে দু'আ পড়েন, অন্যরা তাকে অনুসরণ করেন। জোরে জোরে দু'আ পড়লে তা অন্যের জন্য বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর হয়, অন্যের দু'আয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, মন থেকে বিনয় দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর ঘরের ভীতি চলে যায়। এক রাতে নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কেরামকে মসজিদে জোরে কেরাত পড়তে দেখে বললেন : তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি জানাচ্ছ। তাই জোরে কেরাত পড়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিওনা।[১] তওয়াফ সহ সকল এবাদত নবী করীম (সা)-এর অনুসরণে করার জন্য আল্লাহর তওফীক কামনা করা দরকার।

১২. কেউ কেউ বাবে কা'বা বা কা'বা শরীফের দরজা থেকে তওয়াফ শুরু করে, হাজারে আসওয়াদ থেকে নয়। অথচ নবী করীম (সা) হাজারে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করতেন। তিনি বলেছেন ঃ لِتَاخُذُوا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ 'তোমাদের উচিত, আমার নিকট থেকে হজ্জ সংক্রান্ত মাসলাগুলো শেখা।[২] হাজারে আসওয়াদ বরাবর স্থান থেকে তওয়াফ শুরু না করলে সে তওয়াফ অসমাপ্ত থাকবে।

১৩. তওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়াকে যারা জরুরী মনে করেন, তারা ভুল করেন। ফলে দেখা যায়, ভীড়ের সময়ও ঐ জায়গায় নামায পড়ার কারণে তওয়াফকারীরা স্থানের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হন। এতে করে তওয়াফকারীদের কষ্ট দেয়া হয়। দু'রাকাত নামায মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে পড়লেই হয়ে যায়। বেশ দূরে গিয়েও মাকামে ইবরাহীমকে কা'বা ও নিজের মধ্যে আড়াল করে পড়লে সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

মাকামে ইবরাহীমের জন্য বিশেষ কোন দু'আ নেই। অনেকে বই খুলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সেখানে দু'আ পড়ে। এখানে শুধু দু'রাকাত নামায পড়াই সুন্নত। তাছাড়া নামায শেষ করে পরে আলাদা দু'আ করার চাইতে নামাযের সাজদায় এবং শেষ বৈঠকে দুরূদের পর দু'আ করাই নবী করীম (সা)-এর সুন্নত পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (সা) সাজদায় দু'আ করার বিষয়ে বলেছেন :

---

১. আবু দাউদ, ১৩৩২ নং হাদীস; মুসনাদে আহমদ।

২. মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْثِرُوْا الدُّعَاءَ ـ

'সাজদার অবস্থায় বান্দাহ আল্লাহর সবচাইতে নিকটে অবস্থান করে। তাই তোমরা সাজদায় বেশী বেশী দু'আ কর।' (মুসলিম)

তাশাহহুদের উল্লেখের পর দু'আর বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন : ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَاشَاءَ 'তারপর যে দু'আ করতে ইচ্ছা করে তা-ই করতে পারে।'[১]

১৪. বরকতের নিয়তে কাবার দেয়াল, গেলাফে কাবা কিংবা মাকামে ইবরাহীমকে স্পর্শ করা। এটা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর এবং তাওহীদের পরিপন্থী। এগুলো স্পর্শ করা যায়। কিন্তু বরকতের নিয়তে নয়। বরকত আল্লাহর কাছে, এগুলোর মধ্যে নয়।

সাফা-মারওয়ায় সাঈর মধ্যকার ভুল

১. সাঈর সময় সাফা ও মারওয়ায় উঠে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে বলা, আমি ৭ বার সাঈর নিয়ত করলাম। এটা শুধু মনে মনে না করে মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে একটু আগে ও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সাফা পাহাড়ে উঠে দু'হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে দু'আ করা নবী (সা)-এর সুন্নত। তাই বলে নামাযের মত দুই হাত তোলা বা ইশারা করা ঠিক নয়। সাফায় হাত তুলে নবী করীম (সা)-এর অনুরূপ দু'আ করতে হবে এবং তিনি যেরূপ যিক্‌র ও দু'আ পড়েছেন সেগুলো পড়তে হবে।

৩. দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে জোরে না হাঁটা বরং স্বাভাবিকভাবে হাঁটা। এটা রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নতের পরিপন্থী। তিনি এ দু'টো সবুজ চিহ্নের মধ্যে দ্রুত হাঁটতেন। সাফা থেকে মারওয়ায় এবং মারওয়া থেকে সাফায় সাঈর সময় এখানে জোরে হাঁটতে হবে। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি সাঈ শেষ করার জন্য পুরো সাঈতে দ্রুত হাঁটেন। এটা ঠিক নয়।

৪. বহু লোক যখনই সাফা কিংবা মারওয়ায় পৌছে তখন প্রত্যেক বার নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম নিদর্শন।' (সূরা বাকারা-১৫৮)

---

১. বোখারী, ৮৩৫ নং হাদীস, আযান অধ্যায়; মুসলিম ৫৭-৫৮ নং হাদীস, নামায অধ্যায়।

এটা মহানবীর সুন্নতের বরখেলাফ। তিনি প্রথম সাঈর শুরুতে সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে ঐ আয়াতটি পাঠ করে বলতেন : 'আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন, আমিও সেভাবে সাঈ শুরু করবো।' (মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়) অর্থাৎ আয়াতে আল্লাহ প্রথমে সাফা পাহাড়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই তিনিও প্রথমে সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করেন। তিনি প্রত্যেকবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে ঐ আয়াত পড়েননি।

৫. সাঈর জন্য বিশেষ কোন দু'আ নির্দিষ্ট নেই। যে কোন দু'আ ও যিক্‌র বা কোরআন পাঠ করা যেতে পারে। দু'আ যে কোন ভাষায় হতে পারে। আরবী ভাষায় জরুরী নয়। তবে আরবীতে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, দু'আ উত্তম। নবী করীম (সা) বলেছেন : বায়তুল্লাহর তওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ, ও জামরায় কংকর নিক্ষেপ আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণের জন্য বিধান করা হয়েছে।[১]

অর্থ না বুঝে দু'আ করা ভুল। কেননা, আল্লাহর কাছে কি চাওয়া হচ্ছে তা না বুঝা বেদনাদায়ক। বরং তা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কি?

৬. সাফা থেকে মারওয়া হয়ে পুনরায় সাফায় ফিরে আসাকে যারা এক সাঈ মনে করেন, তারা ভুল করেন। নবী করীম (সা) সাফা থেকে মারওযা পর্যন্ত এক সাঈ এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ বিবেচনা করতেন। এভাবে মোট ৭ সাঈ করতে হবে। কিন্তু যারা সাফা থেকে মারওয়া হয়ে আবার সাফা পর্যন্ত সাঈ করেন, তাদের ৭ বারের জায়গায় ১৪ বার সাঈ হয়। এটা নিঃসন্দেহে ভুল।

৮. অসুস্থ ও দুর্বল লোক ছাড়া কেউ যেন গাড়ীতে সাঈ না করে। সুস্থ ও সবলরা হেঁটে হেঁটে সাঈ করবেন।

চুল কাটা সংক্রান্ত ভুল

১. ওমরাহ বা হজ্জ শেষে পুরুষের পুরো মাথার চুল ছোট কিংবা মুণ্ডন করতে হবে। মহিলা হলে চুলের শেষ মাথা থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ কাটতে হবে। আল্লাহ তাই বলেছেন مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ 'মাথার চুল মণ্ডন কিংবা ছোট করা অবস্থায়।' (সূরা আল-ফাতহ-২৭)। চুল মুণ্ডন করা উত্তম। নবী (সা) তাদের জন্য দ্বিগুণ দু'আ করেছেন। চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করেছেন।

---

১. আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৮৮, মানাসেক অধ্যায়; তিরমিযী, হজ্জ অধ্যায়-হাদীস নং ৯০২। তিরমিযী এটাকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

কেউ কেউ মাথার চুল সামান্য কাটেন। অর্থাৎ পুরো মাথার চুল কাটেন না। দু'তিন জায়গা থেকে একটু একটু কাটেন। এটা জায়েয কিনা– এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

২. কেউ কেউ ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদল করে চুল কাটেন। এটাও ভুল, নবী করীম (সা) চুল কেটে হালাল হতে বলেছেন। فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لْيَحْلِلْ 'প্রথমে চুল কাট, তারপর হালাল হও।' (বোখারী, হজ্জ অধ্যায়; মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়)

৩. কেউ কেউ মক্কার হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে চুল কাটে। এগুলো সবই ভুল। হারাম সীমানার ভেতর চুল কাটতে হবে, বাইরে নয়।

মিনায় যে ভুলগুলো হয়

১. মিনায় যাওয়ার সময় কিংবা মিনাতে উঁচু স্বরে তালবিয়া পড়ার নিয়ম সত্ত্বেও হাজীরা জোরে তালবিয়া পড়ে না। এটা সুন্নতের খেলাফ। সুন্নত হল, কষ্ট অনুভব না করা পর্যন্ত জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করতে হবে। জেনে রাখতে হবে যে, এ তালবিয়া যে সকল নষ্ট পাথরও শুনবে, হাশরের দিন আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে।

২. ৮ তারিখ মিনায় অবস্থান ও রাত্রি যাপন সুন্নত। তা সত্ত্বেও অনেকে ৯ তারিখে সরাসরি আরাফাতের ময়দানে চলে যান। এটা জায়েয হলেও উত্তম নয়। উত্তম হল, মহানবীর পদ্ধতিতে তারওইয়া দিবসে মিনায় অবস্থান করা।

আরাফাতের ময়দানে যে সকল ভুল হয়

১. আরাফাতে যাওয়ার পথে কিংবা আরাফাত ময়দানে জোরে তালবিয়া পাঠ না করা। বর্ণিত আছে, নবী (সা) ১০ তারিখে জামরাহ আকাবার কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতেন।[১]

২. কেউ কেউ আরাফাহ সীমান্তের বাইরে অবস্থান করে এবং সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে প্রস্থান করে। তাদের হজ্জ হবে না। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'আরাফায় অবস্থানই হজ্জ।' আরাফাত ময়দানের ৪ সীমানায় বোর্ড লাগানো আছে। তাই তা না বুঝার কোন কারণ নেই।

৩. আরাফাতের দিবসের শেষাংশে জাবালে রহমত নামে পরিচিত পাহাড়ের দিকে ফিরে দু'আ করা ভুল।

---

১. বোখারী, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ১৫৪৩, ১৫৪৪; মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ১২৮০।

কেবলামুখী হয়ে দু'আ করা উচিত। নবী করীম (সা) পাহাড়ের পেছনে কেবলামুখী হয়ে দু'আ করার সময় পাহাড়টি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে অবস্থিত ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি পাহাড়ের দিকে ফিরে দু'আ করেছেন। বরং তিনি কেবলামুখী হয়েই দু'আ করেন।

নবী করীম (সা) যে জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'আ করেছেন, সে জায়গায় গিয়ে দু'আ করা জরুরী নয়। তিনি বলেছেন : 'আমি এখানে অবস্থান করলাম। কিন্তু আরাফাহ সবটাই অবস্থানের স্থল।'[১] অনেকে বহু কষ্ট কর সে জায়গায় পৌঁছার চেষ্টা করে। অথচ এর দরকার নেই।

৪. আরাফাত দিবসে জাবালে রহমতে উঠার কোন প্রয়োজন নেই। বহু লোক সেখানে উঠে এবং অবস্থান করে। অনেকের ধারণা, এ পাহাড়ে হযরত আদম (আ)-এর উপর রহমত নাযিল হয়েছে। তাই এটি একটি পবিত্র পাহাড়। আসলে এগুলো সব ভুল ধারণা। এটা অন্যান্য পাহাড়ের মতই একটি সাধারণ পাহাড়। এর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। কেউ কেউ ঐ পাহাড়ের গাছে কাপড়ের টুকরা ঝুলায়। এগুলো সবই বেদআত। এ পাহাড়ের নামকরণেরও কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আরবী কিতাবে এটাকে جبل عرفة 'আরাফার পাহাড়' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। জাবালে রহমত হিসেবে নয়।

৫. আরাফাতের গাছসমূহের পাতা ও ডাল ভাঙ্গা জায়েয। এটা হারাম সীমানার বাইরে। তবে বিনা প্রয়োজনে তা করা যাবে না। সরকার আরাফাতের আবহাওয়া শীতল করার জন্য যে গাছ লাগিয়েছে তা নষ্ট করা জায়েয নেই।

৬. কেউ কেউ মসজিদে নামেরায় ইমামের সাথে জামা'আতে নামায পড়াকে জরুরী মনে করেন। এজন্য তারা কষ্ট করে দূরের তাঁবু থেকে মসজিদে আসে। এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, নবী করীম (সা) বলেছেন, আমি এখানে অকুফ করলাম, কিন্তু আরাফাত সবটাই অকুফের স্থান।[২] মসজিদে নামেরা ছাড়াই আরাফাতের যে কোন স্থানে নামায পড়লেই চলবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا 'আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।'[৩]

৭. সময়ের অসদ্ব্যবহার করা ঃ বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা ও আলাপ-

---

১. মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ১৪৯।

২. মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

৩. বোখারী, নামায অধ্যায়; মুসলিম, মসজিদ অধ্যায়।

আলোচনা দ্বারা আরাফাতের পবিত্র দিনের সময় নষ্ট হয়। কেউ কেউ নিন্দা ও গীবতে নিয়োজিত হন। এগুলোর কোনটাই হজ্জের জন্য উপকারী নয়। বরং হজ্জের শিক্ষা বিরোধী। আরাফাহ্ দিবস হচ্ছে এবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম বিশেষ দিন। হজ্জের দিনগুলোতে গুনাহ্ ও মন্দ কাজ অধিক ঘৃণিত। আল্লাহ্ বলেছেন :

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فِسوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ

'হজ্জের মাসসমূহে যে লোক হজ্জ পালন করবে তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন গুনাহর কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ করা নাজায়েয।' (সূরা বাকারা-১৯৭)

সেদিন বেশী বেশী দু'আ যিক্র ও কোরআন তেলাওয়াত করা দরকার। একঘেঁয়েমী লাগলে হাজী সাহেবানের সাথে শরীয়ত ও দীনের উপকারী আলোচনা করতে হবে। যাতে করে তাদের মধ্যে আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশার দরজা উন্মুক্ত হয়। দিনের শেষাংশে আল্লাহর কাছে কেবলামুখী হয়ে করুণভাবে কান্নাকাটি করা উচিত। বারবার দু'আ করা দরকার এবং কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত দু'আগুলোর পুনরাবৃত্তি উত্তম। কেননা, ঐ সময় দু'আ কবুলের সম্ভাবনা বেশী।

মোযদালেফার ভুলসমূহ

১. আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে মোযদালেফার উদ্দেশ্যে রওনা করা কিংবা আরাফাহ্ সীমানা অতিক্রম করা। এটা নবী (সা)-এর বিরোধিতা। কেননা, জাবের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা) সূর্যাস্তের আগে আরাফাহ্ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।[১]

২. আরাফাত থেকে মোযদালেফায় আসার সময় বেশী তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। ধীরে সুস্থে আসতে হবে। নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জের নিজ উষ্ট্রী কোসওয়ার লাগাম এমনভাবে টেনে ধরতেন যে উষ্ট্রীর মাথা তাঁর আসনে সাথে এসে লেগে যেত। এরপর তিনি নিজ হাত মোবারকে ইশারা দিয়ে বলতেন :

اَيُّهَا النَّاسُ اَلسَّكِيْنَةُ اَلسَّكِيْنَةُ 'হে লোকেরা, প্রশান্তির সাথে চল।'

৩. মোযদালেফা সীমান্তে পৌছার আগেই মোযদালেফার বাইরে অকুফ করা ভুল। পায়ে হেঁটে হজ্জকারীরা ক্লান্ত হয়ে গেলে তাড়াহুড়া করে এরূপ করে।

---

১. মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

সেখান থেকে পরের দিন সকালে মিনায় পৌঁছে। এর ফলে, তাদের মোযদালেফায় অবস্থান বিশুদ্ধ হয়নি। অথচ, অকুফে মোযদালেফা ওয়াজিব।

৪. কেউ কেউ মোযদালেফায় পৌঁছার আগেই মাগরিব ও এশার নামায রাস্তায় পড়ে নেয়। এটা সুন্নতের খেলাপ। নবী করীম (সা) আরাফাত থেকে মোযদালেফা পৌঁছার সময় রাস্তায় অবতরণ করে পেশাব করেন এবং ওজু করেন। উসামা বিন যায়েদ ছিল তাঁর সওয়ারের সাথী। উসামা বলল : হে আল্লাহর রাসূল, নামায। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : নামায সামনে গিয়ে পড়বো।[১] তিনি মোযদালেফায় পৌঁছে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক সাথে আদায় করেছেন।

কোন কারণে যদি মোযদালেফা পৌঁছতে এত দেরী হয় যে, এশার নামাযের সময় চলে যাচ্ছে, তখন এশার সময়ের মধ্যে মাগরিব ও এশা একসাথে আদায় করতে হবে। নামায আদায় না করলে কবীরা গুনাহ হবে। কেননা, নামাযের সময়ে নামায না পড়া হারাম কাজ। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

'নিশ্চয় মোমেনদের জন্য নামাযের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট।' (সূরা নিসা-১০৩)

কেউ যদি মনে করে যে, সুন্নতের অনুসরণের লক্ষ্যেই মোযদালেফা পৌঁছার পর নামায পড়বে, যদিও এশার সময় চলে যায়। এই সুন্নতের পরিপন্থী কথা। নবী (সা) মাগরিবকে বিলম্বে পড়লেও এশাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়েছেন।

৫. কেউ কেউ মোযদালেফায় ফজরের সময়ের আগেই ফজরের আজান দিয়ে নামায শুরু করে এবং তাড়াতাড়ি করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এটা হারাম। নামাযের সময় পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই। বরং এটা হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন। এটা ঠিক যে, ফজরের নামায ১ম ওয়াক্তে পড়ে রওনা দেয়ার চেষ্টা করা ভাল। নবী (সা)ও সেদিন ১ম ওয়াক্তে ফজর পড়েছেন। স্মরণ রাখতে হবে, ভোরের আলো উজ্জ্বল হওয়ার পর মোযদালেফার সীমানা অতিক্রম করে মিনায় পৌঁছা উত্তম। ফজরের পর মোযদালেফার মসজিদের (মাশ'আরে হারামে) কাছে অবস্থান করে দু'আ করা ভাল।

৬. মোযদালেফার রাত্রে যারা রাত্রি জাগরণ করেন তারা মহানবী (সা)-এর সুন্নতের বিরোধিতা করেন। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) মাগরিব ও এশা পড়ার পর ঘুমিয়ে পড়েন এবং ফজরের সময় উঠে ফজরের

---

১. বোখারী, হজ্জ অধ্যায়; মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

নামায পড়েন।[১] সে রাতে তিনি তাহাজ্জুদ কিংবা অন্য কোন তাসবীহ ও যিক্র করেননি।

৭. কিছু কিছু হাজী সাহেবান সূর্যোদয়ের পরও মোযদালেফায় অবস্থান করেন এবং সেখানে এশরাকের/চাশতের নামায পড়েন। তারপর মিনায় আসেন। এটা নবী (সা)-এর সুন্নতের খেলাফ। নবী করীম (সা) সূর্যোদয়ের আগে যখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেল তখন মোযদালেফা ত্যাগ করেছেন।

৮. মোযদালেফায় (অকুফের) অবস্থানের পরিবর্তে শুধুমাত্র অতিক্রম করা ঠিক নয়। বরং সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত অবস্থান জরুরী। নবী করীম (সা) কেবলমাত্র অসুস্থ, দুর্বল ও ওজরগ্রস্ত লোকদেরকে রাত্রে মোযদালেফা ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, দুর্বল শ্রেণীর লোকদের কি পরিমাণ সময় মোযদালেফায় অবস্থান করতে হবে? হযরত আসমা বিনতে আবী বাক্র (রা) চাঁদ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মোযদালেফায় অবস্থান করেছেন।[২] তারপর তিনি মিনা চলে যান। নবী করীম (সা) দুর্বলদেরকে রাত্রে মোযদালেফা ত্যাগের অনুমতি দিলেও সময়ের সীমারেখা উল্লেখ করেননি। হযরত আসমার মত একজন সাহাবীর কার্যক্রম নবী করীম (সা)-এর অনুমতির উত্তম ব্যাখ্যা হতে পারে। অর্থাৎ অসুস্থ, দুর্বল ও ওজরগ্রস্ত লোকেরা ১০ই জিলহজ্জ রাত্রে চাঁদ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মোযদালেফায় অবস্থান করবেন। সে সময়টি রাতের $\frac{১}{৩}$ ভাগ হবে। কেননা, ৩০ দিনে ১ মাস। ১ম ১০ দিন চাঁদ রাত্রের $\frac{১}{৩}$ ভাগ সময় আকাশে দেখা যাবে। আর $\frac{২}{৩}$ ভাগ সময় দেখা যাবে না।

জামরায় কংকর নিক্ষেপের ভুল

১. মিনার জামরায় নিক্ষেপের জন্য কেবলমাত্র মোযদালেফা থেকে কংকর সংগ্রহ করা ভুল। নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণিত নেই। যে কোন জায়গা থেকেই কংকর সংগ্রহ করা যায়।

২. কংকর ধুয়ে ও পরিষ্কার করে নিক্ষেপ করা ঠিক নয়। কেউ পেশাব করে থাকতে পারে এ আশংকায় তা ধোয়া বেদআত। নবী (সা) এরূপ করেননি এবং এর কোন দরকারও নেই।

৩. অনেকেই জামরাকে শয়তান এবং শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করছে বলে ধারণা করে। তাই কেউ কেউ খুব রাগ ও গোস্বা সহকারে কংকর নিক্ষেপ করে

---

১. মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

২. বোখারী, হজ্জ অধ্যায়; মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

যেন শয়তান তার সামনে বাঁধা। এটা ভুল ধারণা। শয়তান তো জামরার ইট দিয়ে তৈরী নয়। বরং জামরায় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণ, নবী করীম (সা)-এর অনুসরণ এবং এবাদত করা। পক্ষান্তরে, যারা রাগ-গোস্বা ও কঠিন আবেগ সহকারে কংকর নিক্ষেপ করে, তারা লোকদেরকে অনেক কষ্ট দেয়। ফলে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা তার কাছে পোকা-মাকড়ের মত এবং সে তাদের কোন পরোয়া করে না। সে যেন ক্ষ্যাপা উটের মত উন্মত্ত। কেউ কেউ কংকর নিক্ষেপের সময় নিচের দু'আ পড়ে যা পড়া ঠিক নয় :

اَللّٰهُمَّ غَضَابًا عَلَى الشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ -

'হে আল্লাহ, শয়তানের প্রতি অসন্তোষ এবং মেহেরবান দয়াবান আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে।' বরং কংকর নিক্ষেপের সময় মহানবী (সা)-এর অনুসরণে তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

জামরাকে শয়তান বিবেচনার ভ্রান্ত ধারণার প্রেক্ষিতে অধিকতর প্রতিশোধের জন্য বড় পাথর নিক্ষেপ করে। বেশী অপমান করার উদ্দেশ্যে জুতা, স্যান্ডেল, কাঠ ও অন্যান্য জিনিস নিক্ষেপ করে। অথচ, এগুলো নিক্ষেপ করা নাজায়েয। বিশুদ্ধ আকীদা অনুযায়ী কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ, আল্লাহ্‌র এবাদত এবং নবী করীম (সা)-এর সুন্নতের অনুসরণ।

৪. লোকেরা জামরার স্তম্ভকে লক্ষ্য করে কংকর নিক্ষেপ করে। কিন্তু নিয়ম হল, স্তম্ভের গোড়ায় যে পাকা হাউজ আছে তাতে কংকর নিক্ষেপ করা। স্তম্ভগুলো হচ্ছে কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৈরি হাউজের চিহ্ন। কংকর নিক্ষেপ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল, তা হাউজে পড়তে হবে। স্তম্ভ থেকে হাউজে পড়লে চলবে। কিন্তু যদি ছিটকে অন্যদিকে চলে যায় এবং হাউজে না পড়ে তাহলে কংকর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না। হাউজে নিক্ষেপের পর তা হাউজ থেকে অন্যদিকে চলে গেলে কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ হাউজেই কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, স্তম্ভ পড়ুক বা নাই পড়ুক।[১]

৫. শক্তিবান লোকদের দৈহিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজে কংকর না মেরে অন্যকে কংকর মারার দায়িত্ব অর্পণ নিঃসন্দেহে বিরাট ভুল। কেননা, কংকর নিক্ষেপ হজ্জের অন্যতম নিদর্শন ও হুকুম। আল্লাহ বলেন :

---

১. ফিকহুল এবাদাত, মোহাম্মদ বিন সালেহ ওসাইমিন, সৌদি আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য, দারুল ওয়াতন প্রকাশনী, রিয়াদ, ১৪১৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৯৫।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ـ

'আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পন্ন কর।' (সূরা বাকারা-১৯৬)।

এ আয়াতে হজ্জ সম্পন্ন করার অর্থ হল, হজ্জের সকল হুকুম সম্পন্ন করা এবং সেটা নিজেকেই করতে হবে। নিজে অক্ষম হলে অন্য কাউকে দিয়ে নিক্ষেপ করানো যাবে না। কেউ কেউ বলেন, প্রচন্ড ভীড়ের কারণে কংকর নিক্ষেপ কষ্টকর হওয়ায় এ ওজরের কারণে অন্যকে দিয়ে তা নিক্ষেপ করানো হয়। এ প্রশ্নের জবাব হল, ১ম দিকে ভীড় হলে পরে ভীড় কমলে অথবা রাত্রে কংকর নিক্ষেপ করা যায়। তাই ভীড়ের অজুহাতে কংকর নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকা যাবে না।

মহিলারা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল এবং পুরুষদের কামনা-বাসনার বস্তু। মহিলারা পুরুষদের ফেতনার কারণ। যদি পুরুষদের সাথে কংকর নিক্ষেপে কোন সমস্যা হয়, তাহলে তারা যেন রাত্রে কংকর মারে।

নবী করীম (সা) নিজ স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআ সহ অন্যান্য দুর্বলদেরকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ থেকে অব্যাহতি দেননি। যদিও তারা এই অধিকারের যোগ্য ছিলেন। বরং তিনি তাদেরকে শেষ রাত্রে মোযদালেফা ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যেন তারা পুরুষদের আগেই মিনায় পৌঁছে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (সা) তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ থেকে অব্যাহতি দেননি।

সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ছোট শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। সত্যিকার ওজর ছাড়া অন্যকে কংকরের প্রতিনিধিত্ব দেয়া যাবে না। অর্থাৎ এবাদতের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা করা যাবে না।

৬. কংকর হাত থেকে পড়ে গেলে অন্য যে কংকর পাওয়া যাবে তাই নিক্ষেপ করতে হবে। এমনকি হাউজের নিকটবর্তী এলাকা থেকে তা কুড়িয়ে নিতে ইতস্তত করা ঠিক নয়। অনেকে নিক্ষিপ্ত কংকর থেকে প্রয়োজনে তুলে নিতে ইতস্তত করে।

৭. কংকর ৭টি করে নিক্ষেপ করতে হবে। কেউ যেন ৬টি বা ৫টি নিক্ষেপ না করে। কেউ কষ্টের কারণে এক সাথে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে। এটা ভুল। ৭ বারে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

৮. কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ না করা ভুল। নবী করীম (সা) ১ম জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে একটু সরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী

দু'আ করতেন। মধ্য জামরায়ও তিনি অনুরূপ করেছেন। কিন্তু জামরা আকবায় কংকর নিক্ষেপের পর তিনি দু'আর জন্য দাঁড়াতেন না। নিজেদের সুযোগমত হাজীরা যেন এ সুযোগ হাতছাড়া না করেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল, হজ্জে ৬ জায়গায় দু'আ করা উচিত। সেগুলো হল, সাফা ও মারওয়ায় সাঈর মধ্যে; আরাফাহ্, মোযদালেফা এবং ১ম ও মধ্যম জামরাহ্। মহানবী (সা) এ সকল স্থানে দু'আ করেছেন।

৯. শরীয়তের নির্ধারিত বৈধ পদ্ধতি ও সংখ্যার বাইরে কংকর নিক্ষেপ করা ভুল। কেউ ৭টার বেশী কংকর নিক্ষেপ করে। কেউ কেউ দিনে একাধিকবার জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে। এমনকি হজ্জের সময় ব্যতীতও কেউ কেউ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে। এগুলো সবই ভুল। নবী করীম (সা) যা বলেননি বা যা করেননি তার নাম এবাদত নয়। বরং তা বেদআত ও গুনাহ্।

মিনায় যেসব ভুল হয়

১. মিনায় রাত্রি যাপন না করা। মিনায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব না সুন্নত– এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (সা) মিনায় রাত্রি যাপন করেছেন। রাত যাপন না করা কমপক্ষে সুন্নতের পরিপন্থী। সুযোগ থাকলে এ মহান সুন্নতটি ত্যাগ করা উচিত নয়। শুধু ওজরগ্রস্ত লোকেরা এর ব্যতিক্রম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালেবকে মক্কায় হাজীদের পানি পান করানোর জন্য এবং ভেড়া-বকরীর রাখালদেরকে মিনার বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। রোগী কিংবা রোগীর সেবাকারী ব্যক্তি, নার্স ও ডাক্তার ইত্যাদি লোকেরাও একই কারণে মিনার বাইরে থাকতে পারে।

কেউ কেউ রাত্রে মিনায় থাকলেও দিনে মিনায় থাকে না। যদিও ফেকাহ্‌বিদগণের মতে তা জায়েয, তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) দিনেও মিনায় ছিলেন। মিনায় রাত্রি যাপনের বিষয়ে ফকীহ্গণ বলেছেন, অর্ধেক রাত্রের বেশী থাকলেও রাত্রি যাপনের হুকুম আদায় হয়ে যাবে। মূলকথা মিনায় থেকে আল্লাহর যিক্‌রের চেষ্টা করা দরকার।

২. হাদী অর্থাৎ তামাত্তু ও কেরান হজ্জের জন্য হাজীরা যে কোরবানী দেন অনেকে তাতে কোরবানী শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী বিবেচনা করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) কোরবানীর পশুর জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ضَلْعُهَا وَالْهَزِيْلَةُ اَوْ اَلْعَجْفَاءُ اَلَّتِىْ لاَ تَنْقَى ۔

অর্থ ঃ ১. প্রকাশ্য কানা ২. প্রকাশ্য রোগা ৩. প্রকাশ্য খোঁড়া ৪. দুর্বল– এ চারটি ত্রুটি থাকলে সে পশু দিয়ে কোরবানী করা যাবে না।

৩. কোরবানীর পশু জবেহ করে তার গোশত খাওয়া এবং ফকীর-মিসকীনকে দেয়া কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন :

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ –

'তোমরা এর গোশত খাও এবং অভাবী ও ফকীর মিসকিনকে দান কর।" (সূরা হজ্জ-২৮)

কিন্তু হাজী সাহেবগণ পশু কোরবানী করে গোশত ফেলে দিয়ে আসেন। এটা ঠিক নয়। ভীড় কিংবা দূরত্বের কারণে বহন করে আনতে অসুবিধে হলে কোরবানীর গোশতের সদ্ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিয়ে দিলে তারা কোরবানী করে তা বিলি করবে। সেটাই উত্তম।

৪. হাজীদের কোরবানী কিংবা দম মক্কার বাইরে দেয়া ঠিক নয়। যদিও তা কোন গরীব মুসলিম দেশেই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় গরীব লোক থাকা সত্ত্বেও মক্কায় হজ্জের কোরবানীর পশু জবেহ করেছেন। তাই ফকীহরা হাজীদের কোরবানীর পশু মক্কায় জবেহ করাকে ওয়াজিব বলেছেন। আল্লাহ শিকারের কাফ্ফারার আদেশ দিয়ে বলেছেন :

يَحْكُمُ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ "এহরাম অবস্থায় কেউ শিকার করলে... দু'জন ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত লোক এর ফয়সালা করবে এবং বিনিময়ের পশুটি উৎসর্গ হিসেবে কা'বায় পৌঁছতে হবে।" (সূরা মায়েদা-৯৫)

৫. হাজী ছাড়াও যারা ঈদের কোরবানী দেন, তারা যে যেখানে থাকেন সেখানে কোরবানী দেয়া উত্তম। নবী (সা) মদীনায় ছিলেন এবং সেখানেই কোরবানী দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই ইসলামের এ মহান নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যারা থাকেন এক জায়গায় আর কোরবানী দেন আরেক জায়গায় তারা দুটো সওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। ১. নিজ হাতে কোরবানীর পশু জবেহ্ করা সুন্নত। মহানবী (সা) তাই করেছেন। নিজ হাতে জবেহ না করলেও জবেহর সময় উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখতেন। ২. কোরবানীর পশুর গোশত খাওয়া। কেননা, আল্লাহ বলেছেন : 'তোমাদের নিজেরা কোরবানীর পশুর গোশত খাও এবং ফকীর-মিসকীন ও দুঃস্থ লোকদেরও খাওয়াও।'[১]

---

১. সূরা হজ্জ-২৮।

রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে ১০০টি উট কোরবানী করেন। তিনি নিজ হাতে ৬৩টি জবেহ করেন। অবশিষ্টগুলো জবেহর জন্য হযরত আলী (রা)-কে দায়িত্ব দেন। তিনি সকল উট থেকে এক টুকরা গোশত রান্নার নির্দেশ দেন এবং নিজে সে গোশত ও ঝোল খান। অন্যত্র জবেহ করলে সওয়াবগুলো লাভ করা সম্ভব হবে না।

৬. আইয়ামে তাশরীকে মিনায় অবস্থানকালে বেহুদা গল্প-গুজব, মিথ্যা কথা ও কাজ, তাস খেলা, অতিরিক্ত ঘুমানো– এগুলো ক্ষতিকর কাজ। তাই এখানে অধিক জিকর-ফিকির, তাসবীহ-তাহলীল, তওবা-এস্তেগফার, কোরআন তেলাওয়াত, নফল নামায এবং ওয়াজ-নসীহত করা ও সময়ের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। যিন্দেগীতে ২য় বার হয়তো মিনায় আসার সুযোগ নাও হতে পারে।

বিদায়ী তওয়াফের ভুল

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لَايَنْصَرِفْ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ 'তোমাদের কেউ যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ না করে সর্বশেষ বিদায় না হয়।'[১] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, লোকদের সর্বশেষ বিদায়ী তওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঋতুবতী মহিলাদের ব্যাপারে এ হুকুম শিথিল করা হয়েছে।[২] লোকেরা এক্ষেত্রে অনেক ভুল করে।

১. কেউ কেউ বিদায়ী তওয়াফ করে অথচ তখনও তার জামরায় কংকর নিক্ষেপ বাকী আছে। মিনা যেহেতু মক্কার অংশ এবং কংকর নিক্ষেপ হজ্জের অবশিষ্ট কাজ, তাই আল্লাহর ঘর থেকে বিদায় নেয়া সম্পন্ন হয়নি।

২. বিদায়ী তওয়াফ করে মক্কায় অবস্থান করা। ফলে এটা বিদায়ী তওয়াফ বলে গণ্য হবে না। শেষ বিদায়ের মুহূর্তে আবারও তওয়াফ করতে হবে। বিদায়ী তওয়াফের পর যদি রাস্তায় কিছু কেনা-কাটা থাকে কিংবা মাল পরিবহনের জন্য কিছু সময় থাকতে হয়, তাহলে চলে।

৩. বিদায়ী তওয়াফের পর পেছন দিকে হেঁটে মসজিদে হারাম থেকে বের হওয়া বিরাট ভুল। এটা বেদআত। নবী (সা) কিংবা সাহাবা কেরাম তা করেননি। এবং তাদের চাইতে বেশী কেউ কা'বা শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলেন না।

আল্লাহ হাজী সাহেবনাকে ত্রুটিমুক্ত হজ্জ পালনের তওফিক দিন। আমীন!

---

১. মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

২. বোখারী, হজ্জ অধ্যায়; মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়।

১১. হজ্জ উপলক্ষে হারামাইন শরীফাইনে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সেবা

প্রতি বছর মক্কায় হাজীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ বিরাট সংখ্যক হাজীর সেবা আঞ্জাম দেয়া সোজা ব্যাপার নয়। ১৯২৭ খৃঃ মোতাবেক ১৩৪৫ হিজরীতে বহিরাগত হাজীর সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার ৬৬২ জন। আর ১৯৯৪ খৃঃ মোতাবেক ১৪১৫ হিজরীতে বহিরাগত হাজীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ এবং ভেতর ও বাইরের মোট হাজীর সংখ্যা হচ্ছে ২৫ লাখ। নিম্নে হাজীদের সংখ্যার একটি তালিকা দেয়া হল।[১]

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা
১৯২৭ (১৩৪৫ হিঃ)	৯০৬৬২	১৯৪৭	৫৫২৪৪
১৯২৮	৯৬২১২	১৯৪৮	৭৫৬১৪
১৯২৯	৯০৭৬৪	১৯৪৯	৯৯০৬৯
১৯৩০	৮১৬৬৬	১৯৫০	১০৭৬৫২
১৯৩১	৮১০৪৫	১৯৫১	১০০৫৭৮
১৯৩২	২৯০৬৫	১৯৫২	১৪৮৫১৫
১৯৩৩	২০১৮১	১৯৫৩	১৪৯৮৪১
১৯৩৪	২৫২৯১	১৯৫৪	১৬৪০৭২
১৯৩৫	৩৩৮৯৮	১৯৫৫	২৩২৯৭১
১৯৩৬	৩৩৮৩০	১৯৫৬	২২০৭২২
১৯৩৭	৪৯৫১৭	১৯৫৭	২১৫৫৭৫
১৯৩৮	৭৬২২৪	১৯৫৮	২০৯১৯৭
১৯৩৯	৫৯৫৭৭	১৯৫৯	২০৭১৭১
১৯৪০	৩২১৫২	১৯৬০	২৫৩৩৬৯
১৯৪১	২৩৮৬৩	১৯৬১	২৮৫৯৪৮
১৯৪২	২৪৭৪৩	১৯৬২	২১৬৪৫৫
১৯৪৩	৬২৫৯০	১৯৬৩	১৯৯০৩৮
১৯৪৪	৩৭৮৫৭	১৯৬৪	২৬৬৫৫৫
১৯৪৫	৩৭৬৩০	১৯৬৫	২৮৩৩১৯
১৯৪৬	৬১২৮৬	১৯৬৬	২৯৪১১৮

১. দৈনিক আল মদীনা, ৯-১২-১৪১২ হিঃ, জেদ্দা, সৌদী আরব।

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা
১৯৬৭	৩১৬২২৬	১৯৮১	৮৭৯৩৬৮
১৯৬৮	৩১৮৫০৭	১৯৮২	৮৫৩৫৫৫
১৯৬৯	৩৭৪৭৫৪	১৯৮৩	১০০৩৯১১
১৯৭০	৪০৬২৯৫	১৯৮৪	৯৬৯৬৭১
১৯৭১	৪৩১২৭০	১৯৮৫	৯৪৬০৯৭
১৯৭২	৪৭৯৩৩৯	১৯৮৬	৯৫৬৭১৮
১৯৭৩	৬৬৫১৮২	১৯৮৭	৯৬০৩৮৬
১৯৭৪	৬০৭৭৫৫	১৯৮৮	৭৬২৭৫৫
১৯৭৫	৮৯৪৫৭৩	১৯৮৯	৭৭৪৫৬০
১৯৭৬	৭১৯০৪০	১৯৯০	৮২৭২৩৬
১৯৭৭	৭৩৯৩১৯	১৯৯১	৭২০১০২
১৯৭৮	৮৩০২৩৬	১৯৯২	১০০০৫০০
১৯৭৯	৮৬২৫২০	১৯৯৩	১০,০০,০০০
১৯৮০	৮১২৮৯২	১৯৯৪ (১৪১৪ হিঃ)	১০,০০,০০০

মসজিদে হারাম এবং হারাম এলাকার সেবার ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ ব্যাপক দায়িত্ব পালন করছে। এক কথায় বলা যায় যে, হজ্জের সময়, গোটা সৌদী সরকারই এর পেছনে লেগে থাকে। স্বয়ং বাদশাহও তখন জেদ্দায় অবস্থান করেন এবং হজ্জ কর্মসূচী তত্ত্বাবধান করেন। নীচে, বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো।

১. শাহী দরবার

বাদশাহ্ নিজে সরাসরি হজ্জ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন তদারক করেন। হজ্জ উপলক্ষে বাদশাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং অনেক রাষ্ট্রপ্রধান হজ্জ করার জন্য আসেন। রাজকীয় মেহমানদের আতিথেয়তা ও সেবা করা হয় এবং তাদের অনেকের সাথে বাদশাহ্ সাক্ষাত দেন। হজ্জ উপলক্ষে বাদশাহর পক্ষ থেকে মিনায় হজ্জ প্রতিনিধিদল ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বাদশাহ্ বক্তৃতা করেন। অতিথিদের মধ্য থেকেও অনেকে বক্তৃতা করেন। হজ্জের সময় শাহী দরবার মিনার রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়।

২. উচ্চতর হজ্জ কমিটি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রী পর্যায়ে উচ্চতর হজ্জ কমিটি গঠিত। এটি হচ্ছে, মূলতঃ হজ্জ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী কমিটি। এই কমিটি হজ্জের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়।

৩. হজ্জ মন্ত্রণালয়

হজ্জের সব দায়-দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে হজ্জ মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রধান কাজ হল, হজ্জ সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তদারক করা। একজন মন্ত্রীর অধীন কয়েকজন উপমন্ত্রীও রয়েছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজীদের সংখ্যা নির্ধারণ ও যোগাযোগ, হজ্জ প্রতিনিধিদল, ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা প্রতিনিধিদল গ্রহণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমন্ত্রণ, হাজীদের আবাসিক ভবনসমূহের উপযুক্ততা যাচাই-বাছাই, ভাড়ার হার নির্ধারণ, বিভিন্ন মোতাওয়েফ ও তওয়াফ সংস্থার কার্যাবলী তদারক, মিনা, মোযদালেফা, আরাফাতসহ বিভিন্ন স্থানে হজ্জের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, মক্কা ও মদীনার অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের হেফাজত ও উন্নয়ন, সকল মসজিদের তদারকসহ এই মন্ত্রণালয় আরো বহুবিধ কাজের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। মক্কা, মদীনা ও জেদ্দায় হজ্জ মন্ত্রণালয়ের তিনটি শাখা অফিস আছে। হজ্জমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের হজ্জ প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের কাছ থেকে সমস্যা শুনেন ও সেই আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হজ্জ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছর হজ্জ মওসুমে একটি ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া, হজ্জমন্ত্রী হজ্জ প্রতিনিধিদলকে কা'বার গেলাফের অংশ উপহার দেন। হজ্জ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর হজ্জের সময় বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

৪. কেন্দ্রীয় হজ্জ কমিটি

হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলীর ব্যাপারে হজ্জ মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মক্কার গভর্নরের নেতৃত্বে সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় হজ্জ কমিটি গঠিত। এটি একটি স্থায়ী কমিটি এবং হজ্জ সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য দায়ী। উচ্চতর হজ্জ কমিটির প্রণীত মূলনীতি অনুযায়ী এই কমিটি হজ্জের ব্যাপারে সকল প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, তদারক ও পর্যালোচনা করে থাকে। কমিটির অন্যতম কাজ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু

সমন্বয় সাধন করা। এই কমিটির তৎপরতা, কার্যকারিতা ও সাফল্যের উপরই হজ্জের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল। কমিটি, প্রত্যেক বছর হজ্জ শেষে, হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা, ত্রুটি ও দুর্বলতা পর্যালোচনা করে পরের বছর ঐ সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করে।

কেন্দ্রীয় হজ্জ কমিটির অধীন একটি নির্বাহী কমিটি আছে। এটিই কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাস্তব পরামর্শ দেয়।

ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস

হজ্জের ব্যবস্থাপনা এক বিশাল ব্যাপার। হজ্জ মওসুমে লক্ষ লক্ষ হাজীর আগমন ও বিদায় উপলক্ষে জেদ্দার বিমান ও সামুদ্রিক বন্দরে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য সেবাসমূহ আঞ্জাম দেয়ার জন্য হজ্জ মন্ত্রণালয় 'ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস' গঠন করে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউনাইটেড এজেন্টস অফিসের কাজ পরিচালিত হয়। ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস মূলতঃ তওয়াফ সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

হজ্জ মওসুমে ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস সাময়িকভাবে বহু সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করে এই বিশাল কাজের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেয়। এই সংস্থাটি হাজীদের আগমন ও বিদায়কালীন সময়কার সকল কাজ-কর্মের জন্য দায়ী।

হাজীরা জেদ্দার বিমান বন্দর ও সামুদ্রিক বন্দরে অবতরণের সাথে সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রেশন কাজ শেষ করা হয়। তারপর তাদেরকে হজ্জ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখান ও বিতরণ কমিশন স্বাগত জানায়। কমিশন হাজীর পাসপোর্টে একটি সীল লাগিয়ে তাতে তওয়াফ সংস্থার নাম লিখে দেয়। এর ভিত্তিতেই মক্কা ও মদীনায় মোতাওয়েফগণ হাজীদের সেবা আঞ্জাম দেয়।

এরপর ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস প্রয়োজনীয় সকল তথ্য রেকর্ড করে এবং হাজীর কাছ থেকে বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে আনীত চেক গ্রহণ করে পাসপোর্টে স্বীকৃতিমূলক একটি সীল লাগায়। পরে হাজীরা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ইউনাইটেড এজেন্টস অফিসের কুলীরা বিনামূল্যে ট্রলীতে করে তাদের মাল-পত্র বন্দরের ভেতর সংশ্লিষ্ট দেশের হজ্জ মিশনের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হাজীদের তালিকা ও পাসপোর্ট মোতাওয়েফের গাড়ীর ড্রাইভারের কাছে সরবরাহ করা হয় এবং তাদেরকে মোতাওয়েফের অপেক্ষমান গাড়ীতে

উঠিয়ে মক্কা ও মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। মক্কা ও মদীনায় পৌছার আগেই মক্কার তওয়াফ সংস্থা ও মদীনার আদিল্লা সংস্থার কাছে ট্যালেক্স বা ফ্যাক্সে হাজীদের নাম পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কোন হাজী পাসপোর্ট হারিয়ে ফেললে, তা প্রথমে ইউনাইটেড এজেন্টস অফিসে জানাতে হয়। তারা হাজীর আগমন সম্পর্কিত কম্পিউটার নম্বর নিয়ে মক্কা-মদীনায় যাওয়ার জন্য বিমান বন্দরে অবস্থিত হজ্জ মন্ত্রণালয়ের অফিস থেকে একটি অস্থায়ী পাসের ব্যবস্থা করে। হজ্জ শেষে ফিরে এসে অস্থায়ী পাসটি ফেরত দিলে সংস্থা সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত হাজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য আউট পাসের ব্যবস্থা করে। ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস অসুস্থ্য হাজীদেরকে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে এবং মৃত হাজীদের ব্যাপারে হজ্জ মন্ত্রণালয় তওয়াফ সংস্থা ও বায়তুল মাল সংস্থাকে অবহিত করে।

ইউনাইটেড এজেন্ট অফিস হাজীদের কাছ থেকে গৃহীত চেকের অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে পৌছিয়ে দেয়। এই অফিস হাজীদের মধ্যে হজ্জ সংক্রান্ত বই-পুস্তক ও প্রয়োজনীয় লিফলেট বিলি করে।

হাজীদের বিদায়কালীন সময়ে বন্দরে পৌঁছার পর ইউনাইটেড এজেন্টস অফিসের পক্ষ থেকে একটি Clearance সীল দেয়া হয়। এই সীল না হলে, ইমিগ্রেশন বিভাগ হাজীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে দেবেনা।

মোটকথা, সামুদ্রিক ও বিমান বন্দরে ইউনাইটেড এজেন্টস অফিসের সেবা উল্লেখযোগ্য।

হজ্জের বিভিন্ন ফিস

হজ্জে আসার আগে হাজীকে, প্রথমে সংশ্লিষ্ট দেশের সৌদী আরব দূতাবাস থেকে হজ্জ ভিসা সংগ্রহ করতে হয়। ভিসা পাওয়ার জন্য তাদেরকে দুই ধরনের ফিস বাবদ একটা চেক জমা দিতে হয়। গাড়ী ভাড়া বাবদ ৩৪৫ রিয়াল দিতে হবে।

গাড়ী ভাড়ার হার ঃ

১৭২.৫০ রিয়াল ঃ জেদ্দা-মদীনা-মক্কা অথবা জেদ্দা-মক্কা-মদীনা

১৫০.০০ রিয়াল ঃ মক্কা-মিনা-আরাফাত-মোযদালেফা-মিনা-মক্কা

২২.৫০ রিয়াল ঃ মক্কা-জেদ্দা

মোট ৩৪৫.০০ রিয়াল

তবে এয়ারকন্ডিশন গাড়ী ব্যবহার করলে মোট ৪৩৫ রিয়াল দিতে হবে। আর তা হচ্ছে, নিম্নরূপ ঃ

২২৫.০০ রিয়াল ঃ জেদ্দা-মদীনা-মক্কা অথবা জেদ্দা-মক্কা-মদীনা

১৮০.০০ রিয়াল ঃ মক্কা-মিনা-আরাফাত-মোযদালেফা-মিনা-মক্কা

৩০.০০ রিয়াল ঃ মক্কা-জেদ্দা

মোট ৪৩৫.০০ রিয়াল

সেবা ফিস ঃ

নিম্নলিখিত সেবাসমূহের মোকাবিলায় দুইভাগে মোট ৪৪৪ রিয়াল ফিস দিতে হয়–

২৯৪ রিয়াল ঃ মক্কা তাওয়াফ সংস্থা, মদীনার আদিল্লা সংস্থা, জেদ্দা ইউনাইটেড এজেন্টস অফিস, যমযম পানি সেবা ফিস।

১৫০ রিয়াল ঃ পানি, বিদ্যুত, পরিচ্ছন্নতা, বিছানা ও পাহারাসহ মিনা ও আরাফাতের তাঁবু ফিস।

হাজীদেরকে উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী মোট ৭৮৯ কিংবা ৮৮৯ রিয়ালের একটা চেক জমা দিতে হবে। স্থলপথে আগমনকারী হাজীদের গাড়ী ভাড়া দিতে হবেনা। তারা শুধু ফিস দেবে। ১৫ বছরের কমবয়স্ক হাজীদের ফিস ও গাড়ী ভাড়া দিতে হবে এর অর্ধেক। সৌদী আরবে নেমে ইউনাইটেড এজেন্টস-এর কাছে উক্ত চেকটা হস্তান্তর করতে হবে। তবে কোন হাজী যদি জেদ্দায় সামুদ্রিক ও বিমানবন্দর হাজী ক্যাম্পে থাকতে চায়, তাদেরকে মাথাপিছু ৮০ রিয়াল দিতে হবে। আর মক্কা ও মদীনায় থাকলে সেখানে ঘরভাড়া আলাদাভাবে দিতে হবে।

তওয়াফ সংস্থা

হাজীদের সেবা ও সুষ্ঠুভাবে তাদের হজ্জ আদায়ের ব্যবস্থার জন্য পেশাদার মোতাওয়েফের উদ্ভব হয়েছে। ৮৮৪ হিজরীতে, এই পেশার অভ্যুদয়ের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত বিগত ৪শ' বছরের মধ্যে মোতাওয়েফরা এই সেবা আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। প্রথম প্রথম মোতাওয়েফগণ আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবানের ভাল খেদমত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয় এবং সেবা গৌণ হয়ে যায়। বরং প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় হজ্জ উপলক্ষে হাজীদের কাছ থেকে কতবেশী আয় করা যায়। তাই সৌদী আরব পৌঁছার পর থেকে মক্কা, মিনা আরাফাত ও মোযদালেফায় হজ্জ কার্যক্রম পালন এবং মদীনায়

মসজিদে নবওয়ী যেয়ারতের ব্যাপার তাদের গাফলতি ও উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়। তারা হাজীদের সাথে দেশে প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত সকল বিষয়ে দুর্ব্যবহার করে। সবকিছু মিলিয়ে মোতাওয়েফদের ব্যবসা খুব জমজমাট ছিল। বেশীর ভাগ মোতাওয়েফের একই অবস্থা। সরকারী আইন অনুযায়ী হাজীদের জন্য যে কোন মোতাওয়েফ ধরা বাধ্যতামূলক। ফলে, ভাল মোতাওয়েফের সন্ধান পেলে চলত, কিন্তু পাওয়া দুষ্কর ছিল।

সৌদী সরকার ব্যবসায়ী মনোভাবসম্পন্ন মোতাওয়েফদের এই সকল কার্যক্রম ও দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করে হাজীদের সেবা ফিস ও ঘর ভাড়ার হার বেঁধে দেয়। এতেও সমস্যার তেমন একটা সমাধান হচ্ছিল না।

এই অবস্থার আলোকে ১৪০০ হিজরীর শুরুতে, সৌদী সরকার, প্রচলিত মোতাওয়েফ প্রথা বাতিল ঘোষণা করে তওয়াফ সংস্থা কায়েম করে। পৃথিবীর সকল দেশের হাজীদের সেবার জন্য পৃথক পৃথক তওয়াফ সংস্থা কায়েম করা হয়। এতে করে পূর্বের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মোতাওয়েফ পেশাকে সামষ্টিক মোতাওয়েফ পেশার রূপ দেয়া হয়। বিভিন্ন শর্ত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যেক বছর একাধিক মোতায়েফ নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের হাজীদের সেবার সুযোগ দেওয়া হয়।

তওয়াফ সংস্থার কর্তব্য

হাজীদেরকে স্বাগত জনানো, তাদেরকে আবাসস্থলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত ঘর পেতে সাহায্য করা, তাদের সামান ও আসবাবপত্র ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া, হাজীদের আরামের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে তওয়াফ করানো, সাঈ করানো, সঠিকভাবে হজ্জ করানো, দীনি জ্ঞানদানের ব্যাপারে সাহযোগিতা করা, হারিয়ে যাওয়া কিংবা রাস্তা ভুলে যাওয়া হাজীদেরকে মসজিদে হারামের চারপার্শ্বের নিখোঁজ সন্ধান কেন্দ্রসমূহ থেকে সংগ্রহ করে তাদেরকে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া, মক্কা থেকে মিনা, আরাফাহ, মোয়দালেফা, মিনা ও মক্কা পর্যন্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং এজন্য পরিবহন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা, মিনা যমীন বন্টন কমিটি থেকে নির্ধারিত যমীন বুঝে নেয়া, মক্কা বিদ্যুত কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে বিদ্যুত্যায়নের ব্যবস্থা করা, মিনার শিবিরগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, হাজীদের পাসপোর্ট হেফাজত করা, তাদেরকে একটি পরিচয়পত্র দেয়া, নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নেয়া, নিখোঁজ হাজী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিত করা,

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা, অসুস্থ্য হাজীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র ও হাসপাতালে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া, হজ্জ ও বায়তুল মাল বিভাগকে মৃত হাজীর তথ্যদান করা এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা দেয়া, গাড়ী তদারক সংস্থার কাছে মদীনা কিংবা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৩ দিন পূর্বে হাজীদের তালিকা হস্তান্তর করা, হাজীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, হাজীদেরকে রাস্তায় বিছানা পেতে থাকার অনুমতি না দেয়া, এবং হাজীদেরকে গাড়ীর ছাদে বহন না করাসহ বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া তওয়াফ সংস্থার কর্তব্য।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হজ্জের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ অনেক বেশী। হাজীদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সব দায়দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের। বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর ও চেকপোস্টে এই মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীগণ হাজীদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। হজ্জ মওসুমে জানমালের নিরাপত্তা এই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। পুলিশ বাহিনী সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। তারা শান্তি-শৃঙ্খলা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হজ্জ উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মক্কায় কিছু স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু করে এবং হাজীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে রেডিও, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালায়। কোথাও আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড পানি, গ্যাস ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে আগুন নিভানোর চেষ্টা করে। ১৪০৯ হিজরীতে মক্কায় ফায়ার ব্রিগেডের ৩২টি কেন্দ্রও ১০টি টিম, মিনায় ৪৫টি টিমও ৩১টি কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও আরও ৬টি কেন্দ্র ৩৯টি টিমসহ অন্য ছয়টি নিরাপত্তাকেন্দ্রে আরো ৩শ' টিম কাজ করে।

বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়

সৌদী এয়ারলাইন্স হজ্জ উপলক্ষে হাজী পরিবহনের জন্য ফ্লাইট বৃদ্ধি করে এবং এক বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। সৌদী এয়ারলাইনসের বিমানে করে বিরাট সংখ্যক হাজী হজ্জে আসা যাওয়া করে। এই এয়ারলাইনসের বিশাল বিমান বন্দর আছে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয় হাজীদের আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এবং তাদেরকে জেদ্দা থেকে মক্কা, মিনা, মোযদালেফাহ, আরাফাত এবং মদীনায় আসা যাওয়ার ব্যাপারে পর্যাপ্ত গাড়ী ও যানবাহনের ব্যবস্থা করে। সেজন্য একটি পরিবহন সংস্থা কায়েম করা হয়েছে যা হাজীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় মক্কা এবং পবিত্র স্থানসমূহের রাস্তাঘাটের উন্নয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়।

জেদ্দা ইসলামী সামুদ্রিক বন্দর

হজ্জ উপলক্ষে লোহিত সাগরের তীরে ও জেদ্দা শহরের পশ্চিমে জেদ্দা ইসলামী সামুদ্রিক বন্দর দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জাহাজে করে যারা হজ্জে আসেন তারা এই সামুদ্রিক বন্দরে নামেন ও পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। জেদ্দা সামুদ্রিক বন্দর এক বিশাল বন্দর। এই বন্দর দিয়ে সারা বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মালবাহী অসংখ্য জাহাজ যাতায়াত করে। বন্দরটি আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল নমুনা। একই বন্দরে মাল খালাস, যাত্রীদের যাতায়াত, তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্যাদি বাইরে রপ্তানী প্রক্রিয়াসহ হজ্জের ভীড়ের কারণে এর ব্যস্ততা শীর্ষে উঠে। কেননা, লক্ষ লক্ষ হাজী সামুদ্রিক পথে যাতায়াত করে থাকেন। বন্দরে হাজীদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আছে। ইমিগ্রেশন শেষে তাদেরকে স্বল্প সময়ের জন্য বন্দরে হজ্জ ক্যাম্পে রাখা হয় এবং গাড়ীতে করে মক্কা ও মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জেদ্দা বাদশাহ আবদুল আযীয আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

এই বিমান বন্দরের ৫টি অংশ আছে। একটি হচ্ছে বেসামরিক সৌদী বিমান বন্দর, ২য়টি আন্তর্জাতিক অন্যান্য বিমান, ৩য়টি রাজকীয় বিমান ও ৪র্থটি সৌদী প্রতিরক্ষা বিমান অবতরণ কেন্দ্র। ৫ম অংশটি হচ্ছে হজ্জ টার্মিনাল। হজ্জের সময় হজ্জ টার্মিনাল হাজীদের পরিবহনের ব্যাপারে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ হাজী বিমান পথে হজ্জে আগমন করেন।

হজ্জ টার্মিনাল

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল আধুনিক স্থাপত্য ও নির্মাণ কৌশলের এক জীবন্ত স্বাক্ষর। মরুভূমির পরিবেশের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে ১৯৮১ সালে বিশাল হজ্জ টার্মিনাল তাঁবু আকারে তৈরি করা হয়েছে। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। দুটোর মাঝে রয়েছে পাকা রাস্তা ও পার্কিং। ১৫০ হেক্টর যমীনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দুই টার্মিনালের আয়তন হচ্ছে ১৫ লাখ বর্গমিটার। দুটো টার্মিনালে মোট সাড়ে তিন লাখ হাজীর সংকুলানের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে হাজীরা মক্কা ও মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

টার্মিনালের ছাদ হচ্ছে তাঁবু আকৃতি বিশিষ্ট এবং এতে ৩১০টি ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিটের আয়তন হচ্ছে, ৪৫×৪৫মিটার। এর ছাদ ফাইবার গ্লাসের তৈরি। এতে আর্দ্রতার অনুকূল এবং তাপ দূরীকরণ উপকরণ রয়েছে। উপরের গ্লাসের কারণে নীচে পর্যাপ্ত আলো এসে পড়ে। তাঁবুগুলোর মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে তা দিয়ে ভিতরে বাতাস প্রবাহিত হয়। তাছাড়া চারদিক থেকে টার্মিনাল খোলা হওয়ায় তাতে বাতাসের প্রাচুর্য রয়েছে। প্রতিটি তাঁবুর ছাদ মাটি থেকে ২০ মিটার উপরে অবস্থিত।
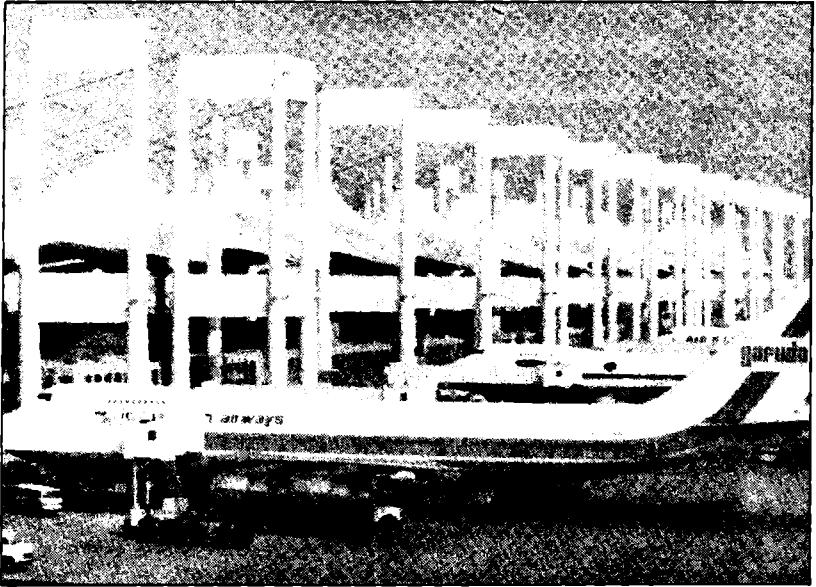
জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল

এর প্রতিটি বিল্ডিং এর রয়েছে ৫টা ইউনিট। প্রত্যেক ইউনিটে রয়েছে বিমানে আরোহণের জন্য ২টা গেইট এবং আগমন ও বিদায়ের জন্য রয়েছে ৪টা লাউঞ্জ। এছাড়াও বিভিন্ন সেবার জন্য রয়েছে দোতলা বিল্ডিং। টার্মিনালে আরোও রয়েছে নামাযের স্থান, বিশ্রাম ঘর, তথ্য বিভাগ, রেস্তোরাঁ, বাণিজ্যিক এলাকা, ডাক ও টেলিফোন সুবিধে, জরুরী বিভাগ, টয়লেট, ব্যাংক, গাড়ী ভাড়া, কাউন্টার টিকেট ডেস্ক, ক্যাফেটেরিয়া, ক্লিনিক ও অন্যান্য সুবিধা।

উভয় টার্মিনালে একই সময়ে ২০টি ৭৪৭ বোয়িং বিমান, ২৬টি বড় ও ২৬টি সাধারণ আকৃতির বিমান দাঁড়াতে পারে। জেদ্দা শহরের অদূরে উত্তরে হজ্জ টার্মিনাল অবস্থিত। হজ্জ টার্মিনাল এ পর্যন্ত ৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। সেগুলো হচ্ছে, ১৯৮৩ সালের আগা খান আর্কিটেকচার পুরস্কার, একই সাথে, যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং প্লানিং, ১৯৮২ সালে মার্কিন আর্কিটেক্ট ইনস্টিটিউট এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক শিল্প ইউনিয়নের পুরস্কার।

বিমান বন্দরের মাধ্যমে প্রতিবছর কি পরিমাণ হাজী বাহির থেকে হজ্জ করতে আসে নিম্নে তার একটা তালিকা দেয়া হল ঃ

সাল	হাজীর সংখ্যা
১৯৭০	১,৮৭,০০০
১৯৭১	২,২০,০০০
১৯৭২	২,৯১,০০০
১৯৭৩	৩,৩৭,০০০
১৯৭৪	৪,৬২,০০০
১৯৭৫	৪,৯৬,০০০
১৯৭৬	৩,৭৪,০০০
১৯৭৭	৪,৬১,০০০
১৯৭৮	৫,০৬,০০০
১৯৭৯	৫,১৩,০০০
১৯৮০	৫,৭২,০০০
১৯৮১	৬,৩১,০০০
১৯৮২	৬,০০,০০০
১৯৮৩	৬,৮৮,০০০

সাল	হাজীর সংখ্যা
১৯৮৪	৬,৪৮,০০০
১৯৮৫	৬,১২,০০০
১৯৮৬	৬,১৯,০০০
১৯৮৭	৬,৮০,০০০
১৯৮৮	৫,০৪,০০০
১৯৮৯	৫,১৫,০০০

সৌজন্যে ঃ সৌদী গেজেট, জেদ্দা, ২৭/৬/১৯৯০

ডাক ও তার মন্ত্রণালয়

ডাক ও তার মন্ত্রণালয় গোটা বিশ্বে হাজীদের চিঠিপত্র, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধে নিশ্চিত করে। মন্ত্রণালয় হজ্জ উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। এই উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে পশ্চিমে, উম্মুস সালামে, বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করেছে। হিঃ ১৪০৯ সালে হজ্জে পবিত্র স্থানসমূহে সর্বমোট ৯২ হাজার ৮৪১টি টেলিফোন লাইন এবং ২৮টি কেবিনে ৩৯৬টি আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইন লাগিয়েছে। কয়েন বক্স টেলিফোন সেট বসানো হয়েছিল ২ হাজার ২২৩টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৮১টি ছিল আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য ২ হাজার ৪১৫টি টেলিফোন সার্কেল নির্মাণ, ৩৮২টি টেলেক্স ও ভ্রাম্যমান টেলিফোন সহ মক্কায় ডাক বিভাগের ৪০টি শাখা কায়েম এবং এগুলোতে মোট ২ হাজার কর্মচারী নিয়োগ করে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয় পবিত্র স্থানসমূহে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে এবং দ্রব্যমূল্য ও খাদ্যের মাণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাউকে নির্ধারিত মূল্যস্তরের উর্ধে উঠে বেশীদামে জিনিস বিক্রী করতে বাধা দেয়। ফলে এত বড় বিশ্বসম্মেলনের সময়ও মূল্যস্তর প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় বিশেষ করে মিনা, মোযদালেফা এবং আরাফাতে খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করে। ১৪০৯ হিজরীর হজ্জে, মন্ত্রণালয়, মক্কা, জেদ্দা ও তায়েফের সকল রুটি ও বরফের

কারখানাগুলো থেকে মক্কায় দৈনিক ৫০ লাখ রুটি ও ১০ লাখ বরফের চাকা সরবরাহ নিশ্চিত করে। মিনা, মোযদালেফা ও আরাফাতে খাদ্য বোঝাই ৫শ' রিফ্রিজারেটর ভ্রাম্যমান গাড়ী ও ২শ' ছোট গাড়ী মওজুদ রাখে। তাছাড়াও বেসরকারী দোকানপাট তো আছেই।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয় মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ইউনিটসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা দান করছে। এইসব চিকিৎসা ও ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গরীব মুসলিম দেশের চিকিৎসা টিমকে অনুরোধের ভিত্তিতে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করে। **স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হজ্জ মওসুমে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে মক্কায় ৮টি ও পবিত্র স্থানসমূহে ১৪টি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল এবং ১১৩টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।** তার মধ্যে মক্কা শহরে ২০০২ আসন বিশিষ্ট ৭টি বড় হাসপাতাল ও ৪০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. বাদশাহ আবদুল আযীয হাসপাতাল- যাহের। এতে ৩২৫ আসন ও ১২টি হিমায়িতকরণ ইউনিট আছে, ২. বাদশাহ ফয়সল হাসপাতাল- শিশশা। এতে ৩০০ আসন ও সানস্ট্রোক রোগীদের জন্য ১০টি হিমায়িতকরণ ইউনিট আছে। ৩. জিয়াদ হাসপতাল। এতে ১৩০ আসন ও ৫টি হিমায়িত করণ ইউনিট আছে। ৪. ইবনে সীনা হাসপাতাল, এতে ২০০ আসন আছে। ৫. আননূর বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল। এতে ৫৭৫ আসন আছে। ৬. শিশু হাসপাতাল ও মাতৃসদন- জারওয়াল। এতে ২২৫টি আসন আছে। ৭. হেরা হাসপাতাল। এতে ২৪৮টি আসন আছে।

মন্ত্রণালয় আরাফাতে ৩টি হাসপাতাল ও ৪৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ১. আরাফাত জেনারেল হাসপাতাল। এতে ৬শ' আসন ও ২৪টি হিমায়িতকরণ ইউনিট রয়েছে। ২. জাবালে রহমত হাসপাতাল। এতে ২৪০ আসন ও ৪টি হিমায়িতকরণ ইউনিট, ৪টি ব্যাপক যত্ন ইউনিট ও সংজ্ঞাহীন রোগীদের জন্য ১৫টি আসন ও ৮টি হিমায়িতকরণ ইউনিট আছে।

মিনায় ২৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৪টি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালগুলো হচ্ছে-

১. মিনা জেনারেল হাসপাতাল, এতে ৫৫০ আসন, ৮টি হিমায়িতকরণ ইউনিট ও সংজ্ঞাহীন রোগীদের জন্য ৫১টি বিশেষ আসন আছে।

২. মিনা ওভারব্রীজ হাসপাতাল। এতে ২২০ আসন, ১২টি হিমায়িতকরণ ইউনিট ও সংজ্ঞাহীন রোগীদের জন্য ৪০টি আসন আছে।

৩. মিনা হাসপাতাল। এতে ১৩৭ আসন, ৮টি হিমায়িতকরণ ইউনিট ও রোগীদের জন্য ৫১টি বিশেষ আসন আছে।

৪. হেলিপোর্ট হাসপাতাল। এটি মিনার মাঝখানে অবস্থিত। এতে ৭১টি আসন ও ২টি হিমায়িতকরণ ইউনিট আছে।

মোযদালেফায় রয়েছে ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পূর্বেই স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বিষয়ে ব্যাপক অভিযান চালায়।

এজন্য পোস্টার, লিফলেট ও পত্র পত্রিকার সাহায্য নেয় এবং হাজীদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়। বিশেষ করে সানস্ট্রোক বা সূর্যতাপে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দান করে। মন্ত্রণালয় মুসলিম বিশ্ব থেকে আগত চিকিৎসা টীমগুলোর সাথে সমন্বয় ও তথ্য বিনিময় করে। ১৪০৯ হিজরীর হজ্জে মন্ত্রণালয়ের সাড়ে ৯ হাজার ডাক্তার টেকনিশিয়ান ও কর্মচারী সেবা দান করে।

সূর্যতাপে আক্রান্ত হওয়া (sun stroke)

গরমকালে হজ্জ অনুষ্ঠিত হলে বহু হাজী মক্কার প্রচণ্ড সূর্যতাপে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। ফলে হাজীরা হজ্জের হুকুম-আহকাম ঠিকমত পালন করতে পারেনা। মক্কার শুষ্ক আবহাওয়া, প্রচণ্ড খরা ও চরম সূর্যতাপই এই সমস্যার জন্য দায়ী। পবিত্র নগরী মক্কা, মিনা, মোযদালেফা, আরাফাত এবং মদীনায় এই সমস্যা বেশী প্রকট। আর্দ্র আবহওয়ার দেশের হাজীদের বেলায় এবং গরমে বেশী চলাফেরা করার কারণে এই রোগ বেশী দেখা দেয়। অতীত কাল থেকে আরবরা sun stroke এর সাথে পরিচিত। তারা এটাকে صَرْعٌ বলত।

সূর্যতাপে আক্রান্ত রোগীর শরীরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রীর অধিক বৃদ্ধি পায়। তাই আক্রান্ত ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে, তার শরীরের আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং চামড়ার ভেতর রক্তক্ষরণ হয়। দ্রুত চিকিৎসা না করলে, ক্ষেত্রবিশেষে রোগী মারা যায়।

সূর্যতাপ আক্রান্ত রোগের কারণ

এই রোগের বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গরমে বেশী পরিশ্রম করা, পানি জাতীয় জিনিস কম পান করা কিংবা আদৌ পান না করা,

দুপুরের প্রচন্ড সূর্যতাপে অবস্থান করা, গরম আবহাওয়ার প্রতি সতর্ক না হওয়া, দুর্বল হয়ে পড়া ইত্যাদি।

সূর্যতাপ আক্রান্ত রোগ থেকে বাঁচার উপায়

এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য পূর্বেই নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ঃ

১. দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় সূর্যের তাপে চলাফেরা ও কাজকর্ম না করা,

২. অধিক বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করা,

৩. পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও পানি জাতীয় জিনিস পান করা এবং ঠাণ্ডা পানি পান করা।

৪. বেশী পরিমাণ লবণ খাওয়া।

৫. গরমের সময় বেশী পরিশ্রম না করা।

৬. রোদের মধ্যে ছাতা ব্যবহার করা।

৭. শারীরিক দুর্বলতা দূর করার জন্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়া।

'মক্কা মোকার্‌রামা চিকিৎসা পদ্ধতি'

সৌদী আরব সুর্যতাপ আক্রান্ত রোগের জন্য একটি নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এর নাম হচ্ছে, 'মক্কা মোকাররামা চিকিৎসা পদ্ধতি'। সৌদী স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় লন্ডনের উষ্ণাঞ্চলীয় কলেজের সাথে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের শরীর হিমায়িত করার মাধ্যমে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এই পদ্ধতিটা খুবই সহজ-সরল।

সূর্যতাপ আক্রান্ত রোগীকে জালযুক্ত আসনে শোয়ানো হয় এবং তার শরীরে বাতাস ও পানির ছিঁটা সরবরাহ করা হয়। বাতাসের মাধ্যমে প্রবাহিত পানি শরীরের চামড়া থেকে তাপ চুষে নেয়। এইভাবে রোগীকে কৃত্রিমভাবে সিক্ত করা হয়। ১৩৯৭ হিজরী থেকে এই কৌশল প্রয়োগ শুরু হয়। প্রতিবছর পদ্ধতিটির উন্নয়নের পর ৬টি পর্যায় অতিক্রম শেষে তা আজকে বিশ্বে এই রোগের সেরা চিকিৎসা পদ্ধতি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফিসিওলজিক্যাল পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি রোগীর শরীর হিমায়িত করার ক্ষেত্রে ৪ গুণ বেশী কার্যকর।

সূর্যতাপ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৬টি চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে দু'টো হচ্ছে মক্কায়, দু'টো আরাফাতে, একটি মিনায় এবং একটি মদীনায়। এগুলোতে মোট ১০৫টি ইউনিট ও ৩ হাজার ৭১৬টি আসন

আছে। এরমধ্যে ২৭টি ইউনিট মক্কায়, ৩২টি ইউনিট আরাফাতে ৩০টি ইউনিট মিনায় এবং ১৬টি ইউনিট মদীনায় রয়েছে।

সংজ্ঞাহীন হাজীদেরকে হজ্জের দিন ডাক্তারদের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষ গাড়ীতে করে আরাফাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে করে হজ্জের প্রধান রোকনটি আদায় হয়ে যায় এবং হজ্জ সম্পন্ন হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও আরো অনেক মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের বহু চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে পবিত্র স্থানসমূহে চিকিৎসা সেবা দান করা হয়।

তথ্য মন্ত্রণালয়

হজ্জের পুরো কর্মসূচী প্রচারের দায়িত্ব তথ্য মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে। রেডিও, টিভি এবং পত্র পত্রিকায় সর্বদা হজ্জ সংক্রান্ত খবর প্রচারিত হয়। হজ্জের সময় এই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানায় এবং তারাও নিজ দেশে হজ্জের খবর পাঠায়। বিভিন্ন দেশের রেডিও এবং টিভির ঘোষকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে হজ্জের জীবন্ত বর্ণনা পেশ করার ব্যবস্থা করা হয়। আরাফাতের দিন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে হজ্জের কার্যক্রম মুসলিম বিশ্বে প্রেরণ করা হয় ও টিভির পর্দায় তা প্রদর্শিত হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

হজ্জের বিশেষ নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়। সৌদী সেনাবাহিনীর টহলদানকারী গাড়ীগুলো সারা শহর ও পবিত্র স্থানসমূহে টহল দিয়ে বেড়ায়। এছাড়াও ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীও হজ্জের কাজে তৎপর থাকে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হজ্জের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদী আরবে নিযুক্ত বিদেশী দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনগুলোর সাথে হজ্জ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে। বিভিন্ন দূতাবাসগুলো নিজ দেশের হাজীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে। এছাড়াও বিদেশী মেহমান ও রাষ্ট্রীয় মেহমানদের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সব যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

ট্রাফিক বিভাগ

ট্রাফিক বিভাগ খুবই প্রয়োজনীয় সেবা দান করে। হজ্জের সময় অতিরিক্ত গাড়ী মক্কা শহরে প্রবেশ করে। এতে যানজট সৃষ্টি হয়। ট্রাফিক বিভাগের সেবার ফলে যানজট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আজকাল, হজ্জ মওসুমে মসজিদে হারামের নামায শেষে, প্রায় ঘন্টাখানেক হারামের চারদিকের রাস্তাসমূহে সকল প্রকার গাড়ী চলাচল বন্ধ রাখা হয় যেন মুসল্লীদের আবাসিক স্থানে পারাপারে কোন অসুবিধা না হয়। হজ্জের কয়েকদিন আগে থেকেই মক্কায় ছোট গাড়ী ঢুকা নিষিদ্ধ করা হয় এবং বড় গাড়ীকে শহরে ঢুকতে দেয়া হয়।

হারাম সীমানার বাইরে, মক্কা-জেদ্দা এক্সপ্রেস রোড, মক্কা-মদীনা রোড, মক্কা-লীস রোড, মক্কা-সায়েল রোড এবং মক্কা-তায়েফ রোডে ৫টি বড় গাড়ী পার্কিং মাঠ নির্মাণ করা হয়। ছোট গাড়ীর মালিকদের সেখানে গাড়ী পার্ক করে বাসে করে মক্কা শহরে ঢুকতে হয়। উল্লেখ্য যে, সৌদী আরব তেলসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে তার রাস্তাঘাট যথেষ্ট উন্নত এবং এখানে লক্ষ লক্ষ গাড়ী রাস্তা যাতায়াত করছে। ফলে ট্রাফিক বিভাগের আইন যথেষ্ট কড়া। এমনকি, গাড়ী দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে সেজন্য গাড়ীর চালক যদি পূর্ণ দায়ী হয়, তাহলে তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে ১ লাখ রিয়াল দিয়াহ বা রক্তপণ দিতে হয়। হজ্জ মওসুমে, রাস্তাঘাটে গাড়ীর ভীড় কমানোর জন্য মক্কার খালি পাহাড়গুলোর উপর গাড়ী পার্ক করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মক্কা পৌরসভা

মক্কা পৌরসভার ভূমিকা ও গুরুত্ব অনেক বেশী। নিয়ম অনুযায়ী, পৌরসভাই মক্কা শহর এবং হারাম এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত দিক, খাদ্যদ্রব্য ও হোটেল- রেস্তোরাঁয় বাসি এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ন্ত্রণসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়। ১৪০৯ হিজরীর হজ্জে পৌরসভার ঝাড়ুদার ও কর্মচারী নিয়ে মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২৬ হাজার ৪২৬ জন।

বয় স্কাউট

হজ্জের সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কাউটদেরকে হজ্জের কাজে লাগানো হয়। তারা সকল বিভাগের লোকদের কাজে সহযোগিতা করে। তাদের সেবাও বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৪০৯ হিঃ ১ হাজার বয় স্কাউট হাজীদের সেবা করে।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

এটি একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা। সংস্থাটি সারা বছর অসুস্থ ও দুঃস্থ লোকদের সহায়তা করে। কিন্তু হজ্জ মওসুমে, তারা মক্কায় আগত লোক এবং বিশেষ করে হাজীদেরকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্থার প্রতিটি কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। মক্কার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তাদের কেন্দ্র আছে। ১৪০৯ হিজরীতে, মক্কা ও পবিত্র স্থানসমূহে সংস্থার ৮১টি কেন্দ্র ছিল।

হজ্জ বাহিনী

১৩৮৭ হিজরীতে, সৌদী সরকার হজ্জ বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনীর কাজের মূল লক্ষ্য হল, হাজীদের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করা। মক্কার আযিযিয়ায় এই বাহিনীর সদর দফতর অবস্থিত। তারা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত এবং সূর্যতাপে আক্রান্ত হাজীদেরকে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে।

রাবেতা আলম ইসলামী

এটি বহির্বিশ্বে ইসলামী তৎপরতা চালানোর জন্য সৌদী সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হচ্ছে, মোবাল্লেগ নিয়োগসহ বিভিন্ন উপায়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় ত্রাণ-সামগ্রী প্রেরণ ও বিতরণ, বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে অনেক সাহায্য দান এবং খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধসহ আরো বহু কাজ আঞ্জাম দেয়া। এই উদ্দেশ্যে রাবেতা বিভিন্ন দেশে অফিস খুলেছে। হজ্জের সময় রাবেতা সংখ্যালঘু মুসলিম দেশের মুসলমানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মান্য-গণ্য লোকদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। রাবেতার প্রধান ভবন হচ্ছে মক্কার উম্মুল জুদে। মিনায় এর একটি অতিথি ভবন আছে।

ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয় সৌদী সরকারের ধর্মীয় বিভাগের কাজ করে। ফতোয়া, দাওয়াহ, ওয়াজ ও ইসলামী গবেষণা পরিচালনা এর অন্যতম কাজ। হজ্জের সময় সংস্থাটি তার পুরো শক্তি হজ্জের মাসায়েল শিক্ষাদানের পেছনে ব্যয় করে। মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের বাছাই করা লোকদেরকে হজ্জের আমন্ত্রণ জানায় এবং বহির্বিশ্বে মোবাল্লেগ নিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেয়।

তাওইয়াহ ইসলামিয়া

দারুল ইফতার হজ্জ সংক্রান্ত বিশেষ বিভাগটির নাম হচ্ছে 'হাজীদের জ্ঞানদান' শাখা। হজ্জ মওসুমে, এই শাখাটি পবিত্র স্থানসমূহে মোবাল্লেগ নিয়োগ করে, তারা লোকদের উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেয় ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার হাজীদের উদ্দেশ্যে সেই ভাষাভাষী বক্তা দিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও সংস্থাকে বিভিন্ন ভাষায় হজ্জের উপর লেখা বই পুস্তক বিলি করে, ১৪০৯ হিজরীর হজ্জ মওসুমে সংস্থাটি ৪শ' মোবাল্লেগ ও ১শ' অনুবাদক নিয়োগ করে।

হজ্জ গবেষণা কেন্দ্র

১৩৯৫ হিজরীতে, জেদ্দায় বাদশাহ আঃ আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হজ্জ গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়। পরে তা মক্কার উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে নেয়া হয়। অবশ্য বর্তমানে, জেদ্দা ও মদীনায় এই কেন্দ্রের দুটো শাখা রয়েছে। ১৪০১ হিজরীতে, সৌদী মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অনুমোদন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিণ করা হয়। উচ্চতর হজ্জ কমিটির সভাপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন এই কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট এবং হজ্জমন্ত্রী এর সদস্য। এতে বর্তমানে ৪টি গবেষণা বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে : ১. আবাদী ও পরিবেশ বিভাগ ২. সভ্যতা ও তামাদ্দুনিক বিভাগ ৩. তথ্য ব্যাংক এবং ৪. ছবি বিভাগ। ছবি বিভাগে, ফটোগ্রাফি, সিনেমা ও ভিডিও ফটো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হজ্জ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল, হজ্জ পালনকে সহজতর করা এবং হাজীদের প্রতি উত্তম সেবা দান করা। হজ্জ গবেষণা কেন্দ্রে একটি লাইব্রেরী, রঙিন ছবির একটি স্টুডিও এবং কম্পিউটার রয়েছে। এই কেন্দ্রের সাথে উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক জড়িত আছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে দিয়ে ময়দানে বহু গবেষণা পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাস্টার্স ও পি,এইচ,ডি কোর্সের অনেক ছাত্র হজ্জ গবেষণা কেন্দ্রের প্রয়োজনকে সামনে রেখে হজ্জ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা করে থাকে।

কেন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে মিনার গাইড ম্যাপ তৈরি করা। যুলকাদা মাসের ২৬ তারিখে উপর থেকে মিনার ছবি গ্রহণ করা হয় এবং ৪ঠা জিলহজ্জ তারিখে, তওয়াফ সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিসকে সরবরাহ করা হয়। হারিয়ে যাওয়া হাজীদের নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার জন্য এটি বেশী সহায়ক। এতে বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও মোতাওয়েফদের তাঁবু ও ক্যাম্পসহ সকল সেবাকেন্দ্রের নির্দেশিকা থাকে।

হজ্জ্ব গবেষণা কেন্দ্র এখানে বহু গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছে। মসজিদে হারামের চারপাশে যানজট, জেদ্দার ইউনাইটেড এজেন্টসের কার্যক্রম ও তার সেবার মান, হাজীদের আগমনের ব্যাপারে কম্পিউটার ব্যবহারের ফায়দা, হাজীদের পরিবহণ, হারাম শরীফের চারদিকের এলাকাকে বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে ব্যবহার, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে মিনার কোরবানীর গোশতের সদ্ব্যবহার, গবেষণা প্রকল্প, মসজিদে হারামের ভেতরের রোগী এবং মিনার জামরাহ এলাকার হাজীদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য সৌদী রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির গবেষণা প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে, মিনার পাহাড়ের উপরিভাগ ব্যবহার, ওভারব্রীজ ও সুড়ঙ্গের মধ্যে বিছানা পেতে হাজীদের অবস্থান, সাঈতে হাজীদের সমস্যা, হজ্জের সময় মিনায় ২৪ ঘন্টা ব্যাপী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, তওয়াফ পেশা, বিমানবন্দরে হাজীদের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম, টার্মিনাল সুবিধে, সময়ক্ষেপণ, সেবাদানকারী কর্মচারীদের শক্তি সামর্থ ইত্যাদি, মক্কায় হাজীদের আবাসিক সুবিধা, হাজীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ডেমোগ্রাফিক অবস্থা জানা, যমযমের পানির রাসায়নিক ও জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষা, যমযমে উৎসারিত পানির বার্ষিক পরিমাণ, হারাম শরীফের চারপাশের ভূগর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণ এবং পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপর গবেষণা চালিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। গবেষণা কেন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী ১৪০৩ হিঃ থেকে মিনায় ব্যবহৃত তাঁবুগুলোতে আগুন প্রতিরোধকারী রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করার ফলে অগ্নিকাণ্ড হ্রাস পেয়েছে। ভবিষ্যতে গবেষণা কেন্দ্র পাঁচ বারের বেশী হজ্জ আদায়কারীদের মানসিকতা, তওয়াফের ভীড়, সামুদ্রিক ও বিমানবন্দরের ভীড়, মক্কার সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে মিনা, মোযদালেফা ও আরাফাতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠা, তাঁবুর উন্নয়ন এবং ভেতরে তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, কেন্দ্রীয় হজ্জ কমিটি কর্তৃক হাজীদের তায়েফ ভ্রমণের সুবিধা প্রদান গবেষণা প্রকল্প, দুই হারামের সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং মক্কা উন্নয়ন ও নির্মাণ প্রকল্পের উপর গবেষণা চালাবে। আবাদী ও পরিবেশ বিভাগ মক্কার ভৌগোলিক ও দ্বীনী পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়ার সুপারিশ করে যাতে করে, কোন অবস্থাতেই, মক্কার ইসলামী ভৌগোলিক পরিবেশ নষ্ট না হয়। হজ্জ গবেষণা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করে এ সকল কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে এবং গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

১২. মসজিদে হারামের ভূমিকা

হযরত আদম (আ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক কাবা শরীফ নির্মাণ করে তাকে খালেসভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ ও আইন পালনের মাধ্যমে এটিকে বিশ্ব মুসলমানের আনুগত্যের আর্ন্তজাতিক কেন্দ্রের রূপ দান করেন। একই কারণে তিনি কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে কাবার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। সেদিন পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও বিধান ছাড়া আর কোন কিছু ছিলনা। মানুষ বহু পরে এসে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেরাই বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার করে অশান্তির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। শান্তির মালিককে বাদ দিয়ে এবং তার বিধান থেকে দূরে সরে শান্তি আনার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরবর্তীতে হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত আদম (আ) এর তৈরি ভিত্তির উপর পুনরায় কাবাশরীফ নির্মাণ করেন। কাবা পুনঃ নির্মাণের উদ্দেশ্যও একই। আর তা হচ্ছে, পুনরায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং তার আইনের প্রতি আনুগত্যের জন্য বিশ্বের মানুষকে আহ্বান জানানো।

হযরত আদম (আ) পর্যন্ত যে সকল নবী কাবা শরীফে হাজিরা দিয়েছেন, তাদের সবার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হল, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে তাওহীদের অনুসরণ করা, আল্লাহ ছাড়া আর কারুর আদেশ নিষেধ না মানা এবং আল্লাহ বিরোধী সকল মত ও পথ থেকে লোকদেরকে দূরে রাখা।

দাওয়াতে দীন

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত ইব্রাহীম (আ) এবং হযরত মোহাম্মদ (সা) পর্যন্ত মসজিদে হারাম ছিল দীনের দাওয়াতের কেন্দ্র। এখান থেকে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয়া হত।

শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)ও কাবা শরীফ এবং মসজিদে হারামকে কেন্দ্র করে দীনের দাওয়াত দেন। তদানীন্তন সমাজের মানুষ আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে শিরক ও বিদআত এবং কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত। আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং আইন কানুনের পরিবর্তে মনগড়া ধ্যান ধারণা ও ভ্রান্ত মতবাদ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করত। তিনি

তাদেরকে ইসলামী বিধানের দিকে আহ্বান জানান এবং সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা, রীতি নীতি ও আচার-আচরণকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা বলে চিহ্নিত করেন। কেননা, সেগুলোর উৎসমূলে আল্লাহর বিধান কার্যকর ছিলনা। তিনি কা'বা শরীফের পার্শ্বে অবস্থান করতেন এবং এবাদত করতেন। আর পার্শ্ববর্তী দারুল আরকামে দীনের দাওয়াত দিতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সাফা পাহাড়ে সবাইকে জড় করে দীনের দওয়াত দেন এবং মসজিদে হারামে বসে বসে মেরাজের বাণী পেশ করেন। তিনি মসজিদে হারামে সুযোগমত দীনের দাওয়াত দিতেন। তবে একথা সত্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মসজিদে হারামের সেই ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা ততটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেনি যতটুকু মদীনার মসজিদে নবওয়ীর ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার প্রধান কারণ হল, মক্কার কোরাইশদের অত্যাচার নির্যাতন ও বৈরিভাবের কারণে তিনি মক্কায় দাওয়াতে দীন ও দীনের অন্যান্য বিষয়ে বেশী কিছু করতে পারেননি। যে কারণে তাঁকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় হিযরত করতে হয়েছিল। অপরদিকে মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে দীন প্রচারে বাধা ছিলনা। সেজন্য তিনি দীনের সকল বিভাগে কাজ করে তাকে বিশাল বৃক্ষ পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে মক্কার কাফেররা ইসলামের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিলো। এছাড়াও মক্কাবাসীরা ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যাপকহারে ইসলামে প্রবেশ করেনি। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মদীনার তুলনায় মক্কায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা বেশী পালন করতে পারেননি। যদিও কাবা শরীফ যুগ যুগ ধরে ঈমান ও জ্ঞান চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল।

জ্ঞান সেবা

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনে যাত্রার আগে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে মক্কায় রেখে যান। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি মক্কাবাসীকে ইল্‌ম ও ঈমান শিক্ষা দিবেন। ইসলামের হালাল-হারাম ও ফরজ ওয়াজিব সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তাদেরকে কোরআন শিখাবেন।

হযরত মুয়াজ আনসার যুবকদের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি, আদব-শিষ্টাচার ও প্রজ্ঞার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তিনি ইসলামের আইন শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইয়ামেনের শাসক হিসেবে পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে মুআজ! যদি তোমার কাছে কোন মামলা আসে, তুমি কিভাবে

বিচার করবে? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহর কোরআনের আইন মোতাবেক ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, যদি কোরআনে তা না থাকে?" মুআজ বলেন, তাহলে রাসূলুল্লাহর হাদীস অনুযায়ী ফয়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়াজের বুকে থাপড় লাগিয়ে বলেন, 'আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধিকে রাসূলুল্লাহর (সা) পছন্দসই কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন।[১]

হযরত মুআজ থেকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস সহ অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি একাধারে হাদীস ও ফেকাহ বিশারদ ছিলেন।

সম্ভবতঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান সেবাই মসজিদে হারামের সর্ববৃহৎ জ্ঞান চর্চা ছিল। তখন মুসলিম বিশ্বে মক্কার জ্ঞান চর্চার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি হারামে কোরআনের তাফসীর পেশ করতেন, লোকদেরকে উন্নত চরিত্রের পথ পদর্শন করতেন এবং ইসলামী আইন শিক্ষা দিতেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) সম্পর্কে মহানবী (সা) আগেই বলে গেছেন–

هُوَحِبْرُالْأُمَّةِ وَتَرْجُمَانُ الْقُرْآنْ -

অর্থ ঃ তিনি উম্মতের পণ্ডিত ও কোরআনের ভাষ্যকার। তিনি তাঁর জন্য আরও দোয়া করেছিলেন যে,

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَ عَلِّمْهُ التَّاْوِيْلَ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তাকে দীন বুঝার তওফীক দাও এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা দাও।

ইবনে আব্বাসের শিক্ষা বৈঠকে মক্কার ভেতর ও বাহিরের বহু লোক যোগ দিত এবং হজ্জের মওসুমে সে বৈঠকের পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত হত।

ইবনে আব্বাসের মসজিদে হারামের শিক্ষালয় থেকে বিরাট বিরাট জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তৈরি হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত মোফাস্‌সের মুহাদ্দিস মোজাহিদ বিন জোবায়ের, আতা বিন আবি রেবাহ, তাউস বিন কিসান, সাঈদ বিন জোবায়ের ও ইবনে আব্বাসের গোলাম একরামাহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মসজিদে

---

১. তাবাকাতে কোবরা, ২য় খণ্ড।

হারামের শিক্ষালয় থেকে এভাবে শিক্ষার্থীরা যুগের পর যুগ শিক্ষালাভ করে বেরিয়েছেন। সেখানকার শিক্ষক সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর কাছ থেকে ইমাম শাফেঈ (র) শিক্ষালাভ করেছেন। প্রখ্যাত আলেম আবদুল মালেক বিন আবদুল আযীয বিন জোরাইজ মক্কার শিক্ষালয়ের অনুরূপ আরেক ছাত্র ছিলেন, তিনিই প্রথম হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। তার ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম আওযায়ী; সুফিয়ান সওরী এবং সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ছিলেন অন্যতম। ইমাম শাফেঈ (র) সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যদি মালেক ও ইবনে উয়াইনাহ না থাকত, তাহলে হেজাযের এলেম বিদায় নিত। তিনি মদীনার ইমাম মালেক বিন আনাস ও মক্কার সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে ঐ মন্তব্য করেন। সাহাবী, তাবেঈ ও তাবয়ে তাবেঈদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মসজিদে হারামে শিক্ষার আসর অব্যাহত রয়েছে। হজ্জ ও রমজান মওসুমে তা আরো বেশী জমজমাট হয়। বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম নানাপ্রকার মাসলা-মাসায়েল ও ফতোয়া দান করেন এবং লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

রাজনৈতিক ভূমিকা

মসজিদে হারামের সেবা শুধু দাওয়াতে দীন, জ্ঞান ও সমাজসেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং এই বিশ্বশ্রেষ্ঠ মসজিদের রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভূমিকা। এখন আমরা এ সম্পর্কে কিছু ঘটনার উল্লেখ করবো। মসজিদে হারামের দারুন নাদওয়ায় কোরাইশদের পরামর্শ সভা ছিল। তারা সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত নিত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণটি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি নিজ ওয়াদা সত্য প্রমাণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং সকল দলকে পরাজিত করেছেন। সাবধান! (জাহেলিয়াতের) সকল লেন দেন ও রক্তপণ আমার দু'পায়ের নীচে, তবে কাবা শরীফের সেবা ও হাজীদের পানি পান পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সাবধান! ইচ্ছাকৃত হত্যার কাছাকাছি– ভুল হত্যার ক্ষতিপূরণ বা দিয়াহ হচ্ছে ১শত উট।

হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জাহেলিয়াতের সব-দর্প উঠিয়ে নিয়েছেন এবং বাপ সহ পূর্বপুরুষের অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত ৩টি পাঠ করেন ঃ

يَا اَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ ذكَرٍ وَّاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًاوَّقَبَا ئِلَ لِتَعَارَ فُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقَاكُمْ ـ (সূরাহ আল হুজুরাত-১৩)

অর্থ ঃ হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী অর্থাৎ যে সর্বাধিক আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে।

হে কোরাইশ! তোমাদের সাথে আমি কি ধরনের আচরণ করবো বলে তোমরা মনে কর? তারা বলল, আমরা ভাল আচরণ আশা করি, আমরা আপনাকে সম্মানিত ভাই ও ভাতিজা মনে করি। তারপর তিনি বলেন, যাও তোমরা মুক্ত।

এই ভাষণে মানবাধিকারসহ মানুষের যাবতীয় অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রা) মক্কায় খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর মসজিদে হারামকেই তাঁর প্রধান কর্মস্থল হিসাবে ব্যবহার করেন। এখানে বসেই তিনি মক্কার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াযিদের যুদ্ধের সময় তিনি মসজিদে হারাম ও কাবা শরীফে আশ্রয় নেন। তাঁর গোটা খেলাফত মসজিদে হারামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে তার সরকারের ভবিষ্যত নীতি ঘোষণা করেন। ভাষণে তিনি নিজেকে শক্তিশালী শাসক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ওসমানের মত দুর্বল খলীফা নই এবং মুআওবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের মত উদারপন্থী নই।"[১]

আব্বাসী খলিফা আবু জাফর মনসুর মক্কায় আসেন এবং মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "আমি যমীনে আল্লাহর মনোনীত সুলতান। আমি তাঁর

---

১. আল-একদুল ফরীদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪।

সাহায্য ও তাওফীকের মাধ্যমে তোমাদের উপর শাসন করেছি। তাঁর সম্পদের আমি পাহারাদার। তাঁর ইচ্ছায় আমি তা খরচ করছি, তাঁর হুকুমে আমি তা দান করি। তিনি আমাকে সম্পদের তালা বানিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে খুলে দিতে পারেন যেন আমি তোমাদেরকে দান করতে পারি এবং ইচ্ছা করলে আমাকে বন্ধ রাখতে পারেন। তোমরা আল্লাহর রহমতের আগ্রহী হও এবং আজকের এই দিনে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও। তিনি তোমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।[১]

আব্বাসী শাসনকাল শেষ হওয়ার পর দাউদ বিন আলী মক্কায় দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেন, "আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কোন নদী প্রবাহিত করা কিংবা রাজপ্রাসাদ তৈরির জন্য বের হইনি। আমার ধারণা, আল্লাহর দুশমনগণ আর বিজয় লাভ করতে পারবে না। এখন অবস্থা সঠিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে এবং সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়েছে। তীর তার ধনুকের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়েছে। নবীর বংশধরের মধ্যে দয়ালু লোক রয়েছেন। আপনারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলুন। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বানাবেন না। কেননা এর ফলে আল্লাহর নেয়ামত দূরে সরে যাবে।[২]

হেজাযের শাসকেরা সর্বদাই মসজিদে হারামের জুমআর খোতবায় নিজেদের নীতি ঘোষণা করতেন এবং তারা কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা খোতবাহ দিতেন। আজ পর্যন্তও মসজিদে হারামের জুমআর খোতবায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকদের নীতি ও তৎপরতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মসজিদে হারামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তাঁর আইন ও তাঁর প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির সকল দিক ও বিভাগে আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মসজিদে হারামের এই ভূমিকা সর্বকালের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

---

১. আল-একদুল ফরীদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬২।

২. আল-একদুল ফরীদ, চতুর্থ খণ্ড।

১৩. কা'বা প্রেমিকের জীবনে কা'বার দাবীর বাস্তবায়ন

আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ শতকোটি ভক্তের অন্তরে ভালবাসার জ্বালা সৃষ্টি করে। এই কাল ঘরটিকে দেখার জন্য যে অভাবিতপূর্ব আবেগ-উচ্ছ্বাস জাগে তার তীব্র জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কা'বা-প্রেমিক ব্যক্তি বাইতুল্লায় হাজিরা দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে আসে পাগলের মতো। অপরদিকে, যে এখানে এসে প্রাণের জ্বালা মিটাতে পারে না সে মনের দুঃখে করুণ রোদনে তিলে তিলে ক্ষয় হয়। কা'বাকে ভালবাসার অর্থ যদি এর পাথরকে ভালবাসা বুঝায় তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এর প্রতিটি পাথর আল্লাহর আদেশ নিষেধের জ্বলন্ত প্রতীক এবং আল্লাহর আদেশ পালনকারী শতকোটি ভক্তের হাতের স্পর্শে ধন্য।

এই কা'বাকে ভালবাসার সঠিক অর্থ হল, এর মালিককে ভালবাসা। কেননা, কা'বা আল্লাহর বহু হুকুমের একটি মাত্র। আল্লাহর হুকুমে এই কা'বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর এই জাতীয় আরো অনেক হুকুম রয়েছে। সে সমস্ত হুকুমের প্রতিও সমান প্রেম-ভালবাসা প্রয়োজন। আমরা যদি আল্লাহর অন্যান্য হুকুম ও বিধানের আনুগত্য না করি তাহলে, নিঃসন্দেহে তা অযৌক্তিক। আল্লাহর কিছু হুকুম মানা আর কিছু না মানা, অবশ্যই কা'বার প্রতি প্রেমের সঠিক দাবী নয়। বরং অন্যান্য হুকুমগুলো মানার জন্যই, কা'বায় প্রতিবছর হজ্জের মাধ্যমে আনুগত্যের আন্তর্জাতিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় কাফনের সাদা আচ্ছাদনের আবরণে মোমেন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পালনের সার্বিক প্রস্তুতি এবং চূড়ান্ত ত্যাগের ঘোষণা দেয়। এছাড়াও সে অতীতের ভুলত্রুটি এবং গুনাহর পুনরাবৃত্তি না করা ও তার ক্ষতিপূরণের জন্য নেক কাজে অধিকতর তৎপর হওয়ার ইস্পাত কঠিন শপথ নেয়।

কা'বাকে ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসাই কাম্য। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার পরিপূর্ণ পদ্ধতি হল ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সর্বত্র আল্লাহর আইন-কানুন ও আদেশ নিষেধ বাস্তবায়ন করা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক-বিভাগে আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী শরীয়াহ কায়েম করার মাধ্যমেই আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যে যতটুকু আল্লাহর আইন মানে, সে ততটুকুই আল্লাহকে

ভালবাসে। যে যতটুকু আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মানব রচিত আইন মানে, সে ততটুকু গায়রুল্লাহকে ভালবাসে, সম্মান করে। একজন মোমেনের জীবনে একই সময় কাবাকেন্দ্রিক জীবন এবং কা'বা বিরোধী জীবনের দু'টো বিপরীতমুখী ধারা থাকা সম্পূর্ণ অনুচিত, বরং তা ভুল ও অজ্ঞতাপূর্ণ।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে কা'বা-কেন্দ্রিক জীবনের আদর্শ তথা কুরআন এবং হাদীসের পরিপূর্ণ প্রতিফলন না ঘটালে, কা'বায় এসে কোন লাভ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়তের ২৩ বছরের যিন্দেগীতে এই কাবা-কেন্দ্রিক আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে কা'বাকে রেখে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত এমনকি কা'বার ভেতর বসে শত বছর এবাদত করলেও মিনা-মোযদালেফা এবং আরাফাতের পবিত্র ময়দানসমূহে যুগ যুগ ধরে হাজিরা দিলেও কোন লাভ হবেনা। বরং কা'বায় হাজিরা দেয়ার সময় পূর্ণাঙ্গভাবে, কাবা-কেন্দ্রিক জীবন গড়ার শপথ নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত যিন্দেগীই হচ্ছে কা'বা কেন্দ্রিক জীবনের বাস্তব উদাহরণ। তাঁরা নিজেদের জীবনে কোরআন সুন্নাহর আইনের বিপরীত কোন মত ও পথের অনুসরণ করেননি।

আমাদের কর্তব্য হল, তাঁদের অনুসরণে ইসলামী শরীয়াহর বাইরের অন্য কোন মতবাদকে আমাদের জীবনের কোন ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রেও গ্রহণ না করা। বরং ইসলামের অপরিহার্য আদেশ-নির্দেশগুলো পালন করা প্রয়োজন এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে দূরে থাকা অতীব জরুরী। ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া এবং এহসানের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য একজন মোমেনকে সর্বদা আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো মানতে হবে।

অপরদিকে, কা'বার শিক্ষা তথা ঈমান ও ইসলামকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ, ইল্‌ম ও জ্ঞানের প্রচার এবং দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে জান-মাল দিয়ে সর্বাত্মক জিহাদে অংশ নেয়া জরুরী। কা'বা কেন্দ্রিক জীবনের অনুসারী রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবায়ে কেরাম এবং ইমামগণ এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

এই কা'বায় হাজিরা দিয়েছেন আল্লাহর অগণিত নবী-রাসূল এবং নেক বান্দাহগণ। মক্কা নগরী হচ্ছে আল্লাহ-প্রেমের নগরী। সবাই আল্লাহর রহমতের এই বিশ্ব দরবারে হাজিরা দিয়ে অনুগ্রহভাজন হয়েছেন। নেককারগণ এখানে এসে নিজেদের

নেক এর পাল্লা ভারী করেছেন। আর পাপীরা এসে নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়েছেন।

কিন্তু রহমতের এই দরবার থেকে বঞ্চিত দুর্ভাগ্য লোকের মিছিলেও রয়েছে অনেক মানুষের ভিড়। তারা ক্ষমার কেন্দ্রে এসেও ক্ষমা পায়নি কিংবা ক্ষমা পেলেও ঘরে ফিরে গিয়ে কা'বার শিক্ষা ও দাবী অনুযায়ী নিজের জীবনকে নতুনভাবে পরিচালনা করেনি। পরশ পাথরের স্পর্শ পেয়েও তার সংস্পর্শে এসে নিজে সোনা হয়নি এবং নিজের পাপ কালিমা দূর করেনি।

কিন্তু কা'বা সফরের স্বাভাবিক দাবী হল, পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ঈমানী ও ইসলামী যিন্দেগী তথা কাবা-কেন্দ্রিক জীবন গঠন করা।

এ প্রসঙ্গে আমরা কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ . اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ (توبة- ٢٠-١٩)

অর্থ ঃ 'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের আবাদকে সেই ব্যক্তির (কাজের) সমান জ্ঞান কর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে? তারা আল্লাহর কাছে কখনও সমান নয়। আল্লাহ জালেম কাওমকে হেদায়াত দান করেন না। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের সম্মান অনেক বেশী এবং তারাই সফল।'

এই আয়াত দু'টোতে আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও হিজরতকারীদের মর্যাদা হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের আবাদ কার্যক্রম থেকে উত্তম। শুধু তাই নয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীই সাফল্য লাভ করবে। তাই ইসলামের অন্যান্য ফরজ ও আবেদনগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু মসজিদে হারামে এসে হাজিরা দিলে কোন লাভ হবে না। এজন্য অন্যান্য সকল এবাদত এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধগুলোকে মেনে চলা দরকার।

তাই কবি বলেছেন,

যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কাভূমি
সেখানেও সে রবে গাধা,
জেনে রাখ তুমি।

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) এর মত মহান নবীর সাথে তাঁর গাধাটিও মক্কা যেয়ারত করলে তাতে গাধার কি কোন উপকার হয়? গাধা গাধাই থেকে যায়, সে কোনদিন উপকৃত হতে পারে না এবং না তার জীবনে কোন পরিবর্তন আনতে পারে।

হাজী সাহেবানের জীবন যেন ঐরূপ না হয়, বরং হজ্জের পরবর্তী জীবন হবে কোরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ নতুন ও পরিবর্তিত জীবন। হজ্জ কবুল হলে হজ্জ পরবর্তী জীবনে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তখন তিনি নেক কাজের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়েন এবং পাপ কাজ থেকে দূরে থাকেন। কবুল হজ্জই সবার কাম্য।

হজ্জের সাথে কোরআনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কোরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে রমজানে, আর সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে আরাফাতের দিন হজ্জে। তাই একজন হাজী আরাফাতের ময়দান থেকে পূর্ণাঙ্গ কোরআনের দীক্ষা ও শিক্ষা বাস্তবায়নের কঠোর শপথ নেবেন।

আল্লাহর রহমত ও হেদায়েতের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কা'বা শরীফ ও মসজিদে হারামে আসতে না পারলেও তিনি সবাইকে কা'বাকেন্দ্রিক জীবন গঠনের তওফীক দিন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. تَارِيْخُ مَكَّةَ ـ اَحْمَد اَلسَّبَاعِيْ .

২. اَخْبَارُ مَكَّةَ فِى قَدِيْمِ الدَّهْرِ وَحَدِيْثِهِ ـ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُبْنِ اِسْحَاقَ الْفَاكِهِىْ .

৩. زَمْزَمْ . يَحْى كُوْشَكْ .

৪. تَارِيْخُ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . حُسَيْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَاسَلاَمَةَ .

৫. اَلْعِقْدُ الثَّمِيْنُ فِى تَارِيْخِ الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ . تَقِىُّ الدِّيْنِ مُحَمَّدُبْنِ اَحْمَدُ اَلْفَاسِىْ .

৬. تَارِيْخِ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُوْدِيَّةِ فِى مَاضِيْهَا وَحَاضِرِهَا – صَلاَحُ الدِّيْنِ اَلْمُخْتَارِ .

৭. صَقْرُ الْجَزِيْرَةِ – اَحْمَدُ عَبْدِ الْغَفُوْرِعَطَّارِ .

৮. فِى رِحَابِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ .دَ. مُحَمَّدْ عَلَوِىْ مَالِكْ .

৯. صَحِيْحُ الْبُخَارِى / اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِسْمَاعِيْلُ الْبُخَارِىْ .

১০. اَلرَّحِيْقُ الْمَخْتُوْمِ . صَفِىُّ الرَّحْمٰنِ اَلْمُبَارَكْبُوْرِىْ .

১১. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা' মওদূদী।

১২. হজ্জের হাকীকত। ঐ

১৩. The Life of the Prophet Mohammad (sm), Laila Azzam & Aisha Governor.

১৪. اَخْبَارُ مَكَّةَ . اَبُوالْوَلِيْدِ الْاَزْرَقِىْ .

১৫. المتجرالرابح فى ثواب العمل الصالح .الحافظ أبُوْمحمدشرف الدين عبدالمؤمن الدمياطى.

১৬. حَجَّةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَحْمَدُ عَبْدُ الْغَفُوْرِعَطَّارِ .

১৭. মাআরেফুল কোরআন, মুফতী মোহাম্মদ শফী।

১৮. تَارِيْخُ الرُّسُلِ وَالْمُلُوْكِ ـ اِبْنُ جَرِيْرُ اَلطَّبَرِىْ .

১৯. اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ـ اِبْنُ كَثِيْر .

২০. عُمْدَةُ الاَخْبَارِ فِى مَدِيْنَةِ الْمُخْتَارِ ـ اَلنَّاشِرُ ـ سَيِّدْ اَسْعَدُ دَرَبْزُوْنِى .